কথা কল্পনা কাহিনী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

পরমকল্যাণীয়া

ভারতী, চন্দ্রা, গীতা, কল্পনা, চিত্রা

চিরসৌভাগ্যবতী বধূমাতাদের

করকমলে—

প্রকাশকের নিবেদন

'কথা কল্পনা কাহিনী' শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোট গল্পের একটি সুবৃহৎ সংকলন। গজেন্দ্রকুমারের ছোট গল্পের সংখ্যা পাঁচশতাধিক। বাংলা সাহিত্যে গল্পকার রূপে তাঁহার স্থান ও তাঁহার গল্পের আলোচনা ভূমিকাকার অন্যত্র করিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্পর জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। বহুদিন যাবৎই তাঁহার অনুরাগী অগণিত পাঠক ও সমালোচক তাঁহার গল্পের একটি সমগ্র সংকলন প্রকাশের কথা বলিতেছেন। সেই কারণেই আমাদেরও সুগভীর বাসনা ছিল তাঁহার সমস্ত গল্পগুলি কয়েকখণ্ডে প্রকাশ করিবার। কিন্তু কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা হেতু তাহা এতদিন সম্ভব হয় নাই। কিছুকাল পূর্বে সাধারণ বইয়ের জন্য সুলভ মূল্যের অল্প পরিমাণ কাগজ আমাদের হস্তগত হয়। আপাতত তাহা হইতেই প্রথম পর্য্যায়ে গজেনবাবুর ছোট গল্পের এই সংকলনটি বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল। অতএব এই গ্রন্থটিকে গজেন্দ্রকুমারের ছোট গল্প সংকলনের প্রথম পর্যায় বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কথা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট বিশেষ ভাবে নিবেদন করিবার আছে যে, এই গল্পগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে অন্য কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। গল্পগুলি নির্বাচনের সময়ও বিভিন্ন রসের বৈচিত্র্য-মূলক গল্পগুলিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে একটি গ্রন্থ হইতেই পাঠকেরা বিচিত্র বিভিন্ন রস উপভোগ করিতে পারেন। ভবিষ্যতে আবারও সুলভ কাগজের প্রাপ্তি সম্ভাবনা ঘটিলে আমরা পরবর্তী কটি পর্য্যায়ে গজেন্দ্র-কুমারের অন্যান্য ছোটগল্পগুলি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিব, আপাতত এইটুকুই জানাইয়া রাখিলাম। ইতি

সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

[এই পুস্তকে ব্যবহৃত কাগজ ভারত সরকারের আনুকূল্যে সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত]

সূচীপত্র

অলৌকিক

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

প্রসন্ন-মধুর

চিত্ত ও চিত্র

ভূমিকা

গল্পশিল্পী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সাহিত্যে হাতে খড়ি মাত্র হয়েছে এমন লোকও আজকাল জানে এবং হামেশাই বলে থাকে যে উপন্যাসকে সংক্ষেপিত করে কখনও ছোটগল্পে পরিণত করা যায় না। এক সময়ে হয়তো কথাটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন ছিল, এখন আর নেই। কিন্তু এখন সকলকে, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যিকদের, যে-কথাটা বার বার বলে সতর্ক করে দেবার প্রয়োজন হয়েছে সে-কথাটা কেউ বড় একটা বলতে চান না। সম্ভবতঃ সাহসের অভাবই এর কারণ।

কথাটা এই: লিরিক কাব্যধর্মী গদ্য রচনা, স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ববিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদ বিশেষ, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ, অথবা রাজনৈতিক অনুচিন্তা—কয়েকটি পাত্রপাত্রী এবং কিছু সংলাপ সন্নিবেশিত করে এদের কোনটিকেই ছোটগল্পে পরিবর্তিত করে ফেলা যায় না।

জনৈক আমেরিকান সাহিত্যিক ও সমালোচক এই কথাটিকেই অন্য ভাবে বলেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক কালে এমন বহু ছোটগল্প লেখা হচ্ছে যাতে 'right bang before our eyes nothing happens.' এই ধরনের ছোট-গল্প পড়তে বা লিখতে তিনি আদৌ ভালবাসেন না।—'In every short story something must happen.'

Something must happen—কোন কিছু একটা ঘটা চাই। ঘটনাটা যেখানে খুশি ঘটতে পারে—জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বাস্তবে স্বপ্নে বা কল্পনায়, চিন্তা অথবা অনুভূতির-রাজ্যে, আকাঙ্ক্ষায় কিংবা আশঙ্কায়, লৌকিক কিংবা অলৌকিক জগতে; যেখানেই হোক্ না কেন, কিন্তু ঘটনা একটা ঘটা চাইই। এই 'ঘটনা'ই ছোটগল্পের প্রাণবস্তু, এবং উপযুক্ততর কোন অভিধার অভাবে একে আমরা বলতে পারি প্লট বা কাহিনী।

ছোটগল্পের এই 'কাহিনী' অংশ গল্পকারের মর্জি অনুযায়ী স্থূল কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা একটা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারও হতে পারে আবার সূক্ষ্ম অনুভূতি-গ্রাহ্য একটা উপস্থিতি মাত্রও হতে পারে। এই plot বা কাহিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গল্পে একটা বিচিত্র ধরনের গতিবেগের সঞ্চার হয় যার শিল্পসঙ্গত পরিণতি অথবা সমাপ্তিতেই গল্পের শেষ।

আজকাল একটা ফ্যাশানের সৃষ্টি হয়েছে কথাসাহিত্য-জগতে—ছোটগল্পে

নাকি প্লটের কোন প্রয়োজন নেই ; যাঁরা কোন রকম প্লট অবলম্বন করে গল্প রচনা করেন তাঁরা নাকি আধুনিক শিল্পী-সমাজে একেবারেই অপাংক্তেয়। তাঁদের অনুসৃত শিল্পপন্থা সেকেলে ও প্রগতি-বিরোধী।

ছোটগল্পের প্লট বলতে ঠিক কি বোঝায় একটু আগে তার একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই রকম কোন একটা প্লট যে গল্পে নেই তা কখনও রসোত্তীর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারে না।

কিন্তু এ বিশ্বাস বর্তমান কালের সকল সাহিত্যিকের নেই। ফলে আজকাল গাদা গাদা তথাকথিত 'প্লটহীন ছোটগল্প' রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। এ-জাতীয় ছোটগল্প যাঁরা পড়ার চেষ্টা করেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, এদের প্রধান লক্ষণ হল একটা অদ্ভুত ধরনের ক্লান্তিকর নীরসতা। এগুলি পড়ে শেষ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং শেষ করার পর পাঠকের মনে শিল্পোপভোগের আনন্দ বিন্দুমাত্রও সঞ্চারিত হয় না। তবু যাঁরা পড়েন তাঁরা ফ্যাশনের দাস বলেই তা করেন এবং তাঁদের প্রশংসাও ফ্যাশন-দুরস্ত আন্তরিকতাহীন কথার কথা মাত্র। সত্যকার রসগ্রাহিতার পরিচয় তাঁরা দিতে পারেন না, কারণ তাঁরা রসের সন্ধানী নন, 'হুজুগে সেপাই' মাত্র।

আমাদের অপরিসীম সৌভাগ্য যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় এই ফ্যাশনের স্রোতে কখনও গা ভাসিয়ে দেননি। প্লটহীন ছোটগল্পের রসোৎকর্ষে বা শিল্পোৎকর্ষে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই কিছু না কিছু একটা ঘটে থাকে—প্রত্যেকটি গল্পেই একটা প্রবহমাণ গতিধারার সন্ধান পাওয়া যায়, তা সে চিন্তা, অনুভূতি অথবা স্থূল ঘটনা যে-কোন শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, এবং সেই গতিধারার একটা শিল্প-সঙ্গত সমাপ্তিও কোন ক্ষেত্রেই দুর্লক্ষ্য নয়।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে প্লটের যে বৈচিত্র্য, শিল্পোৎকর্ষ ও বিশ্বাস্যতার পরিচয় আমরা সর্বক্ষেত্রেই পেয়ে থাকি তা সত্যই অতুলনীয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে অনুরূপ শিল্পগুণবিশিষ্ট ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এখন আর বড় একটা কেউই লিখতে পারেন না।

বস্তুতঃ প্লট-পরিকল্পনার মৌলিকতায় এবং প্লট-পরিবেশনের নৈপুণ্যে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন সাহিত্যিক আছেন বলে আমার জানা নেই।

শুরুতেই প্লটের কথা বললাম বলে কেউ যেন মনে না করেন যে গজেন্দ্রকুমার একমাত্র প্লট-সর্বস্ব গল্পই লিখে থাকেন, অথবা প্লট-সর্বস্বতাই তাঁর গল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। গল্পকার হিসাবে উদ্ভাবনী প্রতিভা ছাড়াও বহু গুণের সমন্বয় ঘটেছে

তাঁর মধ্যে। এইবার তারই কতকগুলোর উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটির কথা মনে পড়ছে সেটি হল তাঁর গল্প-কল্পনার অসাধারণ ব্যাপ্তি বা পরিসর—ইংরেজিতে যে গুণটি বোঝাবার জন্য range শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এমন একাধিক বাঙালী সাহিত্যিকের নাম করা যায় যাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ের গল্প রচনা করেছেন এবং এখনও করছেন কিন্তু যাঁদের গল্পের জগৎ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কেউবা বেছে নিয়েছেন নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন, কেউবা অতীত ইতিহাস-কাহিনী ছাড়া অন্য কোন গল্প-বস্তুতেই রস-সঞ্চার করতে পারেন না, কারও দৃষ্টি একমাত্র পল্লীসমাজ ও পল্লীজীবনের উপরেই নিবদ্ধ, আবার কেউ কেউ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ব্যতীত আর কোন শিল্প-সামগ্রীর সদ্ব্যবহারে অক্ষম। এঁদের রচনায় হয়তো গভীরতার অভাব নেই কিন্তু ব্যাপ্তির অভাব অত্যন্ত সুপ্রকট। এই অভাবকে এক জাতীয় কল্পনাদৈন্যই বলা চলে।

গজেন্দ্রকুমারের শিল্প-কল্পনা এই দৈন্য থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত—সত্যই তা সর্বত্রগামী, স্বচ্ছন্দচারী। সুদূর অতীতের মহাভারতীয় যুগের যদুবংশ-ধ্বংস থেকে এই সেদিনের নকশাল হাঙ্গামা পর্যন্ত, বাদশা-বেগম-বাদশাজাদাদের ঐতিহাসিক অভিজাত সমাজ থেকে শহরতলির কানাগলির দরিদ্র কেরানী-পরিবার পর্যন্ত, কাঞ্চন-কৌলীন্যের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত শিল্পপতির গোপন অন্তর্বেদনা থেকে অধ্যাত্ম-সম্পদ-সন্ধানী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আকস্মিক পদস্খলন পর্যন্ত, নিভৃত অন্তঃপুর থেকে জনাকীর্ণ হাট-বাজার পর্যন্ত, বস্তুনিষ্ঠার দুই-এ দুই-এ চার থেকে অলৌকিক রহস্যের অশরীরী হাতছানি পর্যন্ত—কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না, সব কিছুকেই তিনি অতি অনায়াসে তাঁর গল্পের বিষয়ীভূত করে নিতে পারেন। দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপাততঃ আমি চারটি মাত্র গল্পের নাম করেই ক্ষান্ত হব—বহু-প্রশংসিত 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্', হিমালয়-হরিদ্বারের পট-ভূমিকায় রচিত 'সময়ের বৃন্ত হতে খসা', মহাভারত-কথার নবরূপায়ণ 'জরা ও ও বাসুদেব' এবং সিপাহী-বিদ্রোহের অস্ত্রঝনৎকার-মুখরিত 'প্রাণের মূল্য'। একমাত্র গজেন্দ্রকুমারের গল্পের অনুরাগী পাঠক ব্যতীত আর কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে এগুলি সব একই লেখকের রচনা। বস্তুতঃ রচনা-শৈলীর অসামান্য নৈপুণ্য ব্যতীত এদের মধ্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া সত্যই দুরূহ।

এই বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি তাঁর কাহিনী নির্বাচনে, ঘটনাসংস্থানে, চরিত্রসৃষ্টিতে, পরিবেশ-রচনায় ও রস-পরিবেশনে সর্বত্রই সুপ্রকট। তথাপি রসগ্রাহী পাঠক অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে তাঁর গল্প-পরিধির ঈষৎ সংকোচন লক্ষ্য না করে পারেন না।

সেই দুটি ক্ষেত্রের উল্লেখ এখানেই করে রাখা ভাল। কেবলমাত্র শিশুজীবন ও শিশুমনকে অবলম্বন করে তিনি বোধ হয় একটি গল্পও রচনা করেননি—গল্পকার হিসাবে বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে রাজ্যের অবিসংবাদী সম্রাট, সে রাজ্যে গজেন্দ্রকুমার কখনও পদার্পণ করেননি। তা ছাড়া অতি-বিত্তবান অভিজাত-জীবনকে ভিত্তি করেও তিনি গল্প রচনা করেননি। অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের বিরল ব্যতিক্রম যে দুই-একটি নেই এমন নয়।

গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যের কথা বলেছি। বস্তুতঃ তাঁর চরিত্র-চিত্রশালায় প্রবেশ করলে বহু বিভিন্ন ধরনের নরনারীর ভিড়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠতে হয়; ঠিক একই রকমের দুটি মাত্র চরিত্রও তার মধ্যে খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু গল্প গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় তিনি এই বহু-বিচিত্র চরিত্রগুলিকে যে ভাবে ব্যবহার করে থাকেন তার মধ্যে একটা বিস্ময়কর ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পদৃষ্টি মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টি। তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পেই (পূর্ববর্ণিত অর্থে) একটা করে 'কাহিনী' আছে, কিন্তু তাঁর চরিত্রভিত্তিক গল্পগুলির অধিকাংশই ঠিক কাহিনীনির্ভর নয়। যেখানেই তিনি সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন সেখানেই দেখা যাবে এই চরিত্রাঙ্কনের একমাত্র উদ্দেশ্য চরিত্রের অন্তর্লোকের সন্ধান—তাঁর এই জাতীয় গল্পের প্রধান উপজীব্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মানুষের মন এবং সেই মনের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন।

পাত্রপাত্রীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ব্যাপারে কিন্তু গজেন্দ্র মিত্র গতানুগতিক পন্থার পথিক নন। মানুষের মন-ন্যামধেয় বস্তুটাকে অপারেশন থিয়েটারের টেবিলে ফেলে চেরাই-ফারাই করে, ব্যাখ্যা করে, বক্তৃতা দিয়ে তিনি তার তত্ত্বটাকে পাঠকদের সহজবোধ্য করে তুলতে চান না। তাঁর গল্পের মনস্তত্ত্ব দধিমন্থন জাত মাখনের মত আপনিই উপরে ভেসে ওঠে—আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে আপনিই প্রকাশিত হয়, পাঠকের রসবোধগ্রাহ্য রূপ ধারণ করে। সব পাঠকই যে গণ্ডমূর্খ নয়, তাদের অনেকেই যে কিয়ৎপরিমাণে রসগ্রহণ-শক্তির অধিকারী একথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

বহির্জীবনের নানা ঘটনার সংঘাতে মানুষের অন্তর্জীবনে অনেক সময় যে প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, চিন্তা ও অনুভূতির জগতে যে সব জট পাকিয়ে ওঠে বহু ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রূপ ধরে আবির্ভূত হয়। গজেন্দ্র মিত্রের অনেক গল্প এই জটিলতার কারণ নির্ণয় ও স্বরূপ বর্ণনা করেই শেষ হয়ে যায়, এবং তার ফলে পাঠকের মনে এমন একটা ট্রাজিক বিষণ্ণতা ও তিক্ত নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে

ওঠে যার নিরসন বা অবসান লেখকের অভিপ্রেত নয় বলেই মনে হয়। 'বিগত-যৌবন' গল্পের বড়বাবুর চরিত্রটি এমনি ধরনের নীরন্ধ্র নৈরাশ্যময় ব্যর্থতার ক্ষোভে ও বেদনায় সকরুণ হয়ে উঠেছে এবং সেই ব্যর্থতার পরিণত তীব্রতর ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।—আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখক নিজেই এই জটিলতার গ্রন্থিমোচন করে দিয়েছেন, পরিণতিতে একটা শিল্পসঙ্গত সমাধান বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সমাধানের রূপও সর্বত্র এক রকম নয়। 'বিন্দু'পিসী' গল্পের নায়ক একটি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। তার জীবনে মর্মান্তিক ট্রাজেডির উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই ট্রাজেডির ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল একটা অতি পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ও অপ্রীতিকর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। কিন্তু উপসংহারের সমাধানের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, নায়ক নিজেই এই জটিলতার সরলীকরণে সক্ষম হয়েছে—তার জীবনের জমিতে সাফল্যের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে।—'আকৃতি ও প্রকৃতি' গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে কৌতুক-রসাশ্রিত। স্বর্গত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মত লেখকের হাতে পড়লে যমজ ভগিনীদ্বয়ের যমজ স্বামীদের এই কাহিনীটি হয়তো বিশুদ্ধ হাসির গল্পেই পরিণত হতে পারত। কিন্তু গজেন্দ্রকুমার গল্পের শেষাংশে এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ কষে দিলেন যা মুহূর্তের মধ্যে হাসির অমৃতকে কলুষিত কামনার হলাহলে রূপান্তরিত করে ফেলল। পরিণামে অবশ্য একটা মোটামুটি সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা গোপন কাঁটার খচ্‌খচানি রয়ে গেছে—মনে হয় চিরদিনই রয়ে যাবে।—'সর্পিল' গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে নায়কের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যায়; সব সমস্যার চরম সমাধান হয়েছে চরম ট্রাজেডির মধ্যে।—আর 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্‌' গল্পের নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানে দেখি সুগোপন স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সে মহত্ত্বের প্রথম সোপানে পদার্পণ করেছে; তার সামনে সংশয়-সমস্যার অন্ধকার অবসিতপ্রায়, আসন্ন ঊষার আলোয় তার সমগ্র সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

গজেন্দ্র মিত্রের শিল্পজগৎ সত্যই বহু-বিচিত্রের জগৎ। সেখানে এক মানুষ দুবার দেখা যায় না, এক ঘটনা দুবার ঘটে না, এক কথা দুবার শোনা যায় না—তাঁর আসরে নিত্যই বহুরূপীর মেলা।

গজেন্দ্রকুমারের শিল্প-বিপণির অন্যতম প্রধান পণ্য মানুষ ও মানুষের মন হলেও বিশুদ্ধ কাহিনী-নির্ভর ছোটগল্পও তিনি বড় কম লেখেননি। এই জাতীয় গল্পে সাফল্য অর্জন করতে হলে ঘটনা-উদ্ভাবনে, ঘটনা-বিন্যাসে ও ঘটনা-সংঘাত সৃষ্টিতে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রয়োজন। সে নৈপুণ্য তাঁর অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এই শিল্পপদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পেই সার্থক ভাবে

ব্যবহৃত হয়েছে—তাও শুধু হাসির গল্পে। গজেন্দ্র মিত্র এর প্রয়োগ করেছেন নানা রসের গল্পে, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই সে প্রয়োগ পূর্ণ সার্থকতা দাবি করতে পারে।

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের, বিশেষ করে বৃটিশ আমলের কেরানী-জীবনের দৈন্য ও গ্লানি বর্ণনায় এই পদ্ধতি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হতে পারে—যেমন হয়েছে সেকালে লেখা 'কাউল কাটলেটের ইতিহাস' অথবা 'সাতটি পয়সার মূল্য' গল্পে। যে সব গল্পের সমাপ্তি ঘটে সকল জুয়াচুরি বা অন্তবিধ অপরাধের অনুষ্ঠানে তার ঘটনা-বিবর্তন কৌতুক-রসাশ্রিতই হোক বা ঈষৎ গা-ছম্‌-ছম্‌-করা আতঙ্ক-মিশ্রিতই হোক সেগুলির বেলায় এই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাভঙ্গিই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং আমাদের লেখক তা বেশ ভাল করেই জানেন। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে 'চাকর', 'অন্ধকারের ভয়ঙ্কর' এবং 'কৌতূক ও কৌতূহল'-এর মত গল্পে—যদিও শেষ গল্পটিতে উপসংহারের মর্মন্তুদ ট্রাজেডি একটা গভীরতর বেদনার্ত অনুভূতি সঞ্চারিত করে দেয় পাঠকের মনের মধ্যে।

আর এক জাতীয় গল্পে গজেন্দ্রকুমার এই বিষয়মুখী (objective) শিল্প-পদ্ধতির প্রয়োগে বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন—তাঁর অলৌকিক রসের অর্থাৎ ভৌতিক গল্পগুলিতে। এই শ্রেণীর গল্পের কথককে যদি নায়ক বলে বর্ণনা করা যায় তাহলে সে নায়ক নেহাৎ নিষ্ক্রিয় নায়ক। সে নিজে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত করে না, কোন কার্যকারণ-শৃঙ্খলের প্রারম্ভ-প্রান্ত তার হাতে নেই—সে ঘটনার নিয়ন্তা নয়, ঘটনার দাস মাত্র। তাকে ঘিরে ঘটনাবর্ত সৃষ্টি হয়—এইটুকুই শুধু তার ভূমিকা। কাজেই তার পূর্ণাঙ্গ চরিত্রাঙ্কন বা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ শিল্পবিচারে সম্পূর্ণ অবান্তর। বাকি রইল মাত্র ভূত-প্রেতের দল। তাদের চরিত্র অথবা মনস্তত্ত্ব নিয়ে কারবার করা কি মানুষ-শিল্পীর পক্ষে সম্ভব? (তবে গজেনবাবু অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'অন্তহীন যাত্রা' গল্পে রেলপথের সহযাত্রিণী তাম্বূল-চর্বণরতা সেই মহিলা প্রেতিনীটির আলাপন ও আচরণের বর্ণনা পড়ার পর কারও পক্ষেই বোধ হয় তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকা সম্ভব হবে না—তাঁর চিত্র বা চরিত্র কোন পাঠকই সহজেই বিস্মৃত হতে পারবেন না।) গজেন্দ্রকুমার অনেকগুলি ভূতের গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে আমার মতে 'রহস্য', 'এপার ও ওপার' এবং 'মরণের পরেও' সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর এক ধরনের অলৌকিক-রসাশ্রিত গল্প তিনি লিখেছেন। এগুলির প্রধান চরিত্র প্রায় সর্বত্রই সন্ন্যাসী, মহাত্মা, সাধু-সন্ত বা ঐ শ্রেণীর সর্বত্যাগী মানুষ। এঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতাকে বিষয়বস্তুরূপে অবলম্বন করে এগুলি রচিত হয়েছে। পড়লেই বোঝা যায়, কাহিনীগুলি কল্পনাসৃষ্ট হলেও,

অনুরূপ পরিবেশে বাস্তব জীবনেও যে এরকম অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে এ সম্বন্ধে লেখকের নিজের কোন সন্দেহ নেই। তিনি বিশ্বাসী মানুষ, এবং তাঁর বিশ্বাসে আধুনিক সন্দেহবাদের খাদ বিন্দুমাত্র মিশ্রিত নেই।—এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে 'সাধু ও সাধক', 'নিশির ডাক' এবং 'সময়ের বৃন্ত হতে খসা' এই তিনটি গল্পের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। পাঠক যদি লেখকের বিশ্বাসটুকুকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারেন তাহলেই বুঝতে পারবেন এই সব গল্পে কি অপরূপ শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এদের মধ্যে তৃতীয় গল্পটিকে গজেনবাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের রচনাবলীর অন্যতম বলে বর্ণনা করলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না।

এই জাতীয় গল্পগুলির মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে এদের ঘটনাস্থল সর্বক্ষেত্রেই হয় কাশী নয়তো হরিদ্বার—যে দুটি স্থান সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা সুপ্রচুর, প্রায় স্থানীয় অধিবাসীদেরই অনুরূপ। ঘটনা যতই অলৌকিক হোক না কেন তাকে পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে তুলতে হলে তার অবস্থিতি ও পরিবেশ যে পরিচিত বস্তুজগতে হওয়াই বাঞ্ছনীয় একথা তিনি কদাপি ভুলে যান না।

ইংরেজিতে অনেক ভাল ভাল ভূতের গল্প লেখা হয়েছে। যাঁরা এই সব গল্পের অনুরাগী পাঠক তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনানৈপুণ্য এগুলির শিল্পোৎকর্ষের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। এই বর্ণনায় সাধারণতঃ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়, এবং ভাষার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতাই অনেক সময় অলৌকিক সংঘটনগুলির জন্য পাঠকের মনকে আগ্রহী করে তোলে, অবিশ্বাস্যকে বিশ্বসনীয় করে উপস্থাপিত করে, এক ধরনের শৈল্পিক illusion of reality সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এই জাতীয় গল্পের শিল্প-সাফল্য অনেকাংশে প্রাকৃতিক পরিবেশ-বর্ণনার উপরেই নির্ভর করে।

গজেন্দ্র মিত্রের ভৌতিক কাহিনীগুলি কিন্তু এই সাধারণ নিয়মটিকে প্রায় কখনই মেনে চলে না। পাঠককে শুরুতেই তিনি ঘটনার রাজ্যে নিয়ে চলে যান —উপক্রমণিকাপর্বে বড় জোর কিছু প্রাথমিক ঘটনা বা সংলাপ ব্যবহার করেন, কিন্তু বিস্তারিত প্রকৃতি-বর্ণনা বা পরিবেশ-বর্ণনা দিয়ে গল্প শুরু করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ বলেই মনে হয়। এর একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমার নজরে পড়েছে—পূর্বে উল্লিখিত 'অন্তহীন যাত্রা' গল্পে।

শুধু অলৌকিক রসের গল্পে নয়, গজেন্দ্রকুমারের কোন গল্পেই প্রকৃতির

তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি না। বাস্তব জীবনে যিনি ক্লান্তিহীন পর্যটক ছিলেন এবং আংশিক ভাবে এখনও আছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু চোখ ভরে বারংবার দেখেও যাঁর আশ মেটে না, তাঁর রচনায় প্রকৃতির এই অনুপস্থিতি সত্যিই বিস্ময়কর।

কিন্তু কথাটা সত্য। এই অভাবটিকে অনেকে হয়তো একটা বড় রকমের ত্রুটি বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত যে হ্রস্বায়তন ছোটগল্পের আধারে প্রকৃতিকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অত্যন্ত দুরূহ এবং গজেনবাবুর মতে বোধ হয় খুব বাঞ্ছনীয়ও নয়। তাঁর কোন গল্পই আয়তনে বেশি দীর্ঘ নয়। এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার এও একটা কারণ হতে পারে। —গদ্যে প্রকৃতি-বর্ণনায় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় সিদ্ধহস্ত শিল্পী দ্বিতীয় আর কেউ নেই। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তিনিও, দুই-একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ ছোটগল্পেই প্রকৃতি-বর্ণনা ব্যাপারে অনুরূপ কার্পণ্য প্রদর্শন করেছেন—যদিও পরিবেশ-বর্ণনায় তিনিও গজেন্দ্র মিত্রের মত অতটা মিতবাক নন।

সাহিত্যের পুরাতনতম কথাবস্তু প্রকৃতি ও প্রেম। কাজেই গজেন্দ্র মিত্রের গল্পে প্রকৃতির স্থান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তাঁর প্রেমের গল্প সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি।—তাঁর রচিত গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রেমের গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিক আবির্ভাব কোন পাঠকেরই দৃষ্টি এড়াতে পারে না। প্রেমের গল্প তিনি বহু লিখেছেন। কিন্তু 'boy meets girls'-জাতীয় রোমান্টিক প্রেমের গল্প তিনি বোধ হয় একটিও লেখেননি। তাঁর রচনায় সর্বজাতীয় নায়কের গৃহদ্বারেই একবার না একবার প্রেমের রস এসে থেমেছে, কিন্তু সে রস জীবনের প্রশস্ত রাজপথ ধরে আসেনি—এসেছে জটিল মনস্তত্ত্বের সংকীর্ণ অন্ধকার কানাগলি দিয়ে : প্রেমকে অনেক লেখকই বিষামৃতের সংমিশ্রণ বলে বর্ণনা করেছেন ; গজেনবাবুর গল্পে বিষের ভাগটা একটু বেশি পরিমাণে পাই—অমৃতের আনন্দ ও প্রশান্তির চেয়ে বিষের জ্বলুনিটাই বেশি পরিমাণে অনুভূত হয় তাই তাঁর লেখা প্রেমের গল্প প্রায় সবই দুঃখের গল্প—কোন কোনটি পুরোপুরি ট্রাজিক গল্প।

তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়ে দাঁড়ায় যে গল্প পড়ে শেষ করার পরে পাঠক বুঝতে পারে না, সে যা এইমাত্র পড়ল সেটা একটা প্রেমের গল্প। প্রেমের গল্পকে এই ভাবে ছদ্মবেশ পরিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করার ক্ষমতা একটা দুরূহ আর্ট এবং গজেন্দ্রকুমার এই আর্টটি অতি উত্তমরূপেই অধিগত করেছেন।

দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি অতি ভয়ঙ্কর একটা আত্মহত্যার রহস্য-গল্প। কিন্তু গল্পের মেরুদণ্ড গঠিত হয়েছে একটা প্রেম-কাহিনী দিয়ে—প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতার ও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকাময় কাহিনী দিয়ে—'রহস্য' গল্পটি অলৌকিক রসের গল্প হলেও তার মর্মকেন্দ্রে নিহিত আছে একটি সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যর্থ প্রেমের নিরুদ্ধ হাহাকার।—'প্রাণের মূল্য' গল্পে আপাতদৃষ্টিতে একটি দরিদ্র অশিক্ষিত তরুণীর কৃতজ্ঞতার ঋণ-পরিশোধের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু সেই কাহিনীর অন্তরালে যে অস্ফুট প্রেমের অকাল মৃত্যুর হুতাশ্বাস অনুভূত হয় কোন রসিক পাঠকের পক্ষেই তা দুর্নিরীক্ষ্য নয়।—'কমা ও সেমিকোলন' গল্পে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধানে ধাবমান একজন খেয়ালী পুরুষের জীবনাভিযানের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে আমরা শুনতে পাই দুটি প্রেমমুগ্ধা তরুণীর আশাভঙ্গের নৈরাশ্যময় আর্ত ক্রন্দন।

সত্যই গজেন্দ্রকুমারের গল্পে প্রেমের গতি অতি অসরল, অতি কুটিল—তাঁর নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রেমের আবির্ভাব প্রায় সর্বদাই দুর্ভাগ্যের অশনি-সংকেত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

একটি গল্পের কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই যেটিকে তাঁর গল্পশিল্পের রাজ্যে একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। গল্পটিতে প্রেমের আবির্ভাব-কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি, বলা হয়েছে প্রেমের বিবর্তনের কথা—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে প্রেমের বাইরের রূপটা একেবারে বদলে যায় তারই কথা। তা ছাড়া এ গল্পে প্রেমের আকাশে অশনি-সংকেত দেখা দেয়নি, তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে পুরাতন উষার পুনরাবির্ভাবের আনন্দ-সম্ভাবনা। গল্পটির নাম 'নূতন ও পুরাতন'—প্রেমের গল্প হিসাবে এটি সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে স্থান দাবি করতে পারে। ঠিক এই শ্রেণীর গল্প গজেন্দ্র মিত্র খুব বেশি লেখেননি।

গজেনবাবু তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন ভারতীয় ইতিহাস-ভাণ্ডার থেকে। এগুলোকে অবশ্যই ঐতিহাসিক গল্প আখ্যা দিতে হবে, যদিও ইতিহাস-রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এদের একটিও রচিত হয়নি। সে রসের সন্ধান পাওয়া যাবে তাঁর ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে। এগুলির উদ্দিষ্ট রস মানব-রস। কতকগুলি গল্প ঐতিহাসিক নরনারীর ট্র্যাজিক প্রেমের উপাখ্যান; অধিকাংশই কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্তনে উদ্ভূত নিষ্ঠুর irony-র কবলগ্রস্ত বাদশা-বেগম, বাদশাজাদা-বাদশাজাদী ও আমীর-ওমরাহদের বিবরণী—কখনও বেদনাশ্রুসিক্ত কখনও বা আতঙ্ক-শিহরিত। অকল্পনীয় বিশ্বাস-ঘাতকতার কালিমা-লিপ্ত কাহিনী এবং মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মোৎসর্গের মহিমাদীপ্ত

কাহিনী দুইই ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর এই সব গল্পে ঠাঁই পেয়েছে।

এই জাতীয় প্লটের সন্ধানে গজেন্দ্র মিত্র হিন্দু যুগে অতি কদাচিৎ পদার্পণ করেছেন ; মুসলমান আমলে, বিশেষ করে মুঘল রাজবংশের অবসান-যুগেই তিনি তাঁর অধিকাংশ কথাবস্তু খুঁজে পেয়েছেন। এই যুগের ইতিহাসে অপ্রত্যাশিত নাটকীয় উত্থান-পতনের প্রাচুর্য এবং গ্লানিকর ও মহীয়ান উভয়বিধ মৃত্যুর মিছিলই বোধ হয় এই শোণিতরঞ্জিত অতীত দিনগুলিকে তাঁর এত প্রিয় করে তুলেছে।

এই যুগেরই অনুবৃত্তি হিসাবে তিনি সিপাহীবিদ্রোহের আওতায় এসে পড়েন এবং ভারতেতিহাসের এই বহ্নিশিখাদীপ্ত অধ্যায়টির শিল্পসম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। কিছুদিনের জন্ত সিপাহীবিদ্রোহের তীব্র নেশা তাঁকে একেবারে সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। একখানি সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তাঁকে লিখতে হয়েছিল ('বহ্নিবন্যা') ; তা ছাড়া গুটি দশ-বারো গল্প লিখে তবে তিনি এই দানবীয় মোহ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর মধ্যে দু-তিনটিকে বেশ বড় গল্পই বলা চলে। একটি অসাধারণ গল্প 'প্রাণের মূল্য' সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু মন্তব্যাদি করেছি।—এ ছাড়া কঠোরে-কোমলে মিশ্রিত একজন অত্যাশ্চর্য চরিত্রের বাঙালী কমিসারিয়াট-কেরানীকে কেন্দ্র করে রচিত 'মুখুজ্জে মশাই' ও মদ্যপ ছন্নছাড়া বৃদ্ধ অসিত মিস্তিরের যৌবনস্বপ্নের দীর্ঘশ্বাস-ম্রিয়মাণ 'এক রাত্রি' নামধেয় গল্প দুটি উল্লেখযোগ্য—অবিস্মরণীয়ও বলা চলে।

'থেমে যাওয়া সময়' গল্পটিকে লেখক নিজে সিপাহীবিদ্রোহের গল্প রূপেই গণ্য করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র চরিত্রের অস্তিত্ব-বন্ধন ব্যতীত সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে এ গল্পের কোন যোগসূত্রই নেই। আসলে এটি একটি অপ্রাকৃত কল্পনাভিত্তিক ফ্যানটাসি গল্প। পরিণতির অচিন্তিতপূর্ব চমক ভেঙে পাঠক বস্তুনিষ্ঠ বর্তমানে ফিরে আসার আগেই গল্প শেষ হয়ে যায়—কিন্তু রেশ রেখে যায় সমাধান-হীন সংশয়ের ও বিস্ময়ের। আমার যতদূর জানা আছে ঠিক এই ধরণের গল্প গজেনবাবু আর একটিও লেখেননি।

গজেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্পের সংখ্যা খুবই কম, এবং যে কটি হাসির গল্প তিনি লিখেছেন সেগুলিকেও শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে আমার মতে খুব উচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। (একটি গল্পের বেলায় অবশ্য এ মন্তব্য সত্য নয়—সেটি সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করছি।)

তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলির কথাবস্তু ও রচনাশৈলী দুইই অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ—

অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রেই তাদের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বেশির ভাগ গল্পে হাল্কা কৌতুক-রস সৃষ্টি করেই লেখক সন্তুষ্ট, তার বেশি কিছু করার চেষ্টা তিনি করেননি—যদিও 'ঘেরাও' গল্পটিতে হাস্যরস সৃষ্টির উপায় হিসাবে দুটি প্রতিবেশিনী মহিলার সামাজিক মর্যাদাঘটিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে চিত্র আঁকা হয়েছে সেটিও কম উপভোগ্য নয়।—'দুর্ঘটনা', 'চাকর', 'রাস্তা খরচ' 'অন্ধকারের ভয়ঙ্কর', 'হাসির গান' প্রভৃতি গল্প সার্থক হাস্যরসাত্মক গল্প, কিন্তু একমাত্র প্লটের মৌলিকতা ব্যতীত এগুলিতে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় নয়।

পূর্বে যে ব্যতিক্রমটির কথা একবার বলেছি সেটা হল 'জামাই চাই' নামক গল্পটি। এটিতে নানা দিক দিয়ে বেশ একটু অসাধারণত্ব লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর মৌলিকত্ব অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ধরনের, তা ছাড়া জামাতৃপদাকাঙ্ক্ষী তরুণ সন্ন্যাসীটির যে চিত্র লেখক এঁকেছেন তা সত্যই অত্যন্ত কৌতুকাবহ—তার কথাবার্তার অতি সপ্রতিভ ধরন-ধারণ, সমস্ত অস্বস্তিকর জেরার চটপট লাগসই উত্তর দেবার ক্ষমতা, এবং তার 'কোয়ালিফিকেশনের পরীক্ষা' দেবার নূতন পদ্ধতি সবই পাঠকের হাস্যোদ্রেক করে, এবং সে হাসি নির্মল হাসি হলেও বেশ একটু sophisticated হাসি। গল্পটিকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের হাসির গল্পের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে।

গজেন্দ্রকুমারের অনেকগুলি গল্পে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সম্বন্ধে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই, বেছে বেছে দুই-একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

কাশী ও হরিদ্বারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয় এবং সেই জন্য এই দুটি স্থানের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথা অলৌকিক রসের গল্প প্রসঙ্গে পূর্বেই বলেছি।—'সাহিত্যিকের মৃত্যু' ও অনুরূপ আরও কয়েকটি গল্পে তাঁর লেখক-জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট।—তরুণ বয়সে বেশ কয়েক বছর অর্থোপার্জনের ধান্দায় কলকাতার পাঠ্যপুস্তক-প্রকাশকের ক্যানভাসারের কাজ নিয়ে তাঁকে সুদূর মফঃস্বলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এই ভ্রাম্যমান জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বিবিধ প্রভাবই তাঁর অনেকগুলি গল্পে সুপ্রকট। প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে লেখা হয়েছে ভয়ঙ্কর-রসাশ্রিত গল্প 'রায়বাড়ির অতিথি', কৌতুক-রস-প্রধান চিত্র-জাতীয় রচনা 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' প্রভৃতি, এবং পরোক্ষ প্রভাব-সঞ্জাত রচনার মধ্যে নাম করা যায় 'চাওয়া ও পাওয়া', 'দ্বিতীয় পক্ষ', 'দুরাশা', 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' প্রভৃতি গল্পের। এর মধ্যে শেষ তিনটি গল্পকে গজেনবাবুর শিল্পনৈপুণ্যের চরম নিদর্শন

বলে বর্ণনা করলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তিনটিরই পরিবেশ পল্লী-অঞ্চলের খেয়াঘাট, যাকে তিনি নিজে 'পারঘাটা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আজন্ম শহরে অথবা শহরতলিতে মানুষ। এই পল্লী-পরিবেশ ও তদুপযুক্ত পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র ক্যানভাসায় জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন মুন্সিয়ানার সঙ্গে গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না।

গজেন্দ্র মিত্রের যখন পিতৃবিয়োগ হয় তখন তিনি নিতান্ত নাবালক। এর ফলে পারিবারিক অর্থ-স্বাচ্ছল্যের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হয়ে যায় এবং তাঁর বিধবা মাতা কয়েকটি সন্তান নিয়ে নিঃসম্বল নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। কাজেই তাঁর সমগ্র শৈশব অন্তঃপুরে মাতা ও তাঁর বান্ধবীদের সাহচর্যেই অতিবাহিত হয়। এই অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি আমরা তাঁর বহু গল্পে দেখতে পাই। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে অভাব-অনটন, দুঃখ-দৈন্য, কুশিক্ষা-কুসংস্কার, ভাল-মন্দ সব কিছু সম্বন্ধে তাঁর রচনায় যে অন্তর্দৃষ্টি ও সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় তার মূলে আছে এই শৈশব-অভিজ্ঞতার স্মৃতি। বস্তুতঃ পরবর্তী জীবনে যে সুবৃহৎ ত্রয়ী-উপন্যাস লিখে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি ও পুরস্কারাদি লাভ করেন ('কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে', 'পৌষ-ফাগুনের পালা') তাও এই অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচিত।—এ সব কথা অবশ্য আমার পূর্বেই জানা ছিল। যে কথা জানতাম না সেটা এই : উপন্যাস তিনখানি লেখার অনেক আগে তিনি দুটি ছোটগল্প রচনা করেন এবং এই দুটি গল্প থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ উপন্যাসত্রয়ের উদ্ভব হয়। দুটি গল্পেরই বিষয়বস্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা-জর্জরিত জীবনের সঙ্কীর্ণতার ও গ্লানিকর দুর্দশার নিষ্ঠুর বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী। দুটি গল্পই নারীচরিত্র-প্রধান. উপন্যাস তিনখানিও ওই একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। জনৈক বিখ্যাত সমালোচক এই ত্রয়ী-উপন্যাসকে নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী 'অন্তঃপুরের মহাকাব্য' আখ্যা দিয়েছিলেন; গল্প দুটিকেও ওই একই শ্রেণীর 'খণ্ডকাব্য' বলে অভিহিত করলে অন্যায় হবে না। এই বীজ গল্প দুটির নামও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—'কলকাতার কাছেই' এবং 'বন্দিনী'। যাঁরা গজেন্দ্র মিত্রের শিল্পী-জীবনের বিবর্তন-প্রক্রিয়া ভাল করে বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে গল্প দুটি অবশ্যপাঠ্য।

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় কোন কোন লেখক অল্প বয়সে মনস্তত্ত্বের গুপ্তসর্পের বিবর সন্ধানে এবং প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণে যে অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিতে অভ্যস্ত ছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা হারিয়ে গতানুগতিকতার সোজা পথে হাঁটতে শুরু করেন। গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্পে

এর বিপরীত বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তু-নির্বাচনে ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে কোনদিনই তাঁর সাহসের অভাব ছিল না, কিন্তু প্রকাশভঙ্গির বেলায় পূর্বে তিনি ঈষৎ সনাতনপন্থী ছিলেন। আজ তিনি প্রবীণ সাহিত্যিক—সুতরাং লোকে এই-ই প্রত্যাশা করে যে তিনি এখন অতি-সংযত, ভব্য-সভ্য, লেফাফা-দুরস্ত সাহিত্যই শুধু সৃষ্টি করবেন। কিন্তু এ প্রত্যাশা পূরণ তিনি করেননি। বয়েস ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ হয়েছেন—তার ফলে শিল্পবুদ্ধি পরিপক্বতা লাভ করেছে, কিন্তু জরার জড়ত্ব তাকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। ক্রমশঃ তাঁর সাহস বেড়েছে বই কমেনি; এ লক্ষণ তাঁর রচনায় বেশ কিছুদিন আগেই দেখা দিয়েছে এবং এখনও তা দিনে দিনে প্রস্ফুটতর হয়েই উঠছে। কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে।—বাংলা সাহিত্যে বার্ধক্য-চিত্রণ প্রায়শঃই আবেগাতিশয্য-দোষ দুষ্ট। বৃদ্ধবৃদ্ধার চরিত্র আমাদের গল্প-উপন্যাসে সাধারণতঃ হয় অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত ও সম্মানার্হ নতুবা অতিমাত্রায় খল ও কুচক্রী অথবা অতিমাত্রায় করুণ ও অশ্রু-সজল করে আঁকা হয়ে থাকে। কিন্তু গজেনবাবু তাঁর 'আদিম' গল্পে অতি-বার্ধক্যের যে ছবি আমাদের দেখিয়েছেন তার অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্করত্ব আমাদের অভিভূত করে ফেলে। করুণা হয়তো একটু হয়, কিন্তু তার সঙ্গে এমন একটা গা-ঘিন্-ঘিন্-করা অনুভূতি মিশ্রিত হয়ে আছে যে তাকে করুণা বলে চেনাই যায় না।—'জরা ও বাসুদেব' গল্পে আঘাতটা হানা হয়েছে আমাদের প্রথাসিদ্ধ ধর্মবিশ্বাসে। সত্যই অসমসাহসিক ব্যাপার। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণকে ব্যর্থ প্রেমের মনস্তাপদগ্ধ সাধারণ মানবরূপে, সামান্য জৈবিক দুর্বলতার শিকাররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ধর্মমতের এই জাতীয় বিরুদ্ধাচার ইউরোপীয় সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে অতি-সাম্প্রতিক যুগে।—অতি-সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির মারাত্মক ফলাফল 'বন্ধুমেধ' গল্পে যে ভাবে ভয়ঙ্কর রকমের অকপটতার সঙ্গে অঙ্কিত করা হয়েছে তাও খুব কম সাহসের পরিচায়ক নয়। আর এই সেদিন মাত্র প্রকাশিত হয়েছে (অমৃত, ৪ এপ্রিল, ১৯৭৫) অনুরূপ একটি অসমসাহসিক ছোটগল্প—'স্বর্ণমৃগ'। এ গল্পের উপজীব্য বস্তু যাকে ইংরেজিতে বিশেষার্থে বলা হয় facts of life—তাই; একজোড়া বিবাহবদ্ধ নরনারীর যৌনজীবনকে যে ভাবে সমস্ত ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে রঙ্গমঞ্চে টেনে আনা হয়েছে এবং যে পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। বিন্দুমাত্র কাপট্যের ছলনা নেই কোথাও অথচ শিল্প-সংযম কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি।

আজকাল অনেক অতি-তরুণ পাঠকের মুখেও গজেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের প্রশংসা শুনতে পাই। এ প্রশংসা উদ্দেশ্যমূলক স্তুতিভাষণ মাত্র নয়।

যদি কেউ হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসে, গজেন্দ্র মিত্রের রচনা-শৈলীর

(style-এর) বৈশিষ্ট্য কি, আমি বোধ হয় তড়িঘড়ি সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। অনেক চিন্তার পর হয়তো আমাকে বলতে হবে, বৈশিষ্ট্যহীনতাই বোধ হয় তাঁর ভাষাপ্রয়োগ-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনা-শৈলির মধ্যে সচেতন শিল্পপ্রচেষ্টার চিহ্নমাত্র নেই। বিষয়বস্তু ও চরিত্রের টানে তা আপনিই এসে আবির্ভূত হয়। তাঁর লেখায় তিনি কখনও purple patches, অর্থাৎ অতি বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ বর্ণনা ব্যবহার করেন না। অবশ্য এই জাতীয় বর্ণনার ব্যবহার যে সর্বক্ষেত্রেই দোষাবহ ও পরিত্যাজ্য তা নয়। স্বর্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এই ধরনের ভাষা ও বর্ণনার চিত্তাকর্ষক, চমকপ্রদ ও শিল্পসঙ্গত ব্যবহার বহুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গজেনবাবু purple patches পছন্দ করেন না। তাঁর শিল্পধর্ম ভিন্ন জাতের। স্বচ্ছ, সরল, নিরলঙ্কার বর্ণনা ও সংলাপই তাঁর ভাষা-শিল্পের বিশেষত্ব। এখানে ওখানে সামান্য দুই-একটি ইঙ্গিত, হয়তো একটু বিদ্রূপের বাঁকা হাসির ঝিলিক, হয়তো বা ঈষৎ কাব্যরসের ছোঁয়াচ—তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার হয় না। ইংরেজিতে একটা কথা সাহিত্য-শিল্প-সমালোচনায় প্রায়ই বলা হয়ে থাকে—'Great art consists in the ability to conceal all art,' গজেন্দ্র মিত্রের রচনাশৈলী সম্বন্ধে কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য।

পরিশেষে ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ হিসাবে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

গল্পকার হিসাবে গজেনবাবুর উৎপাদন-প্রাচুর্য সত্যই বিস্ময়কর। জীবনে এত ছোটগল্প তিনি লিখেছেন যে তার একটা যথাযথ হিসাব কেউ রাখতে পেরেছে বলে শুনিনি—তিনি নিজেও বোধ হয় পারেননি। কেউ যদি বলে যে তাঁর সব গল্প সে পড়েছে এবং সব গল্প তার মনে আছে তবে তার দাবি সরাসরি অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। আমি এমন দাবী কখনও করিনি, এখনও করি না। তাঁর সব গল্প আমি পড়িনি।—সুতরাং আমার বর্তমান আলোচনা আংশিক ও অসম্পূর্ণ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এমনও হয়তো হতে পারে যে আমার অপঠিত কোন গল্প এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত দুই-একটি সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিতে পারে।

এই অতি-সম্ভাব্য অসম্পূর্ণতার জন্য আগে থাকতেই মার্জনা ভিক্ষা করে আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

—জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

স্বপ্ন বা মায়া

ভয় পাবার মতোই পরিবেশ। কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে, বিহারের একটি স্বাস্থ্যকর পার্বত্য গণ্ডগ্রাম কল্পনা করুন। স্থানীয় একটা বড় ধাতুর কারখানার জন্যেই যা বারোমাস কিছু কিছু লোক থাকে, নইলে গরমে বা বর্ষায় খাঁ খাঁ করবার কথা। তাও, কারখানার একটা নিজস্ব কলোনী আছে, সে একটা শহর বিশেষ। স্থায়ী কর্মচারীরা সেখানেই থাকেন। সেখানে ইলেকট্রিক আলোও আছে; আসল শহরে নেই, (যদি অবশ্য শহর বলেন তাকে)—মানে আমি যখনকার কথা বলছি তখন ছিল না, সম্প্রতি হয়েছে।

এই জায়গায় ধূ-ধূ মাঠের ভেতর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বিঘের বাগান, তার মধ্যে একটি বড় বাংলো ও গুটি দুই 'আউট হাউস'। কবে কোন মান্ধাতার আমলে বার্ড কোম্পানীর কোন সাহেব এখানে এই বাড়ি তুলে আফিস-কাম-রেসিডেন্স বানিয়েছিলেন, আজও এটা তাই 'বার্ড কোম্পানীর বাংলো' বলে চলছে।

এখন আর অতটা মাঠ নেই, চারদিকে বেশ কখানি বাংলো হয়েছে, তার মধ্যে দু-একটায় স্থায়ী বাসিন্দাও থাকেন কেউ কেউ; খানিকটা-সিনেমাও হয়েছে একটি—অর্থাৎ 'চেঞ্জার' বাবুরা এলে পূজো থেকে ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্যন্ত নিয়মিত একটা ক'রে শো হয়—বাকী সময়টায় ওঁরা মধ্যে মধ্যে 'ফীলার' দিয়ে দেখেন এক আধদিন—লোক না হলে আবার বন্ধ রাখেন। সে সময়ে এসব কিছু ছিল না, বাংলোর চারিদিকে মাঠ, দু-একটা আগাছা, বহু দূরে দূরে একটা দুটো বাংলো—তাতেও সব সময় ভাড়া থাকে না, ওদিকে একটা ছোট পাহাড়, সেখানে বেশ কটি প্রেমিকযুগল গলায় দড়ি দিয়েছে—আর এদিকে, মানে পুব দিকে এগিয়ে এসে রেলের লাইন।

লাইনের এ পাশে নতুন একটা বাংলো হয়েছে সবে, তাতে লোক থাকে না। আর একটা টিন বাংলোয় একঘর উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীরা এসেছেন, ওপারে একটি বাঙ্গালীর বাড়ি—'লাল বাংলা' নাম, সেই খানেই আমাদের ঊষা বৌদিরা ভাড়া থাকতেন—একপাশের একটা অংশে। ঊষা বৌদিরা মানে,

বিধবা উষা বৌদি, তাঁর অতি বৃদ্ধ শ্বশুর আর একটি চিররুগ্ন দেওর। বাকী বাড়িটা—বাড়িওলার অংশ খালিই থাকে প্রায় বারোমাস।

এই লাল বাংলা ছাড়া এদিকে আর বাড়ি নেই। একটা ছোট্ট মুদির দোকান আছে—যা সকালে ঘণ্টা তিন চার এবং বিকেলে ঘণ্টা দুই খোলা থাকে। আর আছে এক উড়িয়া ঠাকুরের পানের দোকান; সে দোকানের মালিককে ঘিরেও বেশ একটা রহস্যের জাল বোনা আছে, অনেক প্রবাদ—সে নাকি নানারকম গুণ-তুক ও মন্ত্রতন্ত্র জানে। ঠাকুরটিকে এখানকার অধিবাসীরা বেশ ভয়ের চোখে দেখে। ঠাকুরের অধীনে নাকি গুটিকতক ভূতপ্রেত আছে—ইচ্ছামতো তাদের দিয়ে সে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে।

বাস। এই পর্যন্ত। লাল বাংলার সামনে দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে ঐ কারখানা শহরে। সে পথ ধরে বহু দূরে গেলে তবে দু-একটা বাড়ি দেখা যায়।

অবশ্য এই লাল বাংলার পিছনে—নদীর ধার ঘেঁষে বেশ একটা ঘন বসতি আছে, বাঙ্গালীর, আদিবাসীর এবং ভাগ্যান্বেষী কয়েকঘর গোয়ালা ও মাড়োয়ারীর। কিন্তু সে বেশ খানিকটা পিছনে। ডাকলে হঠাৎ কেউ বেরিয়ে আসবার সম্ভাবনা নেই।

এ-হেন বার্ড কোম্পানীর বাংলোর এক আউট-হাউসে থাকতেন বিধুবাবুরা। বিধুবাবুর বয়স তখন নব্বুই পেরিয়ে গেছে। তাঁর ছেলেরা সবাই কৃতী। সেই জন্যেই কেউ কলকাতায়, কেউ জববলপুরে, কেউ সারেণ্ডায়। সে সব জায়গায় বিধুবাবুর শরীর ভাল থাকে না বলে তাঁরা বাবাকে বাড়ি ভাড়া করে এখানে রেখেছেন। ছোট ছেলে ভবেশবাবুর পয়সা বেশী, তিনি এখানে একটা জমি কিনে বাড়ি শুরু করেছেন, বাবার যাতে থাকার সুবিধা হয়। এই নিচু আউট-হাউসটা বিধুবাবু বা তাঁর ছেলেদের—কারও পছন্দ নয়। নেহাৎ এই পাশের মাঠে বাড়ি হচ্ছে, কনট্রাক্টরদের হাতে ভার—তবু বিধুবাবু অল্পস্বল্প দেখাশুনা করতে পারবেন বলেই এখানে আছেন।

এখানে তখন থাকেন বিধুবাবু, তাঁর বয়স বিরানব্বুই কি তিরানব্বুই; তাঁর বড় ছেলের মেজ ছেলে কানাই, বয়স বছর সাতাশ; তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী, বয়স আঠারো উনিশ, আর ভবেশবাবুর একটি মেয়ে—রমলা, বয়স আরও কম। চৌদ্দ পনেরো। আর থাকে একটি বাঙ্গালী চাকর—সেও খুব প্রবীণ নয়। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে।

ঘটনাটা যেদিনের—সেদিনই সকালের গাড়িতে কানাই কলকাতা গেছে—পরের দিন তার একটা ইন্টারভিউ, সে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বসে আছে, বিলাত যাবার ইচ্ছা—ইন্টারভিউটা সেই সম্পর্কিত। কাজ শেষ করে রাত্রের গাড়িতেই ফিরবে—একটা দিন, চাকর রাখাল রইল, বিধুবাবু বইলেন—চালিয়ে নিতে পারবে না? বাড়িওলাদের মালীও আছে একজন, তার অবশ্য একেবারে পিছন দিকে ঘর। তবু বললে মূল বাড়িতে এসেও শুতে পারবে।

কানাই যেদিন যায় তার আগের দিনই বিধুবাবুর একটু জ্বর হয়েছে, তিনি সে কথাটা বলেন নি, পাছে কানাইয়ের যাওয়ায় বাধা পড়ে, কাজের ক্ষতি হয়। সামান্য সর্দি-জ্বর—ও আপনিই ভাল হবে।

কানাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ভোর ছটারও আগে, মেলট্রেন ধরে চলে যাবে—তখনও মেলট্রেন ওখানে ধরত। সকাল সাতটায় নাতবৌ কণা দাদাশ্বশুরের চা এনে ডাকতে গিয়ে দেখল, তিনি কেমন অসহায় ভাবে চেয়ে আছেন। তাঁর দু' চোখ দিয়ে জল পড়ছে, কিন্তু কথা কইতে পারছেন না, উঠতে তো পারছেনই না। কণা ভয় পেয়ে রমলাকে ডাকল। দুজনে কোনমতে ধরে ওঠাতে গেল—কিন্তু বৃদ্ধের দেহে নিজস্ব আর কোন শক্তি নেই—ভারী হয়ে উঠেছে, অগত্যা শুইয়ে দিতে হল।

ওরা দুজনেই যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেল। রাখালকে পাঠাল ডাক্তারের কাছে, রমলা ছুটে এসে উষা বৌদিকে খবর দিল। 'কাকীমা, শিগগির একবার আসুন, দাদু কেমন করছেন।'

উষা বৌদিরও শ্বশুরের দায়িত্ব, আশি কবেই পার করেছেন ভদ্রলোক, দেওরটি বয়সে না হোক, অসুখে আরও অথর্ব। সকালে রান্না জলখাবার সবই আছে—মায় স্নানের গরমজলটি পর্যন্ত করে দিতে হয় বারোমাস। বৌদি সেই কথাই বললেন, 'কেমন করে যাই মা বল। এদেরটা একটু গুছিয়ে না দিয়ে—? আর আমি তো ডাক্তার নই—আমি গিয়েই বা কি বুঝব?…যাই হোক, যা তুই। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

উষা বৌদির শ্বশুর কামিনীবাবুই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'না বৌমা, আমাদের চা-টা ক'রে দিয়েই তুমি চলে যাও। দুটো ছেলেমানুষ মেয়ে শুধু বাড়িতে—একজনের যাওয়া অবশ্য দরকার। ফিরে এসে দুটো ভাতেভাত

ফুটিয়ে দিতে পারো তো ভাল। নইলে ঘরে চিঁড়ে আছে, দুধ আছে—আমরা বেশ খেয়ে নিতে পারব। তুমি যাও।'

উষা বৌদিও সেটা বুঝলেন। মানুষের এমন বিপদে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে মানুষ কিসের? তিনি চা জলখাবারই তৈরী করছিলেন। ওদের খাইয়ে নিজেও এক কাপ চা খেয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

তিনি যখন পৌঁছলেন তখনও ডাক্তার আসেন নি। তিনি যা বুঝলেন—বৃদ্ধের অবস্থা খুবই খারাপ। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কপালে ঈষৎ চটচটে ঘাম, হাপরের মতো নিঃশ্বাস পড়ছে, দৃষ্টি স্তিমিত।

উষা বৌদি আবারও রাখালকে পাঠালেন একবার—ডাক্তারের কাছে। কিন্তু ডাক্তারও স্বাধীন নন। ভোর থেকে তাঁর দোরেও বহু লোক ধর্না দেয়। যে কটা খুব জরুরী কেস—সেরে আসতে আসতেও দশটা বেজে গেল।

এসে রোগীর দিকে চেয়ে তিনিও ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'মিছিমিছি আর ফোঁড়াফুঁড়ি ক'রে লাভ নেই। এ শেষ অবস্থা। আর চুরানব্বই বছর বয়স হল—ওঁরা যতই বলুন কম, আমি ওঁকে সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছি, আসল বয়স আমাকে বলেছেন—কতদিন আর ধরে রাখবেন বলুন, শেষ তো একদিন হবেই। আর একটু পরে সমস্ত গা-ই পাথরের মতো হয়ে আসবে, দেখবেন শুধু গলার কাছটা ধুক ধুক করছে—সেই সময়ে একটু নামটাম শোনাবেন বরং, গঙ্গাজল থাকলে দু-এক ফোঁটা মুখে দেবেন।

'তা এখন এদের উপায়? কেউ যে নেই।'

'তাই তো! আচ্ছা, আমি এখনই ডাকঘর থেকে ভবেশবাবুকে ট্রাঙ্ক কল করছি। কিন্তু এখন তো আর সকালের ট্রেন ধরার কোন উপায়ও নেই, আসতে সেই রাতের গাড়ি, এখানে আসতে যার নাম তিনটে।'

ডাক্তারবাবু তাঁর কর্তব্য সেরে চলে গেলেন। তাঁর আর কীই বা করবার ছিল। তবু তো উপযাচক হয়ে ট্রাঙ্ক-কল করার ভারটা নিলেন।

উষা বৌদিই পড়লেন ফাঁপরে। তাঁর নিজেরও শরীর ভাল নয়—লো প্রেসার—উদ্বেগ উত্তেজনাই যথেষ্ট খারাপ—তার ওপর ছুটোছুটি করা তো একেবারেই উচিত নয়। কিন্তু কীই বা করবেন, এই দুটো—বলতে গেলে—বাচ্চা মেয়েকে ফেলে যাবেনই বা কেমন করে? কণাই দুজনের মধ্যে বড়ো, বিবাহিতা—কিন্তু এ বয়সে, এখনকার হিসেবে তার হেসে-খেলে বেড়াবার কথা।

ঊষা বৌদিই রোগীর কাছে বসলেন, রাখালকে বললেন, 'তুই যাহোক করে দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খাইয়ে দে বাবা—নইলে এদের আজ আর খাওয়াই হবে না।'···

বেলা বারোটা নাগাদ এদের দুজনকে বসিয়ে ঊষা বৌদি বাড়ি গেলেন। তাঁরও বাড়িতে বৃদ্ধ আর রোগী—সে কর্তব্য ও দায়িত্ব সবার আগে।

তবে বাড়ি পোঁছে দেখলেন, তাঁর শ্বশুর ও দেওর মিলে ইতিমধ্যেই আলুভাতে দিয়ে দুটো ভাত করে নিয়েছেন। বৌদি স্নান সেরে তাঁদের খেতে দিয়ে নিজেও দুটি ভাত মুখে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলেন—কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন।

রমলা বলল, 'বোধ হয় এখনও পাঁচ মিনিট হয় নি। গলার কাছটায় ধুকধুক করছিল, এখন তো আর করছে না। তাতেই বুঝতে পারলুম—শেষ হয়ে গেল।'

তবু রাখালকে ওরা পাঠিয়েছিল ডাক্তারের কাছে, তিনিও এসে পড়লেন। হেঁট হয়ে মিনিটখানেক দেখেই চাদরটা টেনে মুখে চাপা দিয়ে দিলেন। আর কিছু বললেন না, বলার দরকারও রইল না।

এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা দেখা দিল—সৎকারের।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'লোক আমি এখনই যোগাড় ক'রে দিতে পারি। ইস্কুলে খবর দিলেই মাষ্টারমশাইরা এসে যাবেন, ছেলেরা আছে—আমার পাড়াতেও ব্রাহ্মণ ছোকরা আছে দু-তিনজন—সন্ধ্যের আগেই কাজ সেরে ফেলতে পারবে।'

ঊষা বৌদি বললেন, 'কিন্তু যার তিন ছেলে সাত নাতি বিদ্যমান, সে আপনার লোকের আগুন পাবে না—এ কখনও হয়? আপনি তো খবর দিয়েছেন—ওরা কেউ আসুক না।'

'কিন্তু কী যে আপনারা বলেন সব—বাসিমড়া না কি—হবে না?

'রাত পোহালে হবে। ভবেশবাবু কি কানাইরা যদি তিনটের মধ্যে এসে যায়—আর তখনই নিয়ে যাওয়া হয়—তাহলে আর সে প্রশ্ন উঠবে না। নইলে তারাই বা কি বলবে, বলবে আমরা কেউ এলুম না—আপনারা তাড়াতাড়ি কত্তাত্ব করতে গেলেনই বা—কেন?···আর সত্যি—পুরুষ একজনও নেই—দুটো খুকী মেয়ে···তারা কি জানে, কিই বা করতে পারে!'

'তবে সেই কথাই থাক। আমি হেডমাস্টার মশাইকে বলে রাখছি, উনি দু-একজন মাস্টার মশাই কি ওপরের ক্লাসের দু-চারটে ছেলেকেও বলে রাখতে পারবেন। আয়োজনও যা কিছু করার করে রাখতে পারবেন—বাঁশ-টাঁশ কাটিয়ে—ওরা বরং স্টেশনেই অপেক্ষা করবে ঐ ট্রেনটার সময়ে—ভবেশবাবু বা আর যাঁরা আসেন—তাঁদের নিয়ে চলে আসবে, তাহলে ভোর হবার আগেই বার করতে পারবেন।'

যথেষ্টই করলেন ডাক্তারবাবু, টেলিফোনের খরচা আর এদিকের যা দরকার হতে পারে সেই টাকাটাই নিলেন শুধু, এরা অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও ফীয়ের টাকা নিতে রাজী হলেন না। বললেন, 'চিকিৎসাই করলুম না—ফী নেব কেন?'

এছাড়া তিনি আর বেশী কি করতে পারেন?……

এখন থেকে সেই রাত তিনটে অবধি যে অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা তার সাথী কৈ?

লজ্জাতেই সে কথাটা বলতে পারলেন না এঁরা। রাখাল আছে, মালী আছে—সেই যা ভরসা।……

ঊষা বৌদি বিকেল চারটে নাগাদ রাখালকে দিয়ে চা করিয়ে খাওয়ালেন এদের, খাবারও কিছু তৈরী করতে বললেন। বললেন, 'শব যতক্ষণ না দাহ হচ্ছে ততক্ষণ অশৌচ লাগে না। তোরা খেয়ে নে, কোন দ্বিধা করিস নি।'

তারপর 'ওদের একটু খবর নিয়ে আসি' বলে আর একবার বাড়ি এলেন। স্নান করে চা তৈরী ক'রে খেয়ে এদের খাইয়ে, রাত্রে চিঁড়ে দুধের ব্যবস্থা ক'রে রেখে—লাল বাংলার বুড়ো মালীকে বাড়ির মধ্যে শুতে বলে আবার চলে এলেন। শ্বশুর মশাই-ই তাড়া লাগিয়ে পাঠালেন আরও, 'বৌমা তুমি যাও, আমরা ঠিক থাকব, তার জন্যে কিছু ভেবো না, ওদিকে কচি মেয়ে দুটো বোধহয় এতক্ষণ ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।'

বৌদিও ছুটতে ছুটতেই প্রায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু ফটকে ঢোকার আগেই কেমন যেন নিজের মনের মধ্যেই একটা ধাক্কা খেলেন। জনবিরল মাঠে সেই প্রায় সন্ধ্যায় কোন মানুষের দেখা পাবেন—ওবাড়ির মালী বা চাকর ছাড়া—আশা করেন নি। দূর থেকেই দেখলেন ফটকের পাশের ঝোপমতো গাছগুলোর ছায়ায় কে যেন দাঁড়িয়ে কেমন সন্দেহজনকভাবে উঁকি

মারছে। অন্যত্র এ দৃশ্য দেখলে চোর ভাবতেন, কিন্তু এখানে এখনও পর্যন্ত ও বস্তুটির তেমন বহুল প্রচলন হয় নি—মানে চুরির, তাই বুকের মধ্যেটায় অকারণেই একটু ছাঁৎ ক'রে উঠল। তবু তিনি আরও দ্রুতই এগিয়ে এলেন।

কাছে এসে মানুষটাকে দেখে তাঁর সেই অজ্ঞাত আশঙ্কার ভাবটা বাড়ল বই কমল না।

পানওয়ালা ঠাকুর।

ও লোকটা এখানে কী করছে। অমন চোরের মতো ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে বেড়াচ্ছে কেন?

বুকের মধ্যে গুরগুর করছে, যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে ভয়ে—তবু জোর ক'রেই সহজ হবার চেষ্টা করলেন বৌদি। প্রশ্ন করলেন, 'ঠাকুর কী মনে ক'রে, এখানে?'

সহজ হওয়া এ অবস্থায় অবশ্য সহজ নয়, তাই কণ্ঠস্বর বেশ একটু রুক্ষই শোনাল।

'আজ্ঞে, না, কোন দরকার নেই। এমনি। শুনলুম বুড়ো বাবুটা নাকি মারা গেছেন?'

'তুমি কার মুখে শুনলে?' এবার স্পষ্টই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে বৌদির গলা, 'এরই মধ্যে?'

'কে যেন বলছিল মা। কত বাবুই তো আসে—সিগারেট কিনতে···তাই বলি যে যাই, খবর নিয়ে আসি, যদি লোকজনের দরকার হয়—ব্রাহ্মণ তো। আমরাও ব্রাহ্মণ, আমাদের এটা দায়িত্ব—'

'না, তেমন দরকার হবে না। লোকজনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, বাবুর ছেলে কি নাতি এসে পেঁছিলেই নিয়ে যাওয়া হবে।'

আর কোনও কথার অবকাশ না দিয়ে উষা বৌদি ঠাকুরের মুখের ওপরই ফটকটা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেলেন।

তখনও দিনের আলো বেশ আছে, তবু দেখা গেল—কণা এরই মধ্যে হ্যারিকেন জেলে ঘরে ঘরে আলোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

বৌদিকে দেখে ওরা মনে বল পেল—কিন্তু তিনি কাকে দেখে পান?

বিশেষ সন্ধ্যা যত গভীর হয়ে আসতে লাগল, বাগানের দৈত্যদানোর মতো বড় বড় গাছগুলোর ছায়ায় অন্ধকার যত জমাট বাঁধতে লাগল—আকাশের গা থেকে দিনের শেষ চিহ্নটুকু মুছে গিয়ে একে একে তারার চুমকি ফুটে উঠল—ততই লো-প্রেসারের রুগী ঊষা বৌদির বুকের বল ও মনের জোর কমে আসতে লাগল। বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে তাঁর। ফলে, মৃতের বাড়ি কিছু খাবেন না, মনে মনে এমনি একটা অস্পষ্ট সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও, রাত আটটা নাগাদ রাখালকে দিয়ে এক কাপ চা করিয়ে খেলেন। অবশ্য, এদের বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও আর কিছু খেতে রাজী হলেন না।

ওরাও সন্ধ্যার আগেই যা-একটু খেয়ে নিয়েছিল চায়ের সঙ্গে, আর কিছু খেল না। এবার শোবার পালা। মেয়েরা ঠিক করেছিল জেগেই বসে থাকবে রাতটা—যতক্ষণ না পুরুষরা আসে, কিন্তু ঊষা বৌদিই নিষেধ করলেন। বললেন, 'ওরে, সে বড় বিশ্রী। তাতে শরীরের কষ্ট, আর যত রাত বাড়বে তত ভয় পাবি। এই জঙ্গল চারদিকে—এমনিই তো ভয় করে। তার চেয়ে যাহোক, একটা কিছু পাত এখানে—একসঙ্গেই সকলে শুয়ে পড়ি। রাখাল বরং পাশের ঘরে শুক্। আর মালীটা যদি বারান্দায় শোয়—একটু বলে ছাখ।'

কণা ভয়ে ভয়ে বলল, 'কাকীমা, আমরা যদি সবাই পাশের ঘরেই শুই—এটা বন্ধ ক'রে রেখে—?'

'না রে, তা উচিত হবে না। এমনিতেই বলে নিয়ম—একজন মড়া ছুঁয়ে বসে থাকা, তা তো হ'লই না।...একেবারে ঘর খালি রাখা ঠিক হবে না। এ ঘরে কারও থাকা দরকার।'

সেই মতোই ব্যবস্থা হ'ল।

তবে সে এদের। মালী ঝেড়ে জবাব দিল, 'আমি ওখানে গিয়ে শুতে পারব না। আমি আমার ঘরেই থাকব, কোন দরকার পড়লে ডাকবেন। বাবুরা এতবড় বাড়িটার ভার আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন—আমি কি ক'রে ওখানে যাই বলুন?'

রাখালের সে অজুহাত নেই। সে পাংশুমুখে ঘাড় নাড়ল। বিছানাও একটা পাতল পাশের ঘরে—কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল সেখানে সে শোয় নি—এরা শুয়ে পড়তে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে মালীর ঘরে তার সঙ্গে শুয়েছিল।

এঁরা মাঝের দরজাটা অর্থাৎ রাখালের দিকেরটা খুলে রেখে—বাইরেটা

বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লেন। নানারকম মুখরোচক প্রসঙ্গ আলোচনা হলেও না হয় জেগে থাকা যায়—কিন্তু মৃতদেহ সামনে রেখে হাল্‌কা কোন প্রসঙ্গ তোলা ভাল দেখায় না। দু'একটা প্রাসঙ্গিক কথা মাত্র উঠল, তাও আস্তে আস্তে, চাপাগলায়—তেমন কথা কিছু অফুরন্তও নয়। ক্রমে সকলেই চুপ ক'রে গেল একসময়। মেয়ে দুটো ঘুমিয়েই পড়ল। শেষে বৌদিও।

* * *

ভবেশবাবুকে নেবার জন্যে এবং মৃত্যুর খবরটা দেবার জন্যে—ডাক্তারবাবু যখন ফোন করেছেন, তখন অবস্থা খারাপ—তখনও মারা যান নি, সেই খবরই দেওয়া হয়েছিল—স্থানীয় স্কুলের দু'চারজন শিক্ষক এবং গুটিচারেক উপরের দিকের ছাত্র স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে তারা বাঁশের চালি ও দড়ি প্রভৃতিও গুছিয়ে রেখেছে। ভবেশবাবু প্রথমটা খুবই আঘাত পেলেন, কিন্তু তখন আর দুঃখ করারও সময় নেই। বাঙ্গালীদের মতে মড়া বাসি হওয়া খুব খারাপ—বাড়ির অকল্যাণ হয়, তাই মনের দুঃখ মনেই রেখে দ্রুত চলে আসতে হল।

কিন্তু বাংলোর গেট খুলে ভেতরে ঢুকে মোরাম আর কোয়ার্ৎজের টুকরো ফেলা পথে খানিকটা এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল একটা কি সাদামতো ঘাসের ওপর পড়ে আছে। দ্রুত কাছে গিয়ে টর্চের আলোয় দেখলেন—ঊষা বৌদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

তখন সর্বাগ্রে মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস ক'রে তাঁর জ্ঞান ফেরানো হল। আর তখনই আবিষ্কার হ'ল রাখাল এসে মালীর খাটিয়ায় মালীর পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওখানে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে ঘুমে অচেতন। ঘরের দরজা খোলা—

কী হয়েছিল ঊষা বৌদির—অনাবশ্যক-বোধেই সেদিন কেউ আর জিজ্ঞাসা করেন নি।

ভয় পেয়েছিলেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাছাড়া তখনকার কাজটাই প্রধান। পরে ঊষা বৌদিই উপযাচক হয়ে খুলে বলেছিলেন ব্যাপারটা। কিসের যেন একটা আওয়াজে ভয় পেয়ে রাখালকে ডাকতে গিয়ে দেখেন সে বিছানায় নেই। তখন তার খোঁজে বেরিয়ে দ্রুত যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। তাতেই অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকবেন।

* * *

এর পর বহুদিন কেটে গেছে। ভবেশবাবুরা এখানের বাড়ি শেষ করেছেন। তবে বাড়ির প্রয়োজন আর নেই, কদাচিৎ কখনও আসেন যান। ঊষা বৌদিরাও বাড়ি বদল করেছেন। অনেক পরিবর্তন এসেছে এই গণ্ড-গ্রামে, এখন এটা ক্রমশ শহরের রূপ নিচ্ছে।

কিন্তু ঊষা বৌদির দুর্নামটা যায় নি। যে বাগে পায় সে-ই ওঁকে ঠাট্টা করে এই নিয়ে। কোনরকম সাহসের প্রশ্ন উঠলেই সকলে বলে, 'যান, যান, আপনি আর বলবেন না, আপনার কত সাহস তা বোঝা গেছে বিধুবাবুর মরবার দিন।'

বৌদি চুপ ক'রেই সহ্য করেন। সে আক্রমণের প্রতিবাদ করেন না।

একদিন আমার সামনেই কে একজন সেই পুরনো ঠাট্টাটাই অস্ত্র একবার ব্যবহার করলেন। তিনি উঠে যাবার পর আমি বললুম, না বাপু, সত্যি, ঐ বার্ড কোম্পানীর বাংলোখানি যা, একটা জঙ্গল বিশেষ! অতখানি বাগান, বড় বড় গাছপালা, ওখানে এমনিই রাত্রিবেলা গা ছমছম করে বাইরে বেরোলে। এখন তো তবু পাশে দু'একটা বাড়ি হয়েছে, তখন তাও ছিল না শুনেছি। আপনাকে ওরা ঠাট্টা করে—আমি তো বলি আপনার দুর্জয় সাহস, আপনি ঐ দুটো বাচ্চা মেয়ে নিয়ে একা থাকতে রাজী হয়েছিলেন। আমি তো পুরুষমানুষ—আমার অন্তত সাহসে কুলোত না—ঐ ভাবে একা থাকতে।'

এই প্রথম—বোধহয় একটু সহানুভূতি ও বিবেচনার পরিচয় পেয়ে মুখ খুললেন ঊষা বৌদি।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ছাখো, তোমাকে আজ একটা কথা বলছি, এতকাল কাউকে বলি নি। ব্যাপারটা অত সহজ কিছু হয় নি।'

উৎসুকমুখে চেয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে। বৃথা জেনেই কোন প্রশ্ন করলুম না। বুঝলুম উনিও এতকাল কথাটা বলবার জন্যে ছটফট করেছেন।

বৌদি আস্তে আস্তে বললেন, 'সেদিনের কথা তো শুনেছ সব; মেয়ে দুটো ছেলেমানুষ, ওরা যতই ভয় পাক্, ওদের স্বাস্থ্য ভাল, ওরা সহজেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার চোখে ঘুম এল না। দুর্বল শরীর, পেটে কিছু পড়ে নি, তবুও ঘুম আসতে চায় না। জেগে চোখ বুজে শুয়ে আছি, বাইরে কত কি শব্দ হচ্ছে, শুনছি আর চমকে চমকে উঠছি।…সত্যি বলছি ভাই ঠাকুরপো, রাত্রে বাগানে যে এত রকমের আওয়াজ হয় তা কখনও জানতুম না। পাখীর

আওয়াজ তো আছেই, বোধহয় বুনো শিয়াল কি কুকুর-বেড়ালেরও যাওয়া-আসা আছে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে যাঁরা চলে গেলে সরসর আওয়াজ হয় তাঁদের কথা বলব না এই সন্ধ্যেবেলা। তবে এসব শব্দগুলো তো জানি! জানি না এমন কত কি শব্দও যে শুনলুম সেদিন! তার মধ্যে একটা বুঝতে পেরেছিলুম—বেত বনের কট্‌কট্‌ শব্দ—ওটা নাকি আপনিই ওঠে মধ্যে মধ্যে। যাইহোক্‌, এই সব নানান শব্দ কানে যাচ্ছে আর যেন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি সাহসী নই, কোনদিন বড়াইও করি নি, নেহাৎ কারে পড়েই সেদিন থাকতে হয়েছিল। এক একবার তখন মনে হচ্ছে—ছোট দুটোকে ডেকে তুলি, তিনজনে খানিকটা হাউ হাউ ক'রে শব্দ করলেও বোধহয় মনে জোর পাই, নেহাৎ লজ্জাতেই ডাকতে পারছিলুম না—

'এইভাবেই কাঠ হয়ে পড়ে আছি, এমন সময় এমন একটা শব্দ কানে এল, যা বাইরেকার কোন শব্দ নয়—ঘরের ভিতরকারই। আমার মনে হল, ঐ তক্তপোশটাই মচমচ ক'রে উঠল। পুরনো তক্তপোশ, নড়লে মচ মচ্‌ শব্দ হবেই, কিন্তু নড়বে কেন?'

'খুব সামান্য শব্দ, হয়েই মিলিয়ে গেল—কিন্তু স্পষ্ট যে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ আমারও এমন অবস্থা নয় যে একবার মাথাটা তুলে দেখব। তখন মনে হচ্ছে যে ভয়ে যদি অজ্ঞান হয়ে যেতুম তো ভাল হ'ত—অজ্ঞানা অস্পষ্ট ভয়ের এ যন্ত্রণা সইতে হ'ত না।

'মিনিট পাঁচ-সাত বাদ—সবে বুকের তোলপাড় ভাবটা একটু কমেছে—আবারও সেই রকম শব্দ। এবার আরও স্পষ্ট। কে যেন আস্তে আস্তে সন্তর্পণে তক্তপোশটায় উঠে বসছে। এ বাড়িতে এর আগেও অনেকবার এসেছি, বুড়ো এই চৌকিটাতেই শুয়ে থাকতেন বা বসে থাবতেন—নড়লে-চড়লেই এমনি শব্দ হয় বরাবর। তবে, তাই বলে—আজ নড়বে কেন?

'কেন যে—তাও দেখার শক্তি নেই। পাথর হয়ে গেছে হাত-পা। বুকের মধ্যে এতক্ষণ যে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল, তাও যেন থেমে এসেছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না এমনি কষ্ট—।

'কিন্তু না, আর না—ভাবলুম আমি—এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। নিজেকে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়েই উঠে বসলুম, একটানে। ঘরে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল

বেশ পুরোপুরিই, মোটামুটি আলো আছে। কোন মতে, তেমনি মরীয়া হয়ে চেয়ে দেখলুম—তক্তপোশ খালি, চাদরটা একপাশে পড়ে আছে শুধু। মানুষটার কোন চিহ্ন নেই।...বিশ্বাস করো তুমি ঠাকুরপো, স্পষ্ট, বেশ ভাল ক'রেই দেখেছি—দুবার তিনবার চোখ রগড়ে।

'তখনই যে কেন হার্ট ফেল করল না—এইটে আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। ডাক্তার বলে আমার হার্ট দুর্বল—সেদিন দেখলুম ওরা কিছু জানে না। সেদিন আমি যে অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি, লোহার হার্ট না হ'লে মানুষ পারে না।

'তখন আর আমার মাথার ঠিক ছিল না। কী করব—প্রথমটা মনে হল, চিৎকার ক'রে উঠি, এদের ডাকি—কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরোল না, বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও। ভাগ্যিস বেরোয় নি—আজ ভাবি—মেয়ে দুটো উঠে ঐ দৃশ্য দেখলে হয় পাগল হয়ে যেত, নয় তো চিরকালের মতো হিস্টিরিয়া রোগ জন্মাত ওদের।

'কিন্তু তখন আর ওঘরে থাকার সাধ্য আমার নেই। টলতে টলতে কোন মতে ছুটে পাশের ঘরে এলুম, দেখি রাখালও নেই, বিছানা খালি। দোর খোলা—দুটো দরজাই হাট করা।

'টর্চ খুঁজে দেখব, কি আলোটা তুলে নেব—এসব কোন শক্তিই ছিল না আমার। মাথাতেও কিছু আসছিল না। কী করছি, কী করব—কিছুই জানি না, সেইভাবেই টলতে টলতে বেরিয়ে পড়েছি। বোধ হয়—এখন মনে হচ্ছে—মালীর ঘরের কথাটাই অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে ছিল।

'তবে একটা রক্ষে—বাইরেটা তত অন্ধকার নয়, যতটা আমি ভেবেছিলুম। সেটা যে শুক্লপক্ষ যাচ্ছে আমার খেয়াল ছিল না, সপ্তমী হবে কি ষষ্ঠি, তখনও চাঁদ পুরোপুরি অস্ত যায় নি—তখনও একটু আধটু আলোর রেখা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর মাথায় লেগে, তারই একটা আবছা আলোর আভাস নিচেও এসে পড়েছে, তাতে আর কিছু না হোক—কোয়াৎর্জের সাদাটে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে।

'অবিশ্যি সে আলোর সুবিধেও যেমন—অসুবিধেও তেমনি। আলো-আঁধারিতে চারদিকের গাছেই মানুষ দেখছি। বিশেষ সাদা ইউক্যালিপটাস গাছগুলো তো আরও ভয়াবহ। তার ওপর, যেমন বাইরে পা দিয়েছি, কোথা

থেকে এক ঝলক বাতাস উঠল, চারিদিকের গাছপালাগুলো যেন একসঙ্গে ফিস ফিস ক'রে কী বলে উঠল, যেন সাবধান ক'রে দিতে চাইল আমাকে— আর, হেসো না ভাই, সেই মুহূর্তে আমার মনে হ'ল যে, হাওয়া নয়, কার একটা নিঃশ্বাসই বয়ে গেল—অশরীরী কোন আত্মার।

'তখন আর আমার কোন হুঁশ নেই, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই ছুটেছি— এখন ঠিক বলতে পারছি না, তবে মনে হয় ফটকের দিকেই ছুটেছিলুম, হয়ত মালীকে ডেকে তুলব বলেই—কিন্তু খানিক দূর গিয়েই মনে হ'ল—পথের ওপরই একটা মানুষ দাঁড়িয়ে, আমার দিকে পেছন ফেরা—ফটকের দিকে মুখ—সেও যেন ঐ ফটকের দিকেই চলেছে।

'প্রথমটা মনে হয়েছিল চোর—সে ঐ একলহমার জন্যেই—যেন একটু ভরসাও হয়েছিল সেই কারণে—কিন্তু তার পরই মনে হল, এখানের চোর তো এমন ফরসা জামা-কাপড় পরা হবে না। আর, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, এই ধুতি, এই গেঞ্জি, এই চলার ধরনটাও যেন আমার বিশেষ পরিচিত—ঐ বৃদ্ধের মতোই!

'আর আমি থাকতে পারলুম না, লোকে বলে মরীয়ার সাহস—আমারও বোধ হয় সেই রকম একটা কিছু হয়ে থাকবে—খুব চেঁচাবার চেষ্টা করলুম। তেমন গলার আওয়াজ বেরোল না, তবু শব্দ একটা হ'ল। বলে উঠলুম, "দাঁড়ান"।

'সঙ্গে সঙ্গেই—এতক্ষণ পরে মনে পড়ে গেল—ইষ্টমন্ত্রের কথা। গুরুদেব বলেছিলেন, "বিপদে সঙ্কটে রোগে ভয়ে—সকল অবস্থাতে স্মরণ ক'রো—সব ভয় সব বিপদ কেটে যাবে।"

'সে কথাটাও মনে পড়ল। মনে মনে একবার সে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নিয়ে আবারও বললুম, "দাঁড়ান। আপনি যদি বেঁচে থাকেন তো আমার সঙ্গে কথা বলুন, এমন ক'রে সকলকে মিথ্যে ভয় দেখাবেন না। আর যদি দৈহিক নিয়মে মৃতই হন, দয়া ক'রে আপনার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমার ইষ্ট দেবতার নাম ক'রে বলছি—বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না, আমাকে ভয় দেখাবারও না। আমি মনে মনে আমার ইষ্টমন্ত্র স্মরণ ক'রে যাচ্ছি, আমার অনিষ্ট করার সাধ্য আপনার নেই"।

'এখন এক একবার মনে হয়—ঠিক এতগুলো কথা গুছিয়ে সত্যিই বলতে পেরেছিলুম কিনা সন্দেহ। তবে তখন ঠিকই মনে হয়েছিল যে বললুম। অন্তত আমার কথা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি আগেই থেমে দাঁড়িয়ে

পড়েছিলেন, এবার আস্তে আস্তে ফিরলেন আমার দিকে—দেখার কোন অসুবিধে হ'ল না, ঠিক সেখানটায় কী এক বিচিত্র কারণে খানিকটা আলো এসে পড়েছিল, গাছের ফাঁক দিয়ে।

'সত্যি বলছি ঠাকুরপো, তুমি বিশ্বাস করো, এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি আর কখনও দেখি নি, কল্পনাও করতে পারি নি। বিধুবাবু ঠিকই—কিন্তু সেই সৌম্য শান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কোথায়? বিধুবাবুর সামনের কটা দাঁত তখনও ছিল, দাঁতগুলো একটু বড় বড়ও—এখন দেখলাম ওপর নিচের ঠোঁটগুলো কেমন যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে গিয়ে দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে; ছেলেবেলায় এক ডাক্তারখানায় কঙ্কাল দেখেছিলুম—সেই রকম দাঁত বার করা মনে হ'ল। আর সেই সঙ্গে চোখ দুটোও—বিস্ফারিত স্থির,—যে কোটরগত চোখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল—সে চোখ এ চোখ নয়। এ কোন মানুষের দৃষ্টিও নয়—

'ঠিক সেই মুহূর্তেই, মনে হ'ল যেন—ফটকের বাইরে কে হেসে উঠল একটু। কৌতুকের কি ব্যঙ্গের তা জানি না, শুধু এইটুকু মনে আছে—হাসিটা যেন কেমন কেমন—কতকটা অপ্রাকৃত গোছের; আমার বাসার সামনে যে পানের দোকানটা ছিল—তার মালিককে যেন ঐ রকমভাবে হেসে উঠতে শুনেছি, তার আগেও, তার পরেও কয়েকবার।......যত বারই শুনেছি বুকের মধ্যেটা যেন আতঙ্কে ছাঁৎ ক'রে উঠেছে।

'আর আমি সামলাতে পারলুম না নিজেকে। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে গেলুম বেশ চেঁচিয়ে—কিন্তু কোন শব্দই আর গলা দিয়ে বেরোল না। সব একাকার ঝাপ্‌সা হয়ে গেল চোখের সামনে।

'তারপর—আর কিছু মনে নেই।...একেবারে যখন জ্ঞান হ'ল—দেখলুম ভবেশ ঠাকুরপো, সত্যবাবু, শক্তীশ—সবাই মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন—উদ্বিগ্ন হয়ে।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন ঊষা বৌদি। দেখলুম তাঁর মুখে তখনও—এতদিন পরেও—একটা গভীর আতঙ্কের ছায়া।

আমি বললুম, 'আসলে ভয়ই পেয়েছিলেন খুব। ঘুম হয় নি তো, এটা ওটা নানা শব্দে—নানারকম ভয়াবহ ব্যাপার কল্পনা করেছেন—তাই থেকেই ঐ অবস্থা হয়েছে। হ্যালুসিনেশ্যন্ দেখেছেন—'

উষা বৌদি প্রবল কোন প্রতিবাদ করলেন না, বরং সায়ই দিলেন যেন। বললেন, 'তাই হয়ত হবে। কিন্তু একটা সমস্যার কোন মীমাংসা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি—কাউকে বলিও নি অবশ্য এতদিন, আজ তোমাকে বলছি, যখন জ্ঞান হল ওঁদের সঙ্গেই এসে ভেতরে ঢুকলুম, তখনই ঠিক ও ঘরে ঢুকতে দেন নি ওঁরা—কিন্তু বিছানা থেকে নামাবার সময় আমি ঘরে গিয়েছিলুম—কী দেখলুম জানো? দেখলুম, বৃদ্ধ এমনিই পড়ে আছেন—গায়ের ওপর সে চাদরটা নেই! আমি যাওয়ার আগে যেমন দেখে গেছি, সেইভাবেই এক পাশে পড়া—ঠিক যেমন কেউ গা থেকে সরিয়ে উঠে গেলে হয়—তেমনি! আর ডাক্তারবাবু যখন চাদর টেনে ঢেকে রেখে যান, চোখটা একটুখানি আধখোলা ছিল, মুখও প্রায় বোজা,—এখন দেখলুম—সেই যেমন ফটকের কাছে আবছা আলোতে দেখেছিলুম—ঠেলে-বেরিয়ে আসা দৃষ্টি, আর ঠোঁটগুলো কেমন যেন গুটিয়ে গিয়ে—বড় বড় দাঁত খিঁচনোর ভঙ্গীতে বেরিয়ে আছে—কঙ্কালের মতো!······

'ভুল দেখি নি, কারণ পরে ওটা নিয়ে—সেদিন সে সময় ঘরে যারা ছিল, তারা আলোচনা করেছে। সেদিনও সত্য মাষ্টারমশাই বলছিলেন, ঐ রকম ঠোঁট গুটিয়ে যাওয়া নাকি তিনি আর কখনও দেখেন নি। কণারা ছেলে মানুষ, আর তখন কারুরই মাথার ঠিক নেই; অতগুলো লোক হঠাৎ এসে পড়েছে, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে আমার ঐ খবর শুনেছে—এতক্ষণ ওরা খোলা ঘরে একা শুয়ে ছিল সে ভয় তো আছে—তখন, ঘটনাটা অতীতে পরিণত হয়েছে ঠিকই। অনিষ্ট কারও কিছু হয় নি এও ঠিক, তবু এত লোকের মধ্যেও যে ভয় পেয়ে বসবে, এও স্বাভাবিক—কেউই তাই লক্ষ্য করে নি চাদরের ব্যাপারটা। নইলে ওরাও সংঘাতিক ভয় পেত। আমিও আর মনে করিয়ে দিই নি। দিলে এর পরে আর ও বাড়িতে রাত্রে কেউ থাকতে চাইত না।··· এখন এর কি জবাব দেবে দাও—এই দুটো ব্যাপারের?'

জবাব আমি কিছুই দিতে পারি নি, সেদিনও না, তার পরেও না।

চাওয়া ও পাওয়া

তারিখটা মনে আছে—২৩শে জানুয়ারী, নেতাজীর জন্মদিন। মনে আছে আরও এই জন্যে যে, সেদিনটা আমার বন্ধু ইন্দুভূষণেরও জন্মদিন। চারদিনের ছুটিতে ঘাটশীলায় গিয়েছি, সমবয়সী এতগুলি লোক, বন্ধু ও বন্ধুস্থানীয়—একটা হৈ-চৈ করতে হবে বৈকি। তাই আর কোন উপলক্ষ হাতের কাছে না পেয়ে খেয়াল চাপল ইন্দুভূষণের জন্মদিনটাই 'সেলিব্রেট' করতে হবে।

বলা বাহুল্য ব্যবস্থাটায় বন্ধুবরের নিজের ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু সে আপত্তিতে কান দিতে গেলে আমাদের চলে না। আমাদের কাছে ব্যক্তিটা তথ্য এবং তুচ্ছ, উপলক্ষটাই বড়। কারণ তার দ্বারা আমাদের যা আসল লক্ষ্য—হৈ-চৈ, উৎসব এবং একটা মনের মতো ভোজ—তাতে পৌঁছনো যাবে। সে আয়োজনটাও করা হয়েছে লাগসই। সকালের মেনু ছিল আমার হাতে, মাছের মুড়ো থেকে শুরু করে নতুন গুড়ের পায়েস পর্যন্ত সব হয়ে গেছে—সন্ধ্যার ব্যবস্থাটা সত্যদার—স্থির হয়েছে মুর্গীর কোর্মা ও ঢাকাই পরোটা, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক দু'একটা ছোটখাটো ব্যঞ্জন—চাটনি, কপির ডালনা প্রভৃতি; আর লালডি থেকে দ্বিজেনদা ও তাঁর বৌদি এনেছেন কয়েক রকমের পিঠে। আয়োজনের কল্পনাতেই রসনা লালাসিক্ত হচ্ছে, নিহাৎ দুপুরের ভোজটা তখনও হজম হয় নি বলেই একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে, নইলে এবেলা কম খেয়ে উঠতে হবে।

মাঘের ঘোর শীত, তার ওপর পাহাড়ে জায়গা। আরও—মনে হয় সে বছর শীতটা একটু বেশীই পড়েছিল, ঐ সময়ের তুলনাতেও। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরোনোর কল্পনাতেই মুখ শুকিয়ে যায়—প্রাকৃতিক কাজগুলোও সারতে না পারলেই ভাল হয়, এমনি মনোভাব আমাদের।

সুতরাং সবাই মিলে দোর জানলা বন্ধ করে ভোলাদার বাইরের ঘরে জমিয়ে বসেছি। চা কফি তামাক চলছে অবিরত—তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই গালগল্প। রাজা-উজীর বধ তো তুচ্ছ কথা, সাক্ষাৎ ভগবানও রেহাই

পাচ্ছেন না আমাদের হাত থেকে। ধর্ম থেকে রাজনীতি সর্বত্রই আমাদের সমান অধিকার, চার্চিল থেকে জহরলাল সকলের থেকেই আমরা বেশী বুঝি, সকলেরই ভুল ধরবার যোগ্যতা ধরি আমরা।

তবু এ সবেও ক্লান্তি আসে বৈকি একসময়ে।

জিতেনবাবুই কথাটা তুললেন, 'মরুকগে—বৌদি একটা ভূতের গল্প বলুন দিকি, সময়টার সদ্ব্যবহার হোক!'

বৌদি বিধবা মানুষ—আমাদের ভোজে থাকবেন না, তিনি তখন বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বিষণ্ণমুখে বললেন, 'কিন্তু আমাকে যে বাড়ি যেতে হবে ঠাকুরপো—এই রাত্রে এতটা পথ—আমায় আর এখন আটকাবেন না।'

আমরা সকলে চিৎকার করে উঠে প্রতিবাদ জানালুম, 'আরে এরই মধ্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! এই তো সবে আটটা—কলকাতায় যার নাম সন্ধ্যে রাত্তির। বসুন বসুন, গল্পটা শুনিয়ে যান, প্লীজ!'

আসল কথা, বৌদির ভূতের গল্পে বেশ নাম আছে। সত্যি মিথ্যে জানি না—এ ব্যাপারে তাঁর স্টকও খুব বড়-সড়। যখনই ধরেছি দু'একটা গল্প বেরিয়েছে তাঁর ঝুলি থেকে, আর গল্পগুলোও কোনটা তুচ্ছ নয়—বেশ জমাট, রোমহর্ষক যাকে বলে। এখন এই অলস অবসরে ভালই জমবে আরও, সেটা আমরা সবাই জানি, কথাটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে সবাই জিতেনবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি মনে মনে। এ অবস্থায় বৌদিকে এক কথায় অব্যাহতি দেব তা সম্ভব নয়। আর সব চেয়ে বড় কথা—আমাদের তো বেরোতে হচ্ছে না বাড়ি থেকে—বৌদিই যাবেন এই ঠাণ্ডায় মাইলখানেক রাস্তা—তাতে আমাদের কি?

অগত্যা বৌদিকে বসতে হ'ল আবার চেপেচুপে, গল্পও বলতে হ'ল একটা।

সে গল্প যেমন শুনেছি, মানে বৌদি যেমন বলেছিলেন, বিনা অলঙ্কারে বা অতিরঞ্জনে হুবহু এখানে তুলে দিচ্ছি!

বৌদি বললেন:

আমার বড় জ্যাঠামশাইয়ের সাধু তান্ত্রিক ধরা একটা বাতিক ছিল। কোথাও কারও বাড়ি কোন সন্ন্যাসী এসেছেন খবর পেলেই তিনি দৌড়বেন,

তা কে জানে দশ মাইল রাস্তা, কে জানে কুড়ি মাইল। কে কী রকম সাধু, আসল কি ভণ্ড, এসব তাঁর বিচার ছিল না। গেরুয়া বা লাল কাপড় দেখেছেন কি বড় জ্যাঠা তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়বেন আর কাঁদতে থাকবেন, 'বাবা আমার কিছুই হ'ল না, আমাকে ভক্তি দিন, ভগবানকে পাবার উপায় ক'রে দিন।'

এ নিয়ে আমরা সবাই হাসিঠাট্টা করতুম—আমরা করতুম মানে বড়দের দেখাদেখি, বাবা কাকারা করতেন তাই—আমরা আর কি বুঝি, কিন্তু জ্যাঠা-মশাই তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। বেশী কিছু বলার সাহসও কারও ছিল না। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের তিনিই সর্বজ্যেষ্ঠ, তাঁর ওপর কথা বলবে এত বড় বুকের পাটা কারও ছিল না সেদিন। তাছাড়া আমাদের ও অঞ্চলে —অঞ্চল বলি কেন সমগ্র বিক্রমপুর পরগণাতেই তিনি ছিলেন একজন নামকরা লোক, সবাই এক ডাকে তাঁকে চিনত, যথার্থ খাঁটি মানুষ বলে সম্মান করত।

শেষের দিকে কিন্তু তাঁর মাথাটা একটু খারাপ হয়েই গিয়েছিল বোধহয়। মাথায় ঢুকেছিল তিনি এই চর্মচক্ষুতেই মাকে দেখবেন। আমাদের শাক্তবংশ, যে কোন উৎসবে অনুষ্ঠানে কালীপূজো ছিল বাঁধা—অকারণেও মাঝে মাঝে হত। আর যখনই হোক দেখেছি জ্যাঠামশাই পূজোমণ্ডপে গিয়ে "মা" "মা" বলে ডাকছেন আর মাথা খুঁড়ছেন, 'মা, একবার দেখা দে মা, একবার সামনে এসে দাঁড়া।' প্রথম প্রথম ভাবতুম এ একটা কথার কথা, সাধারণ ভক্তির প্রাবল্য কিন্তু শেষে দেখা গেল, ওটা একটা ফিক্সেশ্যন হয়ে গেছে তাঁর—মন ঐ চিন্তাতে আবদ্ধ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ বলছি এই জন্যে যে তিনি আমাদের সুদ্ধ ধরে ধরে তর্ক বাধাতে চাইতেন—যুক্তি—রামকৃষ্ণ পরমহংস যদি মার দেখা পেয়ে থাকেন, রানী ভবানীর ছেলে রাজা রামকৃষ্ণ, সাধককবি রামপ্রসাদ যদি মাকে চাক্ষুষ দেখে থাকেন, তিনিই বা কেন পারবেন না। ডাকার মতো ডাকতে পারলে মা কি দেখা না দিয়ে থাকতে পারবেন? অবশ্যই নেমে আসতে হবে তাঁকে, ধরা দিতে হবে।

এই সময়ই খবর এল বজ্রযোগিনীর শ্মশানে কে এক পাগলা সাধু এসেছেন—তিনি নাকি মহা তান্ত্রিক, সিদ্ধ সাধক।

ব্যস, আর যায় কোথায়। কথাটা কানে শোনার ওয়াস্তা। জ্যাঠামশাই

তৎক্ষণাত রওনা হয়ে গেলেন। বজ্রযোগিনী আমাদের গ্রাম থেকে সাত আট মাইলের পথ—জ্যাঠামশাইয়ের বয়সও তখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি—তবে এসব তুচ্ছ তথ্যে জ্যাঠামশাইয়ের সেখানে ছুটে যাওয়া আটকাবে তা সম্ভব নয়। তাঁকে সবাই এটুকু চিনত বলে কেউই বাধা দেবার চেষ্টা করল না, শুধু এতটা পথ বুড়ো মানুষ একা যাচ্ছেন দেখে আমার ছোট কাকা সঙ্গে গেলেন।

জ্যাঠামশাই বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলেন বেলা চারটে নাগাদ—উনি আবার খালি পায়ে বেরিয়েছিলেন, সাধু দর্শনে নাকি জুতো পায়ে দিয়ে যাওয়া ভারী অপরাধের—ফলে মাঠ পার হয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই বেশ রাত হয়ে গেল। ছোট কাকার মুখেই শুনেছি আমরা—শ্মশানে তখন একটা মড়া পুড়ছে, আর সেই সাধক আপন মনে কি বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে সেই চিতাটা ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করছেন। সবটা জড়িয়ে সে এক ভয়ানক দৃশ্য; প্রধানতঃ লাল কাপড়, তার ওপর নানা রঙের নানা বস্তুর—সিল্ক থেকে কম্বল ছেঁড়া পর্যন্ত তালি দেওয়া আলখাল্লার মতো পোশাক, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা চুল, গলায় ফকিরদের মতো কতকগুলো কি মালা, কাঁচকড়াও আছে রুদ্রাক্ষও আছে—অবিশ্যি সেটা ছোট কাকার অনুমান, তখন ওসব শ্মশানে কোন আলোর ব্যবস্থা থাকত না, যারা রাত্রে মড়া নিয়ে যেত তারা নিজেরাই আলোর বন্দোবস্ত করত, কেউ লণ্ঠন কেউ বা মশাল তৈরি করে নিত—এ মড়া যারা নিয়ে এসেছিল তারা বোধহয় ঐ কাপালিকের ভয়েই শ্মশানের বাইরে বহুদূরে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল. লণ্ঠন যা দু' একটা সঙ্গে এনেছিল তাও সব সেইখানে, কাজেই চিতার আগুনেই যা দেখেছিলেন কাপালিক বা তান্ত্রিক, যাই বলুন—সেই সাধককে।

অনুমান যেটা নয় সেটা হচ্ছে দুর্গন্ধটা। মড়া পোড়ার গন্ধ আলাদা, ছোট কাকা বলেছিলেন, এ এক বিশ্রী দুর্গন্ধ, পচা মাংস তার সঙ্গে দিশী পচাই মদ মিশলে যেমন গন্ধ হয় তেমনি। সেটা তাঁর গা থেকে কি পোশাক থেকেই বেরুচ্ছে তা বোঝা গেল না—এমনিও, দেখে মনে হয়েছিল ওঁর, বোধহয় বছর তিনেক গায়ে জল পড়ে নি, অর্থাৎ স্নান করেন নি। চুলে জট পাকিয়ে গেছে নোংরায়, বোধহয় পোকা কিলবিল করছে—কারণ মাঝে মাঝেই হিলহিল করে চুলকোচ্ছিলেন—তাতেও খানিকটা দুর্গন্ধ হয়েছে

নিশ্চয়—সবটা জড়িয়ে কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ নাড়িতে পাক দিয়ে উঠেছিল ছোট কাকার।

জ্যাঠামশাইয়ের অত ঘেন্নাটেন্নার বালাই ছিল না, অত লক্ষ্যও করেন নি বোধহয়—উনি ওঁর অভ্যাসমতো এগিয়ে সাধকের পায়ে পড়তে গেলেন। তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না বরং পায়ে কোন লতাপাতা বাজে জঞ্জাল জড়িয়ে গেলে পা ঝাড়া দিয়ে যেমন সেটা ছাড়িয়ে নেয় মানুষ, সেই ভাবেই লাথি মেরে ওঁকে সরিয়ে পা-টা মুক্ত ক'রে নিলেন। ছোট কাকার বিশ্বাস, সাধক তখন আধ-পোড়া নরমাংস সংগ্রহ করার জন্যেই ঘুরছিলেন, ঠিক কোনখান থেকে তুললে নরম মাংস পাবেন, বাগমতো তুলতে পারবেন সেইটেই লক্ষ্য করছিলেন কারণ হাতে একটা বড় গোছের চিমটে ছিল সন্ন্যাসীটির, কিছু একটা খুঁটে তোলবার মতো ক'রেই বাগিয়ে ধরা। বোধহয়—এই ভাবে মাংস সংগ্রহ ক'রে ঐ আলখাল্লার কোন পকেটে রেখেও দেন, সময়মতো বার ক'রে খাওয়ার জন্যে, তাতেই এই পচা মাংসের দুর্গন্ধ।

যাই হোক—সন্ন্যাসীর লাথি খেয়ে নিরস্ত হবেন জ্যাঠামশাই সে পাত্র নন, বরং তাঁর শ্রদ্ধা বেড়েই গেল আরও। তিনি আবারও ছুটে গিয়ে পায়ে পড়ে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'বাবা দয়া করুন। অকৃতী অধম সন্তানকে নিজ্‌গুণে (জ্যাঠামশাই অকারণে নিজ শব্দে হসন্ত ব্যবহার করতেন) কৃপা করুন!'

এবার সে সন্ন্যাসী—অবিশ্যি যদি তাঁকে সন্ন্যাসী বলা চলে—থমকে দাঁড়ালেন, কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এই ব্যাটা, এ আবার কি ঢঙ রে! ব্যাটা আমার সঙ্গে—করতে এসেছ!' মধ্যে খুব একটা নোংরা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, সেটা আর আপনাদের কাছে বলতে পারব না!...

তারপর এই চলল কিছুক্ষণ ধরে। জ্যাঠামশাই যত কাকুতিমিনতি করেন সে সন্ন্যাসীও তত গালিগালাজ মুখখারাপ করেন। একবার তো একটা আধ-জ্বলন্ত কাঠ নিয়েই তেড়ে এলেন, 'মেরেই ফেলব শালাকে, পুড়িয়ে মারব। ঐ এক শয়ে তুলে দোব। ব্যাটা নেকু, ন্যাকামি করতে এসেছেন! ব্যাটা আকণ্ঠ ভোগে ডুবে আছেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিষয়ের মদে চুরচুরে—ব্যাটা সাধু দেখে পায়ে পড়তে এসেছেন। নিজে কষ্টটষ্ট কিছু করতে পারব না, বাবা, তোমার কাঁধে চেপে ভবনদী পার হবো! তুমি এত কাণ্ড ক'রে

মেহনত ক'রে যা কিছু করেছ, আমাকে দিয়ে সরে পড়ো!···ব্যাটা, একের নম্বর বদমাইশ—হারামী, হারামীর বাচ্ছা!'

কিন্তু সে যতই যা বলুন, জ্যাঠামশাই অচল অটল। পোড়া কাঠ নিয়ে তেড়ে আসবার সময় ছোট কাকা পালিয়েছিলেন, বড় জ্যাঠা এক পাও নড়েন নি। বোধহয় এই ধৈর্যেরই জয় হল। বাবা নরম হলেন। বললেন, 'কী, কী চাস ব্যাটা তুই, য়্যাঁ? বলি শালা তোর মতলবটা কি? খুলে বল দেখি!'

'বাবা—দয়া করে একটিবার আমার বাড়ি চলুন, শ্রীচরণের ধুলো দিন। আপনি রাজী হলে গোরুর-গাড়ি পাল্‌কি যা বলবেন ব্যবস্থা করব—কিচ্ছু কষ্ট হবে না—'

'ওরে শালা, যে শ্মশানে থাকে মড়ার মাংস খায়—তাকে তুই কষ্টর কথা কি বলছিস রে শালা? য়্যাঁ!'

তারপর কে জানে কেন খুব জোরে হেসে উঠলেন হা-হা ক'রে, অট্টহাস্য যাকে বলে। তারপর বললেন, 'সব্বনাশের খুব শখ হয়েছে—না? তাই আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছিস? শালা আমি গেরস্ত-বাড়ি যাব কি রে, য়্যাঁ? কখনও কোন মন্দিরে মসজিদে যাই না। শালা আমি যেখানে যাব সেই তো শ্মশান হয়ে যাবে। তোর বাড়ি শ্রীচরণের ধুলো দিলে তোদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, সব শ্মশান হয়ে যাবে। ছাখ, ভেবে ছাখ—নিয়ে যেতে চাস?'

জীবনে এই প্রথম জ্যাঠামশাই যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বোধহয় তাঁর একার সংসার হলে এতটুকুও ইতস্ততঃ করতেন না, এখানে সাত ভাইয়ের সংসার, একান্নটি লোক বাড়িতে। এতগুলো লোককে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার তাঁর অধিকার নেই—এই কথাটাই বোধহয় মনে হল তাঁর।

ওঁকে চুপ ক'রে যেতে দেখে আবারও হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন সাধক।

তবে তার পরই গলার আওয়াজটা আশ্চর্য রকম ভাবে কোমল হয়ে এল, বললেন, 'ওসব ছাড়। তোর আসল মতলবটা কি বল দিকি শালা। কি চাস তুই?'

'বাবা—অপরাধ নেবেন না, মাকে একবার দেখতে চাই, বড্ড বাসনা প্রাণে। একবারটি দেখিয়ে দিন, আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব!'

'ওরে শালা! তুই তো দেখি মহা সাউকার! শালা এত লোক এত

কষ্ট ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে যাকে দেখবার জন্যে—তুই শালা বিনি মেহনতে বিনি কষ্টয় পায়ের ওপর পা দিয়ে ঘরে বসে রাজভোগ খেতে খেতে তাকে দেখবি! তোর আস্বা তো কম নয়। য়্যাঁ। বলিস কি রে ব্যাটা! য়্যাঁ। মহা ধড়িবাজ ফন্দিবাজ লোক তো দেখি! সেই জন্যে ব্যাটা এত কাকুতিমিনতি, এত পায়ে পড়া! এই জন্যে আমাকে বাড়ি নেবার এত ফন্দি! ওরে হারামীর বাচ্ছা!...আবার বলে কেনা গোলাম হয়ে থাকব।...সে বেটিকে দেখার পর কার কেনা গোলাম হবি রে শালা, তুই কোথায় থাকবি আর আমি কোথায় থাকব!...ভণ্ডামির জায়গা পাও নি শালা। জেনে শুনে ন্যাকামি!'

এমনি আরও অকথ্য কুকথ্য গালিগালাজ দিতে লাগলেন পাগল সন্ন্যাসী—অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু যতই গালমন্দ দিন, গায়ে থুথু দিন—এর মধ্যে দু ধাবড়া থুথুও দিয়েছেন জ্যাঠার মুখে—বড় জ্যাঠার ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের কাছে তাঁকে হার মানতে হ'ল। একটু একটু ক'রে নরম হয়ে এলেন সন্ন্যাসী। আগের থেকে অনেক কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ছাখ এসব পাগলামি করিস নি, এসব করতে নেই। মা আমার সর্বনাশিনী শ্মশানবাসিনী—গেরস্ত মানুষদের তাঁকে দেখতে চাইতে নেই। রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদ এঁরা সন্ন্যাসী ছিলেন, রাজা রামকৃষ্ণও তাই—গুপ্তসন্ন্যাসী—তা ছাড়াও তাঁর অতবড় রাজত্বর কিছুই তো রইল না দেখলি।...ঘর ছেড়ে আয়, তার পর তাঁকে দেখতে চাস—ছেলেপুলে নিয়ে বাস করিস এসব মতলব করিস নি।'

ভালই বলেছিলেন সন্ন্যাসী, পাগলের মতো নয়—বুদ্ধিমানের মতো জ্ঞানবানের মতোই যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু আসল পাগল হয়ে গিয়েছিলেন আমার জ্যাঠামশাইই, তিনি কোন সদ্‌যুক্তিতেই কর্ণপাত করলেন না। আসলে এতদিনের আশা তাঁর, মাথার মধ্যে একটা স্থির ধারণা হয়ে গেছে—যে আশা সবাই বলেছে অবাস্তব, যা নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছে, পাগল বলেছে তাঁকে—সেই আশা হয়ত ফলবতী হতে পারে এঁর কৃপায়—সেইটুকু আভাস মাত্রে তিনি যেন আরও ক্ষেপে উঠেছেন তখন, আরও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন, কোন কথাই আর শুনতে প্রস্তুত নন। তিনি বরং আরও আড় হয়ে পড়লেন—সবলে পা জড়িয়ে ধরলেন সেই সন্ন্যাসীর, 'বাবা, দোহাই আপনার, একবারটি দেখান মাকে, বড় আশা আমার। তার পরমুহূর্তে মরে গেলেও কোন দুঃখ নেই। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়!'

চিতাটা নিভে এসেছিল ততক্ষণে। ওঁরাও কথা কইতে কইতে দূরে সরে এসেছেন খানিকটা, সেই জন্যেই হোক, আর দুজন সহজ সুস্থ মানুষ আসার জন্যেই হোক—ভরসা পেয়ে শবযাত্রীরা এবার এগিয়ে এসে চিতা খুঁচিয়ে দিতে লেগে গেছে। সন্ন্যাসী সেদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, একটু একটু ক'রে তাঁর মুখে একটা দুজ্ঞেয় রহস্যময় হাসির আভা ফুটে উঠল যেন—তারপর হঠাৎ আমার জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা ব্যাটা। দেখা পাবি মায়ের। তবে কী রূপে সে বেটি দেখা দেবে, তা আমি বলতে পারব না। সামনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন—বেলা ঠিক আড়াইটের সময়, মা তোদের বড় পুকুরের জল থেকে উঠে দেখা দেবেন। ঐ সময়—পাঁজি দেখে নিস, ত্রয়োদশী ছাড়ছে, চতুর্দশী লাগছে, ঠিক সেই ক্ষণে। তবে সে এমনি হবে না—তোদের বাড়িতে একটি শ্যামবর্ণের ষোড়শী মেয়ে আছে কুমারী, তার বাঁ হাতের তর্জনীতে একটা লাল তিল আছে দেখে নিস,—সেই মেয়ে যেন উপবাস করে থেকে বেলা দুটোর সময় ঐ পুকুরেই স্নান ক'রে হাতে একশ আটটি দূর্বা নিয়ে ভিজে কাপড়ে এলোচুলে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তবেই মা দেখা দেবেন, নইলে নয়। তবে এখনও বলছি, এসব মতলব ছাড়, এতে ভাল হবে না তোর। সূর্যেই আমাদের সকলের জীবন তবু সেই সূর্যের দিকে চাইলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। মা সকলেরই—কিন্তু মাকে দেখারও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।'

ছোট কাকা কাছেই ছিলেন, সব কথা স্পষ্ট শুনেছেন। এবার তাঁরও একটু আস্থা হ'ল। কারণ যে মেয়েটির কথা কাপালিক বলেছেন সে মেয়েটি তাঁরই, আমার খুড়তুতো দিদি, তার নামও শ্যামা, সবে মাস দুই আগে সে ষোল বছরে পা দিয়েছে। শ্যামবর্ণ বটে কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে ছিল, এক ঢাল চুল—খুলে দিলে সারা পিঠ পাছা পর্যন্ত ঢেকে যেত। তার বাঁ হাতের তর্জনীতে একটা লাল তিলও আছে—আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। লাল বলেই বোধহয় লক্ষ্য পড়েছে সকলের, কালো মেয়ের আঙুলে লাল তিল বলেই। ঠিক দেখলে মনে হ'ত এক ফোঁটা লাল কালি পড়েছে কী ক'রে। এই মেয়েটিই যে তাহলে মায়ের চিহ্নিতা সেবিকা হিসেবে নির্বাচিত হ'ল—মনে ক'রে ছোট কাকার বেশ একটু গর্বও বোধ হয়ে থাকবে হয়ত।

ওঁরা ফিরে আসার পর মহা তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল বাড়িতে। কথাটা আর কাউকে বলা হল না, এত কষ্টে অর্জিত সৌভাগ্যে বিনা আয়াসে অপরে ভাগ বসাবে সেটা কারুরই মনঃপূত নয়। তবু—আত্মীয়-মহলে একটু জানাজানি হয়েই গেল কী ক'রে, সকলেই, যাকে বলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই মহা-প্রতীক্ষিত দিনটির।

অবশ্য তার বিশেষ দেরিও ছিল না। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে যেদিন সন্ন্যাসীর কথা হয় সেদিন ছিল অষ্টমী, মধ্যে আর পাঁচটি দিন মাত্র। এদিকেও যেমন তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল ওদিকেও তেমনি আমার সেই দিদি শ্যামার মহা খাতির বেড়ে গেল বাড়িতে। সকলে যেন দিনরাত তাকে আগলে আগলে নিয়ে বেড়াতে লাগল, সকলেরই চোখে একটা সম্ভ্রম আর বিস্ময়ের দৃষ্টি। জেঠীমা কাকীমার দল তো উঠে পড়ে লাগলেন সাধ-খাওয়ানোর মতো ওকে ভালমন্দ এটা ওটা রেঁধে খাওয়াতে।

অবশেষে ত্রয়োদশীর দিনটি এসে গেল। মা ভোরে উঠে স্নান সেরে এসে ভোগ রাঁধতে শুরু করলেন। জ্যাঠামশাই আগের দিন থেকে উপবাসী আছেন—তিনিই পূজা করবেন স্থির ছিল। সেই মতোই ফুল দূর্বা ইত্যাদি তুলে বেছে প্রস্তুত করতে লাগলেন। মেয়েরা ও পুরুষরা সকলেই উপবাসী রইলেন সকাল থেকে, কেবল আমার এক পিসীমা বাচ্ছাদের খাইয়ে একসময় নিজে স্নান করে এলেন। বেলা একটা থেকে পুকুরপাড়ের অনেকটা জায়গা নিকিয়ে পূজার জিনিস সাজানো হল, মা এসে ভোগ ও নৈবেদ্য সাজিয়ে বড় বড় কলার পাতা দিয়ে ঢেকে রাখলেন, ঠিক সময়টিতে খুলে দেওয়া হবে।

দুটো বাজতেই শ্যামা স্নান করতে নামল। তার আগেই বড় জ্যাঠা তার হাতে একশো আটটি দূর্বার আঁটি তৈরি ক'রে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, ঘিয়ে সিঁদুর গুলে কপালে টিপ দেওয়া হয়েছে—যাতে জলেও ধুয়ে না যায়। স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলের রাশ পিঠে এলিয়ে শ্যামা দু'হাত জোড় ক'রে উত্তরাস্য হয়ে যখন দাঁড়াল, তখন সত্যি কথা বলতে কি আমাদেরই বেশ ভক্তি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ওকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিই।

তারপর এল সময় দুটো চৌত্রিশ মিনিট হ'ল ঘড়িতে। ঘড়ি আগে থাকতেই সাবধানে মিলিয়ে রাখা ছিল। জ্যাঠা এক হাতে অর্ঘ্য আর এক হাতে

ঘণ্টা নিয়ে আসনের ওপর দাঁড়িয়ে উঠলেন। মেয়েদের হাতে হাতে শাঁখ। বাবা কাকারা সবাই মিলে কালীর স্তব করতে লাগলেন অনুচ্চ কণ্ঠে। মহামায়া মা যে ঐ সময়টিতে পুকুরের জল থেকে উঠবেনই, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয় ছিল না, সুতরাং সেই ভাবেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম।

উঠলেনও মা। ঠিক নির্ধারিত সময়টিতেই উঠলেন।

কিন্তু সে যে কী রূপ ধরে উঠলেন মা, কী যে দেখলাম—তা ঠাকুরপো আপনাদের ঠিক বোঝাতে পারব না। এই দেখুন, এতকাল পরেও, মনে হওয়ামাত্র আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, গায়ে ডোল দিচ্ছে বারবার।···

কী দেখলাম সেটা বলার আগে আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের ঐ বড় পুকুরটার পশ্চিম দিকে সরু এক ফালি জমি ছিল, বড়জোর হাত কুড়ি চওড়া—তার পরই বিল শুরু হয়েছে, প্রকাণ্ড বিল। ওর মধ্যে আমাদের ভাগ ছিল অর্ধেক, বাকী অন্য শরিকদের। এই বিলের সঙ্গে নাকি এককালে সমুদ্রের যোগ ছিল—লোকমুখে শুনেছি, এখনও হয়ত অন্য নদীর সঙ্গে যোগ আছে, কারণ জোয়ারের সময় জল বাড়ে।

ঠিক দুটো বেজে চৌত্রিশ মিনিটে—পুকুরের মাঝখানে নয়—ঐ পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা আলোড়ন উঠল জলের মধ্যে, যেমন বড় ঘেটো রুই ঘাই মারলে হয়, কি শুশুক ডিগবাজি খেলে—তার পরই একটা ভয়াবহ মূর্তি উঠল জল থেকে আস্তে আস্তে। সিংহের কেশরের মতো ঝাঁকড়া এক মাথা চুল; মুখখানা কুকুরে-মানুষে মিলনো কিম্ভূতকিমাকার ধরনের—তার মধ্যে গোল দুটো চোখ, লাল ভাঁটার মতো জ্বলছে যেন; কাঁধ পর্যন্ত উঠল মানুষের মতো, বাকিটা লোমশ জন্তুর দেহ; সামনের দুই পা থাবা, পেছনের পা দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট—অনেকটা কুমীরের পায়ের মতো দেখতে কিন্তু হাঁসের পায়ের মতো জোড়া, তবে হাঁসের চেয়ে অনেক বড়, শুনেছি ভোঁদড়েরও ঐ রকম পা হয়—দেখি নি কখনও; পুকুরের মধ্যে প্রবল যেন এক ঘূর্ণির সৃষ্টি ক'রে জন্তুটা জল থেকে উঠে লাল আগুনের মতো সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার আমাদের দিকে চেয়েই ঐ ডাঙ্গাটা পেরিয়ে গিয়ে ঝপাং ক'রে বিলের জলে পড়ল—আর তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। শুধু যেখানটায় পড়েছিল অনেকক্ষণ ধরে বিলের সেইখানটাকে কেন্দ্র করে জলে কতকগুলো তরঙ্গবলয় উঠতে লাগল!

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটতে তিন চার মিনিটের বেশি সময় লাগে নি। কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট। মেয়েদের হাতের শাঁখ হাতেই রয়ে গেল, নৈবেদ্য ও ভোগের ঢাকা খোলার কথাও মনে রইল না কারো। জ্যাঠামশাই তো পাথর হয়ে গেছেন একেবারে—তাঁর এতদিনের আশাকে যে মা এই রকম নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ ক'রে যাবেন তা বোধহয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। কাকাদের মুখের স্তোত্র থেমে গিয়েছিল অনেকক্ষণই—সকলেই একটা অজানা বিমূঢ় ভয়ে স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

এমনই অবস্থা সকলকার যে সকলের আগে যার দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল, তার কথা এতক্ষণ কারও মনেও পড়ে নি। মূর্তিটা বিলের জলে ডুব দেওয়ার দু তিন মিনিট পরে যখন শ্যামাও অজ্ঞান হয়ে জলে পড়ে গেল তখন সকলের হুঁশ হ'ল।

তাড়াতাড়ি জলে লাফিয়ে পড়ে ছোট কাকাই তুললেন তাকে। কিন্তু প্রাথমিক যা কিছু করার করা হলেও তার জ্ঞান এল না। যার যা জানা ছিল সব রকম টোটকা চিকিৎসা ক'রেও না। তখন ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে কী সব ইঞ্জেকশ্যন দিলেন, জোর ক'রে দাঁত ফাঁক করে ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি দিলেন—তাতে চোখ চাইল, একটু নড়ল—কিন্তু কাউকে চিনতেও পারল না, কোন কথাও কইল না।

এদিকে, শ্যামাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত বিব্রত, জ্যাঠামশাই তো সেই যে ঠাকুরঘরে গিয়ে পড়েছেন—উঠছেনও না, মুখে এক ফোঁটা জলও দিচ্ছেন না।—সন্ধ্যা থেকে বাড়ির চারপাশে একটা অদ্ভুত ভয়াবহ কুকুরের কান্না উঠল। এমনিই কুকুর-কাঁদা বলে অলক্ষণ—তার ওপর এমন বীভৎস কান্না কেউ কখনও শোনে নি, যখনই কেঁদে ওঠে আমাদের সকলের গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে যায়—ভয়ে বুকে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। পুরুষেরা বার বার লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে দেখে আসতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত বেড়াজালের মতো ক'রে বাগানটা ঘিরে খোঁজ করা হ'ল কিন্তু সে কুকুরের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও। অথচ সকলে এসে বাড়িতে ঢুকলেই সেই কান্না ওঠে, বাড়ির খুব কাছে, জানলার ধারে ধারে।

আমাদের বাড়িটা ছিল ছড়ানো-ছেটানো—পাকা-দেওয়াল-মাথায়-খড়ের চাল বড় বড় দু'তিনখানা ক'রে ঘর এক এক জায়গায়—সবগুলো ঘিরে, ঘিরে

কেন সকলের মধ্যেও, বড় উঠোন, তার পর পাঁচিল, পাঁচিলের বাইরে বাগান। কখনও মনে হয় উঠোনের মধ্যে, জানলার ঠিক নিচেই কাঁদছে দাঁড়িয়ে, কখনও মনে হয় পাঁচিলের বাইরে। বিশেষ লক্ষ্য যেন শ্যামার বা ছোট কাকার ঘরটাই। কিন্তু সেও যেমন সারারাত ধরে কাঁদল আমরাও প্রায় সারারাত ধরেই খুঁজলাম, সে কুকুর কোথাও দেখা গেল না। মনে হল অশরীরী কিছু কুকুরের ডাক অনুকরণ ক'রে ডাকছে। আরও, সঙ্গে সঙ্গে দুপুরে দেখা সেই মূর্তিটা মনে পড়তেই আমরা যেন আতঙ্কে জন্তু হয়ে গিছলাম সেই রাত্রে, কারও কোন কাজে হাত পা উঠছিল না, কেউ ভাল ক'রে পরস্পরের সঙ্গে কথাও কইতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হচ্ছিল ভয়ানক একটা কিছু অমঙ্গল ঘটবে এ বাড়িতে, কাপালিক ঠিকই বলেছিল, জ্যাঠামশাইয়ের এ আগ্রহ না করলেই হত।

শ্যামা সারারাতই তেমনি অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে রইল। বাবা সাইকেলে ক'রে গিয়ে আরও একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন পাশের গ্রাম থেকে—কিন্তু কেউই কিছু করতে পারল না। একবার যেন মনে হ'ল ঠোঁটটা নড়ল শেষ রাত্রের দিকে—ছোট কাকা বললেন, ওঁর দীক্ষার বীজমন্ত্রটাই নিঃশব্দে উচ্চারণ করল মেয়ে, তবে সে সবটাই ওঁর অনুমান হতে পারে—কারণ আমরা কিছুই বুঝতে পারলুম না—তারপর রাত চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে, পুব আকাশে ভোরের আভাস লাগতে না লাগতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সেই সময়টা, মিনিট দশেক ধরে কুকুরটাও যা বাড়িয়েছিল কী বলব, অমন বীভৎস ভয়ঙ্কর স্বর বোধহয় কেউ কখনও শোনে নি, আমাদের বাড়ির পুরুষরা পর্যন্ত ভয়ে কাঠ হয়ে গিছলেন, ডাক্তারবাবু বসে ছিলেন, তিনি ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলেন সেই চিৎকার শুনে। কিন্তু আশ্চর্য এই শ্যামা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কান্নাও থেমে গেল, আর একবারও শোনা গেল না! সেদিনও না, তার পরেও আর কোন দিন নয়।

জ্যাঠামশাইও আর বেশীদিন বাঁচেন নি। এই ব্যাপারের জন্যে স্বভাবতঃই তিনি নিজেকে দায়ী বোধ করতে লাগলেন, লজ্জায় যেন কারও সামনে আর মাথা তুলতে পারতেন না, ছোট কাকার সামনে তো নয়ই। একদিন ছোট কাকার পায়ে ধরে মাপ চাইতেও গিয়েছিলেন—ছোট কাকা খুব বকাবকি কান্নাকাটি করায় তবে নিরস্ত হন। অমন যে অষ্টপ্রহর 'মা' 'মা' ডাক—এই

ঘটনায় তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছিলেন বলতে গেলে। ঠিক মনে নেই, তবে বোধহয় শ্যামার মৃত্যুর ঠিক একুশ দিনের দিনই জ্যাঠামশাই মারা গিছলেন।

নজর

খুব একটা বেশী দিনের কথা নয়। গত মহাযুদ্ধের আমল সেটা। দেশ ভাগ হওয়ার ঠিক আগেই এ কাহিনীর শেষ। যে শিশুর কথা বলছি সে আজ পূর্ণ যুবক। পড়াশুনো শেষ ক'রে চাকরিতে ঢুকেছে। ঘটনাটারও ষোল আনাই প্রায় সত্য—শুধু নাম ধামগুলো পাল্‌টানো হয়েছে, পাল্‌টানো উচিত বলে।

কার্য-কারণটা প্রথমে কেউ অত ধরতে পারে নি। সে তান্ত্রিকটি এসে না বললে আজও বোধহয় কেউ পারত না।

পূর্ববঙ্গের বাড়ি সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরাই জানেন, পাঁচিলঘেরা ঘনসম্বন্ধ বাড়ি ওদিকে বড় একটা হ'ত না। কোঠাবাড়ির কথা আলাদা, যাঁদের মাটির ঘর—অনেক সম্পন্ন ব্যক্তিও মাটির ঘরে থাকতেন, কেউ কেউ বা বন্যার জন্যে থাকতে বাধ্য হতেন—ছিটে বাঁশের দেওয়ালে মাটিধরানো, কোথাও বা এমনিই বাঁশের ফ্রেমে সাধারণ মাটির দেওয়াল, কোথাও বা ছিটেবেড়া শুধু, মাটি নেই ; অনেক জায়গা নিয়ে তাঁদের ভিটে গড়ে উঠত, খেয়াল-খুশি মতো ছড়ানো। দাওয়া-উঁচু, বড় বড় ঘর—একটা বা একজোড়া এক জায়গায়। রান্নাঘরও তাই। ছাড়া ছাড়া, গায়ে গায়ে লাগানো নয় কোনটা কোনটার সঙ্গে—পাঁচিলের বালাই নেই—শুধু বসবাসের ঘরগুলোর সংলগ্ন জমিটা নিকোনো সাফ্ করা থাকত, ঘাস বা আগাছা জন্মাতে দেওয়া হ'ত না, সেইটেকেই উঠোন বলত। শহরে বা বড় শহরের উপকণ্ঠে যাঁরা থাকেন—উঠোন বলতে তাঁরা যা বোঝেন—এ তার ধারে কাছেও যায় না।

আসলে এটাকে উঠোনও বলা যায়, চলন বা চলাচলের রাস্তাও বলা যায়। রাস্তা হিসেবে একটু বেশী চওড়া, এই যা। কারণ এরই একটা অংশ নির্বাধায় পুকুর পর্যন্ত চলে গেছে—গৃহবিশেষে একাধিক পুকুর—কোনটা বা

গেছে পিছনের সুপুরি-নারকেলের বাগান পর্যন্ত। সেই একেবারে শেষে, পাঁচ-ছ' বিঘা বা আট-দশ বিঘা, যার যেমন—জমি বাগান মিলিয়ে যেটাকে বাস্তু ধরা হয়—তার চারদিকে কারও হয়ত বা বাঁশের বেড়া, কারও বা কাঁটাগাছের—কারও বা তাও নেই, মাটি কেটে একটু নালা-মতো করা আছে, সীমানা হিসেবে।

যে দিনের কথা বলছি—মুকুল বৌদি সেই রকম একটা চলাচলের রাস্তায়—উঠোনও বলতে পারেন তাকে—বসে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। তখন ঠিক সন্ধ্যের মুখটা, চারদিকের বড় বড় গাছের ছায়ায় বেধে আবছা হয়ে এসেছে আলো—অথচ ঠিক আলো জ্বালারও সময় হয় নি—ঝুঁঝকি বেলা যাকে বলে এমনি সময় সেটা। কতকটা সেই আবছায়ার জন্যেই ফাঁকায় এসে বসেছিল বৌদি, কিছুটা আলো পাবে বলে। সন্ধ্যা দেখানো হ'লেও—পাড়াগাঁয়ে সেই প্রদীপের আলো ভরসা। দুটো হ্যারিকেন আছে। একটা নিয়ে ছেলেরা পড়াশুনো করে, আর একটা জ্বলে বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে, মুকুল বৌদির ভাশুর বসে হিসেবপত্র দেখেন—পাড়ার লোকজন এলে গল্পও করেন।

তাছাড়া সন্ধ্যা দেওয়া হলে আবার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সেই সন্ধ্যে-কালটা না কাটলে নাকি খাওয়াতে নেই। অথচ দেরিও হয়ে গেছে ঢের, কিষেণ এসেছে অনেক দেরিতে, গাই দুইতে দুইতে সূর্য পাটে বসে গেছেন—ছেলেটা ক্ষিদেয় চিল-চেঁচাচ্ছে।

তৎসত্ত্বেও শাশুড়ী তিরস্কার করেছিলেন মুকুল বৌদিকে, 'ও কি গা বৌমা, এই রাক্কুশী বেলায় তুমি পথে বসে ছেলেটাকে দুধ খাওয়াচ্ছ! খোলাজায়গা, যাতায়াতের পথ—পথ নয়, চার রাস্তার মোড় বলাই উচিত, চারটে পথ চারদিকে চলে গেছে—এই কি একটা বসবার জায়গা হ'ল? এমন সময় কোন খোলা জায়গাতেই খাওয়াতে নেই, অন্যি দেবতাদের নজর লাগে।'

অত গা করে নি মুকুল বৌদি, সত্যিই কোন বিপদ হ'তে পারে, তা ভাবে নি। ভাবার কথাও নয়। এসব ভয় থাকে মানুষের অল্প বয়সে, তবু তখনো কেউ ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। এসবে বিশ্বাস আসে বেশী বয়সে, যৌবনে ভয়ও থাকে না বিশ্বাসও থাকে না। সে বয়সে অপদেবতার অস্তিত্ব একটা পরিহাসের বিষয়মাত্র।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, ছেলের সেদিন এক বছর বয়স পূর্ণ হ'তে

ঠিক একটি দিন বাকী—মুকুল বৌদি ছেলেকে কোলে ক'রে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক দুপুর বেলা—চড়া রোদ, তবে বৌদি দাঁড়িয়েছিল একটা বড় কাঁঠাল গাছের ছায়ায়—অতটা কড়া রোদ বোঝা যাচ্ছিল না সেখানে। অবশ্য ছায়া না থাকলেই বা কি—রোদ থাকলেও দাঁড়াতে হ'ত। মুকুল বৌদি দাঁড়িয়ে ছিল, মানিক জেলের খোঁজে, যে বুড়োটা মাছ দিয়ে যায়। আজ তিনদিন তার পাত্তা নেই, ফলে কারও পেটেই মাছ যায় নি কদিন। অসুবিধাটা মুকুলেরই বেশী, ছেলেটা সবে ভাত খেতে শিখেছে—কিন্তু মাছ না হ'লে একদানা ভাতও খেতে চায় না। সেই গরজেই একেবারে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, মানিককে দেখতে পেলে এক কুন্‌কে চাল আর দু'কুন্‌কে ক্ষুদ কবুল ক'রে নিজেদের পুকুরেই নামাবে একবার। আগে শুধু ক্ষুদ দিলেই হ'ত—এখন আর কেবলমাত্র দু'কুন্‌কে ক্ষুদে বড় পুকুরে জাল ফেলতে চায় না।

যেদিন দরকার থাকে সেদিন সামান্য বস্তুও দুর্লভ হয়ে ওঠে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়েও মানিকের দেখা পাওয়া গেল না সেদিন। ফিরেই আসছে—হঠাৎ একটি মেয়েছেলে কোথা থেকে এসে প্রায় পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল, 'আহা, কাদের খোকা গা, বাঃ, ভারি সুন্দর খোকা তো! তোমার বুঝি গা মা? এইটি প্রেথম—না আর আছে? বাঃ, বুক জুড়নো ধন! অ খোকাবাবু, আমার সঙ্গে যাবে? পেট পুরে রসগোল্লা খাওয়াবো?'

বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে খোকাকে কোলে টেনে নিল সে। ইচ্ছা ছিল না মুকুল বৌদির, যার তার কোলে ছেলে দেওয়া পছন্দ করে না সে, বিশেষ, সব মুখে মুখ দিয়ে চুমো খায়—বিশ্রী লাগে ওর—কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে ঠিক বাধাও দিতে পারল না। স্বভাবতই ছেলেমেয়েকে সুন্দর বললে মা একটু গলে যায়, আর দিনে দুপুরে পাড়ার মধ্যে ছেলেকে একবার কোলে করবে—আপত্তিরই বা কি কারণ দেখাবে? বরং না দেওয়াটাই অভদ্রতা দেখায়। কেন দিচ্ছি না—মুখ ফুটে বলাও তো শক্ত।

আর মেয়েছেলেটিও নেহাৎ খুহাৎ খুব ছোটঘরের কি ভিখিরি—এমনও মনে হ'ল না। বাসি-করা ফরসা কাপড় পরনে, রঙটা ময়লা হ'লেও চেহারায় বেশ একটা শ্রী আছে, ওর কলকাতার মাসিমা বলেন 'লাজ্জৎ'। মুখটাও কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে, কোথায় যেন এর আগে দেখেছে ওকে। সে-ক্ষেত্রেও যদি কিছু পরে মনে পড়ে যায় যে, মেয়েছেলেটি ওদের জানাশোনা

কিম্বা দূরসম্পর্কের আত্মীয় কেউ—তখন লজ্জার সীমা থাকবে না, ছেলেকে কোলে দিতে অস্বীকার করলে !

অবশ্য সে বেশীক্ষণ রইলও না। খানিকটা আদর করে, চুমো খেয়ে আবার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় খোকার গা গরম হ'ল। রাত দশটা নাগাদ সে-জ্বর উঠল একশো চার ডিগ্রিতে, গা পুড়ে যেতে লাগল। ভয় পেয়ে রাত্রেই পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে আনলেন যোগেশদা, কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। সর্দি নেই, কাশি নেই, বুকে সর্দি-বসা কি জল জমা কোনটারই কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না—টাইফয়েড বা ঐ-জাতীয় কোন জ্বর হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এত জ্বর বাড়ে না। তবে এটা কিসের জ্বর ? বিষিয়ে টিষিয়ে গিয়েছিল কোনরকম ? কোথাও কেটে-কুটে যায় নি তো ?—অসহায়-ভাবে এদেরই বারবার প্রশ্ন করেন ডাক্তারবাবু।

জ্বর কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে এদিকে। ভোরের দিকে সদরে লোক পাঠানো হ'ল—হাসপাতালের বড় ডাক্তারের জন্যে। সদর খুব বেশী দূরও নয়—মাইল ছয়েক—তবু খানিকটা নৌকোর পথ, ইচ্ছে থাকলেও তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় না। ফলে সেখানে পৌঁছে ডাক্তারবাবুকে ধরে নিয়ে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তখন আর ডাক্তারের কোন প্রয়োজন ছিল না—তার অনেক আগেই ছেলেটি মারা গেছে।

কিন্তু কী হয়েছিল, কিসে মারা গেল, এত জ্বরই বা হঠাৎ উঠল কেন, এমন নীল হ'য়ে গেল কেন ছেলে—তা এই বড় ডাক্তারবাবুও কিছু বুঝতে পারলেন না।

এর পরেও যোগেশদার একটি ছেলেই হ'ল।

এটি আরও সুন্দর দেখতে আরও স্বাস্থ্যবান।

এর যখন এগারো মাস বয়েস, মুকুল বৌদিকে বাপের বাড়ি যেতে হয়েছিল। বাবার খুব অসুখ, মা তার আগে থাকতেই শয্যাশায়ী, এক বৌ দিল্লীতে, আর এক বৌ বাঙ্গালোরে—বাধ্য হয়েই মুকুল বৌদিকে যেতে হয়েছিল। সে কাছে থাকে, তার শ্বশুরবাড়িতেও লোকের অভাব নেই—

অর্থাৎ কাজ করবার লোকের—শাশুড়ী-পিসশাশুড়ী, বড় জা,—এক বাড়ি মেয়েছেলে, এদেরও কিছু অসুবিধা ছিল না।

যেতে হয়েছিল গিয়ে থাকতেও হয়েছিল মাসখানেক—মা যতদিন না উঠে সংসারের ভার নিতে পারেন।

এইখানে একদিন—মুকুল বৌদির বাপের বাড়িতে দু'খানা ঘর, কোঠা—তারই একটার সামনে দালানে ছেলেকে নিয়ে বসে আছে, ছেলে বুকের দুধ আজকাল খায় না বড় একটা, সেদিনই খাচ্ছিল একটু আধটু—এক বৃদ্ধা মহিলা এলেন, 'হরেন কেমন আছে রে—তোর বাবা ?'

হরেন মুকুলের বাবার নাম।

মুকুল চিনতে পারল না ঠিক, কিন্তু চক্ষু-লজ্জায় সেটা বলতেও পারল না। ইনি যে চেনেন আর ভাল ক'রেই চেনেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে-ক্ষেত্রে এঁকে চিনতে না-পারাটা ওরই অপরাধ বলে বোধ হ'ল। বিশেষ একটু পরেই আবার যখন ওর মা'র নাম ধরে তত্ত্ব করলেন, 'তরু কোথায় গেছে ? সে ভাল আছে তো ?'

'মা গোপাল মামাদের বাড়ি গেছেন—কি একটু কাজে।' হাসি হাসি মুখেই খবরটা দিতে হ'ল 'আসুন, বসবেন না ?'

'না-না। আমি যাই। এইটি বুঝি তোর খোকা ? বাঃ- বেশ খোকা। কী খোকাবাবু—তোমার নাম কি ?'

মুকুলের কোলেই রইল ছেলে, উনি শুধু গাল টিপে চুমো খেয়ে আদর করে চলে গেলেন।

মা ফিরে আসতে মুকুল বৌদি ওঁর কথা বলল, বাবার ঘুম ভাঙ্গতে তাঁকেও। দুজনের কেউই চিনতে পারলেন না ভদ্রমহিলাকে। এ গ্রামের তো কেউ নয়ই—কিন্তু অন্য গ্রামেরই বা কে এত পরিচিত। ঐ বয়সী যত মহিলার কথা মনে হ'ল—খানিকটা মেলে হয়ত, পুরো কারও সঙ্গে মেলে না।

এর দিন-দুই পরে এ ছেলেরও তেমনি জ্বর এল।

সেই প্রচণ্ড গা-পুড়ে-যাওয়া জ্বর। এ গ্রামের যিনি একমাত্র ডাক্তার, তাঁকে সেদিনই কি কারণে পাওয়া গেল না। সে জায়গায় বড় কবিরাজকে ধরে নিয়ে এলেন হরেনবাবু। খুব বিখ্যাত কবিরাজ, বিস্তর নামডাক—রসসাগর উপাধি। তিনি হাসতে হাসতেই এসেছিলেন কিন্তু ছেলের নাড়ি

ধরতেই তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠল। তিনি হরেনবাবুকে বললেন, 'আমাদের শাস্ত্রে যেটুকু আছে আমি করছি কিন্তু এর নাড়ির গতিক আদৌ ভাল না। তোমাদের যাতে কোন ক্ষোভ না থাকে—সেইভাবে তোমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। অন্য কোন ডাক্তার ডাকতে চাও—ডাকো।'

যা করার সবই করা হল। সন্ধ্যা নাগাদ একজন কেন—দু'জন ডাক্তারই এলেন। যোগেশদারাও এসে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—রাত একটা নাগাদ এ ছেলেও মারা গেল।

পরে হিসাব ক'রে দেখা হয়েছিল—সেইদিনই ওর এক বছর পূর্তির দিন। আর একটা দিন বেঁচে থাকলে জন্মদিন পেত।

এর পরের ছেলে অর্থাৎ যোগেশদার তৃতীয় সন্তানটিও যখন এইভাবে ঠিক এক বছরের হয়ে মারা গেল, তখন সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এতটা একেবারে কাকতালীয় হ'তে পারে না অন্তত অনেকেরই তাই মনে হ'ল। ঠিক এক বছর বয়স হ'লেই মরছে, আর একই ধরণের জ্বর, এক রকম লক্ষণ—জ্বর হওয়ার ঠিক আগে একজন ক'রে অচেনা লোক আদর ক'রে যাচ্ছে—সবটাই স্বাভাবিক, দৈবের যোগাযোগ বলে মানতে চাইলেন না তাঁরা। তৃতীয় সন্তানটির বেলাও নাকি—সেই জ্বর আসার আগের দিন যোগেশদা কোলে ক'রে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন—কে একটি অল্পবয়সী ফ্রক পরা মেয়ে পথে ধরে কোলে ক'রে প্রচুর আদর করেছিল। অত অল্প বয়সের মেয়ে বলেই কোন সন্দেহ হয় নি যোগেশদার—কিন্তু এখন 'প্যাটার্ন' মিলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে সে একই ব্যাপার।

এর পর কিছু যে একটা করা দরকার সে বিষয়ে কারও সন্দেহ রইল না। সকলেই নিজের নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মতো উপদেশ দিতে লাগলেন। নানা ধরণের পরিকল্পনা, অনেক সময় পরস্পরবিরোধীও হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যোগেশদার মামা কামিনীবাবুর পরামর্শটাই এঁদের সকলের মনে লাগল। কামিনীবাবু জানালেন—ওঁদের গ্রাম থেকে তিনখানা গ্রাম পরে এক তান্ত্রিক সাধক থাকেন—পিশাচসিদ্ধ, খুব বড় সাধক নাকি—তাঁকে গিয়ে ধরলে এর প্রতিকার হতে পারে। তিনি নাকি প্রসন্ন হ'লে দিনকে রাত ক'রে দিতে পারেন—এমন বহু লোকের বহু উপকারই করেছেন তিনি, জীবনও রক্ষা করেছেন, কামিনীবাবুর এক সম্বন্ধীকে ঘোর সর্বনাশ থেকে

উদ্ধার করেছেন। তবে পয়সার লোভ দেখিয়ে কিছু করানো যাবে না, সে-মানুষ নন, খেয়াল হ'লে করবেন—নয় তো একেবারে হাঁকিয়ে দেবেন। খেয়াল হ'লে নিজেই পয়সা চেয়ে নেবেন, নইলে—সেধে কেউ দিতে গেলে হয়ত লাথি মেরে বসবেন। নয়তো মুখে থুতু দিয়ে দেবেন।···একবার চেষ্টা ক'রে দেখা হোক তো অন্তত। যা মনে হচ্ছে সত্যিই যদি তা-ই হয়, যদি কোন অপদেবতারই ব্যাপার হয় এটা—ওর দ্বারাই একটা সুরাহা হবে।

পরামর্শটা সকলেরই মনে লাগল। কামিনীবাবু বলে দিলেন, পাইখানার কাপড়ে বা সম্ভব হ'লে আরও অশুচি অবস্থায় তাঁর কাছে যেতে হবে। ঘোর নোংরার মধ্যে বাস করেন তিনি। কিন্তু তা দেখে ঘেন্না করা চলবে না, বা সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করাও না।

স্থির হ'ল যোগেশদা, তাঁর দাদা ক্ষিতীশবাবু আর কামিনীবাবু—এই তিনজনে যাবেন সেখানে।···

'দুর্গা' বলে একদিন শেষ রাত্রে নৌকো ক'রে রওনা দিলেন ওঁরা। যেখানে গিয়ে যাত্রা শেষ হ'ল—নদীর ধারেই একটা বিরাট পাকুড় গাছের দুটো মোটা শিকড়ের খাঁজে কোনমতে আটকে থাকা একটা ভাঙ্গা চালাঘর—এত আবর্জনায় পূর্ণ যে, দূর থেকেই তার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। আর তেমনি সে লোকটিও, বড় বড় চুল, বাঘের মতো নখ, বোধহয় বছর দশ বারো চান করেন নি, পরনের কাপড়-জামাও তথৈবচ, রাস্তায় যে সব পাগল ঘুরে বেড়ায় তাদের মতোই গায়ে পুরু হয়ে ময়লা জমে আছে। সবটা জড়িয়ে এমন একটা বদগন্ধ যে কাছে যায় কার সাধ্য!

তবু যেতে হ'ল, প্রণামও করতে হ'ল। কে জানে কেন, তিনি অতি সহজেই প্রসন্ন হলেন। সব শুনে বললেন, 'তরা যা গিয়া, আমি যাইত্যাছি। ছেম্‌বাটারে না দেইখ্যা কিছু বলন যাইব না।'

এঁরা রাহা-খরচ বাবদ কিছু দিতে গেলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন একটা।

আশ্চর্য এই, এতটা দূরের পথ, নৌকো ক'রে যখন ফিরে এলেন ওঁরা তখন সন্ধ্যা হয় হয়, কিন্তু বাড়ি ঢোকার মুখেই যার সঙ্গে দেখা হ'ল সে সেই তান্ত্রিক সাধু, ঘোষালমশাই। বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে আর কি যেন বাতাসে শুঁকতে শুঁকতে যোগেশদাদের বাড়িতেই ঢুকছেন। চোখোচোখি হ'তে এঁদের বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন। হাসিটাও যেন

ঠিক সাধারণ মানুষের হাসি নয়, সে হাসির শব্দে এঁদের সর্বাঙ্গ শিউরে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গাছ-পালায় যে সব কাকপাখীর দল রাত্রির মতো এসে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও ভয় পেয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল।...

ঘোষালমশাই সেই প্রায়-অন্ধকারেই মুকুলকে ভাল ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তার পর আশ্চর্য কোমল সুরে বললেন, 'মা, গুরুজনরা যা বলে তা শুনতে হয়। শাশুড়ী বারণ করেছিলেন—কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলে, মনে মনে হেসেও ছিলে। কিন্তু ওঁরা বহুদর্শী লোক, যা বলেন ভেবেই বলেন। সন্ধ্যাবেলা চলাচলের পথে বসে দুধ খাইয়েছিলে কেন—বড় ছেলেটাকে? আর জায়গা পাও নি?'

সকলেই চমকে উঠল। কথাটা অনেকেই জানত না, যারা জানত তাদেরও মনে ছিল না। শুধু সেই সামান্য একটি তুচ্ছ ভুলের যে এতদূর পরিণাম হ'তে পারে—তা বোধহয় মুকুলের শাশুড়ীও ভাবেন নি। মুকুল বৌদি তো ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। ভয়ে দুঃখে অনুতাপে দেখতে দেখতে তার কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিল, গলার কাছে কান্না ঠেলে উঠতে লাগল।

যোগেশদার মা-ই প্রথম কথা কইলেন। তাঁরও গলায় কান্না—বললেন, 'তাহলে কি হবে বাবা? আমার বৌমার কোন ছেলে বাঁচবে না?'

'কে বললে বাঁচবে না? সব তাইতে কথার ডগ কাটিস কেন মাগী? বাঁচবে না তো আমি আছি কি করতে?...সব ঠিক ক'রে দেব। এই তো আবার সামনে ছেলে আসছে ওর। এ বাঁচবে, ওর আরও ছেলেমেয়ে হবে, সব বাঁচবে। তবে যা বলে যাচ্ছি ঠিক মতো তাই শুনতে হবে। যতদিন না ছেলের আঠারো মাস বয়স হচ্ছে—ততদিন ছেলেকে কোন খোলা জায়গায় বসিয়ে খাওয়াবে না, সন্ধ্যার পর ঘরের বার করবে না। আর কোন অচেনা লোকের কোলে দেবে না। এই যদি শুনে চলতে পারো তা'হলে আর ভয় নেই। এ ছেলে আঠারো মাস পেরিয়ে গেলে অন্য ছেলেমেয়েও বাঁচবে!

'কিন্তু' ক্ষিতীশবাবু খুব ভয়ে ভয়েই প্রশ্ন করলেন, মা'র লাঞ্ছনা দেখে ভয় হয়ে গেছে তাঁর, 'যদিই কোন বিশেষ কারণে বার করতে হয়?'

'নিতান্তই যদি বার করতে হয়' এবার আর খিঁচিয়ে উঠলেন না ঘোষাল-মশাই, 'সর্ষের তেলের মশাল জ্বালিয়ে এক হাতে মশাল আর এক হাতে ছেলে

নিয়ে বেরোবে—যে-ই বেরোও। যতক্ষণ বাইরে থাকবে—যার কোলে থাকবে—তার হাতে সেই মশাল থাকবে, নেভা চলবে না।'

ঘোষালমশাই বাইরে পুকুরপাড়ে বসে পান্তাভাত আর বাসি মাছের অম্বল খেয়ে চলে গেলেন, যাবার সময় কী ভাগ্যি একটা টাকাও চেয়ে নিলেন ক্ষিতীশবাবুর কাছ থেকে। যোগেশদা তাড়াতাড়ি পাঁচটা টাকা বার ক'রে দিতে গিয়েছিলেন—তাঁকে কুৎসিত কটু ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠলেন। যোগেশদা সামনে থেকে পালাতে পথ পান না।

ঘোষাল মশাইয়ের প্রথম কথাটা অচিরেই ফলে গেল অবশ্য—একটি ছেলেই হ'ল আবার মুকুল বৌদির—আগের মতোই সুন্দর ফুটফুটে ছেলে—তবে তাতে আরও চিন্তা বেড়েই গেল—ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না কেউ। ঘোষালমশাইয়ের আশ্বাসবাণী যে সত্য হবে তা এখনও প্রমাণিত হয় নি। ছেলে এর আগেও হয়েছে সুশ্রী স্বাস্থ্যবান—তিনতিনবারই হয়েছে—এক বছর ক'রে বেঁচেওছে—কিন্তু রাখতে পারা যায় নি। এবারই কি থাকবে? সত্যিই কি ঘোষালমশাইয়ের কোন শক্তি আছে?···

জন্মদিন যত কাছে আসে ততই যেন কণ্টকশয্যা বোধহয় সকলের—মা-বাবা ঠাকুমার তো বটেই—জ্যেঠাজ্যেঠিদেরও কম নয়। বার বার এই বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, কারুরই ভাল লাগছে না সেটা।

কিন্তু ঘোষাল মশাইয়ের প্রভাবেই হোক, আর সাবধানে থাকার জন্যেই হোক,—উৎকণ্ঠ রুদ্ধ নিঃশ্বাস প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে এক সময় এক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেল খোকার। তাও যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না, সবাই বারবার হিসেব করছেন—পাঁজি ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন—তবুও দুর্ভাগ্য যে সত্যিই কাটল, এক বছর যে ভালোয় ভালোয় পার হয়ে গেল, একথা ভাবতে পারেন না আর। সেই কারণেই আরও দুটো-তিনটে দিন ছটফট করল সবাই—আশা ও আশঙ্কায়, নিদারুণ সংশয়ের মধ্যেই, তারপর একটু একটু ক'রে যেন নিশ্বাস পড়ল সকলের, আবার সহজ হ'তে শুরু করলেন সবাই।

অবশ্য ফাঁড়া একেবারে কাটে নি এটাও ঠিক, ঘোষালমশাই আঠারো মাস বা দেড় বছর সময় বেঁধে দিয়েছেন, ঐ সময় পর্যন্ত সাবধানে থাকার

নির্দেশ আছে—তবু আসল সেই ভয়ঙ্কর এক বছরের সীমানা তো পেরিয়ে আসতে পারা গেছে। এই তো ঢের।······

অনেকদিন পরে আবার এবাড়ির মেয়েদের মুখে হাসি ফুটল।

এই একটা বছর খুবই সাবধানে ছিলেন এঁরা। মধ্যে একবার রাত্রে বার করতে হয়েছিল খোকাকে,—মুকুল তখন বাপের বাড়িতে, হঠাৎ এঁদের এক জ্যাঠা এসে পড়লেন—মানে যোগেশদাদের জ্যাঠা—'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন—দীর্ঘকাল পরে ছাড়া পেয়ে একবার এঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সেইদিনই ভোররাত্রে রওনা হ'তে হবে, অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার—গুরুতরভাবে পীড়িত, একদিন দেরি হওয়া মানেও মৃত্যুর দিকে একপা বেশী এগিয়ে যাওয়া—সুতরাং তাঁকে নিয়ে যাওয়া যায় নি অত দূর, রাত পোহানো পর্যন্ত অপেক্ষাও করা যায় নি। খোকাকেই আনতে হয়েছিল।

দূর বেশী নয়। মাত্র মাইল চারেকের ব্যবধান, তবু—দেরি লাগে একটু, খানিকটা পথ নৌকোয় ও খানিকটা হেঁটে আসতে হয় কিম্বা গোরুর গাড়িতে। সেই সমস্ত পথই হরেনবাবু এক হাতে নাতিকে আর এক হাতে মশাল নিয়ে এসেছেন—কারুর হাতেই দেন নি। ফলে এখানে এসে যখন পৌঁছলেন, কোন হাতই আর নাড়বার ক্ষমতা নেই। তিন দিন ধরে সেঁক মালিশ দিয়ে তবে সাড় ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।

এইভাবেই হুঁশিয়ার থাকতে হবে, নিয়ম-কানুন সতর্কতা একটুও শিথিল করা যাবে না—সে সম্বন্ধে সকলেই সচেতন, কারুরই দ্বিমত নেই—পরস্পরকে বলেওছেন বার বার, তবু কবে এবং কখন যে সে সতর্কতা শিথিল হয়ে এসেছে একটু, তা কেউই টের পান নি।

এমন কি, যার সবচেয়ে সজাগ থাকার কথা, সেই মুকুলও যে কখন নিজের অগোচরেই একটু ঢিল দিয়েছে, আগের সেই সদা-সতর্কতায়—তা সেও বুঝতে পারে নি। আর তার ফলেই সেদিন একটা অঘটন ঘটে গেল।

কালটা পূর্বাহ্ণ বেলা, নটা-সাড়ে নটা হবে, বাড়িতে লোকজনও বিস্তর। আর সেই জন্যেই কারও খেয়াল হয় নি কথাটা। আর একেবারে বাইরেও নয়, দরজা ঘেঁষে বসে ছিল ঠিকই—তবু ঘরের মধ্যে বসেই মুকুল দুধ খাওয়াচ্ছিল

তার ছেলেকে। এক বছরের হ'লেও এখনও ঝিনুকে দুধ খায় খোকা—গ্লাসে বা বাটিতে চুমুক দিতে শেখে নি।

ব্যাপারটা কেউ লক্ষ্যও করে নি।

সকলের চোখের সামনে বলেই হয়ত বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করার মতো মনে হয় নি কারও।

একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক দৃশ্য। ঘরের সামনে দাওয়ায় বসে খাওয়ালেও কেউ লক্ষ্য করত না। লক্ষ্য করার কিছু আছে বলেও ভাবত না।

সেই জন্যেই বুড়িটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে এবং একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলেটার দিকে—তাও কেউ অত লক্ষ্য করে নি।

এই সময়টা পাড়ার বহু মেয়েছেলেরা আসে। আসে তারা নানান কাজে। কেউ ধান ভেনে দিয়ে যায়, কেউ বা ঘবের কোন কাজ করতে আসে; কেউ আসে মাছ বেচতে, কেউ মুড়ি ভাজতে; কেউ গোয়ালের কাজ করে। কেউ বা নিজের গরজেই আসে—টাকা ধার করতে, তেল ধার করতে, চাল ধার করতে। ভিক্ষার্থী সাহায্যার্থী হয়েও আসে অনেকে।

তাছাড়া অনেকেরই এটা যাতায়াতের পথও। এদের বড় পুকুরে স্নান করতে আসে অনেকে। পুকুরপাড় থেকে শাক তুলতেও। এদিক থেকে ওদিকের কোন বাড়ি যাবার পক্ষেও এদের উঠোন ডিঙিয়ে যাওয়া সহজ। সময়টাও কর্মব্যস্ততার এসব দিকে সকালের জীবন শুরু হয় শহরের থেকে অনেক পরে। সে জন্যেও কতকটা—ধীরেসুস্থে কেউ কারও দিকে নজর রাখতে পারে না।

নজরে পড়ল প্রথম যোগেশদার মারই। মুকুল যে দরজার কাছে বসে ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে তা তিনিও দেখেছেন—কিন্তু অত লক্ষ্য করেন নি, অর্থাৎ সে ঘটনার পূর্ণ তাৎপর্যটা তাঁর মাথায় যায় নি। এখনও বুড়িটার দিকেই তাঁর আগে নজর গেল—অপরিচিত মুখ। এ-গ্রামের কেউ তো নয়ই—ঠিক পাশের কোন গ্রামেরও নয়। কেমন একরকমের হাসি-হাসি মুখে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—প্রায় পলকহীন চোখে।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ ক'রেই এবার তিনি যেন প্রথম দেখতে পেলেন মুকুলের কাণ্ডটা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন তিনি, 'বৌমা!'

সে চীৎকারে সকলেই চমকে উঠল। মুকুল তো উঠবেই, ত্রস্ত হয়ে শাশুড়ীর দিকে তাকাতেই তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে বুড়িটাকেও দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা দিয়েও একটা ভীত আতঙ্কগ্রস্ত স্বর বেরোল—সে সভয়ে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে ভেতরে সরে গিয়ে সশব্দে কপাট দুটো বন্ধ ক'রে দিল।

মহা বিরক্ত হ'ল যেন বুড়িটা। অপমানাহত ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলল, 'কেন্, কেন্, বিষয়ডা কি ? আমি কি নজর দিতাম নাকি ? বলি নজর দিচ্ছিলাম মনে করো নাকি ? পোলাটারে যে সরাইলা ? ছিঃ ছিঃ। এম্নে ভাব নাকি—আমার তো কাম সারাই হইয়া আইছিল, চলিয়াই তো যাইতাম। এত আবার গণ্ডগোলের আছেডা কি ?'

বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে বুড়িটা আশ্চর্য রকমের ক্ষিপ্রবেগে চলে গেল।

এঁরা সকলেই এত হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন যে,—সে কে, কোথায় থাকে, কোথা থেকে এসেছে এবং কী দরকারে—সে সব প্রশ্ন করার কথা কারও মনেও পড়ল না—দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার আগে।

* * *

সেইদিনই সন্ধ্যায় বাচ্ছাটার জ্বর হল। সেই ভুতুড়ে জ্বর।

এদের মুখ শুকিয়ে আসা স্বাভাবিক। মুকুল এবং মুকুলের শাশুড়ী কান্নাকাটি শুরু করবেন—তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। সকলেই ধরে নিলেন যে আর কোন প্রতিকার সম্ভব নয়, একেও হারাতে হবে এবার। এমন কি ক্ষিতীশদা যখন ডাক্তার ডাকতে উদ্যত হলেন, তখন যোগেশদাই তাঁকে বাধা দিল, 'কী লাভ দাদা, বুঝতেই তো পারছ।'

কিন্তু, সামনে সেই-সকল-দিক-আচ্ছন্ন-করা অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার আলো এই যে, এবারে জ্বরের তাপটা পূর্ববারের মতো ভয়াবহ নয়—গতিটাও অত দ্রুত নয়। শেষ রাত্রেও একশো তিনের বেশী উঠল না। ছেলেও তেমন বেহুঁশ হয়ে পড়ল না।

ক্ষিতীশদা তখনই মনস্থির ক'রে ফেললেন। আর কারও কথা শুনবেন না তিনি। একেবারেই সদর থেকে বড় ডাক্তার ডাকবেন। তাঁর এবার একটা ঘোড়া হয়েছে। সদরে পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। যদি

ডাক্তারকে ধরতে পারেন তো বেলা নটা-দশটার মধ্যেই তাঁকে নিয়ে চলে আসতে পারবেন।

যোগেশদারও বোধ হয়—জ্বরটা দেখেই—একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছে—তিনি আর বাধা দিলেন না।

কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়তেই—ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পেয়ে সামনের পা তুলে চীৎকার ক'রে উঠল। ক্ষিতীশদা পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখলেন—সামনে একটা মানুষের মতো কি! সেই শেষ-রাত্রের ঝাপ্‌সা আলোতে আর একটু ঠাউরে দেখলেন—ঘোষাল মশাই, আপন মনেই বিড় বিড় ক'রে কি বকছেন আর ওপরদিকে মুখ তুলে কী যেন শুঁকছেন।

এবার মনে পড়ল তাঁর কথাটা সবাইকারই। ক্ষিতীশদা ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর পায়ে পড়লেন।

ঘোষাল মশাই মুকুলকে ও মুকুলের শাশুড়ীকে খুব তিরস্কার করলেন। তাঁর তিরস্কার সাধারণ তিরস্কার নয়—কুৎসিত কদর্য ভাষা—এমনিই শুনে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। ছেলেপুলে কি গুরুজনদের সামনে দিলে তো—দাঁড়ানোই যায় না।

তবে অভয়ও দিলেন ঘোষাল মশাই। বললেন, 'ডাক্তার ডাকতে হবে না। ও বেটাদের কম্ম নয়। ওরা জানে মানুষ মারতে। এমনিই ভাল হয়ে যাবে। চরম অনিষ্টটা হতে পারে নি—আর দুটো মিনিট দেরি হ'লে তাও হ'ত—তখন আর কিছুতেই বাঁচানো যেত না। যাক গে, আমি আছি, ছেলের জ্বর না ছাড়লে যাচ্ছি নি, তোরা নিশ্চিন্তি থাক।'

তিন দিন থাকবেন তিনি বললেন। কোথায় থাকবেন কী খাবেন—সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন। বাড়ির সীমানার বাইরে পাড়ার আঁস্তাকুড় যেটা—জঞ্জাল-টঞ্জাল ফেলা হয়, সেদিনও একটা আধপচা মরা কুকুরকে ফেলে দিয়ে গেছে—সেইখানে থাকবেন। রসুন দিয়ে পচা মাছের তরকারী রেঁধে দিতে হবে—আর পান্তাভাত। কেবল শেষদিন রাত্রে—অতিরিক্ত দু বোতল দিশী মদ এবং খানিকটা ঝল্‌সানো-পোড়া মাংস চাই।

ঠিক তিন দিনের দিনই ছেলের জ্বর ছেড়ে গেল।

ঘোষাল মশাই বললেন, 'আর ভয় নেই—এবার যা খুশি করতে পারিস।

আর সে আসবে না, অন্তত এ-বাড়ি ঢুকবে না। তবে আঠারো মাস পূর্ণ হবার আগে এ-বাড়ির বাইরে কোথাও যাস না, আর দেরিও তো নেই—মোটে দুটো মাস। না-ই বা গেলি কোথাও!'

ঘোষাল মশাইও সেইদিন রাত্রে অন্তর্হিত হলেন। পরের দিন ভোরে উঠে আর তাঁকে দেখা গেল না। যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই চলে গেলেন।

* * *

এর মাসখানেক পরে একদিন সেই বুড়িটাকে আবার ওদের বাড়ির সামনে রাস্তায় দেখা গিয়েছিল। যেন কি একটা মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভেতরে ঢোকারই ইচ্ছে—কিন্তু ঠিক ঢুকতে সাহস করছে না—ভাবভঙ্গী কতকটা সেইরকম।

যোগেশদার মা-ই প্রথম দেখতে পান তাকে। চিনতেও পারেন সঙ্গে সঙ্গে। তিনিই চীৎকার ক'রে ছেলেকে ডাকেন। চীৎকারে যোগেশদা ক্ষিতীশদা দু'জনেই ছুটে আসে। সেদিন বাড়িতে অনেকে এসে পড়েছিল—ক্ষিতীশদার ভাগ্নেরা, কামিনী মামার ছেলেরা—বিস্তর ছোক্‌রা। তারাও হৈ-হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

এরা কেউই চিনত না বুড়িকে—কিন্তু ব্যাপারটা শুনেছিল। যোগেশদা সেদিন দেখেছিল—আজও চিনতে পেরেছে। মা এদের কাছে পরিচয়টা দিতে দিতে সে রাস্তায় বেরিয়ে ছুটতে লাগল বুড়িটার পিছনে। বহুদিনের নিরুদ্ধ উষ্মা তার—স্ত্রী-হত্যা হয় হোক—ডাইনীটাকে নিজে হাতে পুড়িয়ে মারবে সে।

ততক্ষণে ছেলের দলও বেরিয়ে এসেছে। সবাই মিলেই ছুটতে শুরু করল। বুড়িও ব্যাপারটা বুঝে ছুটতে শুরু করেছে আগেই। তবে তা নিয়ে ওরা কেউ মাথা ঘামায় নি অত, একে মেয়েছেলে তায় বুড়ো মানুষ—কতক্ষণ পারবে ওদের সঙ্গে ছুটতে?

কিন্তু আশ্চর্য এই—এরা সকলেই অল্পবয়সী, গ্রামের ছেলে, খেলাধুলোও করে সকলে—ছোটা প্রত্যেকেরই অভ্যাস আছে এদের, তবুও বুড়িটাকে ধরতে পারল না ওরা। ওরা যত জোর দেয় বুড়িও তত জোরে দৌড়য়।—

ছুটতে ছুটতে ক্রমশ গ্রামের সীমানায় এসে পড়ল। সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত

মাঠ—ধানের ক্ষেত। অবশ্য তখন ধান কাটা হয়ে গেছে, তবুও দৌড়তে অসুবিধে হয় বৈকি।

সে অসুবিধে দু' পক্ষেরই হবার কথা। কিন্তু এই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। মাঠের মাঝামাঝি একটা গাছ ছিল, সম্ভবত শিমুল গাছ, বিরাট বহুদিনের গাছ। বুড়িটা সেইখানে গিয়ে হঠাৎ—সেই প্রকাশ্য দিবালোকে, সকলের সামনে—চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল। আগের মুহূর্তেও সকলে দেখেছে বুড়িটাকে সেই গাছটা দু' হাতে জড়িয়ে ধরতে—পরমুহূর্তেই আর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না তার।

ভয় হবারই কথা। ভয় হলও। যতই দিনের আলো হোক, আর দল বেঁধে থাক—এমন অলৌকিক অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখলে কার না ভয় হয়? সকলেরই গা টা ডোল দিয়ে উঠল একবার। মুখ শুকিয়ে গেল।

কিন্তু যোগেশদাও প্রতিহিংসায় স্থির-প্রতিজ্ঞ।

সে বলল, 'এই, আমি এখানে আছি। তোরাও জন-দুই থাক! বাকী সব বাড়ী গিয়ে কিছু কাঠ খড় আর তেল নিয়ে আয়, গাছটাকে পুড়িয়ে দেব।'

সেই মতোই ব্যবস্থা হ'ল। চারিদিকে কাঠ খড় সাজিয়ে তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। বিপুল অগ্নিশিখা উঠল গাছটার চারদিক বেয়ে—সে আগুন আর ধোঁয়া দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকেও দেখা গেল। শয়ে শয়ে লোক ছুটে এল ব্যাপার কি দেখার জন্যে। ডালপালা শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব সব ঝল্‌সে পুড়ে গেল কিন্তু আশ্চর্য এই, মূলকাণ্ডটা কিছুতেই পুড়ল না—বহু চেষ্টা করেও। সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা ক'রে যোগেশদাকেও হাল ছাড়তে হ'ল শেষ অবধি। ছালগুলো পুড়ে সাদা ছাই হয়ে গেল সেই অসহ উত্তাপে কিন্তু কাণ্ডটা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।—

আজও আছে নাকি। তেমনিই খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনও এক দল এসেছে দেশ থেকে। পাকিস্তান হবারও বেশ কয়েক বছর পরে—তারাও এসে গল্প করেছে—শাখা-প্রশাখাহীন নিষ্পত্র সাদা কাণ্ডটা তেমনিই আছে—আজও। না পচছে না ঘুণ ধরেছে তাতে। কে জানে আরও কতকাল থাকবে।

হাসি

আর যাই হোক—ডাক্তার রায়ের এই হাসিটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউ। এরকম নিদারুণ সংবাদেও মানুষ হাসে, মর্মন্তুদ শোকাবহ ঘটনার সামনে দাঁড়িয়েও একরকমের হাসি ফোটে মানুষের মুখে, কিন্তু তাকে হাসি বলা চলে না, সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ। এ হাসি তা নয়, এ অপ্রতিভ হাসি, ঈষৎ-কৌতুক মেশানো! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাজী রেখে সগুসগু হেরে গেলে যেমন হাসে মানুষ, ঈষৎ লজ্জা ঈষৎ কৌতুকে মেশা, বোকা-বোকা ধরণের হাসি—এও কতকটা তাই।

অবাক হয়ে গেল সবাই। অবাক হয়ে গেল গৌতমও। তার এই দুঃসহ দুঃখও কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল—এই বিস্ময়ের আঘাতে। খুব একটা শোচনীয় ঘটনার খবর পেলে, একসঙ্গে একাধিক প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে মানুষ সাময়িকভাবে পাগল হয়ে যায় কখনও কখনও—কিন্তু তা বলে সঞ্জীবন রায়ের মতো লোকও? তাও কি সম্ভব? ওঁর মতো বিচক্ষণ চিকিৎসক—ভারতজোড়া তো বটেই—সুদূর ইউরোপ-আমেরিকাতেও যাঁর এত নাম, যিনি বিলেতেই আগাগোড়া পড়ে ডাক্তারী পাস করেছেন। আবার সেখানেই হাসপাতালে চাকরি ও রিসার্চ ক'রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছেন—তিনিও একটা মৃত্যু-সংবাদে এতদূর বিচলিত হবেন? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কত মৃত্যুই তো তিনি দেখেছেন। দুর্ঘটনার মৃত্যু দেখাও কিছু নতুন নয়। বহু লোকের মৃত্যু-শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। মার মৃত্যু দেখেন নি—তখন বিলেতে—কিন্তু বাবা, ভাই, তারপর সেই স্ত্রী পর্যন্ত, সবাই তো তাঁর চোখের সামনে মরেছে। তবে আজ এ সংবাদে তিনি একেবারে পাগল হয়ে উঠবেন কেন?

হ্যাঁ, এ-মৃত্যুটা সাধারণ মৃত্যু নয়—এটা ঠিক।

মৃত্যুটাও নয়, যারা মরেছে তারাও নয়।

এইমাত্র টেলিফোনে খবর এসেছে যে, গতকাল সন্ধ্যার মুখে মধুপুরের

কাছে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর বন্ধু-পত্নী অঞ্জনা, তার মেয়ে অর্পণা ও অমিয়া এবং অর্পণার বর অর্থাৎ অঞ্জনার জামাই কিশোর মারা গিয়েছে। কিশোরই গাড়ি চালাচ্ছিল—সঞ্জীবনের বড় ভারী বিলিতি গাড়িখানা। যন্ত্রপাতি নিখুঁত এবং গাড়ির বডি মজবুত বলে, তেল খরচা বেশী হবে জেনেও—সঞ্জীবনই নিয়ে যেতে বলেছিলেন। অঞ্জনারা যাচ্ছিল রাজগীর, অঞ্জনার শরীর ভাল নয়, আট-দশদিন ওখানের গরম জল লাগালে ভাল হতে পারে—এই আশাতেই যাচ্ছিল। গয়ার পথেও যাওয়া চলত, এ পথটা কিশোরের জানা ও পছন্দ বলে এইদিক দিয়েই যাচ্ছিল তারা। সঞ্জীবন এটা জানতেন না, জেনেছিলেন একেবারে ওরা বেরিয়ে চলে যাবার পর। জানলেও নিষেধ করতেন না হয়ত। কথাটা মনে ছিল না তাঁর। মনে ছিল না তার কারণ মৃত্যুপথযাত্রিণী ঈর্ষাতুরা নারীর প্রলাপোক্তিই ভেবে এসেছিলেন এতদিন, তা ছাড়া আর কোন গুরুত্ব আছে মনে করেন নি।

কিশোর নতুন ছোট গাড়িখানাই নিতে চেয়েছিল তাঁর। ওখানে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরবে, এদিক ওদিক, পাটনা গয়া করবে—ভারী গাড়িতে বেশী তেল পুড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু সঞ্জীবনই জোর ক'রে এই গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ যুক্তিই দেখিয়েছিলেন, 'যা পথ, য়্যাক্সিডেন্ট তো লেগেই আছে। এখনকার ওসব দিশী গাড়ি দেশলাইয়ের বাক্সের মতো, একটু কিছুতে লাগলেই চুরমার হয়ে যাবে। তুমি বড় গাড়িটাই নিয়ে যাও, ধাক্কাটাক্কা লাগলেও সহজে এ গাড়ির কিছু হবে না, সাধারণ কোন গাড়ির সঙ্গে লাগলে সেই গাড়িই যাবে বরং। তেল একটু বেশী খরচা হয় হবে—কী আর করা যাবে?

খরচা বেশী হলে তাঁরই হবে, ওদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—স্বাভাবিক সঙ্কোচে সে কথাটা আর বলতে পারলেন না।

হ্যাঁ, নামে বন্ধুপত্নী, বন্ধুর ছেলেমেয়ে—কিন্তু আসলে এরাই তো ওঁর আপন। ওঁর আর কে আছে। নিঃসন্তান বিপত্নীক সঞ্জীবন রায়—এদেরই আশ্রয় করে ছিলেন এতকাল। ডাক্তারই হোক আর বৈজ্ঞানিকই হোক—সব মানুষেরই একটা পারিবারিক আশ্রয় দরকার হয়। সব পুরুষই খোঁজে—বিশেষ ক'রে যদি সে কর্মী, কৃতীপুরুষ হয়—এমন দু'চারটি আত্মার আত্মীয় যাদের কাছে সে নিতান্ত অসহায়, যাদের ইচ্ছার অধীন সে—যারা তার

কাছে আব্‌দার করবে, জোর খাটাবে, ধমক দেবে। স্নেহের প্রশ্রয়ে যারা মাথায় উঠে থাকবে। এই মাথায় রেখে ধমক খেয়েই তার সুখ, হার মেনে তার আনন্দ। বাইরে যে যত প্রবল, কঠিন—ঘরে সে তত দুর্বল, নমনীয়। এই দুর্বলতা তার শখের, সাধের। সে ঘর যদি নিজের না থাকে—অন্য ভাবে স্মৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু এটা তার চাইই। বিরাট রাজনীতিক নেতা, ব্রতধারী তপস্বীর মতো নিশিদিনমান যিনি মানব-সেবার সাধনায় রত তিনিও একটি রমণীর কটাক্ষে উঠতে-বসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন, একটি শিশুর আবদারে বিব্রত হতে পেলে কৃতার্থ হয়ে যান।

সঞ্জীবন রায়ও এর ব্যতিক্রম নন।

বন্ধু নির্মল দত্তের মৃত্যু-শয্যার পাশে প্রথম তিনি অঞ্জনাকে দেখেন। এমন কিছু রূপসী নয় যে—বিশেষত হাহাকার ক'রে কাঁদছে যে, সেই সদ্যোবিধবার দিকে ভাল ক'রে তাকাতেও ইচ্ছা হয় নি তাঁর। প্রথম তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই ফুটফুটে ছেলেমেয়েগুলোর দিকেই। তখন তাঁর পাঁচ ছ' বছর বিয়ে হয়েছে মাত্র. ছেলেমেয়ে হবার সম্ভাবনা একেবারে কিছু লোপ পেয়ে যায় নি, তবুও অন্তরে যেন একটা শূন্যতা-বোধ জেগেছিল তখনই। সেই জন্যেই আরও যেন ভাল লেগেছিল এদের। অপর্ণা অমিয়া আর এই গৌতম,—খুবই ছোট ছোট ওরা তখন, সে বয়সে এমনিই সকলকে সুন্দর দেখায়, এরা তো সত্যিসত্যিই সুন্দর দেখতে। ওদের দিকে চেয়ে যেন চোখ ফেরাতে পারেন নি ডাক্তার রায়।

ওদের টানেই তিনি যাতায়াত শুরু করেছিলেন ওদের বাড়ি, নির্মল একেবারে নিঃস্ব ছিল না, যা রেখে গিয়েছিল, এদের উপবাস থেকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই ঠিক অর্থের প্রয়োজনে অঞ্জনা ওঁকে অবলম্বন করে নি—অভিভাবকের প্রয়োজনটাই সেদিন ছিল বেশী।

আসা-যাওয়া করতে করতে একটি মধুর পারিবারিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে এসে পড়ে, একটি সু-স্বচ্ছন্দ সুপরিচালিত গৃহস্থালীর চেহারা দেখে একটু যেন অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার সঞ্জীবন রায়! তিনি দীর্ঘদিন বিলেতে ছিলেন, এখানে এসে, অর্থের প্রয়োজন তত না থাকলেও, ধনী শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, সে কন্যাটিও আবার মা-মরা, হোস্টেলে মানুষ! তাই গৃহসুখ বলতে কোনদিনই কিছু জানতেন না, ভাল

খাওয়া মানে হোটেলে, আনন্দ মানে সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া, গৃহস্থালী বলতে চাকরবাকরদের স্বেচ্ছাচার ও অব্যবস্থা,—এইতেই অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

এদের এখানে এসে যেন নতুন জগৎ আবিষ্কার করলেন একটা।

তিনি এই প্রথম জানলেন, মেয়েরা নিজে হাতে বেঁধে খাওয়াতে চায়, খাইয়ে আনন্দ পায়। তারা পুরুষের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য সদা-সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকে—পুরুষের পছন্দ-অপছন্দের মাপে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দকে তৈরী করে। চোখ মেলে দেখলেন কেমন আরামের নীড় তারা তৈরী করতে পারে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর, সাজানো গোছানো ঘরকন্না, স্নেহ-মধুর পরিবেশ।

ক্রমশ আসা-যাওয়া করতে করতে অঞ্জনাকেও ভাল লাগল তাঁর।

আরও কিছুদিন যাওয়ার পর সুন্দরী বলে মনে হ'ল তাকে। সুন্দরী অন্তত তাঁর কাছে, মনোহারিণী।

ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ অন্তরঙ্গতাতে পরিণত হ'তেও দেরি হ'ল না। উপকারী বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা একটু একটু ক'রে প্রেমে পরিণত হ'ল, অঞ্জনার মনেও। সঞ্জীবন এ-পরিবারের যথার্থ অভিভাবক হয়ে উঠলেন। তাঁরই টাকায় মেয়েরা কনভেণ্টে পড়ে মানুষ হ'ল, ছেলে প্রথম শ্রেণীর ইস্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করল। ভাল ভাল মাস্টার রাখা হ'ল, ওদের জন্য দামী দামী জামা-কাপড় আসতে লাগল। ইতিমধ্যে সঞ্জীবনের স্ত্রী-বিয়োগ হতে—যেটুকু চক্ষুলজ্জার বাধা বা ন্যায়-নীতি-বিবেকের বাধা থাকতে পারত—সেটুকুও অপসারিত হ'ল। যদিও ওদের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন নি আজ পর্যন্ত,—তবু ওঁর আসল বাড়ি যে কোন্‌টা তা তাঁর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কর্মচারী, এমন কি নিয়মিত যাতায়াতকারী রোগীদেরও জানতে বাকী ছিল না।

সেই পরিবারের—বলতে গেলে তাঁর নিজেরই পরিবারের—প্রায় সব ক'টি লোক মারা গেল, একসঙ্গে একটি মাত্র দুর্ঘটনায়—সে খবরে ভেঙ্গে না পড়ুন, অন্তত হতভম্ব স্তম্ভিত হয়ে যাবেন কিছুকালের জন্য—এইটেই ভেবেছিল সকলে। গৌতমও। সে নিজে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেও একেবারে জ্ঞান হারায় নি। সেও মুখের দিকে চেয়েছিল ওঁর। প্রথমটা একেবারেই ছাইয়ের মতো রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল সঞ্জীবনের মুখ, যেমন সবাই আশা করেছিল—থরথর ক'রে কথা কইবার বৃথা চেষ্টায় কেঁপেছিল ঠোঁট দুটো;

নিঃশব্দে বসে পড়েছিলেন চেয়ারে, কিন্তু তারপরই ঐ বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল মুখে। চোখের জলের জন্যে যারা প্রস্তুত—মুখে ঐ হাসি দেখে চমকে উঠবে বৈকি তারা।

যেন এতখানি শোকের মতো কিছু হয় নি, কাঁদবার মতোও না। শুধু বন্ধুতে বন্ধুতে বাজী রেখে হেরে গেছেন ডাক্তার রায় তাই ঈষৎ বোকা-বোকা অপ্রতিভের হাসি হাসছেন।

অসহিষ্ণু গৌতম আর অপেক্ষা করতে পারে না, অসহিষ্ণুতা চাপবারও চেষ্টা করে না। বলে ওঠে, 'তুমি—তুমি ওখানে যাবে তো? নাকি আমিই রওনা হয়ে যাবো? কিন্তু গাড়ি তো আমি এখন চালাতে পারব না। তুমি কি ড্রাইভার একজনকে স্পেয়ার করতে পারবে?'

চমকে ওঠেন ডাক্তার রায়, যেন অকস্মাৎ কোন্ অবাস্তব কল্পনা ও চিন্তায় গড়া জগৎ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন। ব্যাকুলও হয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে, অসহায় বিহ্বলভাবে ওর দিকে চেয়ে বলেন, 'ড্রাইভার? গাড়ি? কী গাড়ি?' তারপরই সচেতন ও সচকিত হয়ে ওঠেন যেন, 'না না—আমি যাবো বৈকি!—আমিই যাবো। খোকা—একটা কথা বলছি বাবা। তুই বরং থাক এখানে। আমি একাই যাই। তোর মনের অবস্থা ভাল না, সে দৃশ্যও তুই সহ্য করতে পারবি না। আর সব তো এখানেই নিয়ে আসছি—তুই গিয়ে আর কি করবি?'

'কী বলছ কাকু, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখ্‌ছি এই শক্-এ', বেশ একটু ধমক দিয়েই ওঠে গৌতম, 'এই খবর শোনবার পরও আমি চুপ ক'রে বসে থাকব এখানে—একথা তুমি ভাবতে পারলে কি ক'রে? তোমার চেয়ে আঘাত আমার কম লেগেছে একথা মনে করার কোন কারণ আছে কি? হাজার হোক আমার মা, আমার নিজের বোন!'

অকারণেই কেমন যেন রূঢ় হয়ে ওঠে গৌতম।

আবারও বলে, 'তোমার অসুবিধে থাকে বলো—আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছি—'

আবারও হাসেন সঞ্জীবন রায়, অস্ফুট কণ্ঠে যেন স্বগত বলে ওঠেন একবার 'ফ্যাটালিটি!' তারপর গৌতমের মুখের দিকে কেমন এক রকমের

বিচিত্র স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, 'আমি যে তোমাদের পর, কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই তা আমি জানি খোকা, অত রুড্‌লি সেটা মনে করিয়ে না দিলেও পারতে। ঠিক আছে, চলো—আমি তো যাচ্ছিই, আমার সঙ্গেই চলো। তবে আমার ঘণ্টাখানেক দেরি হবে অন্তত, আমার এখানে কিছু জরুরী কাজ সেরে যেতে হবে। যেসব ক্রিটিক্যাল কেস আছে সেগুলোরও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

বেশ সহজভাবেই বলেন কথাগুলি। যেন মনে হয় ইতিমধ্যেই খানিকটা সামলে নিয়েছেন নিজেকে। ফলে আবারও একবার অবাক হয় গৌতম। তবে কি ওরা যা ভাবত, যা জানত—যা সেই আশৈশব জেনে এসেছে তা ঠিক নয়? সত্যিসত্যিই এমন কোন গভীর স্নেহ নেই সঞ্জীবন রায়ের মনে তাদের সম্বন্ধে? না কি ডাক্তাররা—বহু মৃত্যু দেখে, বহু মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হয়ে এমনিই কঠিন হয়ে যায়?

কিন্তু সে যতই শোকার্ত আর অস্থির হোক, কোন উপায় ছিল না অপেক্ষা করা ছাড়া। সে নিরুপায় চোখ মেলে বসে বসে দেখতে লাগল—একটার পর একটা টেলিফোন ক'রে যেতে লাগলেন সঞ্জীবন রায়। প্রথমেই ডাকলেন তাঁর বন্ধু দুই ডাক্তারকে, তাঁরা দুজনে যদি ওঁর রোগীদের একটু সামলাতে পারেন কদিন—সকালে একঘণ্টা বিকেলে একঘণ্টা অন্তত, আর এখনই একবার যদি কেউ চলে আসতে পারেন, নিচে একঘর রোগী অপেক্ষা করছে। ওঁর আর এখন রোগী দেখার মতো মানসিক অবস্থা নেই। কারণ? সে পরে বলবেন তিনি। এরপর ডাকলেন তাঁর বন্ধু কন্‌ট্রাক্টরকে—বাড়ির এই পশ্চিমের অংশটা সম্প্রতি বাড়িয়েছেন তিনি—সে বাবদ হাজারকতক টাকা এখনও পাওনা তার। তিনি ফোন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে সম্পূর্ণ টাকার চেক্ লেখা রইল মোহনের কাছে, যেন অতি অবশ্য আজই এসে নিয়ে যায়। না না, যখন খুশী নিলে চলবে না বলেই এই সাত সকালে ফোন করছেন তিনি। ঠিক যেন আসে।—

সব শেষে ডাকলেন য়্যাটর্নী বন্ধু গাঙ্গুলীকে। বললেন, 'উইলটা একটু পাল্‌টাতে হবে গাঙ্গুলী। খবর শুনেছ তো?'

—'শোন নি? মধুপুরের কাছে একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে এ উইলের প্রিন্সিপ্যাল লিগাটী যারা তারা প্রায় সকলেই মারা গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সে খবর

পরে শুনো, কাগজেও দেখতে পাবে নিশ্চয় কাল—এখন কাজের কথা শুনে নাও, আমার সময় খুব কম, এখনই রওনা দিতে হবে, যাবার আগে নতুন উইলে সই ক'রে যেতে চাই। গৌতম এখনও বেঁচে আছে, নির্মল দত্তের ছেলে গৌতম দত্ত, যদি সে আমাকে সারভাইভ করে তো কথাই নেই, সে-ই সব পাবে, মানে ওদের যা পাবার কথা ছিল—আর যদি আন-ফরচুনেটলি অন্য রকম হয়—আমার কর্মচারী চাকর বাকরদের প্রাপ্য দিয়ে যা থাকবে সবটাই চ্যারিটিতে যাবে। না, না—অত ডিটেল্‌স্ বলবার সময় নেই, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তুমি যা ভাল বোঝ যেভাবে দিতে চাও দিয়ে দিও, য়্যাজ ইউ থিংক ফিট : শুধু দেখো—এর কোনটার সঙ্গে অঞ্জনার নামটা জড়িয়ে রাখা যায় কি না, সামহাউ যাতে তার মেমারীটা সামান্য কিছু দিন জীইয়ে রাখা যায়।—পাগল নাকি, খসড়াটসড়া পড়ার সময় নেই আমার, তুমি একেবারে রেডী ক'রে রাখো। মোটে দশ মিনিট সময় আছে আমার হাতে, তার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। যাবার পথে সই ক'রে চলে যাবো, সাক্ষী দুজন ঠিক রেখো—। এত তাড়া করছি কেন ? সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। হ্যাঁ, তাই। নার্ভাস হয়েই পড়েছি ধরে নাও। এ অবস্থায় সকলেরই বোধহয় এই অবস্থা হয়। কিন্তু আমি ডাক্তার, আমাকে আর তুমি ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে এসো না—দোহাই !'

বেশ হাসি-হাসি মুখেই টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন যেন তিনি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করার পর যেমন স্মিতপ্রসন্ন মুখে লোকে টেলিফোন ছাড়ে তেমনিই—

বুঝতে পারে না গৌতম, কিছুই বুঝতে পারে না সে।

এ লোকটা যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করছে। কিন্তু কেন ? কেন ? একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই ঐ পথে যারা যাবে তাদের সকলেই মরবে ? এ তো মেয়েলি ভয়। ওঁকে যা দেখে এসেছে এতদিন—তাতে তো কখনও ওঁকে এমন দুর্বলচিত্ত—এমন সশঙ্ক বলে মনে হয়-নি কখনও। বৈজ্ঞানিক উনি, চিকিৎসক, যুক্তিবহ মন ওঁর—ওঁর এমন অবুঝ ভয় তো সাজে না।

অভিভূতের মতোই বসে শোনে সে, উনি বাড়ির পুরনো চাকর মোহনকে ডেকে সব চাবি এবং নিত্যপ্রয়োজনের টাকা কড়ি দিয়ে সংসারের পুরো

ভারটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেই সুরটাই বাজছে তাঁর গলায়—কিছু-পূর্বের শেষ প্রস্তুতির সুর। বলছেন, 'শোন, আর যদি না-ই ফিরি, অধীর হোস নে, তোর ওপরই সব ভার রইল মনে রাখিস। এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাস নে। গাঙ্গুলীবাবুকে বলা আছে, সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। তোর কোন অভাব থাকবে না। আর কোথাও খেটে খেতে হবে না। তুই যতদিন বাঁচবি এ বাড়ির একখানা ঘর তোর থাকবে। কেউ সরাতে পারবে না।'

হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে মোহন, 'এসব কি বলছ বাবু, এ কী সব অলুক্ষুণে কথা! কী এমন হয়েছে যে তোমাকেও বেদায় নিয়ে যেতে হবে এমন ক'রে। অদেষ্টে ছেল—একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এখনও তো খোকাবাবু রয়েছে, ওকে দেখে ওর মুখ চেয়ে বুক বাঁধো—এমনতরো ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? এ সব কি আর নিত্যি হয়?'

গৌতমও এবার কথা না কয়ে পারে না। গভীর শোকের মধ্যেও এটা যেন অসহ্য মনে হয় তার। বলে, 'তুমি মিছিমিছি এই ক'রে খানিকটা সময় নষ্ট করলে কাকু। তোমার মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মন আছে বলে জানতুম, এখন দেখছি তুমি মেয়েছেলেরও অধম। ছিঃ! একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছে বলে ওপথে যত গাড়ি যাবে—সবগুলো ভাঙ্গবে? না, সবাই মরবে?'

আবারও একবার হাসলেন সঞ্জীবন রায়।

এবার আর অপ্রতিভের হাসি নয়। ছেলেমানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখলে যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন গুরুজনরা—তেমনিভাবেই হাসলেন তিনি।

ছেলেমানুষ গৌতম, নেহাৎই ছেলেমানুষ। এখনও ওর জ্ঞানবুদ্ধি হতে বেশ দেরি।

খবরটা ও-ই বলেছে। গৌতমই।

ট্রাঙ্ককলে খবর দিয়েছে ওর এক বন্ধু। দুর্ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে সে।

কাল সন্ধ্যার অনেক আগে ঘটনাটা ঘটেছে, দিনের আলোয়, অনেকেই চোখে দেখেছে ঘটতে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া গেছে। সোজা রাস্তা দিয়ে আসছিল গাড়ি, উঁচু নিচু নয়—অনেকখানি, প্রায় দু-তিন মাইল একেবারে সমতল রাস্তা। বহুদূর থেকেই দেখা যায় কী আসছে না আসছে। লরীটা যে আসছে তা দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। রাস্তায় যথেষ্ট জায়গা

ছিল, ফাঁকা রাস্তা—লরীর চালকও বে-আইনী কিছু করে নি, সে বাঁদিক ঘেঁষেই আসছিল। এদের গাড়ি যে চালাচ্ছিল সে-ই নাকি অন্ধের মতো, উন্মত্তের মতো বেঁকে গিয়ে লরীটার ওপর পড়েছে। আরও আশ্চর্য, সঞ্জীবনের অত ভারি গাড়ি গিয়ে লাগা সত্বেও লরীটার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি, এঁদের গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে একটা বড় গাছে লেগে চুরমার হয়ে গেছে। আরোহীদের একটি প্রাণীও বাঁচে নি।

অথচ সঞ্জীবন জানেন, গৌতমেরও অজানা নেই—কিশোর অপ্রকৃতিস্থ, মদ্যপ বা উন্মাদ কোনোটাই নয়। অন্ধ তো নয়ই! বরং কিশোর স্টিয়ারিং ধরলে ভাঙ্গাগাড়িও চলতে শুরু করে—এমনই একটা প্রবাদ চালু আছে। এত ভাল হাত তার। সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ছেলে কিশোর। সে এমন কাজ কেন করবে একবারও ভেবে দেখল না গৌতম! সেটা ভেবে দেখলে তাঁর এই আজকের আচরণের কার্যকারণ বুঝতে হয়ত এতটা অসুবিধা হ'ত না।···

সব কাজ চুকিয়ে ব্রেকফাস্টটাও সেরে নিলেন সঞ্জীবন। গৌতমকেও কিছু খেতে বলেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখনও তো অশৌচ লাগে নি তোমার, খেয়ে নিতে পারো।'

গৌতম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'অশৌচটাই বড় কথা নয় কাকু, ওসব আমি মানিও না,—কিন্তু মানুষের মানসিক অবস্থা বলেও একটা জিনিস আছে, ডাক্তারি করতে করতে সেইটেই ভুলে গেছ তুমি।'

আর পেড়াপীড়ি করেন নি ডাক্তার রায়, শুধু আর একবার হেসেছিলেন একটু। তাঁর ইঙ্গিতে মোহন জোর ক'রে এককাপ কফি খাইয়ে দিয়েছিল।—

খাওয়া শেষ ক'রে পোশাক বদলে ডাক্তারী ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দিতে বলে, অনেকদিন পরে নিজেদের শয়নকক্ষে এসে ঢুকলেন সঞ্জীবন রায়। অনেকদিন এ ঘরে তিনি আসেন নি। শোন নি স্ত্রীর মৃত্যুর আগে থেকেই। যখন বোঝা গেল স্ত্রীর অসুখ সহজে সারবে না তখনই এ ঘরে নার্সদের থাকার ব্যবস্থা করতে পাশের ছোট ঘরটা নিজের শোবার ঘরে রূপান্তরিত করেছিলেন। মৃত্যুর পরও আর ঘর বদল করেন নি, ইচ্ছা হয় নি। এ ঘরে আর শোবার কোন ব্যবস্থা ছিলও না। অমিতা বিছানার ওপরই মারা

গিয়েছিল, নিচে নামানো হয় নি। সঞ্জীবন হয়ত এমনিই নামাবার কথা ভাবতে পারতেন না, তার ওপর অমিতা বার বার এই 'হৃদয়হীন আচরণে' তার আপত্তি জানিয়ে রেখেছিল। তার ধারণা ছিল, 'তে-শূন্যে' মরতে নেই এ বিধানটা বিছানা বাঁচাবার জন্যেই দেওয়া হয়েছে। রোগীর জ্ঞান থাকতে বিছানা থেকে নামালে কারণ বুঝে তখনই তো তার হার্টফেল করবে!··· ফলে সে সব গদী বিছানা ফেলা গিয়েছিল। খাটটা তাঁর এক রাঁধুনী বামুনকে দান ক'রে দিয়েছিলেন ডাক্তার রায়। সেই থেকে এ ঘর শূন্য আছে প্রায়, দেওয়ালে খানকতক ছবি, বইয়ের শেল্ফ্, অমিতার কাপড়-জামার আলমারি, একটা ছোট বেডসাইড্ টেবিল—ও আর-একটা টেবিলে স্ত্রীর একখানা ছবি ছাড়া এ ঘরে কিছু নেই এখন।

তবু সেই শূন্য ঘরেই এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার রায়।

খাটখানা কোথায় পাতা ছিল, তা আজও মনে আছে তাঁর। এইখানে, পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে বসানো ছিল, মেঝেতে চারটে খুরোর দাগ এখনও মিলিয়ে যায় নি। এই দিকে মুখ ক'রে শুত অমিতা, পুবদিকের এই দরজার দিকে মুখ ক'রে—যাতে সেই সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত সমস্ত বারান্দাটা দেখা যায়। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—সাধারণত সেইখানেই এসে বসতেন তিনি, স্ত্রীকে দেখবার জন্যে, তার খবর নেবার জন্যে।

ইদানীং অমিতা তাঁর সঙ্গে কথা কইত না, তিনি ঘরে আসছেন টের পেলে মুখটা ফিরিয়ে চোখ বুজত, নইলে নার্সকে বলত ওপাশ ফিরিয়ে দিতে। তাঁর চিকিৎসাও চলতে দেয় নি শেষের দিকে, তাঁর বন্ধু সমর সেনই দেখত। সেনকে কৈফিয়ৎ দিতেন ডাক্তার রায়, 'ঘরের লোকের চিকিৎসা করা উচিত নয় কোন ডাক্তারেরই।' তবে মনে হয়, সমর সেনের কিছুই জানতে বাকী ছিল না, অমিতার এ বীতরাগও না, তার কারণও না। অমিতাই সেনকে বলে দিয়েছিল। কারও কাছেই গোপন করার চেষ্টা করত না সে, ইদানীং স্বামীকে অপদস্থ করার চেষ্টাটাই যেন তার একটা সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কারণও ছিল অবশ্য, আজ আর অস্বীকার করবেন না সঞ্জীবন রায়, অঞ্জনার সঙ্গে, ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার চেহারাটা ততদিনে সকলের কাছেই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, সে সংবাদ অমিতার রোগশয্যাতে এসে পৌঁছতেও কোন বাধা পায় নি। প্রথম প্রথম ঝগড়া করত, কান্নাকাটি

করত—কতদিন কোন পথ্য পর্যন্ত গ্রহণ করে নি—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর এই নিষ্ফল অভিমানের অসারতা ও মূল্যহীনতা নিজের কাছেই ধরা পড়েছে ক্রমশ, অপমানে লজ্জায় মাথা খুঁড়েছে সে সেই রোগশয্যাতেই। তারপর থেকেই নিথর ও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে। শেষের একটা বছর কোন দিন কোনও কথা বলে নি। কথাই কয় নি স্বামীর সঙ্গে।

কেবল সেই একটি দিন ছাড়া।

মৃত্যুর সাত-আট দিন আগে। অভ্যাসবশত, কতকটা চক্ষুলজ্জাতেই—নার্স বা চাকর-বাকরদের কাছে লজ্জা ঢাকতে, তখনও প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যা একবার ক'রে এসে বসতেন এ-ঘরে। নার্সকে জিজ্ঞাসা করতেন রোগিণীর খবর। ঔষধ বা পথ্য সম্বন্ধে দু একটা নির্দেশ দিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু সেদিন তিনি গিয়ে বসতেই—অমিতা বলে রেখেছিল কি না কে জানে—কী একটা ছুতো ক'রে নার্স উঠে চলে গিয়েছিল। আর সেই অবসরে অমিতা কথা কয়েছিল ওঁর সঙ্গে।

চমকে উঠেছিলেন সঞ্জীবন রায়। দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ততায় স্ত্রীর কণ্ঠস্বরটা পর্যন্ত যেন ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

অমিতা যে আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে কথা কইবে, তা ভাবতেই পারেন নি।

কিন্তু কথা বলেছিল সে। কণ্ঠস্বর ক্লান্ত হ'লেও তাতে কোন অস্পষ্টতা বা জড়তা ছিল না; তাঁর দিকে চেয়ে খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছিল, 'ছাখো, একটা কথা বলে যাচ্ছি তোমাকে। বিয়ের পর একটি মাস—মাত্র এক মাসই তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে পেয়েছিলুম, সুখী হয়েছিলুম। সেটা হ'ল সেই মধুপুরে হনিমুন করতে যাওয়ার এক মাস। পুরো এক মাসও না, সাতাশ দিন। তবু সেই সাতাশটি দিনই আমার জীবনে অক্ষয় অম্লান হয়ে আছে। আমার স্মৃতিতে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু প্রিয়—তার সব ক'টিই ওখানে পাওয়া। তারপরই এখানে এসে তুমি চাকরি নিলে, কিছুদিন পরে তাও ছেড়ে প্র্যাকটিশ ধরলে, প্র্যাকটিশ জমল, কাজ বাড়ল—আমি পিছনে পড়ে গেলাম, তোমার আর আমার জীবনের মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান রচিত হ'ল। তবুও হয়ত কিছুটা পেতে পারতুম যদি এই কাল-ব্যাধি না এসে ধরত আর ঐ সর্বনাশী রাক্ষুসী না এসে হাজির হ'ত তোমার জীবনে।'

এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে উঠেছিল অমিতা, রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু সঞ্জীবন বাধা দেন নি। তিনি জানতেন এখন বাধা দিতে গেলে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়বে, হিতে-বিপরীত ঘটবে।

অমিতা একমুহূর্ত থেমে, রাক্ষসীকে-মনে-পড়ার-অস্বাভাবিক-উত্তেজনা কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি মরার পর যা করবে তা জানি, কাজে তো সে স্ত্রীই হয়ে বসেছে, চোখ বুজলেই সে নামেও গৃহিণী হয়ে এ-বাড়িতে এসে বসবে। তা সে যা খুশি ক'রো—এ বাড়ির ওপর আমার মায়া নেই এককরত্তিও, এখানে নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে একটি দিনের জন্যেও শান্তি পাই নি আমি—কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, যদি আত্মা আর পরলোক বলে কিছু থাকে তো আমার আত্মা মধুপুরের সেই বাড়িতেই থাকবে—যতদিন না তোমারও মৃত্যু হয়, আবার সেখানে দেখা হয়। ঐদিকে যেন তোমার ঐ প্রেয়সী কখনও না যায়। পৃথিবীতে ঢের জায়গা আছে—মধুপুরটা বাদ দিলেও কোন ক্ষতি হবে না তোমাদের—ঐটুকু আমাকে ছেড়ে দিতে আশা করি কুণ্ঠিত হবে না। যদি কোনদিন ওকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো ওদিকে, তাহলে নিজের সর্বনাশ, নিজেদের সর্বনাশই করবে। এ আমি মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি না। লোকে মৃত্যুর পর মুক্তি চায়, আমি তা চাইছি না। কোন-দিনই চাই নি। যদি আমি মনে-প্রাণে সতী হই, যদি একদিনের জন্যেও ভগবানকে ডেকে থাকি তো, আমার এটুকু অভিলাষ সিদ্ধ হবে। তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে আমি মরার পরও বেঁচে থাকব।'

আর কিছু বলে নি অমিতা, বলতে পারে নি। অবসন্ন হয়ে চুপ ক'রে ছিল। নার্সও এসে পড়েছিল ততক্ষণে।

সেই শেষ ওঁদের কথাবার্তা। অনেকদিনের ব্যাপার—তবু আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে সঞ্জীবন রায়ের।

মধ্যে একটু ভুলেছিলেন কথাটা—তারই শাস্তি পেলেন। বিশ্বাস করেন নি সেদিন—তবুও, মনে থাকলে কিশোরকে বারণ ক'রে দিতেন হয়ত।

বেশীক্ষণ দাঁড়ানো হ'ল না আর। নিচে অসহিষ্ণু গৌতমের অসন্তোষ সরব হয়ে উঠছে। ডাক্তার রায় একটু হেসেই ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এসে গাড়িতে চাপলেন। আর ফিরে তাকালেন না সেদিকে। নতুন বাড়ি, ভৃত্য-

পরিজন, অগণিত রোগী সব পিছনে পড়ে রইল। নির্বিকার চিত্তে স্টিয়ারিং ধরে বসলেন।

গৌতম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'ড্রাইভার নেবে না?'

'না না। থাক ও। ওকে আর কেন—।'

'ওকে আর কেন' এ কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না গৌতম, কিন্তু কোন প্রশ্নও করল না। কারণ সকাল থেকেই—এ-খবর শোনবার পর থেকে—ওঁর সব আচরণ আর কথাবার্তাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে গৌতমের। সম্ভবত শোকে আর শক্-এই হয়েছে এটা। এতবড় বৈজ্ঞানিকও মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।······

এর পরের যা ইতিহাস তা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। যাঁরা নিয়মিত কাগজ পড়েন তাঁদের চোখ এড়াবার কথা নয়। লক্ষ্য করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই।

খবরটি সংক্ষেপে এই :

মধুপুরের কাছে একটা মোটর-দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল নিহতদের আত্মীয় দুই ব্যক্তি আর একটি গাড়ি ক'রে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। কাছাকাছি পৌঁছে—ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক গজ তফাতে, গাড়িটি সবেগে গিয়ে একটা গাছে ধাক্কা লাগে এবং এ-গাড়িটির দুজন আরোহীই মারা যান। তার মধ্যে কলকাতার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকও ছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তখন পথে অন্য কোন গাড়ি বা জনপ্রাণীও ছিল না, অথচ পরিষ্কার দিবালোকেই গাড়িটা ডাইনে বেঁকে যেন গাছটা লক্ষ্য ক'রেই ছুটে গেল, কতকটা আত্মহত্যার মতো ক'রেই। এখানে উল্লেখ্য ঐ চিকিৎসকটি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

কী হয়েছিল, কেন একাজ করলেন সঞ্জীবন রায়—তা অবশ্য আর কোন-দিনই কেউ জানতে পারবে না। কারণ অপর লোকজন এসে পৌঁছবার বহু পূর্বেই তাঁরা মারা গিয়েছেন; কোন কথাই কাউকে বলে যাবার সুযোগ পান নি। তবে আমরা জানি—বলতে চেয়েছিলেন ডাক্তার রায়। কী দেখেছিলেন, কেন গাড়ি এমনভাবে পাগলের মতো ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন—সে কথাটা কাউকে অন্তত বলে যাবার জন্য আকুলি বিকুলি করেছিল তাঁর মন, দুর্ঘটনার পূর্বে যে চার পাঁচ মুহূর্ত বেঁচে ছিলেন সেই সময়টায়। তিনি যে

ঠিকই বুঝেছিলেন, তাঁর যে অনুমানে কিছুমাত্র ভুল হয় নি—এই কথাটাই জানিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়েও এইটুকু বিজয়-গর্বের লোভ ছাড়তে পারেন নি।

তিনি দেখেছিলেন, পরিষ্কার দিনের আলোয় স্বাভাবিকভাবে পরিচিত মানুষকে যেমন দেখে—রাস্তার ঠিক মাঝখানে, গাড়ির একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে একটা চ্যালেঞ্জের ও বিদ্রূপের হাসি হাসছে অমিতা, তাঁর স্ত্রী। তাকে বাঁচাতেই অমন ক'রে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়ি ঘুরিয়েছিলেন, সে কায়া—না ছায়া—না শুধু কল্পনা—অত হিবেবের সময় পান নি।

পাগলা বাবা

বছর কতক আগের কথা।

পূজোর পর দেরাদুনের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলুম। ঠিক দেরাদুন নয়, ওখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, রাজপুরের নিচে একটা গ্রামে ছিলুম। খুবই নির্জন জায়গা, এখন তবু একটা আধা-সরকারী কারখানা বসে একটু সরগরম হয়েছে—আমি যখনকার কথা বলছি, তখন সিকি মাইলের মধ্যে কিষেণপুরের রামকৃষ্ণ আশ্রম, মাতাজীর আশ্রম, আর তার দুপাশে খান চার-পাঁচ মাত্র কোঠাবাড়ী ছিল। এ ছাড়া একটা কাঠের চুঙ্গিঘর, কী যেন একটা মন্দির, দু-একটা কাঁচা বাড়িতে সামান্য দোকান—লোকালয় বলতে এই বোঝাত। খুব দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন দু-একটা বাগানবাড়িও চোখে পড়ত, তবে তাতে মানুষ থাকত কি না সন্দেহ।

নির্জন বলতে যা বোঝায় জায়গাটা তাই। বিস্তৃত চওড়া পাকা রাস্তা, দু'পাশে চাষের ক্ষেত—পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সামনেই মুসৌরী যাবার চড়াই—যেদিকে দৃষ্টি যায়, পাহাড় আর পাহাড়—রাস্তাটাও ক্রমাগত উঠে গেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না,—রাস্তার পাশে একটা জলের নহর, বোধ হয় কোন পাহাড়ী ঝরনার জল এইভাবে নহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবটা জড়িয়ে মনে হ'ত কোন স্বপ্নের দেশে এসেছি।

সভ্যতার এবং মানব-বসতির কথা মনে পড়ত যানবাহন চলাচলের সময় শুধু। তাও মুসৌরী যাবার বাস, সকালে উর্ধ্বমুখী, বিকেলে নিম্নমুখী—আর সে কখানাই বা ?—এ ছাড়া দু-একখানা প্রাইভেট গাড়ি, জীপ এবং মালবওয়া দু-একখানা লরী যাতায়াত করত। রাজপুর থেকে দেরাদুন—কয়েকখানা বাসও যাতায়াত করত কিন্তু সে বোধ হয় এক ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার অন্তর। কদাচ কখনও এক-আধখানা টাঙ্গার মুখ দেখা যেত—তবে সে কালেভদ্রে। মোটা টাকার লোভ না দেখালে ঘোড়া জখম করতে এতটা চড়াই ভাঙ্গতে রাজী হ'ত না কেউ।

পথে পথেই হাঁটতুম তাই—পাকা রাস্তা ধরে—নিশ্চিন্ত হয়ে। গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত যেমন নেই—মানুষেরও না। পথে দাঁড় করিয়ে কেউ পরলোকতত্ত্ব কিম্বা রাজনীতি আলোচনা ক'রে উজ্জ্বল মধুর প্রভাত অথবা স্বপ্নময় সন্ধ্যা বিষাক্ত ক'রে তুলবে—এমন সম্ভাবনা নেই। বরং মধ্যে মধ্যে এক-আধখানা গাড়ি বা বাস চলে গেলে ভালই লাগত।···বিশেষ রাত্রে। হঠাৎ কোন প্রাইভেট গাড়ি যখন বাঁধানো জনহীন রাস্তা ধরে বিচিত্র ধ্বনির স্পন্দন তুলে সুপ্তিমগ্ন প্রকৃতিকে সচকিত ক'রে চলে যেত—বাস চলত না রাত্রে—বহুদূর পর্যন্ত তার সেই শব্দ তরঙ্গিত হ'তে থাকত—আরও বহুদূরে চলে না-যাওয়া পর্যন্ত ; দূর থেকে দূরান্তরে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া সে শব্দ দূরাগত সঙ্গীতের মতোই মিষ্টি লাগত। সভ্যতার চিহ্ন শহরে বা জনপদে যতটা অসহ্য···অরণ্যে পর্বতে তত মধুর, তত শ্রেয়।

যা বলছিলুম, দু'বেলাই আমি রাস্তা ধরে হাঁটতুম, বেশ খানিকটা ক'রে। কোনদিন রাজপুরের দিকে, কোন দিন বা নতুন তৈরী মুসৌরীর পথ ধরে। এই দিকটাই বেশী ভাল লাগত, আরও নির্জন, জনবসতির চিহ্নহীন—মধ্যে মধ্যে একটা ক'রে শুকনো নদী, তার পুল, আরো আরো দূরে দূরে এক-আধটা চাষীর বস্তি। চলতে চলতে মাথা তুলে মুসৌরীর দিকে চাইলে আরও ভাল লাগত। একহারা বিস্তৃত শহরটা প্রভাতের সূর্যালোকে ঝলমল করত, এক একটা বড় বাড়ির কোন-এক কাঁচের জানলায় সে আলো প্রতিফলিত হয়ে বিশেষ এক একটা পথকোণে চোখ ধাঁধিয়ে দিত ক'মুহূর্তের জন্য।

বাস বা গাড়ি ঘুরে ঘুরে ওঠার দৃশ্যও নিচে থেকে মনোরম বোধ হ'ত। দূরে বার্লোগঞ্জের মিশনারী কলেজের ঝুলোনো পুলটা আঁকা ছবির মতো মনে

হ'ত—কুলড়ী বাজারে স্ট্যাণ্ডে-দাঁড়ানো বাসগুলো দেখাত খেলাঘরের গাড়ির মতো। বিকেলের দিকে শহর বিশেষ চোখে পড়ত না—প্রায়ই মেঘ বা কুয়াশায় ঢেকে যেত, তবু সেই মেঘে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ বিকাশ হ'ত যখন—তখন কেমন যেন আশ্চর্য লাগত। কিন্তু বিকেলের এই অন্তর্ধানের সুদসুদ্ধ পুষিয়ে যেত রাত্রে; সন্ধ্যার পর—কি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে রাত্রে—বাইরে এসে দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যেত যেন। অত বড় লম্বা শহরটা জুড়ে আলোর মালা—মনে হত আকাশ থেকে কোন ছায়াপথের টুকরো কিম্বা বিশাল কোন নক্ষত্রপুঞ্জ নেমে মাথার ওপর—একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে।···

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন একটু বেশী শীত বোধ হওয়াতে দুপুরের একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলুম। ঝলমলে রোদে হাঁটতে ভালই লাগছিল। তা ছাড়া, এই সব পাহাড় অঞ্চলে দুপুরেরও একটা বিশেষ রূপ আছে—বিশেষ অক্টোবর মাসে। সেইটেই উপভোগ করতে করতে হন-হন ক'রে হেঁটে বহুদূরে গিয়ে পড়েছিলুম—অত খেয়ালও করি নি। হঠাৎ সামনে অনেকগুলো লোক দেখতে পেয়ে যেন একটু চমকেই উঠলুম। অনেক দিন পরে এতগুলো লোক দেখতে পেলে চমকে ওঠবারই কথা!

প্রথমটা মনে হ'ল ফিরে যাই আবার; কিন্তু তারপরই কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। এত লোক এই নির্জন পাহাড়ে-পথে কী করছে? কোন হাঙ্গাম-হুজ্জত হয়নি তো? ভাবতে ভাবতেই খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি ততক্ষণে। কাছে যেতে ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। কিছুদিন আগের অকাল-বর্ষার জল নেমে পথের খানিকটা অংশ ধুয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফলে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল রাস্তাটা—লরী বা বাস চলাচলের পক্ষে। সেইটেই মেরামত করা হচ্ছে সরকারের উদ্যোগে। সেটাতে তত বিস্ময়কর কিছু ছিল না, তবু আরও একবার চমক লাগল কাছে আসতে—কারণ, কাজটার জন্য সাধারণ নয়—অসাধারণ মজুর আমদানী করা হয়েছিল—জেলখানার কিছু কয়েদী। সকলেরই একরকম পোশাক, চিনতে অসুবিধা হয় না।

পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিলুম—কর্তাব্যক্তির দল কেউ প্রশান্ত মুখে, কোন-রকম কৌতূহল প্রকাশ না ক'রে, কেউ বা ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলেন, কয়েদীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরীহ যারা—'সমস্ত ভদ্দর আদমীকেই সেলাম করা উচিত' এই সংস্কারবশত অকারণেই হাত তুলে সেলাম বা নমস্তে জানাল—এরই মধ্যে

হঠাৎ একসময়, এদের মধ্যে অথচ একেবারে সকলের আড়ালে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে হেঁট হয়ে গাঁইতি দিয়ে পাথর সরাতে দেখে থমকে থেমে গেলুম। ব্যাপারটা এমনই বিসদৃশ বা বেমানান যে, বিস্ময়ের সীমা রইল না। এদেশে এখনও 'মহাৎমারা' পূজনীয় ব্যক্তি, তাঁদের খাওয়াবার দায়িত্ব প্রধানত জনসাধারণের—সে কথা জনসাধারণ এখনও অস্বীকার করে নি ; সুতরাং গেরুয়াধারী জটাজুটসমন্বিত একজন সন্ন্যাসীকে সকলের সঙ্গে জনমজুরী খাটতে দেখলে বিস্মিত হবার কথা বৈ'কি।

বাকী কয়েদী মজুররা আমাকে এইভাবে থেমে যেতে দেখে আমার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ব্যাপারটা বুঝল। অনেকেরই মুখে একটা চাপা কৌতুকও ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। শুধু তাদের চালক যাঁরা—কপট গাম্ভীর্যের বর্মে নিজেদের মর্যাদা বাঁচিয়ে উদাসীনভাবে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন।

তাঁদের কাছ থেকে কোন উত্তর পাবার আশা নেই। এদিকে কৌতূহলও অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছে। বারকতক মনকে শাসিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করেও পারলুম না। তখন অগত্যা এক কয়েদীরই শরণাপন্ন হতে হল। সামনেই যে ছোকরা কয়েদীটি দাঁড়িয়েছিল তাকে প্রশ্ন করলুম, 'ও সাধুবাবা,—এখানে তোমাদের সঙ্গে কাজ করছেন কেন ? কে উনি, কোথায় থাকেন ?'

'ঐ মহাৎমা ? ও তো পাগলা বাবা। আপনি চেনেন না ?'

'না, আমি কি ক'রে চিনব। আমি নতুন লোক। পাগলা বাবা কেন ?'

'ও মহাৎমা একেবারেই পাগল।' সোৎসাহে উত্তর দিল লোকটি, 'কারও কাছ থেকে ভিক্‌ষা নেন না, মজুরী খেটে যা পান সিফ' তাইতেই নিজের জিন্দিগী গুজরান করেন। মাঝে মাঝে দেরাদুন কি রাজপুর বাজারে গিয়ে বসে থাকেন, কিম্বা বাস-ইস্টাণ্ডে—কারও মুটের দরকার হ'লে মোট বয়ে দেন। দরদস্তুর কিছু করেন না, যে যা দেয় খুশিসে, তাইতেই উনি ভি খুশ থাকেন। তবে মোট মেলেই কম, লোকে সাধু মহাৎমাকে দিয়ে ওসব কাম করাতে চায় না তো—ভয় পায় কি অধরম্ হবে। সে জন্যে খুব একটা রোজগার হয় না। লেকিন খাটতে পারেন উনি খুব। তাই এক এক সময় কোথাও ঘর-বাড়ি তৈরি কি রাস্তা মেরামতের কাম হচ্ছে শুনলে নিজেই যেচে এসে কাজে লেগে যান। কেউ কোন মজুরী দেবে কি না তা পুছতাছ

না ক'রেই ; এই দেখুন না এখানেই—সরকারী কাম, জেহেল থেকে লোক আনানো হয়েছে, এ মহাৎমাকে মজুরী কে দেবে বলুন ? ঠিকাদার তো কেউ নেই এখানে। তবু আজ ক'দিনই কাম করছেন এখানে, বারণ করলেও শোনেন না। আমাদের খাবার থেকে এক-আধখানা রুটি দিই দুপুরে—কাম শেষ ক'রে সন্ধ্যায় চলে যাবার সময় ওভারসীয়ারবাবু দয়া করে সিকিটা-আধুলিটা দেন—ওঁর কাছে খুচরো খরচের যে তবিল থাকে তাই থেকে—কোনদিন হয়ত নিজের জেব্ থেকেও যায় কিছু। বাবা কিন্তু তাতেই খুশী।'

কৌতূহল কমল না এতে—বেড়েই গেল বরং।

ওভারসীয়ারবাবু আর জেলের ক্ষুদে কর্তার দল ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ঘনঘন তাকাচ্ছেন দেখেও—আমি এঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলুম—পাহাড়ের গা ঘেঁষে সাধুবাবা যেখানে পাথর কাটছিলেন—সেই দিকে। গেরুয়া বহির্বাস, খাটো একটা গেরুয়া জামা, এলোমেলো কয়েকটা জটা, একহারা গঠন—তবে শীর্ণ বা কৃশ যাকে বলে তাও ঠিক নয়। গায়ের রঙ এককালে ফরসাই ছিল সম্ভবত—এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে।

পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম কিন্তু কথা কইবার সুযোগ হ'ল না অনেকক্ষণ। কারণ তিনি হেঁট হয়ে কাজই ক'রে যাচ্ছিলেন ; একবার একটু মাথা তুলে না তাকালে, চোখোচোখি না হলে কথা কই কী ক'রে ?

মাথা তুললেন না—তবে তিনি যে আমাকে লক্ষ্য করেছেন তা একটু পরেই বোঝা গেল। তেমনি হেঁট হয়ে, কাটা পাথরের বড় টুকরো গুলোর গা থেকে হাতে করে মাটি সরিয়ে সেগুলোকে আলগা করার চেষ্টা করতে করতে, একসময় পরিষ্কার 'কলকাত্তাই' বাংলায় প্রশ্ন করলেন—'আপনিও বাঙ্গালী, না ?'

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই—আমি বেশ একটু থতমত খেয়ে গেলুম। আর যাই হোক, এখানে এ প্রশ্নের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলুম না। সুতরাং খানিকটা সময় লাগল—এই বিস্ময়ের চমকটা সামলে নিয়ে উত্তর দিতে। বারকতক ঢোঁক গিলে বললুম, 'হ্যাঁ, মানে, আপনি—আপনারও কি বাঙালী শরীর ?'

সাধুদের পূর্বজীবনের কথা বলতে নেই, সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নবজন্ম শুরু হয়। তাই পূর্বাশ্রমে কোন্ দেশী ছিলেন প্রশ্ন করতে গেলে 'শরীর'টা কোন্ দেশীয়—এই প্রশ্নই করতে হয়।

আমার কথা কইতে—অথবা কথা কইবার মতো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে বলাই উচিত—যেটুকু সময় লেগেছে, তার মধ্যেই সাধুবাবা উঠে দাঁড়িয়েছেন। এবার আরও পরিষ্কার দেখলুম তাঁকে। রোদে-পোড়া জলে ভেজা চেহারা—রঙ বা কান্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, মুখ ও চিবুক দাড়ি-গোঁফের অবগুণ্ঠনে ঢাকা—তবু মনে হল সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়, চল্লিশ হবে বড়জোর—এবং বয়সকালে, 'যখন জরার কোপে দাড়ি-গোঁফে হয়নি জবরজঙ্গিমা' তখন দেখতে সুশ্রীই ছিলেন।

আরও সেটা টের পাওয়া গেল সাধু যখন আমার প্রশ্নে হেসে উঠলেন, ঝকঝকে সুন্দর দাঁত বলে নয়,—হাসির ভঙ্গীটাও ভারী মিষ্টি, অনেকটা ছেলেমানুষের মতো। সমস্ত মুখটা যেন নিমেষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সে হাসিতে।

বললেন, 'না না, অত সমীহ ক'রে শরীর-টরীর বলতে হবে না, আমি বাঙ্গালীই। রীতিমতো সন্ন্যাস নেওয়া যাকে বলে তা আমি নিই নি। কাজেই—কোন বাধা-নিষেধেই বাঁধা নেই আমি—এটা আমার একরকম ছদ্মবেশ বলতে পারেন, ভেক। ভেক না হ'ল ভিখ্ মেলে না—জানেন তো?'

'ভিক্ষে তো আপনি নেন না শুনলুম, খেটেই খান। তবে আবার ভেকে কি দরকার?'

'তাও শোনা হয়ে গেছে এরই মধ্যে?…ভক্তসংখ্যা দেখছি আমার অনেক।…আরে মশাই খেটে খেতে চাইলেই কি খাওয়া যায় সব সময়? এই যে বাবুরা কেউ ভিক্ষে চাইলেই বলেন, খেটে খেতে পারো না? খাটুনিটা দিচ্ছে কে সব সময়?—এই যে এদের মধ্যে কাজ করছি—অন্য কেউ এলে কি কাজ করতে দিত সরকারী লোকের সঙ্গে, না এত দয়াধর্ম করত? এ খাতির এই গেরুয়া কাপড়টার আর এই জটার।…সে যাক গে, আপনি এখানে কি বেড়াতে এসেছেন? আজই এসে পড়েছেন, না আছেন ক'দিন, কাছাকাছি কোথাও আড্ডা গেড়েছেন?'

'না, প্রায় দিন দশেক আছি। আরও দিন দশ থাকব, এই রকম ইচ্ছে।'

'কোথায় আছেন? এদিকে তো থাকার মতো তেমন—। কোন্‌দিকে কার বাড়ি উঠেছেন?'

বললাম, 'আমার এক বন্ধু এসেছেন সপরিবারে, তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি।

মাস দুয়েক থাকবেন তিনি। আমি এসেছি আমার বন্ধুর অতিথি হিসেবে। কিষেণপুরের দুই আশ্রম ছাড়িয়ে দেরাদুনের দিকে যেতে এক ফার্লংটাক গেলে যে ছোট একটু গ্রামের মতো পড়ে ডানহাভি—সেইখানে দেখবেন পাশাপাশি দুটো পাকাবাড়ি উঠেছে—তারই এদিকেরটায় আছি।'

'বুঝেছি। ভার্মার বাড়ি। বুঝতে পেরেছি। ' আমিও ঐ কাছেই থাকি।···জোয়ালাপ্রসাদ আহীর দুধ বেচে—আপনাদেরও বাড়িতে বোধ হয় ও-ই দুধ যোগায়—তারই আশ্রয়ে আছি আপাতত। রীতিমতো আশ্রয়ই। বাইরের দিকের দাওয়া ঘিরে দিয়েছে, একখানা চারপাই কম্বলও দিয়েছে, রীতিমতো সাধু প্রতিষ্ঠা যাকে বলে। অন্য বিছানাও দিত—সাধুদের তুলোর বিছানায় শুতে নেই বলে সেটা এড়িয়ে গেছি। ভারী ভক্তিমান লোকটা। খেতে দিতেও তার আপত্তি নেই। নেহাৎ আমি ঘাড় পাতি নি—তাই। সময় পেলে ভোরে উঠে ওর সঙ্গে হাত লাগিয়ে একটু-আধটু গরুর সেবা ক'রে দিই, তাতেই ওর কুণ্ঠার সীমা নেই। আমি রাগ ক'রে চলে যাব—এ ভয় না থাকলে ওটুকুও করতে দিত না। তাও, একটা না-একটা ছুতোয় প্রায়ই দুধ গিলিয়ে দেয় খানিকটা—ফাঁক পেলেই।···ভারী মজা, যত বলি আমি সাধু নই···ততই দেখি সকলের ভক্তি বেড়ে যায়। সাধুগিরির বোধ হয় এইটেই সিক্রেট অফ সাকসেস।'

উৎসাহিত হয়ে আমি বললুম, 'তা একদিন আসুন না আমাদের ওখানে—'

উনি ঘাড় নাড়লেন, বললেন, 'এও একরকমের ভণ্ডামী ভাববেন হয়ত, কিন্তু সত্যিই শিক্ষিত ভদ্র-গৃহস্থ বাড়িতে আমি যাই না। তার থেকে এদের মধ্যেই থাকি ভাল। আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগছে, কিন্তু আপনার ওখানে গেলেই আপনি বাকী সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, কিম্বা তাঁরাই এসে আলাপ করবেন। সাধু সম্বন্ধে যতই বীতরাগ থাক, মুখে যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুন—কৌতূহল কারও কম নেই। হয় ভক্তি নয় বিদ্রূপ—কিম্বা নিছক কৌতূহল—কোনটাই আমার সহ্য হবে না। আর তার দরকারই বা কি? আপনার বাড়ির পিছন দিকটাতেই দেখবেন জোয়ালাপ্রসাদের খাটাল, অত গরু-মোষ, দেখতে ভুল হবার কথা নয়। আপনি যদি দয়া করে ওখানে আসেন তো, ভেরী মাচ্ ওয়েলকাম,—বসার জন্যে একটা সাফ চারপাই—হয়ত বা গোটা কুর্সিও একটা দিতে পারব। তবুও যদি আপত্তি থাকে, একখানা খবরের কাগজ

পেতে তোফা রাস্তার ওপরই বসা চলবে, আমার তাও লাগবে না। সন্ধ্যার পর এ রাস্তা তো দেখেছেন—জনবিরল যানবিরল—কী সব বলে আপনাদের পোশাকী বাংলাতে—দিব্যি বাঁধানো রোয়াকের মতোই পরিষ্কার আর নিরাপদ।'

এইটুকু কথাতেই বুঝলুম ভদ্রলোক শিক্ষিত শুধু নন—বেশ বুদ্ধিমানও। আকৃষ্টও যেমন হলুম—একটু অস্বস্তিও বোধ করতে লাগলুম। কোন অপরাধী অর্থাৎ ক্রিমিন্যাল সাধুর ছদ্মবেশে এই নির্জন জায়গায় আত্মগোপন ক'রে আছে হয়ত—কিম্বা কোন স্পাই —?

বোধ করি আমার মনের ভাবটা মুখে ফুটে উঠেছিল ছাপা বইয়ের পাতার মতো। তা নইলে তিনি অমন পরিষ্কার দেখতে পাবেন কেন? হেসে বললেন, 'জেলখানাকে ফাঁকি দিতে লুকিয়ে থাকতে হ'লে জনাকীর্ণ শহরে থাকাই নিরাপদ, কলকাতা কি বম্বের মতো। আর স্পাই? এখন তো আর ইংরেজ আমল নেই যে স্বদেশী ডাকাতদের ধরবার জন্যে সরকার মাইনে দিয়ে স্পাই পুষবে। আর আপনারই বা তাতে চিন্তার কি আছে? গোপন করার মতো কোন কথা থাকলে সে প্রসঙ্গ তুলবেন না—চুকে গেল।'

খুব যে চুকে গেল তা নয়—অস্বস্তি বরং বেড়েই গেল। তবে অপ্রস্তুতও হয়ে পড়লুম খুব। 'না না, সে কি কথা, সে সব কিছু নয়!' ইত্যাদি বলতে বলতে পশ্চাদপসরণ করলুম। তিনি আবারও একটু হেসে কাজে মন দিলেন।

ভেবেছিলাম দেখা করব না আর। মানুষটাকে ঘিরে যে বড় রকমের একটা রহস্য আছে, তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক—এই জনবিরল স্থানে এসে জনমজুরী খাটবে, অথচ এধারে সাধুর বেশ—সবটাই যেন কেমন গোলমেলে। মরুক গে ছাই—ও সম্পর্ক এড়িয়ে চলাই ভাল।

বাড়িতে এসেও কিছু বলি নি কাউকে। বন্ধুকেও চিনি, বন্ধুপত্নীকেও। দুজনেরই কৌতূহল ছেলেমানুষের মতো, বরং বেশী। একবার কানে গেলেই অস্থির ক'রে তুলবেন এবং আমি নিয়ে না গেলে নিজেরাই খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হবেন, শেষ পর্যন্ত উৎখাত ক'রে ছাড়বেন সাধুজীকে।

ওঁদেরও কিছু বলে কাজ নেই—আলাপ ঝালিয়েও না, মনে মনে স্থির করলুম। প্রসঙ্গটাই একদম ভুলে যাওয়া ভাল।...

কিন্তু অপরাহ্ণ পার হয়ে যখন সন্ধ্যা নামল একসময়, তখন কে যেন ভেতরে ভেতরে অবিরাম ঠেলতে লাগল ঐ দিকে। শেষে মানতে বাধ্য হলুম—কৌতূহল আমারও বড় কম নয়। এ পরিচয় ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা যে বিপজ্জনক এবং সে বিপদ কী কী, আর কতদিক থেকে আসতে পারে—মনকে তা বুঝিয়ে আর ভয় দেখিয়েও ঠেকানো গেল না। শুভবুদ্ধি নিরাপত্তাবোধ আর কৌতূহলের লড়াইয়ে কৌতূহলই জয়ী হল। শেষ অবধি অন্ধকার বেশ ঘোরালো হতে—'একটু রাস্তার দিকে যাচ্ছি'—এমনি অস্পষ্ট একটা কথা বলে একসময় একটা টর্চ হাতে বেরিয়েই পড়লুম জোয়ালাপ্রসাদের খাটালের উদ্দেশে।

খাটালটা দেখেছি এর আগেও, অত লক্ষ্য করি নি। আজ বিকেলে ফিরে এসে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে চিহ্নিত ক'রে রেখেছি। আমাদের এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো পঞ্চাশ কদম আন্দাজ গিয়ে বাঁ-হাতি যে পায়ে-চলা রাস্তাটা নেমে গেছে—সেই রাস্তা ধরে গেলে প্রথম বাড়িটাই ওদের, আমাদের বাড়ির ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে। কাছেই—রাস্তা থেকে একশ-সওয়াশ' গজের বেশী দূর হবে না।

রাস্তার ইলেকট্রিক আলো অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। বাড়িটাও ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখা যায়, তবে খুব পরিষ্কার নয়। বাড়ি বেশ অন্ধকার, ভেতরে আলো জ্বলছে বটে, সেটার একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে, শিশুর কান্নাও শোনা যাচ্ছে, তাতেই মানব-বসতির আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু বাইরের দিকটা যেমন নিস্তব্ধ তেমনি জনহীন আর তেমনি অন্ধকার।

এ অবস্থায় কী করা যায় ভাবছি, ফিরেই যাব অথবা কাউকে ডাকব কি না, কী বলেই বা ডাকব—ভাবতে-ভাবতেই দাওয়ার কাছাকাছি এগিয়ে গেছি খানিকটা, হঠাৎ সেই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে থেকে পরিষ্কার সম্ভাষণ কানে এল, 'আসুন, আসুন। শেষ পর্যন্ত ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারলেন তাহলে ? না কি কৌতূহল—কী যেন বলে কেতাবে—অসম্বরণীয় হয়ে উঠল ?···না, না, দাওয়ায় উঠে আর কাজ নেই, ঝুপ্সি অন্ধকারে বসে থাকা—গোবর-পচার খুশবুর মধ্যে—এদের গেরস্থালির সৌরভও আপনার সহ্য হবে না।—বাইরেই বেশ বসা যাবে। আপনার ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই তো ? না হয় মাফলারটা জড়িয়ে বসুন ভাল ক'রে।'

তখনও পর্যন্ত দাওয়ার ঘেরা অংশটার যেন ডেলা-পাকানো অন্ধকার থেকে শুধু কণ্ঠস্বরটাই ভেসে আসছিল। কেমন যেন ভয় ভয় করে—সেই অদৃশ্য অশরীরী শব্দে। লোকটার কি সবই বিদঘুটে!

যাই হোক, এবার বেরিয়ে এলেন সাধুজী। একহাতে একখানা খাটিয়া আর একহাতে একখানা চেয়ার বয়ে এনে বাইরে ফাঁকা মাঠে ফেললেন। তারপর নিজের গায়ে যে গামছার মতো বস্তুটা জড়ানো ছিল সেইটে দিয়ে চেয়ারখানা মুছে বললেন, 'বসুন। কোন ভয় নেই, বেশ মজবুত চেয়ার, মিস্ত্রী দিয়ে ঘরে তৈরী করানো।'

সেই সূত্রপাত।

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হ'ল বসে বসে। সেদিনও, তার পরের দিনও। ক্রমশ আড্ডাটা প্রাত্যহিক হয়ে উঠল। সকালে সুবিধা হ'ত না, কারণ রাত থাকতে উঠে গোশালার কাজ সেরে সাড়ে পাঁচটা-ছটার মধ্যে বেরিয়ে যেতেন ভদ্রলোক কাজের ধান্দায়—তখনও এখানে বেশ ঘোর থাকে অন্ধকারের। ফিরতেন অবশ্য সকাল সকাল, আমি কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না এলে যেতুম না। এই সখ্য বা সৌহার্দ্য বা ঘনিষ্ঠতা—বন্ধুদের জানাতে রাজী নই।

সাধুজীকেও আড্ডাটা পেয়ে বসেছিল ক্রমশ। দেখতুম ইদানীং তিনি বেশ একটু উৎসুকভাবেই অপেক্ষা করতেন আমার জন্যে। ওঠার সময়ও ছাড়তে চাইতেন না, 'আর একটু' 'আর একটু' ক'রে ধরে রাখতেন। আতিথেয়তারও একটা ভাল ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। জোয়ালাপ্রসাদ প্রত্যহই একগ্লাস গরম দুধ—ঈষৎ 'শক্কর' মিশিয়ে বিনীতভাবে সামনে এনে ধরত, দুহাতে, অনুনয়ের ভঙ্গীতে। বলা বাহুল্য এটা যোগানের দুধ নয়—সুতরাং নির্জলা খাঁটি। বহুকাল এমন সুস্বাদু দুধ খাই নি। প্রথম প্রথম ক্ষীণ আপত্তি করেছি, শোনে নি। শেষের দিকে আর তাও করতুম না—ওর আন্তরিকতা দেখে। ঠাণ্ডায় অমন সুস্বাদু গরম দুধ মুখের কাছে এনে ধরে পীড়াপীড়ি করলে কে ছাড়ে?

তবে আড্ডা যতই জমুক—প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা ক'রেও সাধুজীর জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি। মানুষটা সদালাপী শুধু নন, বাক্‌কুশলী। প্রসঙ্গটা তুলতে গেলে বোকার মতো গম্ভীর হয়ে যেতেন না।—কথার কৌশলে

অনায়াসে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেন—কোন কোন সময় আমি বুঝতেও পারতুম না—কেমন ক'রে এড়িয়ে গেলেন উনি। কিন্তু শেষের দিকে—ঘনিষ্ঠটা প্রীতির সম্পর্কে পরিণত হতে একটু একটু ক'রে নিজেই অল্পে অল্পে বিকশিত করেছিলেন, তাঁর জীবনের নিদারুণ ট্র্যাজেডির করুণ রক্তপদ্মটি। অবিশ্বাস্য সে ইতিহাস, তাঁর মুখ থেকে বিভিন্ন সময়ে টুকরো টুকরো ক'রে না শুনলে এবং বার বার জেরা করার পরও কাহিনী অবিকৃত এবং কাহিনীকার অবিচল না থাকলে আমারও বিশ্বাস হ'ত না। আপনাদেরও হবে না খুব সম্ভব। সেই জন্যেই এ গল্প এতকাল লিখি নি। আরও লিখি নি কতকটা চক্ষুলজ্জায়। সে সন্ন্যাসীর চোখে পড়লে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা মনে করতেন। আজ আর সম্ভবত তিনি বেঁচে নেই—থাকলেও এমন কোন দুর্গম স্থানে বাস করছেন, যেখানে এ লেখা পৌঁছবে না। কারণ তারপর বার বার ঋষিকেশ, দেরাদুন, কিষেণপুর, রাজপুর, পশুলোক খুঁজে দেখেছি—সে সাধুর কোন খবর পাই নি। সেই ভরসাতেই লিখছি এবার। বিশ্বাস? ইচ্ছা হয় করবেন, না হয় তো করবেন না। আগে ভয় ছিল আষাঢ়ে বা গাঁজাখুরী বলে মনে করলে হাস্যাস্পদ হবার—এখন ওসবের বাইরে চলে এসেছি। যা-খুশি লেখার যুগ এটা। তা ছাড়া বছর দুই আগে খবরের কাগজে মুসোলিনী সংক্রান্ত যে সংবাদ বেরিয়েছিল তাতেও খানিকটা জোর পেয়েছি মনে। এ বিবরণের খানিকটা যে সত্য হ'তে পারে সে প্রমাণ তো পেয়েই গেলুম—খানিকটা হ'লে বাকীটাই বা হতে বাধা কি?

গল্প সাধু যেমনভাবে বলেছিলেন সে ভাবে বলা চলবে না। এমনিই পুঁথি বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই সংক্ষেপে আমার মতো ক'রেই কাহিনীটা বলছি। আশা করছি তাতে অসুবিধা হবে না কারুরই।

সাধুজীর আসল নাম প্রবীর, রাজসাহীর দিকে দেশ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ওঁরা। বাবা ছিলেন উকীল, রোজগার খারাপ করতেন না—কিন্তু বহু পোষ্য ছিল। তাতে খরচও যেমন হ'ত, তেমনি কোলাহল। অত লোকের মধ্যে, বিশেষ অনেক সমবয়সী ছেলে থাকলে ছেলেদের লেখাপড়া হয় না! প্রবীরের অন্য ভাইদের হয়ও নি। একমাত্র ওরই পড়ার ঝোঁক এবং মাথা দুই-ই আছে দেখে—ওর এক মামা নিজের কর্মস্থল ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কাছে রেখেছিলেন,

সেইখান থেকেই বি-এস-সি পর্যন্ত পড়ে প্রবীর।

তারপর ওর মামা নিজে এসে কলকাতায় ডাক্তারী পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। কালীঘাটের দিকে সেই মামার এক বন্ধু থাকতেন বীরেশ লাহিড়ী বলে—বলে-কয়ে সেইখানেই ওর থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন মামা। স্থির হ'ল পড়ার খরচ প্রবীরের বাবা দেবেন, আর বীরেশবাবুকে যা দেবার তা মামাই পাঠাবেন। অন্য লোকে দিতে গেলে তিনি নেবেন না, মামা নগদে হোক অন্যভাবে হোক পুষিয়ে দেবেন। প্রবীর প্রথমটা খুবই কুণ্ঠাবোধ করেছিল কিন্তু মামা জোর করলেন। বললেন, 'মেসেহোস্টেলে বেশীদিন থাকলে শরীর নষ্ট হয়ে যায়। যদি শেষের দিকে খুব অসুবিধা বোধ করিস তো বরং ক'মাসের জন্যে হোস্টেলে চলে যাস, এখন এখানেই থাক চোখ-কান বুজে।'

অবশ্য বীরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রীর অমায়িক ব্যবহারে প্রবীরের কুণ্ঠা দূর হতেও খুব দেরি লাগে নি। দেখতে দেখতে সে বাড়ির-ছেলেই হয়ে উঠল। তবে এঁদের ঋণ আংশিক শোধ ক'রে---নিজের সঙ্কোচ নিজের কাছে অন্তত খানিকটা কাটিয়ে নেবার একটা ব্যবস্থাও ক'রে নিল সে। বীরেশবাবুর মেয়ে যূথিকা আর ছেলে শিবেশকে সময়মতো কিছু কিছু পড়াতে লাগল। বীরেশবাবু প্রথমটা খুবই আপত্তি করেছিলেন, ডাক্তারীতে পড়ার খুব চাপ, মিছিমিছি এতটা সময় নষ্ট করা কিছুতেই উচিত হবে না—এই যুক্তিতে। কিন্তু প্রবীর বুঝিয়ে দিল যে প্রথম প্রথম অত সময়ের অভাব হয় না তাদের, তা ছাড়া সে তো আর প্রাইভেট টিউটারের মতো সময় বেঁধে নিয়ম ক'রে পড়ায় না, দরকার মতো সকালে হোক বিকেলে হোক, নিজের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু দেখিয়ে দেয়—তাতে আর এত সময় নষ্ট হবার কি আছে ?

তবু কিছু দিন খুঁৎ খুঁৎ করেছিলেন বীরেশবাবু কিন্তু তারপর ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই পড়ার চাড় বাড়ছে দেখে মেনেই নিয়েছিলেন একসময়ে। সুবিধেও যে কিছু হয়েছিল তাতে তো সন্দেহ নেই। প্রবীর ছাত্র ভাল, ওর মতো একজন প্রাইভেট টিউটার রাখতে গেলে অনেকগুলো টাকা বার করতে হ'ত মাসে মাসে। অথচ একজন টিউটার না রাখলেও চলছিল না আর—বিশেষ ছেলের জন্যে। মাইনে দিলেও এত কাজ পেতেন না। সময় বেঁধে দায়ঠেলা গোছের কাজ সেরে চলে যেত সাধারণ কোন টিউটার, এত যত্ন ক'রে পড়াত না।

এর যা স্বাভাবিক ফল—তাই হ'ল। প্রবীর অল্পে অল্পে যূথিকার দিকে

আকৃষ্ট হ'তে লাগল। যূথিকাও। শান্ত স্বভাবের সুশ্রী মেয়ে, মমতাময়ী—এ ধরণের মেয়ের সংস্পর্শে এলে আকৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রবীরও প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র। প্রেমে পড়লেও বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করে নি কখনও, আতিথেয়তার অপব্যবহার করে নি—এঁদের স্নেহ ও বিশ্বাসের সুযোগ নেয় নি। পড়াশুনোতেও অবহেলা করে নি—নিজেরও না, এদেরও না। পড়ানোর সময় শিক্ষকের মতোই ব্যবহার করত যূথিকার সঙ্গে—আসক্তি তার কর্তব্যের অন্তরায় হ'ত না। সুতরাং তাদের এই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের খবর রাখলেও বীরেশবাবুরা উদ্বেগ বোধ করেন নি। অযথা ব্যস্তও হন নি। তাঁরা যে টের পেয়েও প্রশ্রয় দিচ্ছেন—তাও জানতে দেন নি। প্রবীর সুপাত্র, ওঁদের সমশ্রেণীও। এমন পাত্র যদি নিজেই এসে ধরা দেয় তো মন্দ কি ?

এই যখন অবস্থা—চারিদিকেই সৌভাগ্য ও শান্তির লক্ষণ—হঠাৎ, বছর দুই পরে, মামীর অসুখের খবর পেয়ে প্রবীরকে ঢাকায় যেতে হ'ল একবার। এই যাত্রাই ওদের জীবনে বিপর্যয়ের উপলক্ষ হয়ে উঠল।

ঢাকায় ওদের পল্টন বাজারের বাসার সামনেই থাকতেন পরিমলদিদি। ওর মামীও দিদি বলতেন, মামাতো ভাইবোনেরাও। সেই সুবাদে প্রবীরও তাঁকে দিদি বলে ডাকত। ভদ্রমহিলার বড় বিচিত্র ইতিহাস—সে-ইতিহাস শোনার পর থেকে প্রবীর তাঁকে একটু সহানুভূতির চোখে দেখত, সাধ্যমতো তাঁকে দেখাশুনোও করত ওখানে থাকার সময়। পরিমলদির বাবা অনেক টাকা খরচ ক'রে লেখাপড়া-জানা কলেজের লেকচারার পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কলেজে পড়ায়—দেখতে ভাল এই দেখেই গলে গিয়েছিলেন পরিমলদির বাবা, শিক্ষিত বুদ্ধিমান জামাতার পূর্ব-ইতিহাস কিছু খোঁজ করার চেষ্টাও করেন নি।

জামাই জীবনময় স্কুল-জীবনেই দুবার হোস্টেল থেকে বিতাড়িত হয়েছিল চুরির অপরাধে। কলেজে ঢুকে যে-সব দুঃসাহসিক কাজ করেছিল—তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে সাহস করেন নি প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু ভয় দেখিয়ে পরীক্ষায় পাশ করা যায় নি—খোঁজখবর পেলে সে তদ্বিরও করতে পারত হয়ত—সেই সময়টায় একজনের বাড়ির পাঁচিল ডিঙ্গোতে গিয়ে বুকের হাড় ভেঙ্গে মাস-দুই শয্যাশায়ী ছিল বলে পারে নি। সুতরাং সেখানে অন্য পথ ধরতে হয়েছিল।

কী পথ সেটা দৈবাৎ ধরা পড়ে গেল। জানা গেল এম-এ ডিগ্রির যে কাগজ দেখিয়ে জীবনময় চাকরি পেয়েছিল সেটা জাল, এমন কি বি-এ পাসও করে নি সে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কেস করেছিলেন, পুলিশে ধরা পড়ে হাজতেও যেতে হয়েছিল। সে সময় কোন আপনজনই তার পাশে এসে দাঁড়ায় নি, আত্মীয় বলতে কেউ ছিলও না নাকি। এক—ছুটে যেতে পারতেন পরিমলদির বাবা, কিন্তু তিনি অশ্বিনী দত্তের ছাত্র, অন্যায় ও অপরাধকে প্রশ্রয় দেবার লোক তিনি নন, তা সে যে-ই করুক। সুতরাং জীবনময় জামিন পায় নি, হাজতেই যেতে হয়েছিল তাকে। তবে তাকে ধরে রাখবে মফঃস্বল শহরের হাজতের সে শক্তি ছিল না। খুব সহজেই হাজত ভেঙ্গে পালাল জীবনময়। সেই শেষ, পরিমলদির সঙ্গে ইহজীবনে আর দেখা হয় নি তাঁর স্বামীর।

তাই বলে যে স্বামীর খবর পান নি তা নয়।

খবর পেয়েছে দেশের লোকও। এর পর থেকে আমরণ—খবরের কাগজের বড় বড় হেড লাইন সৃষ্টি করে গেছেন মধ্যে মধ্যেই।

নানা বেশে, নানারূপে, নানা নামে—নানা বিচিত্র অপরাধ করে বেড়িয়েছে জীবনময়। যে সোনা মিঞা সে-ই জীহন আলি, সে-ই রতন ভট্টাচার্য, সে-ই আবার মাতাপ্রসাদ—কখনও সে-ই হীরা সিং। কর্মক্ষেত্র কখনও জম্মু, কখনও রাজপুতানা, কখনও হায়দ্রাবাদ, কখনও আসাম। অপরাধের ফর্দ দেওয়া আরও মুশকিল; চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এসব তো নেহাৎ তুচ্ছ—নারীধর্ষণ, খুন—এও খেলামাত্র। করে নি এমন কুকাজ নেই। হত্যা বা নারীধর্ষণের নানা বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত সে—নিত্যনূতন। একেবারে ধরা যে পড়ে নি তাও নয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড় করানো যায় নি কখনই। একবার ট্রেন থেকে পালিয়েছে, আশ্চর্য কৌশলে হাতকড়া খুলে সঙ্গের সিপাহীদের খুন করে গাড়ির ছাদ বেয়ে গিয়ে চলন্ত গাড়ির কাপলিং খুলে দিয়ে শেষ বগিটা বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে—তারপর জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যক্ত সেই বগির আরোহীদের ভয় দেখিয়ে লুঠ ক'রে নিয়ে একাই পালিয়ে গেছে জঙ্গলে। আর একবার কলকাতা শহরের বুকের ওপর দিবা-দ্বিপ্রহরে পুলিশ ভ্যান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে—ভেল্কিওয়ালার মতো। আরও বার দুই থানার হাজত থেকে। কে তাকে সাহায্য করত তা কেউ জানতে পারে নি আজও, তবে তার দলে যে অন্য লোক ছিল তার প্রমাণ

পাওয়া গেছে বহুবারই বরং এই বিভিন্ন নামের ভয়ঙ্কর অপরাধী যে সেই জীবনময়, এটাও পুলিশ খুঁজে বার করতে পেরেছে।

কিন্তু কথায় আছে সাতদিন চোরের একদিন সাধুর। ভাগ্যের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে বার বার ভাগ্যের নাকের সামনে তুড়ি মেরে আসা যায়—শেষ খেলাটা কিন্তু থাকে ভাগ্যের হাতেই। সেই খেলাতেই হারল জীবন। ইংরেজীতে যাকে বলে Once too many—তাই হ'ল ওর। মধ্যপ্রদেশের এক পাহাড়ী জঙ্গলে হাতবোমা মেরে পুলিশকে ঘায়েল করতে গিয়ে—সেই বোমা হাত ফসকে পড়ে নিজেই সাংঘাতিক জখম হল। এই প্রথম দলপতিকে জখম হ'তে দেখে ভয়ে দিশাহারা হয়ে পালাল দলের লোকেরা। তাদের অবস্থা অবশ্য আগেই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল—তাদের মধ্যে অক্ষত ছিল না একজনও, তিন ঘণ্টা পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে সকলেই আহত হয়েছিল অল্পবিস্তর, সেই কারণেই পরে ধরাও পড়েছিল তারা অতি সহজে।

এরপর পাকড়াও করা তো সময়ের অপেক্ষা শুধু। পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়ে বীরদর্পে এগোচ্ছে, সেই সময় এক কাণ্ড ক'রে বসল জীবন—জীবনের সর্বশেষ বাহাদুরী দেখিয়ে দিল পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে। পাশে কার একখানা তলোয়ার পড়ে ছিল—কোন অস্ত্রই তুচ্ছজ্ঞান করত না ওরা, জীবনের দুই পা আর এক হাত জখম হয়ে উড়ে গেলেও বাঁ হাতখানা সক্রিয় ছিল তখনও—সেই হাতেই চোখের পলক ফেলার অবসরে তলোয়ারখানা কুড়িয়ে নিয়ে ছিন্নমস্তার মতো নিজের গলায় বসিয়ে দিল সজোরে।

খবরটা সব কাগজেই ফলাও ক'রে বেরিয়েছিল। ছবিও ছাপা হয়েছিল। সেই ছবি দেখেই পরিমলদি স্বামীকে চিনতে পেরেছিলেন—নইলে যখন মারা যায় জীবন তখন শের সিং বলে পরিচিত।

সে সময়টা যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেলেও এদেশ তখনও মার্কিন ডাক্তারে বোঝাই। শের সিংয়ের বিচিত্র জীবনের প্রায়-অবিশ্বাস্য ইতিহাস কাগজে পড়ে এক চিকিৎসাবিজ্ঞানীর শখ হ'ল—তিনি ওর মস্তিষ্কটা পরীক্ষা করে দেখবেন—সাধারণ মস্তিষ্ক থেকে কোনখানটায় তফাৎ এই ধরণের অস্বাভাবিক ক্রিমিন্যাল মনোবৃত্তি—অপরাধের কল্পনা ও শক্তি এল কোথা থেকে। তখনও ইংরেজ আমল শেষ হয়নি—আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের এই

মস্তিষ্ক সংগ্রহে বাধা পাবার কথা নয়। খুলি সরিয়ে ব্রেনটি বার ক'রে আরকে ডুবিয়ে নিয়ে তিনি দেশে চলে গিয়েছিলেন। বাকী দেহটা বা দেহের টুকরো-গুলো দাহ হয়েছিল কি সমাহিত হয়েছিল কিম্বা সোজাসুজি ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—তা কেউ জানে না। পরিমলদিও না। তিনি শব দাবীও করেন নি। জীবনে মাত্র বছর-দুইয়ের মতো স্বামীকে পেয়েছিলেন তিনি, যে-কোন কারণেই হোক, সে সময়টুকুতেও প্রণয় জমতে পারে নি। স্বামীর মনের তল পেতেন না পরিমলদি, ভয় ভয় করত তাঁর। তারপর দীর্ঘকাল কেটেও গেছে—এখন এতদিন পরে ঐ লোকটাকে স্বামী বলে স্বীকার ক'রে তার শব দাবী করা বা সৎকারের ব্যবস্থা করা, কোনটাতেই তাঁর মন সায় দেয় নি। ঘৃণাই বোধ হয়েছে তাঁর। আয়তির লক্ষণ লোহা-সিঁদুর অনেক দিনই ত্যাগ করেছিলেন—যেটুকু ছিল, পেড়ে কাপড় আর একগাছা ক'রে চুড়ি সেটুকু থেকেই গেল। অর্থাৎ তাঁর জীবনে কোন পরিবর্তনই এল না—শুধু মাংছ-মাংস খাওয়াটা ছেড়ে দিলেন চিরকালের মতো।

এর মধ্যে বহু ঘাটের জল খেয়েছেন পরিমলদি'ও। বাবা মরবার পর ভাইদের সংসারে অনেক দুঃখ পেয়ে শেষ অবধি নিজের পথ নিজেই দেখেছেন। এক ধনী-পরিবারে উচ্চ শ্রেণীর পরিচারিকা হিসেবে কলকাতায় যান, সেখানে নিজের চেস্টায় প্রাইভেটে একটা পাশ দিয়ে কোন মাইনর ইস্কুলে সামান্য একটা চাকরি পেয়েছিলেন। সেখান থেকে ঢাকায় আসেন এক নবাব পরিবারের গবর্নেস হয়ে। এ বিষয়ে কোন কুসংস্কার ছিল না—ভাগ্যিই তাঁকে রাখতে দেয়নি এ সব সংস্কার, তবে পৃথক রেঁধে খেতেন, সেই শর্তেই চাকরি নিয়েছিলেন। এঁদেরই সঙ্গে থাকাকালীন এক বেগমের কাছে আঁকতে শেখেন পরিমলদি, আর একজনের কাছে কিছু বাজনা। ওঁরা দুজনই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, পরিমলদি'র অত যোগ্যতা না থাকলেও ওঁরা খুবই যত্ন ক'রে শিখিয়েছিলেন। তার ফলে ভাল চাকরি পাওয়া সহজ হয়েছে তাঁর। প্রবীরের সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন পরিমলদি এক বড় মেয়ে-ইস্কুলের ড্রয়িং ও মিউজিক মাস্টারের চাকরি করছেন।—

এবার ঢাকায় পৌঁছেই প্রবীর শুনল, সে আসবে শুনে পরিমলদি বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে প্রবীর না কলকাতা চলে যায়। কী একটা জরুরী প্রয়োজন আছে তাঁর।

মামীকে অনেকটা সুস্থ দেখে পরের দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল প্রবীর। দেখল সেখানে আরও একটি বিচিত্র ইতিহাস তার জন্য অপেক্ষা করছে।

যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী শের সিং বা জীবনময়ের মস্তিষ্ক নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে—সে গবেষণার ফলাফলও এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রে ছাপা হয়েছে, ছবিসমেত। কাজ শেষ হবার পর সে বৈজ্ঞানিকের মনে হয়েছে মস্তিষ্কটিকে এবার মৃতের আত্মীয়দের কাছে প্রত্যর্পণ করা উচিত, যাতে তারা এটাকেও সমাধিস্থ করতে পারেন। সে বিষয়ে একজন ভারতীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে শুনেছেন যে, যেহেতু মৃত মুসলমান বা ক্রীশ্চান নয়—সেহেতু শব খুব সম্ভব সমাধিস্থ করা হয়নি, দাহ করা হয়েছে। কিন্তু তাহলেও—হিন্দু হলে, শাস্ত্রমতে সে অংশটুকুও দাহ করা দরকার, নইলে পারলৌকিক কাজ শেষ করা যাবে না। আর এ সব ক্ষেত্রে হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক—দেহাবশেষ অন্য জায়গায় পড়ে থাকলে মৃতের আত্মীয়রা খুব দুঃখিত বোধ করেন।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক কিছুই জানেন না, যা শুনেছেন তাই বিশ্বাস করেছেন; অনুতপ্তও হয়েছেন খুব। ওঁরা কোন ব্যাপারেই দীর্ঘসূত্রী নন। এই অজ্ঞান-কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি মার্কিন দূতাবাস মারফৎ ভারত সরকার এবং ভারত সরকার মারফৎ ভারতীয় পুলিশ-ব্যবস্থাকে তোলপাড় ক'রে তুলেছেন। সাধারণত ভারত সরকারের কর্ম-তৎপরতার চাকা ধীরে ঘোরে, একটা ফাইল এক টেবিল থেকে পাশের টেবিলে যেতে বছরখানেক সময় নেয়। কিন্তু মার্কিন তাগাদায় অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে—সন্ধান শুরু হবার মাস দুয়েকের মধ্যেই তাঁরা মস্তিষ্কের আধার যে দেহ, সেই দেহীর নিকটতম আত্মীয় ও উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বার করেছেন। এর জন্য নাকি অমানুষিক কাণ্ড করতে হয়েছে পুলিশকে; জীবনময়ের যত নাম তত কীর্তি—তার মধ্য থেকে আসল পরিচয়ের সূত্রটি খুঁজে বার করা এবং সেই কীর্তির মাল্যরচনা করা—সত্যিই সহজসাধ্য নয়। সম্ভব হয়েছে শুধু মার্কিন সরকারের কড়া ও অবিরাম তাগাদায়।

এই মাত্র ক'দিন আগে দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের এক সাহেব একটি নি-বাত বা এয়ারটাইট কৌটায় ক'রে সেই পদার্থটি উত্তরাধিকারিণীর হাতে

পৌঁছে দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ ক'রে গেছেন এবং সেই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোকের দুঃখ প্রকাশ করা একটি চিঠিও দিয়ে গেছেন। এও বলে গেছেন যে, এখন মৃতের বাকী পারলৌকিক কাজ করার জন্য যদি খরচপত্রের কিছু দরকার হয়, তাও যেন ভদ্রমহিলা নিঃসঙ্কোচে জানান। সেই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক এখানের দূতাবাসে লিখেছেন—ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকাই লাগুক, তাঁরা যেন সেটা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেন, উত্তরাধিকারীদের কোন ক্ষোভের কারণ না থাকে।

পরিমলদি অবশ্যই তাঁদের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নিতে রাজী হন নি। কিন্তু মৃতদেহের অংশটি নিয়েছেন। বিদেশী ভদ্রলোক এত খরচ ক'রে এতটা পথ বহন ক'রে এনেছেন—প্রত্যাখ্যান করতে চক্ষুলজ্জাতেও বেধেছে খানিকটা, তার সঙ্গে বোধ হয় হিন্দু-সংস্কারও কিছুটা কাজ করেছে।...

আনুপূর্বিক সমস্ত ইতিহাস বিবৃত ক'রে পরিমলদি ছলছল চোখে প্রবীরের দুটি হাত ধরে বলেছিলেন, 'ভাই, তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য না করো তাহলে আর আমার কোন উপায় নেই। যতই যা হোক, মন্ত্রপড়া অগ্নিসাক্ষী-করা স্বামী, আমরা হিন্দুর মেয়ে—আমাদের কাছে এটা জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। এ জন্মটা তো লোকটার বাদে-ছরাদে গেল একদম, যতই যা করুক —এক মুহূর্তও শান্তি পায় নি এটা তো ঠিক, তার ওপর এই অপঘাত মৃত্যু—যে জীবন কাটিয়ে গেছে তাতে স্বাভাবিক মৃত্যু সম্ভবও না, এ জীবনের এইই পরিণতি—কিন্তু এই পাপের বোঝা নিয়ে পরকালেও একটু শান্তি পাবে না। শুনেছি অপঘাত মৃত্যুর শ্রাদ্ধ গয়াতে গিয়ে ক'রে আসতে হয়—কিন্তু সে অনেক খরচসাপেক্ষ। কে নিয়ে যাবে, কবে কার সঙ্গে যেতে পারব তারও ঠিক নেই। এখানের এ চাকরি কতদিন থাকবে তাই সন্দেহ—হয়ত সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাতে হবে শীগগিরই, তখন আবার নতুন ক'রে জীবিকার সমস্যা। তুমি তো ভাই কলকাতায় যাচ্ছ, কৌটোটা নিয়ে গিয়ে সময়মতো একদিন চুপিচুপি গঙ্গায় ফেলে দেবে? শুনেছি যে যতই পাপ করুক, যত বড় অপরাধীই হোক—গঙ্গা-পেলেই তার মুক্তি হয়ে যায়। অস্থি দেওয়াই নিয়ম, তা অস্থি কোথায়, আদৌ দাহ হয়েছিল কি না কিছুই তো জানি না। অস্থি না হোক—এ তো দেহেরই অংশ, মা-গঙ্গা অন্তর্যামিনী, আমার অবস্থা বুঝে এতেই অব্যাহতি দেবেন নিশ্চয়। মুক্তি পাক সে, শান্ত হোক—যদি প্রেতজন্ম

পেয়ে থাকে তো তাও অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়, এতে অন্তত সেটুকু থেকে মুক্তি শান্তি পাক। আর যদিই আবার জন্মান্তর পায়, সেই দেনার বোঝা নিয়ে না জন্মাতে হয়। লক্ষ্মী ভাইটি, আমার মুখ চেয়ে পারবে না এটুকু করতে? কার কাছে দেব এ ভার, কাকে বলব—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। যাকেই দেব সে-ই ঘেন্না করবে—বুঝবেও না আমার কথাটা, ভাববে ঐ স্বামীর জন্যে আদিখ্যেতা করছি! তুমি তো ডাক্তারী পড়ো, শুনেছি মড়া নিয়ে কাটা-ছেঁড়া না করলে ডাক্তারী পড়া যায় না, তোমার অত ঘেন্না হবে না নিশ্চয়।'

এই বলে তিনি প্রবীরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, উৎকণ্ঠ ব্যাকুলতায় —দু চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নেমেছিল তাঁর।

খুব ভাল লাগে নি প্রস্তাবটা, মড়ার অংশবিশেষ বলে নয়,—ও সংস্কার সত্যিই ছিল না প্রবীরের—কোন্ মানুষের দেহাবশেষ সেইটে চিন্তা ক'রেই তার বেশী আপত্তি। গঙ্গায় যে অস্থি দেয়—ধরে নেওয়া হয় সে মৃতের নিকটতম আত্মীয়, এক্ষেত্রে সে আত্মীয়তা একেবারেই কাম্য নয়। তবু পরিমলদি'র মুখের দিকে চেয়ে, সেই কাতর মিনতির পর আর 'না' বলতে পারে নি সে। কৌটোটা নিয়েই আসতে হয়েছিল।

ঢাকা থেকে ফেরবার মুখে অকালে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছিল জাহাজ, ট্রেনও গোয়ালন্দ থেকে বেরিয়ে একবার ডি-রেল্ড্ হ'ল, আর একবার ইঞ্জিন বেগড়াল—সব জড়িয়ে বারো ঘণ্টা লেট। আগে ভেবেছিল বাড়িতে পৌঁছেই মালপত্র নামিয়ে ওটা গঙ্গায় দিয়ে আসবে, কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন প্রবীর আর তখন সরাসরি গঙ্গায় যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না। তখন গেলে নানান কৈফিয়তের মধ্যেও পড়তে হ'ত। বীরেশবাবুর স্ত্রী বেশ একটু বাতিক-গ্রস্ত। তাঁর কানে গেলে ওকে তো পোশাক-আশাকসুদ্ধ স্নান করাবেনই, তখনই হয়ত ছুটবেন কোন কালীবাড়িতে প্রবীর আর তাঁর ছেলেমেয়ের কল্যাণ কামনায়। পড়ার জন্যে কিছু হাড় এনে রাখতে হয়েছে প্রবীরকে—তা ইতিমধ্যেই নাকি তিনি বাড়িতে নারায়ণকে এনে তুলসী দিইয়েছেন একবার।

যখনকার কাজ তখনই চুকিয়ে ফেললে ভবিষ্যতে অনেক জটিলতা থেকে

অব্যাহতি পাওয়া যায়। দীর্ঘসূত্রিতা দীর্ঘতর-সূত্রিতার কারণ হয়। সেদিন সদ্য সদ্য ধুলোপায়ে যদি কাজ চুকিয়ে আসত প্রবীর তো সেইখানেই ও পর্বের যবনিকা পড়ে যেত। কিন্তু তা হ'ল না। পরের দিন তো হ'লই না, তার পরের দিনও না। এটা ওটা নানা তুচ্ছ অসুবিধার অজুহাতে হয়ে উঠল না। এদিকে পড়াশুনোর চাপ ছিল, যূথিকাদেরও কিছু কিছু পড়ার ক্ষতি হয়েছে এই ক'দিনে—সেইগুলো সেরে সামনের সপ্তাহে চুপিচুপি একদিন কলেজ যাবার পথে একটু আগে বেরিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবে—মনে মনে স্থির ক'রে রাখল।

এরই মধ্যে কবে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল—তা প্রবীরের মনে নেই।

হঠাৎই মনে হয়েছিল হয়ত—কিম্বা একটু একটু ক'রে রূপ নিয়েছিল চিন্তাটা—সেও তো ডাক্তারির ছাত্র, য়্যানাটমি চর্চা তথা ডিসেকশ্যন তার অবশ্য-করণীয়। একবার কৌটোটা খুলে দেখবে নাকি—অতবড় আর্চ-ক্রিমিনালের মস্তিষ্ক-কোষের গঠন কি ছিল? অবশ্য কোন অসাধারণত্ব চিহ্নিত ক'রে নেবার মতো বিদ্যা আয়ত্ত হতে এখনও বহু বিলম্ব তার—তবু একবার দেখে রাখতে দোষ কি? নানা রকমের আরকে ডুবনো ছিল, এয়ার-টাইট কৌটোয় আছে—চেহারাটা অবিকৃত আছে নিশ্চয়ই। কৌটোটা কেটে একবার দেখে নিয়ে আবার তুলে রাখবে—পচ ধরবার আগেই। পরের দিন খুব ভোরে বেরিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে গঙ্গায়।

শুধুই অলস কৌতূহল। এ তার কোন কাজে আসবে না। এমনি তো ডাক্তারিটাই ভাল ক'রে শিখতে এখনও বহু বিলম্ব, তার ওপর এই ধরণের উচ্চমার্গের গবেষণা ইহজীবনেই হয়ে উঠবে কি না সন্দেহ। সে ইচ্ছাও তার খুব নেই। পাশ ক'রে কিছুদিন কোন হাসপাতালে ট্রেনিং নিয়ে চাকরি করবে—আর যদি পয়সার যোগাড় হয়—কোন মফস্বল শহরে গিয়ে চেম্বার খুলে বসবে—এই তার আশা। দেশ স্বাধীন হ'ল—এখন চারিদিকে বহু সুযোগ সত্য—কিন্তু তারও পয়সার দরকার। গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে থাকলে তার চলবে না।

তবু, কৌতূহলটা অনর্থক জেনেও, দমন করতে পারল না। যে জিনিস এখান থেকে যত্ন ক'রে অপরে আমেরিকা নিয়ে গিয়েছিল—এত বড় অপরাধী-মনের শক্তিকেন্দ্র ঐ মস্তিষ্কটা হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবে—না দেখে?

মনস্থির করতে আরও ক'টা দিন গেল। শেষ পর্যন্ত একদিন রাত্রে মরীয়া হয়ে কেটেই ফেলল কৌটোর ঢাকনিটা। ভেতরে স্বতন্ত্র প্লাস্টিকের খামে সেলাই করা ব্রেনটা—য়্যাসিডে বা কেমিকেল্‌স্‌-এ কঠিন হয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কাছে ধরে খুব ভাল ক'রেই দেখল, এমন কোন বিশেষত্ব কিছুই বুঝতে পারল না। অন্য মস্তিষ্কের সঙ্গে কোন তফাৎ আছে বলে মনে হ'ল না। ওদের অবশ্য এ সব পাঠ সবে শুরু হয়েছে, দুটোর বেশী ব্রেন এতাবৎ হাতে ক'রে দেখার সুযোগ হয় নি—সে স্বল্পবিদ্যাতে কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ার কথাও নয়।

মাঝে থেকে একটা উৎকট দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেল। জিনিসটা কৌটোয় ছিল একরকম, বার ক'রে হাতে নিতে কী রকম একটা ঘেন্নাও করতে লাগল। তাড়াতাড়ি আবার কৌটোয় পুরে, বইয়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে রেখে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে শুয়ে পড়ল।......

শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুম এল না। নানা এলোমেলো চিন্তা। বোধ হয় ঘুম না আসার জন্যই উত্তপ্ত মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে উত্তেজনা, এত কাল পরে স্পষ্ট বোধ করল, কামেরই। যূথিকা সম্বন্ধে ওর যে স্নেহস্নিগ্ধ প্রণয়-কোমল মনোভাবটি এতদিন একটি অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধের মতোই উপভোগ করেছে—সেটা আজ যেন প্রবল লালসায় পরিণত হ'ল। সে আজ স্পষ্টই, নির্লজ্জভাবে যূথিকার সদ্য-কৈশোরোত্তীর্ণ দেহটাকে নগ্নসম্ভোগের বস্তু রূপে কল্পনা করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার অদৃশ্য কামনার রসনা সেই মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লেহন করতে লাগল। সেই দেহটাকে কাছে পাবার জন্য, তাকে পীড়ন করার জন্য, তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য, সম্ভোগ করার জন্য অস্থির উন্মত্ত হয়ে উঠল সে।......

সারারাত বিনিদ্র থেকে ছট্‌ফট করার পর ভোরবেলা আর থাকতে না পেরে যেন ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে। তার সমস্ত মন সমস্ত চিন্তা বাসনার বিষে জর্জরিত, অতৃপ্ত ক্ষুধায় মূর্ছাতুর—কৌটোর মধ্যে দেহাংশের কথা মনেও পড়ল না তার।

হয়ত রাত্রের কলুষিত চিন্তা দিবালোকে আত্মগোপন করে—কিম্বা অনিদ্রার তাপ ভোরের বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। প্রবীরও, খানিকটা এমনি পথে পথে বেড়াবার পর—কিছুটা প্রকৃতস্থ বোধ করল। লজ্জিত হয়ে পড়ল মনে

মনে। এ লজ্জা তার নিজের কাছেই। ছি-ছি, এ কোন্ অধঃপাতে নামল্ সে!

আরও বহুক্ষণ ঘুরে বেরিয়ে রাস্তার কল থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন বীরেশবাবুর স্ত্রী রীতিমতো উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। যূথিকা তো পাংশু-বিবর্ণ মুখে একেবারে দরজার কপাট ধরে সদরেই দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি আসতেই সকলে হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন। ওর সেই অনিদ্রারক্ত চক্ষু ও উদ্‌ভ্রান্ত ঘর্মাক্ত মূর্তি দেখে বীরেশবাবু সোজা-সুজি তখনই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। ওঁরা যে ওকে এত ভালবাসেন—এর আগে পর্যন্ত প্রবীর অত বোঝে নি, সে আরও লজ্জিত হয়ে পড়ল। বলল, 'ও কিছু না, কী রকম কাল মাথাটা গরম হয়ে গেল—কিছুতে ঘুম এল না। সেই জন্যেই এমন দেখাচ্ছে। ক'দিন কোন-রকম ফিজিক্যাল এক্‌সারসাইজ হচ্ছে না বলেই বোধ হয়—। তাই একটু জোরে হেঁটে এলুম খানিকটা।'

শিবেশের মা জোর ক'রে ঘরে এনে বসিয়ে পাখা খুলে দিয়ে চা-জলখাবার আনতে রান্নাঘরে চলে গেলেন। যূথিকা এসে তাড়াতাড়ি নিজেই ওর জামা আর গেঞ্জি ছাড়িয়ে নিল, ঘামে ও জলে ভিজে সপসপ করছিল একেবারে। তার দুই চোখে তখনও উদ্বেগের অশ্রু টলটল করছে, হাত দুটি কাঁপছে থরথর ক'রে। সেদিকে চেয়ে কী যে হ'ল প্রবীরের—আবারও যেন আগুন জ্বলে উঠল মাথায়, কিছু পূর্বের সমস্ত অনুশোচনা ও লজ্জা কোথায় মিলিয়ে গেল—সেই অবস্থাতেই সজোরে সবেগে তাকে বুকে চেপে ধরল।···

প্রথম কয়েক মুহূর্ত প্রবীরের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যূথিকা, তার পরই ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে সময়ে প্রবীরের গায়ে যেন দশটা হাতীর বল এসেছে, সেই কঠিন আলিঙ্গন থেকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে, সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের সতেরো বছরের মেয়ের পক্ষে তা সম্ভব নয়। চেঁচাতেও পারল না, কারণ উন্মত্তের মতো তার দুই ঠোঁটের ওপর নিজের মুখ চেপে ধরেছে প্রবীর—সে চাপে দেখতে দেখতে নিজের দাঁতেই ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে শুরু করেছে—লবণস্বাদে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

প্রবীরের তখন কোন জ্ঞানই ছিল না, কী করছে সে সম্বন্ধেও কোন

স্পষ্ট ধারণা নেই—একেবারে সম্বিৎ ফিরল ঝনঝন ক'রে বীরেশবাবুর স্ত্রীর হাত থেকে যখন চায়ের কাপটা মেঝেয় পড়ে গেল। অতিরিক্ত চমকে ওঠার ফলে দুটো হাতই কেঁপে উঠেছিল তাঁর—খাবারের থালাটা সামলাবার চেষ্টায় চায়ের কাপটা আর সামলাতে পারেন নি।

সেই শব্দে প্রবীরের হাতের বেষ্টনী শিথিল হতেই যূথিকা সবেগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মাও খাবারটা কোনমতে সামনের একটা টুলে নামিয়ে রেখে তার পিছু পিছু চলে গেলেন।

নিদারুণ লজ্জিত হবারই কথা—অপ্রতিভ অবশ্যই হ'ল খানিকটা—কিন্তু আশ্চর্য এই—ভেবে নিজেরও অবাক লাগল—তেমন একটা লজ্জাবোধ করল না। বরং কেমন একটা উগ্র বিরোধীভাবই প্রবল হয়ে উঠল মনে, 'বেশ করেছি। কী হয়েছে কি? আমারই তো জিনিস। দুদিন বাদে তো পূর্ণ অধিকার জন্মাবে। ওঁরাও তো জানেন তা, তবে আবার অত কিসের?'

বীরেশবাবু ওকে দেখেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাজারে চলে গিয়েছিলেন; বাড়িতে কেউ আর ছিল না, শিবেশ বোধহয় ওপরের ছোট ঘরটায় পড়ছে, বীরেশবাবুর স্ত্রী মেয়ের পিছনে পিছনে শোবার ঘরে গেছেন—নিস্তব্ধ থমথম করছে বাড়িটা। একবার মনে হ'ল এই অবসরে সেও বেরিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার সেই উগ্র মনোভাবটা প্রবল হয়ে উঠল। বেশ ধীরে-সুস্থে মুখ-হাত ধুয়ে এসে জলখাবার খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বইখাতা নিয়ে বসল।

বই নিয়ে বসলেও পড়াতে মন বসল না। কিছু পূর্বের ঘটনা তাকে তত লজ্জিত করতে পারে নি, যত উত্তপ্ত করে তুলেছে। বই-খাতা খুলে বসে সে সেই স্মৃতিরই রোমন্থন করতে লাগল।

বীরেশবাবু অবশ্যই বাড়ি ফিরে সমস্ত শুনে থাকবেন। কিন্তু তিনি বা তাঁর স্ত্রী কিছুই বললেন না। এই নীরবতাই যথেষ্ট অস্বস্তিকর বোধ হওয়ার কথা—তাও হ'ল না। বরং প্রবীরের মনে হ'ল, ওঁরাও এটাকে ওর অধিকার সাব্যস্ত ক'রেই চুপ ক'রে গেলেন।

সন্ধ্যার পর আপিস থেকে বাড়ি ফিরে বীরেশবাবু কথাটা পাড়লেন।

কোনও সঙ্কোচ করলেন না, তিরস্কারও করলেন না। বললেন, 'ছাখো বাবা প্রবীর, এটা আমাদের সকলকারই মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এভাবে এত কাছাকাছি থাকলে এরকম হওয়ারই কথা। আগে থাকতেই এটা বোঝা উচিত ছিল। তোমাকে আমি সাধারণ ছেলে থেকে একটু স্বতন্ত্র ভেবেছিলুম বলেই—। সে যাক গে। আমি বলি কি, তুমি ভাল কোন মেস কি হোস্টেল দেখে চলে যাও। তোমার সেখানকার খরচা আপাতত আমিই দেব—মন দিয়ে পড়াশুনো করো। আজই তোমার মামার চিঠি পেয়েছি, উনি বিহারে চলে আসছেন। তোমার খরচা উনি এখন যা দেন তা তো দেবেনই, বাকিটা আমি দেব। তবে সে তো খুব বেশী-একটা লাগবে না। কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, ধার বলেই নিও না হয়। ভালভাবে পাস ক'রে বেরোলে এ টাকা শোধ দিতে বেশী দেরি লাগবে না তোমার।'

লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাকার কথা—কিন্তু আবারও সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া হ'ল প্রবীরের মনে। সে বিষম ক্রুদ্ধই হয়ে উঠল যেন—কতকটা বজ্জাৎ ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে অন্য দিকে চেয়ে বলল, 'তা—এতে এত ফাস্ করারই বা কি আছে।—সেই বিয়েই যখন হবে আমাদের—সেটা এখনই সেরে ফেললে হয়।'

এবার বীরেশবাবুও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠেই বললেন, 'এখনই বিয়ে দিয়ে তোমাকে ঘরজামাই রাখব? ছিঃ! আর একটু আত্ম-সম্মান তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলুম। মেয়ে যার হাতে দেব—তার অন্তত একটা খড়ের ঘরেও মাথা গুঁজে থেকে, আমার মেয়েকে কিছু না হোক শাক-ভাত খাওয়াবার ক্ষমতা আছে, এটুকু দেখে দেব।—এখন বিয়ে দিলে তুমি পাস করার আগেই ছেলেপুলে হয়ে জড়িয়ে পড়বে—সম্ভবত পাসও করতে পারবে না।—তা ছাড়া এটাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে, তোমার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব? এমন কথা তোমাকে কে দিয়েছে? আমি তো দিই-ই নি—আমার মেয়েকেও আমি জানি, সেও দেবে না। তুমি এইভাবে চিন্তা করছ জানলে আমি আগেই সতর্ক হতুম।

'না বাবা, তুমি যত শীগগির হয় বাসা খুঁজে নাও। তোমার মামাকেও আমি লিখে দিয়েছি, আমার বহু আত্মীয়-স্বজন এসে পড়ছেন দেশ থেকে, তোমার অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। জুঁইকে আমি কাল সকালেই

ওর কাকার ওখানে পাঠিয়ে দেব—যতদিন না তুমি অন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারো—সে সেখানেই থাকবে।—'

আবারও আগুন জ্বলল মাথায়। সে তাপে আর ধোঁয়ায় যেন সমস্ত শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাত্রে কিছু খেল না প্রবীর, রাগ ক'রে তখনই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়া অবশ্য বৃথা—গত রাত্রের জাগরণ সত্ত্বেও তন্দ্রা নামল না তার চোখের পাতায় আজও। কিন্তু সবটাই উষ্মা বা ক্ষোভ নয়। এ অনিদ্রার প্রধান কারণ বোধহয় কদর্য কুৎসিত একটা লালসা, সম্ভোগলিপ্সা। ক্রোধ কিছু ছিল অবশ্যই, তবে সেও ঐ পথ ধরেই তার জ্বালা প্রশমনের কথা চিন্তা করতে লাগল। প্রতিশোধের কথা ভাবতে গিয়েও মেয়েটার কথা ছাড়া কিছু ভাবতে পারল না। যেতে যদি হয়—ঐ মেয়ের সর্বনাশ ক'রে দিয়ে সে যাবে—যাতে ঐ মেয়েকে নিয়ে গর্ব করা ওঁদের চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যায়। মনে হতে লাগল যে এই সর্বনাশ তার আগেই করা উচিত ছিল। বিকৃত প্রবৃত্তি মনে মনে হিসাব করতে লাগল কত সুযোগ কী ভাবে সে নষ্ট করেছে। এমন কি শুধু যূথিকাই নয়, শিবেশ সম্বন্ধেও তার মনোভাব দেখে—এব মধ্যেও—সে নিজেই চমকে উঠল একবার।···

সর্বনাশ করবে সে। সকলের সর্বনাশ করবে। এই অপমানের চরম শোধ তুলবে। ওর পয়সা নেই তাই উনি মেয়ে দেবেন না? পয়সা তো চোরে-ডাকাতেও করতে পারে। পাস করলেই পয়সা রোজগার করতে পারবে নইলে পারবে না! পৃথিবীর এত ধনী লোকের পয়সা ছড়ানো আছে কি জন্যে? এই তো বীরেশবাবুই সেদিন জমি বেচে তেরো হাজার টাকা নগদ এনে বাড়িতে রেখেছিলেন দুদিন। ইচ্ছে করলেই তো সে টাকা সে হাতাতে পারত। ঠিকে-ঝির বাসা সে চেনে—তার ঘরে কিছু টাকা রেখে এসে ঝিকে জড়াতে পারলে ওর দিকে কারও সন্দেহমাত্র আসত না—।

অপমান-বোধে ও লালসায় উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নানাভাবে এই প্রতিশোধ চরিতার্থের উপায় চিন্তা করতে লাগল। বেশ হয়, সবকটাকে যদি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে।—কিম্বা এদেরই কিছু টাকা হাতিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যদি সরে পড়তে পারে। যাবে না? আলবৎ যাবে। গায়ের জোরে নিয়ে যাবে ও। মেয়েরা পুরুষের কাছে এই জোরটাই চায়। মেয়েটাকে উনি

সরিয়ে দেবেন ওর ভয়ে—তার আগেই যেমন ক'রে হোক, ও-মেয়ের চরম সর্বনাশ ক'রে দিতে হবে।...

এ ধরণের একটা চিন্তা অন্যকে ডেকে আনে। ছটফট করতে করতে একসময় পাগলের মতো উঠে দাঁড়াল সে। যদি যেতেই হয়—এ বাড়ি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাবে সে, এ বাড়ির মানুষগুলোকেও। এ অপমানের উপযুক্ত শোধ যদি তুলতে না পারে তো সে পুরুষ-বাচ্চাই নয়।

প্রবীরের মনে পড়ল—উনুন ধরানোর জন্যে মাসে মাসে একেবারে পাঁচ বোতল ক'রে কেরোসিন তেল কেনেন বীরেশবাবু। সেটা পরশুই কেনা হয়েছে। এ ছাড়া গরম কাপড় ধোওয়ার জন্য দু গ্যালন পেট্রোলও কোথা থেকে এনে রেখেছেন।

ঠিক হয়েছে।

নিঃশব্দে উঠে পড়ল সে। নিঃশব্দেই টর্চ জ্বেলে প্রেতের মতো নিচে গিয়ে তেলের টিন সংগ্রহ করল। দালানের আলনায় শুকনো কাপড় থাকে—সেগুলো টেনে নিয়ে এল, তারপর ওঁদের দুটো জোড়া শোবার ঘরের তিনটে দরজায়—একটা ওর ঘরের ভেতর দিয়ে—সব কটা কপাটই ভাল ক'রে কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে দিয়ে, তার নিচে নিচে কতকগুলো কাপড় জড়ো ক'রে তাও তেলে ভিজিয়ে দিল। যেন কোন দানব ভর করেছে তার ওপর—এমনি ভাবেই পর পর এই পৈশাচিক বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য শুধু নয়—উন্মত্তের মতোই তার অবস্থা তখন। পাগলে যখন কোন বদমাইশী করে তখন যেমন একটা অবচেতন ধূর্ততা তাকে পেয়ে বসে—সেই ভাবেই প্রবীর একটার পর একটা ধাপে ধাপে এই সাংঘাতিক প্রতিহিংসার আয়োজন ক'রে যেতে লাগল। কেরোসিনের-পর্ব শেষ হলে সে ঐ দরজা-গুলোর কাছে-রাখা কাপড় থেকে পেট্রোল ঢালতে ঢালতে দ্রুতগতিতে সদর দরজা পর্যন্ত এসে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দিয়ে একলাফে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারপর খালিপায়েই একদিকের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল দিশাহারা হয়ে।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। আগুনের শব্দে ও মুমূর্ষুদের আর্তনাদে পাড়াসুদ্ধ লোক ভেঙ্গে এসেছিল, দমকলও এসে পড়েছিল পনেরো-

বিশ মিনিটের মধ্যে—তবু না বাড়ি আর না বাড়ির অধিবাসীরা—কিছুই বা কাউকেই বাঁচাতে পারা যায় নি। একসঙ্গে বেড়া-আগুনের মতো বাড়িটা জ্বলে উঠেছিল, তার মধ্যে থেকে কাউকে বার করা যায় নি—আগুন নিভতে নিভতে ওদিকে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কেন আগুন লাগল তা কেউ জানতে পারে নি।

রাস্তায় পড়েই প্রথমটা জ্ঞানশূন্য হয়ে শুধুই দৌড়েছিল প্রবীর—কোন্ দিকে বা কেন যাচ্ছে তা ভেবে দেখে নি। অনেকটা ছোটবার পর শারীরিক শ্রান্তিতে যখন থামতে হ'ল, তখন নিজের কৃতকর্মের পূর্ণ চেহারাটা মনের মধ্যে রূপ নিচ্ছে একটু-একটু ক'রে। আরও খানিক পরে অবশ পা দুটোকেই টেনে নিয়ে আবার ছুটল সে। তীব্র অনুতাপ, লজ্জা আর আত্মধিক্কারে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ তার—পথ দেখতে না পেয়ে বারে বারে আছড়ে পড়ছে, আবার উঠে ছুটছে। তখনও আগুন জ্বলছে—সে সোজা সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে গেছে—দমকল আর পাড়ার লোকেরা ধরে ফিরিয়ে এনেছে। 'না আমাকে যেতে দিন, আপনারা জানেন না এর জন্য আমিই দায়ী' বলেছে আর বার বার চেষ্টা করেছে অন্তত নিজের কাপড়-জামায় আগুন লাগাতে।

সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, সেই অত রাত্রেও একটা নৌকোয় দুজন মাঝি জেগে বসে তামাক খাচ্ছিল, ভাঁটার টানে মানুষের মতো কী একটা ভেসে যেতে দেখে লাফিয়ে পড়ে টেনে তুলেছে। জ্ঞান হয়ে সোজা গেছে সে থানায়—বলেছে, 'ঐ বাড়িতে আমিই আগুন ধরিয়েছি, এতগুলো মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী, আমাকে ফাঁসি দিন।' পুলিশ বিশ্বাস করে নি সেকথা। প্রবীর জেদ করেছে, তখন ও. সি. পাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, সবাই জানিয়েছে, প্রবীর খুব ভাল ছেলে, হীরের টুকরো, এঁরাও যেমন ওকে ছেলের মতো ভালবাসতেন প্রবীরও তেমনি এঁদের বাপ-মায়ের মতো দেখত। তবু দারোগা খোঁজ করেছেন কোন প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ছিল কিনা—সবাই একবাক্যে বলেছে যে ছিল না—থাকলে তাঁরা অবশ্যই কিছু শুনতেন।

অতিরিক্ত দুঃখে ও শক'-এ সাময়িকভাবে মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝে পুলিশ খোঁজ করে ওর বাবাকে আনিয়ে তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি

এসে ওকে কৃষ্ণনগরের নতুন বাসায় নিয়ে গেছেন। তাঁকেও সব কথা খুলে বলতে গেছে প্রবীর, তিনি কবিরাজ ডেকে ঠাণ্ডা তেলের ব্যবস্থা করেছেন।

অগত্যা একদিন তাকে পালাতে হয়েছে। তার বিশ্বাস—মরে সে অব্যাহতি পায়, ঈশ্বরের সে অভিপ্রায় নেই। সেও প্রতিজ্ঞা করেছে, কারা-দণ্ডের আসামীর মতোই দিনরাত সে কঠোর পরিশ্রম করবে। শুধু জীবন ধারণের মতো যেটুকু লাগে তার বেশী পারিশ্রমিক নেবে না—শ্রম না ক'রে কোন ভিক্ষা নেবে না। সেই ভাবেই আজও চলছে।

সাধুর কাহিনী শেষ হ'তে তিনটি প্রশ্ন করেছিলুম তাঁকে—'তা তার পরেও তো আত্মহত্যা করতে পারতেন, সে চেষ্টা করেন নি কেন?'

'ঐ তো বললুম, পরে ভেবে দেখেছি তাতে প্রায়শ্চিত্ত হ'ত না। ওটা পলায়নী মনোভাব। বেঁচে থেকে নিত্য অনুশোচনায় জর্জরিত হবো, আর জেলের কয়েদীর মতো খেটে খাব—যতটুকু সাধ্য—এইই আমার উপযুক্ত শাস্তি। সেইজন্যে কয়েদীরা বাইরে কোথাও কাজ করছে দেখলে আগে সেখানে ছুটে যাই—তবু মনে হয় আমিও জেল খাটছি।'

'এ সাধুর বেশ কেন?'

'স্রেফ আত্মরক্ষার জন্যে। নইলে আত্মীয়-স্বজনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতুম না। তাঁরা বার বার আমাকে খুঁজে বার ক'রে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। এখন এই জটা আর গেরুয়া দেখে সসম্ভ্রমে ফিরে যান।—অবিশ্যি লোকালয়ে থাকলে এতেও জ্বালা হয়—প্রণামী আর পূজো দিতে আসে লোকে—এই দূর পাহাড়ে-গ্রামে এসে কোনমতে রেহাই পেয়েছি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবারও প্রশ্ন করেছি, 'আপনি কি মনে করেন ঐ জীবনময়ের ব্রেনটার সঙ্গে আপনার এই দুর্বুদ্ধির সম্পর্ক আছে?'

'তা নইলে আর তো কোন কারণ খুঁজে পাই না। আজও ভাবি মধ্যে মধ্যে।—ঐ পাশবিকতা—পাশবিকতা কেন পৈশাচিকতা—বাড়িতে ঢুকলেই যেন পেয়ে বসত, রাস্তায় বেরোলেই প্রকৃতিস্থ হতুম।—যাক্ গে, ও প্রসঙ্গ থাক। এখন আপনি কবে ফিরছেন বলুন। আর ক'টা দিন থেকে যান না?'

জালিয়াৎ

ট্যুরিষ্ট বাংলো (বা লজ, যা-ই বলুন) আর ধর্মশালার মধ্যে অন্ততঃ অকারণ কোলাহলের দিক দিয়ে এমন কোন তফাৎ নেই। আমার তো মনে হয় ট্যুরিষ্ট বাংলোতে সে ব্যাপারটা আরও বেশী। বিশেষ যদি 'সীজ্‌ন্' নামক অবাঞ্ছিত সময়ে গিয়ে পড়া যায়। ঘরে ঘরে একাধিক মেয়েছেলে এবং একপাল ক'রে ছেলেমেয়ে—মুনিয়া পাখীর খাঁচাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাতদিনই কিচকিচ করছে। ধর্মশালাতে তবু যে যার ঘরেই থাকে বেশির ভাগ—এখানে একটি লাউঞ্জ নামক পদার্থ আছে, সোনায় সোহাগা। কিচকিচিনিটা ঘরে বাইরে সমান।

বাধ্য হয়েই—কোলাহলে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। উপায়ও তো নেই। বারো দিনের জন্যে বুক করেছি—সেইভাবেই ফেরার টিকিট কাটা। পালিয়ে অন্য কোথাও যাবো, সে পথও খোলা নেই। এখানে যে ইংরেজী মেজাজের একমাত্র হোটেল আছে—একটা নিরিবিলি থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারত সেখানে গেলে—খোঁজ নিয়ে জেনেছি আগামী পনের দিনের মধ্যে সেখানে কোন স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার অনেক আগেই আমার এখানকার পরমায়ু শেষ হয়ে যাবে।

অবশ্য তিন-চার দিনের মধ্যেই এই 'বেড্‌লাম'টা সয়ে গেল। এখন আর ঘুমের ব্যাঘাতও হয় না, এমন কি বারান্দা পরিহার ক'রে ঘরে বসলে বইও পড়তে পারি এক-আধ সময়। সবটাকে একটা অস্পষ্ট শব্দ-সমন্বয়—শব্দ-নীহারিকা বলা চলে কিনা জানি না—বলে ধরে নিলে আর কোন অসুবিধা হয় না। পরিচিত কণ্ঠ থাকলেই মুশকিল, কানে গিয়েই ক্ষান্ত থাকে না সে, মরমে বা স্মৃতিতে গিয়ে পৌঁছয়, সেই সঙ্গে সেই লোকটির পরিচয়ের সমস্ত বাতাবরণ নিয়ে আসে— মনটা মুহূর্তে সেইখানে চলে যায়। এখানে সে আশঙ্কাটা নেই—কথাগুলো শব্দ মাত্র—কোন অর্থবহ নয়।

তবে আজকের কোলাহলটা কিছু স্বতন্ত্র। খুবই উত্তেজনা দেখলুম আমাদের এই দোতলার বারান্দায়। তার মধ্যে কতকগুলো শব্দ একেবারেই

অভিনব, সেই সঙ্গে উদ্বেগজনকও। অন্য দিনের অন্য সময়ের মতো অলস অবসরের মূল্যহীন বাক্যসমষ্টি নয়।

'ইস! এ যে রক্তে ভেসে গেছে! আগে ডেটল দিন। নেই? চুন আছে নাকি কারও কাছে? তাই দিন না—'

'আরে, আগে দেখুন স্টিচ্‌-টিচ্‌ করতে হবে কি না। চুন দিলে তো বিপদ—'

'আহা-হা, আপনারা ডাক্তারি করছেন কেন? দিস ইজ এ সিরীয়াস কেস। হোয়াই ডু ইউ টেক দিস কেস ইন ইয়োর ওন হ্যাণ্ড। ডাক্তার নেই কাছে কোথাও?'

'থাকা তো উচিত? ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করুন না।'

'এমন ক'রে মারে মানুষ। কে সে? চাঁড়াল না বনমানুষ?'

'স্কাউণ্ড্রেল। সাধু না ছাই। উচিত পুলিশে দেওয়া। একটা ডায়েরী করিয়ে দিন মশাই। এই অবস্থাতেই চলে যান। কেস স্ট্রং হবে।'

অন্যরকম সুরও শোনা গেল।

'যান কেন আপনারা? সাধু শুনলেই ছুটতে হবে কাছা আঁটতে আঁটতে! বেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে আপনাদের।'

'আর সত্যিই তো', আর একজন এই বক্তাকে সমর্থন জানালেন, 'আপনারা সেখানে গেছেন ট্রেসপাস্‌ করতে—সে তো আসে নি। সে যদি নিভৃতে সাধনভজন করতে চায়, আপনারা কেন যাবেন সেখানে ডিস্টার্ব করতে?'

'তা হোক না মশাই, তাই বলে মানুষ খুন করবে। এ কী মগের মুলুক নাকি! আশ্রম! কিসের আশ্রম? আমাদের পাঁচজনের টাকাতেই তো চলে—সেখানে আবার ট্রেস্‌পাস্‌ কি? চলুন দিকি দল বেঁধে যাই—উচিত শিক্ষা দিয়ে আসি ভণ্ড মাতাল বেটাকে।'

'আপনারা কে তাকে টাকা দিয়েছেন? উপস্থিত একজনও দিয়েছেন কি? উল্‌টে শুনেছি বরং কেউ প্রণামী দিতে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে।'

'আরে রাখুন মশাই—তবে চলে কিসে?' পূর্ববর্তী বক্তা কি বলতে গেলেন কিন্তু বলা হ'ল না। তার মধ্যেই কেয়ার-টেকার ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল, 'উহু, উহু, ওসব কাজ করতে যাবেন না স্যার। এখানের পুলিশ সার্কেলে ওনার খুব খাতির, সবাই ভয় করে, সমীহ করে।...এর আগেও জনাকতক গেছেন, সাধু ত্রিশূল দিয়ে একজনের মাথা ফাটিয়ে

দিয়েছিল। আর একজনের কাঁধে বিঁধিয়ে দিয়েছিল—এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে। পুলিশকে জানাতে তারা বললে, "আপনারা উইদাউট পারমিশন একজনের প্রাইভেট প্রেমিসেসে ঢুকেছেন—যদি আমাদের সুবিচার করতে হয় তাহলে তো আগে ট্রেসপাসের চার্জে আপনাদের য়্যারেস্ট করব। তার পর সাধু যদি বলেন, আপনারা ডাকাতি করার মতলবে তাঁর বাড়ি চড়াও হয়েছিলেন—আপনারা অন্য রকম প্রমাণ করতে পারবেন? সিরীয়াস গোলমালে পড়ে যাবেন বলে দিলুম"।...এই সব শুনে সে ভদ্রলোকরা পালাতে পথ পান না। বুঝে দেখুন ব্যাপারটা!...ঐজন্যেই তো কেউ ওঁকে ঘাঁটাতে সাহস করে না।'

এর পর কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে উঠবে বৈকি!

উঠে বাইরে এলাম। দেখি আমাদের বারান্দার প্রান্তে ষোল নম্বর ঘরে হাসানজী এন্টারপ্রাইজের যে পাঁচ-ছটি ভদ্রলোক এসেছেন—তাঁরাই যৎপরোনাস্তি শুকনো মুখে বসে আছেন—ওঁদের মধ্যে মোটা-মতো যে ভদ্রলোকটি, তুলসীবাবু—তাঁর কপাল এতখানি কেটে গেছে, তা থেকে বেশ খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। জামায় অবধি পড়েছে খানিকটা—ওঁদেরই ঘিরে এই জটলা এবং পরস্পরবিরোধী মন্তব্য নিক্ষেপ চলছে।

ঘটনাটাও জানতে বেশী দেরি হ'ল না। এখান থেকে ঐ যে একটা লাল রঙের বাড়ি দেখা যায়, বেশ গাছপালা বাগানে ঘেরা, মধ্যে একটু মন্দিরের মতোও আছে—তার কাছে বাঁশের মাথায় রক্তবর্ণ নিশান উড়ছে—ঐখানে কে এক তান্ত্রিক সাধু থাকেন।

সাধুর খুব নাম—অবশ্য নাকি সুনামের থেকে দুর্নামই বেশি। দিনরাত নাকি মদ খান, চক্ষু দুটি মদে ও গাঁজায় সর্বদা জবাফুল হয়ে থাকে—। অত্যন্ত কটুভাষী, অভদ্র। কেউ দেখা করতে গেলে মারধোর করেন—আবার কারও ওপর অকারণেই প্রসন্ন হয়ে অনেক ভাল ভাল কথাও বলেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দেন, ছাপা বইয়ের মতো।

সাধুটির স্ত্রীঘটিত দোষও নাকি বিস্তর। প্রায়ই নতুন নতুন ভৈরবী দেখা যায় ওখানে। সেদিক দিয়ে কপালও খুব—বয়স এখন পঁয়ষট্টি-ছেষট্টির কম নয়—কেউ কেউ বলে আরও বেশী,—কিন্তু সম্প্রতি যে ভৈরবীর অধিষ্ঠান হয়েছে—পরমাসুন্দরী মেয়ে, কুড়ি-একুশ হবে বড় জোর। কোন ধনীগৃহের মেয়ে বা বৌ—একরাশ হীরের গহনা আর গিনি নিয়ে নাকি এসে উঠেছে ওঁর

কাছে। তাঁর সঙ্গেই এক-আধবার যা সাধু বাইরে বেরোন—রিক্শা বা ট্যাক্সি ক'রে—তরুণী ভৈরবীটি ওঁর জন্যে দুহাতে টাকা খরচ করে।

শুধু কি তাই? কোন্ নাকি বিখ্যাত পাণ্ডার ছেলে—প্রিয়দর্শন, লেখাপড়ায় ভাল ছেলে ছিল—কলেজ-টলেজ ছেড়ে ওঁর কাছে এসে পড়ে আছে; চাকরের মতো সব করে। এমনি আর একটি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের ছেলেও থাকে, সে রান্না করে, পূজো করে—সাধুর পা টেপে—আবার সময়ে অসময়ে লাথিও খায়। এক এক সময় পান থেকে চুন খসলেই বেধড়ক মার দেন। এতদিন তো নাকি ঐ পাণ্ডার ছেলেটার বুকে বসে জোর ক'রে মদ খাওয়াতে গিয়েছিলেন—ছেলেটা মরবার দাখিল—ছ' ঘণ্টা জ্ঞান ছিল না।···সব সহ্য ক'রেও পড়ে থাকে তারা। দুজনেরই নাকি বাড়ির অবস্থা ভাল—বাপ-মারা এসে কত কান্নাকাটি করে, ছেলেদের হাতে-পায়ে ধরে, কিন্তু তারা কেউ বাড়ি যায় না। কিসের লোভে পড়ে থাকে তা কেউ জানে না। ইত্যাদি—

আজকের ঘটনার বিবরণও শোনা গেল।

এই ভদ্রলোকদের একটু সাধুখোঁজা বাতিক আছে। সেই জন্যেই এঁরা যখন ছুটি নেন বা পান—কয়বন্ধু একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। তীর্থেই যান বেশির ভাগ—তীর্থ-দেবতারা সে ভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য নন তা বলাই বাহুল্য। এখানে এসেও সাধুর খোঁজ করেছিলেন। কয়েকজনের মুখে এই তান্ত্রিক সাধুটির বিবরণ শুনে লাফিয়ে উঠেছেন। শিষ্য করতে চান না, টাকা বা প্রচার চান না, উল্টে ভক্তদের পরিহার ক'রে চলতে চান—এ যদি যথার্থ খাঁটি সাধু না হয় তো সাধু কে? এই লোককেই তো খুঁজছেন তাঁরা এতকাল।

বারণ করেছিল অনেকেই। বদমেজাজী মাতাল—কী দরকার ঘাঁটাতে যাওয়ার? এঁরা কারও কোন কথা শোনেন নি, আজ সকালে স্নান ক'রে ফুল মিষ্টি ধূপ ইত্যাদি কিনে গেছেন সাধুকে দর্শন করতে। ভেবেছিলেন যখন ভেতরে একটা মন্দির বা ঠাকুরঘর আছে তখন দেবতার নাম ক'রে পূজার উপকরণ নিয়ে গেলে কিছু প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। আর সকালে মদের প্রভাবটাও নিশ্চয় কম থাকবে।

কিন্তু কে জানে কেন, সাধু ওঁদের দেখামাত্র যেন জ্বলে উঠেছেন। 'নিকালো' 'আভি নিকাল যাও, 'কুত্তীকি বাচ্চা' 'গাধীকে বাচ্চা' ইত্যাদি বলে

তেড়ে এসে ফুল মিষ্টি সব ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছেন—পা থেকে খড়ম খুলে প্রথম দিকে ক'জনকে এলোপাথাড়ি পিটেছেন, তাতেও এঁরা পালান নি, তুলসীবাবু হেঁট হয়ে পায়ে ধরতে গিয়েছিলেন, তখন একটা ভারী লোহার চিমটে তুলে বসিয়ে দিয়েছেন তুলসীবাবুর মাথায়। তখন আর পালিয়ে আসা ছাড়া পথ থাকে নি, বেরিয়ে এখানে চলে এসেছেন পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

পাঁচজনে পাঁচ রকম পরামর্শ দিলে, আগেই তো দিয়েছিল ঢের—কিন্তু তুলসীবাবুরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের বুদ্ধিই গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপেই গেলেন।...'সিয়ান ঠকলে বাপকে বলে না'—এই প্রাজ্ঞ রীতির অনুসরণ ক'রে নিজেদের লজ্জা ঢেকে পরের দিনই কলকাতা ফিরে গেলেন রিজার্ভেশনের অপেক্ষা না ক'রেই। তাঁরা যে শুধু ট্যুরিস্ট লজ নয়—আশপাশের সমস্ত বাঙালীরই দর্শনীয় এবং কৌতুক-লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন, এইটে বুঝেই এত ব্যস্ততা তাঁদের।

তাঁরা তো চলে গেলেন—কিন্তু আমি কথাটা ভুলতে পারলুম না কিছুতেই। বড়ই দুর্বোধ্য মনে হতে লাগল সবটা। খামোকা ভক্ত দর্শনার্থীদের সঙ্গে এত দুর্ব্যবহার করার অর্থ কি? এ কী একটা প্রচার-কৌশল? 'পাব্লিসিটি স্টাণ্ট' যাকে বলে? না কি এর গভীর কোন অর্থ আছে? সত্যি সত্যিই জনসমাজ থেকে গা-ঢাকা দিতে চায় না কি? কোন ক্রিমিনাল নয় তো? না হলে শিষ্য বাদ দিয়ে চলেই বা কিসে? আজ না হয় পয়সাওলা তরুণী ভৈরবী জুটেছে—এতকাল চলত কিসে? বাড়ি-ঘর-মন্দির, নিত্যসেবা পূজা, সবই তো চলছে। মদেরও তো দাম কম নয়। আর সে মেয়েটাই বা কত পয়সা আনতে পেরেছে? এটা সবই একটা বড় রকমের আবরণ নয় তো? কী করে লোকটা ঠিক—রিসিভার অফ স্টোলেন প্রপার্টিজ—চোরাই মালের মহাজন—না স্পাই? না কি সত্যিই সাধু? পুলিশ এত খাতির করে কেন? চোরা লাভের ভাগ পায়—না সত্যিই ভক্তি করে?

যতই ভাবি ততই উত্তেজিত হয়ে উঠি।

শেষে আর থাকতে না পেরে একদিন বিকেলের দিকে চলে গেলুম ওঁর আশ্রমের দিকে। উঁচু পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়ি, বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। মন্দিরের চুড়ো আর লাল নিশানটা—তাও একটু দূরে গেলে

তবে চোখে পড়ে, পাঁচিলটা এতই উঁচু। সন্দেহ আরও বাড়ল, এভাবে সরকারী জেলখানার মতো পাঁচিল তুলে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার উদ্দেশ্য কি? সাধুর আশ্রমে এমন কি অবাঞ্ছিত কার্য-কলাপ হ'তে পারে—যা লোকে দেখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? মদ আর স্ত্রীলোক-ঘটিত বদভ্যাসের কথা তো সবাই জেনে গেছে—নিশ্চয় তাহলে আরও কোন গোপন কুকার্য চলে এখানে, যা কেউ দেখলে বা জানলে বিপদ বাধবে?...

সারা বিকেলটা, সন্ধ্যা পর্যন্ত আশ্রমের চারিদিকে ঘুরলুম, না সে সাধু, না তার রূপসী ভৈরবী আর না সেই আশ্রম-বালক দুটি—কেউ একবারও বাইরে বেরুল না বা দরজা খুলল না। কে কেমন দেখতে একবার দূর থেকেও দেখা গেল না। গিয়ে দোর ঠেলে দেখা করতে চাইব—সে সাহস নেই। দেখে শেখাই বুদ্ধিমানের কাজ, ঠেকে শেখে বেকুফরা। তুলসীবাবুদের দেখেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।

তবে এটা ঠিক—বাজার-হাট যখন করতে হয়, শুনেছি মধ্যে মধ্যে দর্শনেও যান সাধুজী, এমনিও ভৈরবীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন মধ্যে মধ্যে—তখন, একবার না একবার দেখা হবেই।

গেলুম ভোরবেলাই আবার। খুব ভোরেই উঠেছিলুম—ওঁর আশ্রমের কাছে যখন পৌঁচেছি তখনও পাঁচটা বাজতে বেশ কিছু দেরি। দূর থেকেই দেখলুম আমার অধ্যবসায় সফল হয়েছে—অল্প-স্বল্প, দূর থেকে এক-আধ চাউনি দেখার প্রয়োজন নেই, সাধু মশাই সামনেই বসে আছেন। আশ্রমের সামনে উঁচু-মতো বালির ঢিবিটায় বসে নিষ্পলক একদৃষ্টে নবোদ্ভাসিত পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে আছেন। দৃষ্টি স্থির, সেই সঙ্গে সমস্ত দেহটাও—মনে হচ্ছে প্রাণহীন কোন পাথরের মূর্তি! লোকটি কি যোগেই আছেন? একেই কি তবে যোগাসন বলে? তাহলে! এটা তো ঠিক ভেল্কিবাজী বা বিজ্ঞাপন বলে মনে হচ্ছে না। এত ভোরে উনি নিশ্চয়ই এখানে কোন ভক্ত দর্শনার্থী আশা করেন নি যে, তার কাছে বিজ্ঞাপন করতে এইভাবে বসে থাকবেন? এদিকের কোন হোটেল-বাড়িতে কি ট্যুরিস্ট বাংলোয় এত ভোরে কেউ ওঠে না।...এক যদি আমাকেই আশা ক'রে থাকেন—কিন্তু তাহ'লে তো আরও বুঝতে হবে কোন শক্তিমান বড় তপস্বী।...

অতি সন্তর্পণে, কোন শব্দ না হয় এইভাবে পা ফেলে কাছে এগিয়ে

গেলুম। পাশ থেকে মুখটা ঠিক দেখা যাচ্ছিল না—তাই ঘুরে একটু কোণাকুনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম—যাতে ভাল ক'রে মানুষটা দেখা যায়—এবং দেখে চমকে উঠলুম!

এ মুখ যে আমার চেনা, খুবই চেনা।

সাত-আট বছর খুব কম সময় না হলেও, এমন কিছু বেশী সময় নয় যে, এতটা ভুল হবে। সেই মুখ, সেই দাড়ি, সেই কপালে সিঁদুরের টানা দাগ, তার মধ্যে একটি শ্বেতচন্দন কি মাটির টিপ (এটা কেন—অনেকবার প্রশ্ন ক'রেও জানতে পারি নি)। শুধু পরিবর্ত্তনের মধ্যে আগে মাথার চুলগুলো এমনিই বড় বড় ঝাঁকড়া গোছের ছিল, এখন পিছনের দিকে দু'তিনটে ছোট ছোট জটা হয়েছে। দাড়িটাও একটু বেশী লম্বা বোধ হচ্ছে; আগেও কাঁচাপাকা ছিল—এখন কাঁচার চেয়ে পাকার ভাগ কিছু বেড়েছে—এই মাত্র।

স্বামী তারানন্দ।

ছোটনাগপুরের এক বিখ্যাত শহরে উনি থাকতেন (শহরের নামটা না-ই বা বললুম, বিশেষ তারানন্দও নাম নয়—কারণ আট-ন' বছরের কথা হ'লেও খবরটা সকলেই কাগজে পড়েছেন, মনে আছে নিশ্চয়), সেখানে আগে আমাকে প্রায়ই যেতে হ'ত। সেইখানেই ওঁকে প্রথম দেখি। নদীর ধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ওঁর আশ্রম ছিল, সাঁওতালী ধরনের চওড়া দেওয়ালের বড় মেটে ঘর—অসংখ্য গাছপালা—গোরু ছাগল দুটো, অনেকটা সেকালের তপোবনের মতো মনে হ'ত।

তখন ওঁর ভক্তসংখ্যা অনেক। স্থানীয় বাঙ্গালী, বিহারী, অনেকেই নিয়মিত যেতেন। অতি মিষ্টভাষী অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যে-কেউ ডাকত তার বাড়িতে চলে যেতেন, তাতে কোন বাছবিচারও ছিল না। কখনও দেখেছি ওখানেও বড় কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের ঢাউস বিলিতী গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন, আবার সাইকেল রিকশায় কোন নিম্নবিত্ত ভক্তের সঙ্গে বসে তার বাড়িতে চলেছেন। কারও অসুখবিসুখ হয়েছে শুনলে হেঁটেও চলে যেতেন তাকে দেখতে, সেজন্য দু'তিন মাইল হেঁটে যাওয়াও তাঁর কাছে আয়াসসাধ্য বা অপমানকর মনে হ'ত না। তবে শহরের মধ্যে দিয়ে বড় একটা কেউ হেঁটে যেতে দিত না। দেখতে পেলেই রিকশাওয়ালারা ছুটে এসে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিত এবং ভাড়া দিতে চাইলে জিভ্ কেটে হাতজোড় করত।

তার একটা কারণ অবশ্য—যা শুনেছি—অনেক রকম ওষুধ-বিষুধ জানতেন তিনি। যাদের ডাক্তার ডাকার ক্ষমতা নেই, তারা সকলেই অসুখবিসুখে ওঁর কাছে ছুটে যেত। অনেক সময় ধনী লোকেরাও যেতেন—চিকিৎসার খ্যাতি শুনে।

আমিও ক্রমশঃ ওঁর ভক্তসংখ্যার মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছিলুম। বেশ লাগত মানুষটিকে। একটু পাগলা-মতো ছিলেন তখনও—কিন্তু অতি সদাশয় পাগল। নেশাটেশা করতে কখনও দেখি নি। প্রতি অমাবস্যায় সন্ধ্যা থেকে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পূজো করতেন—তখন ভেতরে কি করতেন, মদ-ফদ খেতেন কিনা জানি না। তবে সারাদিন উপবাসী থেকে নিজে হাতে পূজোর যোগাড় করতেন, ভোগ পর্যন্ত নিজে রাঁধতেন—তাতে পূজোটা সাত্বিক ভাবেই হ'ত মনে হয়। পরের দিন ভোরে প্রসাদ পেতে গেছি কয়েকবার—তখনও কই, মত্ত অবস্থায় কোনদিন দেখি নি।

তার পর কী যে হ'ল—একটা যেন বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। অকস্মাৎ দেখা গেল পুলিশ এসে ওঁর আশ্রম ঘিরেছে—পরে শোনা গেল যে বিস্তর জাল নোট পাওয়া গেছে আশ্রমে। তার দাম যা লেখা আছে—লাখখানেক টাকা প্রায়। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেছে।

তারপর কী হ'ল তা জানি না। তখনও ওঁর এক ভৈরবী ছিলেন, তিনি এই ঘটনার কয়েকদিন পর আশ্রম ও তার সমস্ত সাজপাট গোরুবাছুর ইত্যাদির ভার এক আদিবাসী পরিবারের হাতে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

প্রথমটা বিশ্বাস হয় নি। মনে হয়েছিল কোথাও একটা বিরাট ভুল হচ্ছে। তারপর যখন দেখলুম পুলিশ ওঁকে হাজতেই রেখে দিল—মামলা চালাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন একটু দ্বিধায় পড়লুম। তবে কি এ সত্যি? না হ'লে উনি ছাড়া পেলেন না কেন? আর সাধুর আশ্রমেই বা অত জাল নোট এল কোথা থেকে? ভৈরবীই বা ওঁকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চাটিবাটি তুলে সরে পড়বে কেন?

খুবই একটা রূঢ় আঘাত পেলুম মনে মনে। কষ্টও হ'ল খুব। সেই সঙ্গে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর থেকে আস্থাও চলে গেল অনেকখানি।

মানুষ আমরা কিছুই চিনি না, কার ভেতর কি আছে তা এক ভগবানই জানেন বোধ হয়।...

এর পরে আর কোন খবর পাই নি। ওখানে যাওয়াও ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেল। ওখানে যে ঠিকার কাজে ঘন ঘন যেতে হ'ত—সে কাজ শেষ হয়ে গেল—কর্মক্ষেত্র সরে এসে গেল উড়িষ্যায়। কাজকর্মের ঝামেলাও বেড়ে গেছে আজকাল, অনেক বাধা অনেক ঝঞ্ঝাট—ব্যবসায়ীর জীবনে বিড়ম্বনার অন্ত নেই। ফলে ক্রমশঃ ভুলেও গেলুম সেই সাধুজী আর তার পরিণামের কথা।

তারপর এই দেখা।

সেই সদানন্দময়, পরোপকারী অমায়িক সাধু এখানে এসে দুর্দান্ত মদ্যপ ও বদমেজাজী তান্ত্রিকে পরিণত হয়েছেন? বোধহয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই ভাবেই গা-ঢাকা দিয়েছেন—সবটা জড়িয়েই ছদ্মবেশ একটা।

মজা মন্দ নয়। এই সব ভণ্ডদেরই দেখি যত ভক্ত শিষ্য জোটে, এদের টাকারও অভাব হয় না।

কিন্তু—। একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছেই।

জেল থেকে ছাড়া পেল কখন?

কালই তো টুরিস্ট লজের ম্যানেজার বলছিলেন সাধুটি এখানে এসেছেন—ন'-দশ বছর হয়ে গেল।

দশ বছর ভুল—হিসেব করে দেখলুম যে ঠিক ন' বছর হয়ে গেল—ওঁর সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা হয়—অর্থাৎ যেদিন পুলিশে ধরে ওঁকে।

তবে কি শেষ পর্যন্ত উনি ছাড়াই পেয়েছিলেন? মকদ্দমা চালাতে পারে নি পুলিশ?

তাহলেও তো সগৌরবে সেখানে ফিরে যাবার কথা। এখানে এলেন কেন?

স্মৃতি ও চিন্তার বিবরণ কাগজে লিখতে অনেক সময় লাগে। মনের মধ্যে খেলে যায় এক মুহূর্তে। গিয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের আঘাতটা ভাল ক'রে সামলে নেবার আগেই উনি চোখ চাইলেন।

বলাটা হয়ত ভুলই হ'ল একটু—চোখ দিয়ে তো চেয়েই ছিলেন, সে চোখে দৃষ্টি ফিরে এল।

আমার দিকে ফিরে সস্নেহ সহজ ভাবেই বললেন, 'আয়। আমি জানি

তুই গত শুক্রবার এসেছিস—না না, যোগবল নয়। তুই স্টেশন থেকে যখন আসছিলি তখনই দেখেছি। ভাবছিলুম মাতাল গেঁজেল বজ্জাত সাধুটাকে একবার হয়ত দেখতে আসবি আপনিই—না হ'লে ডেকেই পাঠাব একদিন। আগেই খবর দিতুম—কিন্তু আমি কাউকে ডাকতে পাঠিয়েছি দেখা করব বলে—এ শুনলে শহরে এমন শোরগোল পড়ে যেত যে তোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হ'ত। চল, ভেতরে যাই। ……না কি জালিয়াৎ সাধুর আশ্রমে ঢুকতে ঘেন্না করবে?'

এই বলে হাসলেন একটু। সেই অভ্যস্ত মিষ্টি অমায়িক হাসি, মাতলামির কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। বদমেজাজের তো নামগন্ধ নেই।

কথাটা ঠাট্টার ছলে বলছেন, না সত্যিই—বুঝলুম না। সে যাই হোক, এ ধরনের সোজাসুজি আক্রমণে অপ্রতিভ হয়ে পড়ারই কথা, আমিও হলুম। হাসব না অনুতপ্ত হব, না প্রতিবাদ করব ঠিক বুঝতে না পেরে একটু বোকার মতো হেসে বললুম, 'এখানেই বসি না—বেশ নিরিবিলি?'

সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় নাড়লেন সাধু আর বললেন, 'বেশ তো, তাই বোস। আরও আধ ঘণ্টার আগে চেঞ্জারবাবুদের কারও ঘুম ভাঙ্গবে না, ততক্ষণ অনায়াসে বসতে পারা যায়।…তোর তো এখনও চা পেটে পড়ে নি বোধ হয়? তা দেবে—ভৈরবীকে তোর কথা বলাই আছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝেছে, যে তুই সে-ই মানুষ—এখনই চা পাঠিয়ে দেবে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একটি অতি সুদর্শন বছর সতেরো বা আঠারোর ব্রাহ্মণ ছেলে, খালি গায়ে শুভ্র পৈতের গোছা পড়ে আছে, ব্রাহ্মণ বলে চেনার অসুবিধা নেই—এসে অতি সুদৃশ্য ট্রে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল। বুঝলুম এই সে পাণ্ডার ছেলে—সেবকটি। এমন ছেলে বাড়ি ছেড়ে এসে এই বিনামাইনের চাকরের কাজ করছে—বাপ-মার তো পাগল হয়ে যাবার কথা।

চায়ের সরঞ্জাম শুধু নয়—চাও মূল্যবান, সুগন্ধি। চা আর কয়েকখানা নিমকি। কিন্তু একটিই মাত্র কাপ। ব্যস্ত হয়ে ছেলেটিকে সে কথা স্মরণ করাতে গিয়ে মনে পড়ল তারানন্দ চা খান না, অন্তত তখন খেতেন না।

তবু প্রশ্ন করলুম একবার, 'আপনি খাবেন না চা? খান না নাকি এখনও?'

তারানন্দ মুচকি হাসলেন। বললেন, 'ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক, দিনরাত মদে

ডুবে থাকি—শুনিস নি? আমি চা খাব কি রে!…তুই খা। বোধ হয় এসে সমস্তই শুনেছিস—ও চা খায়, চায়ের শখও খুব। কলকাতা থেকে ভাল চা আনায়।'

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁরে, সাধনরা কেমন আছে জানিস? কাজকম্ম ভাল পেয়েছে কি? বিয়ে করেছে?'

সাধন? সে আবার কে? একবার এক মুহূর্ত একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম। তারপরই মনে পড়ল। সাধন ওঁর সেই ওখানকার আশ্রমের পাশেই থাকত—বিহারের সেই শহরে। সাধারণ গৃহস্থ, ওখানের এক মাড়োয়ারীর গদিতে সামান্য চাকরি করত—মা বাবা ভাই বোন—বিরাট সংসার—আর ঐ অল্প আয়। অতি কষ্টেই সংসার চালাত, তাই—তখনই বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছুবে, ও ভাই-বোনের মুখ চেয়ে বিয়ে থা করে নি।

ভদ্রলোককে বেশী ক'রে মনে রাখার কারণ—মা-বাবার ওপর অমন ভক্তি আর কারও দেখি নি। মানে আমি অন্তত দেখি নি। প্রতিদিন সকালে উঠে মাকে আর বাবাকে প্রণাম ক'রে তবে সূয-প্রণাম বা ভগবানের নাম করত। আমি ওখানে থাকতে থাকতেই বাবার ক্যানসার ধরা পড়ল যখন—অত বড় লোকটার কী ছেলেমানুষের মতো কান্না! জমি-জমা সামান্যই ছিল, কিন্তু তাও বোধ হয় সব দিয়ে দিতেন সাধনবাবু বাবার চিকিৎসার জন্যে—যে রকম পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন—শুধু বাবা তখনও বেঁচে, জমি-জমা যেটুকু ছিল সমস্তই তাঁর নামে—সেই জন্যেই বেচতে পারেন নি। বাবা সই করতে রাজী হন নি বলেই কোনমতে ঐটুকু রক্ষা পেয়েছিল।

বাবা স্পষ্টই বলেছিলেন বার বার যে, 'এ সারবার রোগ নয়। বিশেষ এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যখন ধরেছে—মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েগুলোকে পথে বসাবো?…তোর মা-ই বা কি খাবে? এখনও তো কেউ কাজকর্ম কিছু পেল না! জমি বলতে তো এই—পুরো ফসল হ'লে ন' মাসের খোরাকি ওঠে, তাও পুরো ফসল তিন বছরে একবারও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এবারেই বা কি হবে? আর এতেই কি চিকিৎসার খরচ উঠবে?'

সংযুক্তির কথা—কিন্তু সাধন বাবু বাবাকে অত ভক্তি করলেও, অথবা করতেন বলেই—সে যুক্তি শুনতে পারেন নি। জমি বাড়ি বেচতে পারলেন

যা ঠিকই, কিন্তু তা ছাড়া যা কিছু ছিল—বাসন কোসন, সোনারূপো বিশেষ ছিল না, যা দু'এক কুঁচি ছিল, সব বেচে দিলেন। তার পর শুরু হ'ল দেদার দেনা। এই পর্যন্ত জানি। তার পরের খবর আর কিছু রাখি না। তারানন্দ গ্রেপ্তার হবার পর আর যা দু একবার গিয়েছিলুম—বকেয়া পাওনা আদায়ের দায়ে—কতকগুলি ভাউচার ইত্যাদি সই করাতে—কিন্তু সেও এক বেলা আধ বেলার জন্যে। জনৈক সাধন বাবুর কি হ'ল, এত খোঁজ করবার সময়ও ছিলনা, মনেও ছিল না।

সেই কথাই বললুম চা খেতে খেতে।

তবে একটা কথা মনে ছিল না, এখন ওঁকে বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, যেটা শেষ বার ওখানে গিয়ে শুনে এসেছিলুম। বলেছিল গনু রিক্শাওয়ালা, এমনিই—কথা-প্রসঙ্গে বলেছিল। সবাই যখন নাকি সাধুর ওপর বিরূপ, নিন্দায় ও ধিক্কারে মুখর হয়ে উঠেছে—সাধনবাবু নাকি আশ্রমে গিয়ে খুঁজে খুঁজে ওঁর একজোড়া পরিত্যক্ত পুরনো খড়ম এনে নিজের ঘরের কুলুঙ্গীতে রেখে দিয়েছেন—নিত্য তাতে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করেন—রামায়ণের ভরতের মতো। প্রত্যহ সকালে উঠে যেমন মা বাবাকে প্রণাম করেন, তেমনি সেই খড়মেও একবার ক'রে মাথা ঠেকান।

এটাও বললুম ওঁকে। শুনে একটু হাসলেন সাধু। বললেন, 'ওটা অমনি চিরকালের পাগলা।' তারপর শূন্য পানে একটুখানি চেয়ে থেকে বললেন, 'অথচ উল্‌টোটাই হওয়া উচিত ছিল। আমাদেরই উচিত ওর পাদুকা পূজা করা। এ যুগে—এ যুগে কেন, আমার এতখানি বয়সে আর কারও এমন মা-বাপের ওপর ভক্তি দেখিনি। মা-বাপের সেবা হবে না হয়ত ঠিক-মতো, বৌ এসে পর করবে—এই ভয়ে বিয়েই করল না। ও-ই যথার্থ সাধু।'

আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'লোকটা কৃতজ্ঞও। ওর ভাল হবে, শান্তি পাবে অন্তত। অকৃতজ্ঞ বেইমান লোকে কখনও শান্তি পায় না।'

হঠাৎই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'আচ্ছা, ও ব্যাপারটা কি বলুন তো? ঐ—ইয়ে, মানে পুলিশের হাঙ্গামাটা?'

নিঃশব্দেই খুব খানিকটা হাসলেন, কৌতুকের হাসি। অপরের দুর্বলতা

ধরা পড়ে গেছে—ওঁরই প্রত্যাশামতো ফাঁদে পড়েছে কেউ—এইরকম দেখলে যেমন বিজয়-মিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসে মানুষ—তেমনি। বললেন, 'সেটা এখনও মনে আছে? ঐ মতলবেই এসেছিস বুঝি? এতদিনের কৌতূহল মেটাতে? কিন্তু শুনেই বা লাভ কি? নোট জাল করি বলে জেনে রেখেছিস, সেই তো ভাল। ভক্তিতে আর আমার কাজ নেই—এখানে মাতাল বদমাইশ বলে জানে সবাই—বদমেজাজী ভণ্ড লোকটা—এ একরকম বেশ শান্তিতে আছি। গুচ্ছের ভক্ত শিষ্য জুটলে একেবারে গেরস্ত হয়ে যেতে হয়, সংসারে জড়িয়ে পড়তে হয়। তখন তারাই হয়ে দাঁড়ায় আত্মীয়ের মতো। তাদের দুঃখদৈন্য রোগশোকের অংশভাগী হ'তে হয়—সে মহাজ্বালা। যেন বিরাট এক সংসার গড়ে ওঠে সবাইকে নিয়ে। ঐ সব ঝঞ্ঝাট অশান্তিই করব শুধু তো নিজের কাজ করব কখন? আর তাহলে সংসারই বা ছাড়লুম কেন? বে-থা ক'রে নিজের ছেলেপুলে নিয়েই তো থাকতে পারতুম।'

আমি বললুম, 'তা বলে অমন মারধোর করাটা—শেষে একটা খুন জখম কিছু হয়ে গেলে তখন?'

'ও, এখানের এইসব শৌখীন ভক্তদের কথা বলছিস? কাল তারা তোর ওখান থেকে এসেছিল—না?···সত্যি কথা বলতে কি, ওখানে যারা আসত তাদের বুঝি, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক, তারা তাদের ধারণা বিশ্বাস মতো চলে। এই শহুরে ভক্তগুলোকে দেখলে, সত্যি বলছি, আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে যায়, আগুন জ্বলতে থাকে—ইচ্ছে করে খুন করি বেটাবেটিদের, টুকরো টুকরো ক'রে কাটি। নিজেরা কিচ্ছুটি করবে না, কোন রিপুদমনের চেষ্টা করবে না—আশা করবে মহাপুরুষ বা সাধু একজন যাকে ধরেছে তিনিই ওদের হয়ে সব করে দেবেন। ভাবটা এই—তুমি সাধু, তোমাকে ভক্তি করছি এই ঢের। এখন তোমার কর্তব্য আমাদের তরিয়ে দেওয়া। আমরা বসে বসে আরাম করব, গোচ্ছার গিলব, বিলাসে ডুবে থাকব—যত পাপ অন্যায় চুরি জোচ্চুরি সব করব—তুমি আমাদের ইহলোকের বিপদ-আপদ কাটিয়ে দেবে—ছেলেদের ভাল চাকরি, মেয়েদের ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করবে, তাদের পাস করিয়ে দেবে, অসুখ-বিসুখ ভাল করবে—সেই সঙ্গে পরলোকে ভাল দেখে একটি বাড়ি দেখে রাখবে, সেখানেও যাতে এইরকম সুখেস্বচ্ছন্দে থাকতে পারি সে ব্যবস্থা করে দেবে। আর, ভগবানের দেখাটাও অমনি—আমার

যদি সময় হয়, সব কাজ শখ বজায় দিয়ে—পাইয়ে দেবে !···বুঝলি ? এদের সব ব্যাপারেই ঐরকম। অসুখ হ'লে দেখিস না, কেউ একটু সাবধান হয় না, বলে যদি সাবধানেই থাকব তাহলে ডাক্তার দেখাচ্ছি, ওষুধ খাচ্ছি কেন ? পয়সাও খরচ করব আবার খাওয়াও বন্ধ করব !···পাপ, পাপ, মহাপাপ। এদের মুখ দেখলেও পাপ হয়, ঐ গুটি গুটি—দাঁত বার ক'রে অমায়িক হাসির সঙ্গে এসে দাঁড়ানো দেখলে আমার সমস্ত শরীর যেন বিছের কামড়ে জ্বলতে থাকে। বেশীক্ষণ ওদের সঙ্গ করলে আত্মার অধঃপতন ঘটে, সাধনভজন নষ্ট হয়ে যায় !'

বলতে বলতেই চোখমুখ লাল হয়ে উঠল সাধুর, দৃষ্টি যেন আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। কিন্তু একটু চুপ ক'রে থেকে অমানুষিক চেষ্টাতেই আবার সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, 'সেইজন্যেই, এই এদের জন্যেই মানুষের সংসর্গে আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। ওখান থেকে যে চলে এলুম সেও তো ঐ জ্বালাতেই। ঐ সাধনটার জন্যেই—মানে সে জন্যে যে আসতে হ'ত তা নয়, তবে ওর পরেই চোখ খুলে গেল, বুঝলুম এভাবে থাকলে আরও জড়িয়ে পড়তে হবে—নিজের কাজ শিকেয় উঠবে।'

'কিন্তু সাধনের জন্যেই—ব্যাপারটা তো কিছু বুঝলুম না। ওর জন্যে কি হয়েছিল ?'

কণ্ঠস্বরে কি একটু বেশী ব্যগ্রতা প্রকাশ পেয়েছিল ? বোধ হয়।

সাধুর কণ্ঠে সেই পরিমাণই ব্যঙ্গ-কৌতুক। বললেন, 'কথাটা শোনবার জন্যে, এর ভেতর সেঁধুবার জন্যে পেট ফুলছে, না ? মেয়েছেলেদের মতো এত কৌতূহল কেন রে ব্যাটা ? তুই না পুরুষ !'···

তারপর একটু থেমে, যেন কী ভেবে নিয়ে বললেন, 'তা শোন, তোকে বলতে পারি। এখন আর এসব কথা রটলেও সাধনের কোন অনিষ্ট হবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না। আর তুই-ই বা সেখানে কবে যাচ্ছিস, কাকে বলছিস !···এমন কিছু নয়, সাধন বাপের অসুখে তো পাগল হয়ে গেছল একেবারে—কত বুঝিয়েছি, বলেছি যে শরীরটা যাওয়ার একটা উপলক্ষ তো চাই, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু কেউই এ নিয়ম এড়াতে পারে নি। আর অনেক বয়েস হয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রেখেই বা কী করবি। এমন কী ভোগসুখ দিতে পারবি ? তারই বা কতটুকু সামর্থ্য আছে ভোগ করার—তা কে সে কথা

শোনে। মানুষ পাগল হলে কি আর যুক্তিতে কান দেয়, না সে সব কথা মাথাতে ঢোকে।···পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই সময় এক বেটা জালিয়াৎ ওর ঘাড়ে এসে ভর করল। ঐ জাল নোটের বাণ্ডিল ওকে গছিয়ে দিল। মাড়োয়ারীর গদিতে কাজ করে—পোষ্ট অফিসে, ব্যাঙ্কে নিত্য টাকা যায়—বলে দিয়েছিল যে রোজ একখানা দুখানা করে জাল নোট চালিয়ে দিলে কেউ ধরতে পারবে না। ধরা পড়লেও বলতে পারবে আমি জানি না কে দিয়েছে। চালাতে পারলে সিকি সাধন পাবে—মানে একশো টাকায় পঁচিশ টাকা। তবু হয়ত রাজী হ'ত না—আগাম দুশো টাকা, মানে ভাল টাকা—ওর হাতে গুঁজে দিয়ে গেল, সাধনও আর লোভ সামলাতে পারল না। তার আগেই এক কাণ্ড হয়ে গেছে—রামস্বরূপের দোকানে ধারে ওষুধ কিনছিল, সেদিনই বলে দিয়েছে তারা বকেয়া টাকা খানিকটা না পেলে আর ওষুধ ইঞ্জেকশন ধারে দিতে পারবে না।

'জালিয়াৎ বেটারা ভেবেছিল যে, সাধনকে সবাই ভালবাসে, সৎ ধর্মভীরু লোক বলে জানে—ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু ধর্মের ঘরে যে পাপ সয় না, সেইটেই জানত না বেটারা। প্রথম দিনই, সাধনেরই দুর্বুদ্ধি—বা সুবুদ্ধি যা-ই বলিস, পাপের পয়সা খেতে হ'ল না—একেবারে চারখানা একশো টাকার জাল নোট নিয়ে গেছে—তাতেই ধরা পড়ে গেল। ব্যাঙ্কের লোকেরা ওকে ডিটেন ক'রে পুলিশে খবর দিলে। ভাগ্যিস সেই সময় জীবন মাহাতোও ব্যাঙ্কে গিছল, সে খুব ভালবাসত সাধনকে—সে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে খবর দিলে। তখনই বুঝে নিলুম ব্যাপারটা। আগের দিনই রামস্বরূপের দোকান থেকে একগাদা ওষুধ এনেছে—অথচ টাকার জন্যে ওরা ওষুধ দেওয়া বন্ধ করেছিল জানি। আমি জীবনকে নিয়েই চলে গেলুম ওদের বাড়ি। সেখানে ধানের বস্তা সবাতেই ছোট একটা কালো ট্রাঙ্ক দেখা গেল, বস্তাচাপা লুকনো। আমি আর খুলে দেখিওনি, জীবনকে দিয়েই বাক্সটা বাইরে এনে আমার শোবার ঘরে চৌকীর নিচে রেখে জীবনকে শিখিয়ে দিলুম বলতে—সাধন নিজে বাঁচবার জন্যে কখনও আমার নামে এমন দোষ চাপাতে রাজী হবে না জানতুম—তাই ওকে বলতে বললুম যে, আমিই এই ক'খানা নোট সাধনকে ভাঙাতে দিয়েছিলুম। সাধন গুরুভক্তিতে সে কথা বলছে না, দায়টা নিজের ওপর নিচ্ছে। আরও বলেছিলুম সাধনকে বলতে যে, যে-বাবার

জন্যে এত বড় ঝুঁকিটা নিয়েছিল—ও জেলে গেলে সে-বাবার কি গতি হবে? না খেয়ে মরেই যাবে যে। তাছাড়া আমাকে পুলিশ কিছু করবে না—সুতরাং সে যেন চুপ ক'রে থাকে—বেশী সাউখুড়ি করতে না যায়।'

এই পর্যন্ত বলে বোধ করি শ্রান্তিতেই চুপ করলেন সাধু।

কিন্তু আমার তখন আর ধৈর্য নেই, অসহিষ্ণুভাবেই তাড়া লাগাই, 'তার পর?'

'দাঁড়া রে বাপু, দম নিতে দে একটু। সস্নেহ ধমক দিয়ে ওঠেন সাধু। বলেন, 'তারপর আর কি! চুপ ক'রেই রইল সে। আসল দোষী যে তার নামও সে বলবে না কিছুতে এটাও জানতুম। যেহেতু ঐ কটা টাকা খেয়েছে —বেইমানী করবে না। আর বাবার কথা ভেবেই আমার কথাও অমান্য করতে সাহস করল না।...আমার আন্দাজও ঠিক—পুলিশ এসে বাক্সটা ভাঙতেই গাদাখানেক ঐ জাল নোট বেরোল ঠাসাঠাসি করা। অন্তত লাখখানেক টাকা হবে—সব ভাঙালে।...পুলিশ ধরে আমাকে থানায় নিয়ে যেতে ও. সি. তো অবাক। সে বেচারার যা মুখের অবস্থা—কী বলব! আমাকে হাত জোড় ক'রে বলে, "মহারাজজী কেয়া বাৎ হ্যায় কৃপা করকে বাতাইয়ে!" আমি বললুম, "আমি কিছুই বলব না, হ্যাঁও বলব না, নাও বলব না। কিছু বললেই মিথ্যে বলা হবে। এ অবস্থায় তোমার আইনে যা আছে তাই করো—আমার মুখ চাইতে হবে না।"

'তার পর—ছাড়া পেলেন কী ক'রে?'

'আরে, আমাকে ধরে কে? আমি জেলে থাকলে যে মা বেটির ঘুম হবে না। ও বেটিই নিজের গরজে ছাড়িয়ে আনল।...তবে তার জন্যে নয়, ভক্ত এড়াতেই পালিয়ে এলুম। এর পর ওখানে থাকলে আরও হাজারখানেক ভক্ত বাড়ত।...আরও, মামলার ভোজবাজীটাও কী ক'রে ফাঁস হয়ে গিছল, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বাক্স দেখাতে গিয়ে সবাই দেখে বাক্স খালি, একখানা নোটেরও চিহ্ন নেই। যেমন তালা বন্ধ তেমনিই আছে, সীলমোহরও ভাঙে নি, থানার গুদোমে ছিল—তখন আর আমাকে ধরে রাখবে কোন অজুহাতে? অবিশ্যি আসল কালপ্রিট্ কে তা আমি পরে জেনেছিলুম, ও. সি-কে জানিয়েও দিয়েছিলুম চুপিচুপি, ব্লক ছাপা মেসিনসুদ্ধ ওরা ধরেছিল। আমার জন্যে সাধন বেচারার যে দুর্নামটা হ'তে পারত, চাকরি নিয়ে টানাটানি—সেটা

বেঁচে গেল।···কিন্তু আর নয়, পথে লোক দেখা যাচ্ছে একজন দুজন ক'রে। এবার ওঠ্ ভেতরে চ।'

উঠে চলতে চলতে—এতক্ষণে ভরসা বেড়ে গেছে খানিকটা—প্রশ্ন করলুম, 'তা আপনি তো ভক্ত ঢুকতে দেন না--চলে কিসে? খরচ তো কম নয়।

'যার গরজ, যার আশ্রম সে চালায়। মা চালায়। কোথা থেকে টাকা আসে কোনদিনই খবর নিইনি, আজই বা নিতে যাবো কিসের জন্যে? টাকার খবরই যদি নেব, আয়ের কথা ভাবব---তাহ'লে সন্ন্যিসী হলুম কি জন্যে রে ব্যাটা'।

'কিন্তু এই যে দুজন ভক্ত সেবক—এদের আসাতে বাধা দেন নি কেন? এরাই বা পড়ে আছে কিসের আশায়? আর ঐ অল্পবয়িসী ভৈরবীই বা কোন আকর্ষণে আপনার কাছে এল?'

অকস্মাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন সাধু, 'ঐটে জানার জন্যেই আরও ছটফটিয়ে মরছিস, না?···ওরে গাধা, অল্পবয়স যতটা দেখিস অতটা নয় ওর। তাছাড়া জানবি এও জন্মান্তরের সম্পর্ক। গত শরীরেও ও আমার ভৈরবী ছিল। মায়ের একটু মজা করার ইচ্ছে—তাই অন্য জায়গায় ছটকে পড়েছিল। ···তবে আর নয়, এ জন্মেই ওর শরীর নেওয়ার শেষ। ও মায়ের কৃপা, তার প্রসাদ পেয়ে গেছে। উচ্চমার্গের সাধিকা ও। শুনলে অবাক হয়ে যাবি—আমি ওকে নিত্য পূজো করি—ফুল চন্দন দিয়ে।'

'আর ঐ ছেলে দুটো?'

'সেও নিশ্চয় পূর্বজন্মের সংস্কার। নইলে ওরাই বা এসে অমনভাবে পড়ে থাকবে কেন—আর আমিই বা তাড়াতে পারি না কেন? নিশ্চয় আগের জন্মে এগিয়ে ছিল, তাই সে বেটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।···আসল কথা কি জানিস, আমি এসব নিয়ে মোটে মাথা ঘামাই না। মায়ের হোটেলে আছি—মহা আনন্দে, নিশ্চিন্ত হয়ে, এত কথা আমার জানার দরকারই বা কি?'

দরজার সামনে দাঁড়িয়েই শেষের কথাগুলো বলছিলেন সাধু, এখন চারদিকে চেয়ে দেখে বললেন, 'তুই বরং এখন ফিরেই যা, তোর আর ভেতরে এসে দরকার নেই। এখন কেউ দেখছে না ঠিকই—কিন্তু এর পর, যখন বেরোতে যাবি কে কোথায় দেখবে—অস্থির করে মারবে।'

বলতে বলতেই নিজে ভেতরে ঢুকে—আর কোন বিদায়-সম্ভাষণের চেষ্টা-মাত্র না ক'রে—ঝপাৎ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন আমার মুখের ওপরই।

মাতাজী

উত্তরকাশীর উজলিতে স্বামী অখণ্ডানন্দের আস্তানা ছাড়িয়ে একটু ওপরে উঠতে এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক চমৎকার একটি অতিথিশালা করে দিয়েছেন। প্রায় ওর নিচেই কালভৈরবের মন্দির, আর তার পাশেই থাকেন একশো একচল্লিশ বছরের এক উলঙ্গ সাধু রামানন্দ, কঠোর যোগী বলে যিনি বিখ্যাত। তাঁকে দেখতে বহু লোক আসে—তিনি কোথাও যান না। তিনি কোন মঠ বানাননি, আশ্রম করেন নি, চেলা নেই একটিও—যেখানে থাকেন তাকে ঝোপড়া বলাই উচিত। কেউ কোন ছত্র থেকে ভিক্ষা এনে দিলে খান, নইলে পরম নিশ্চিন্তে চুপ করে আকণ্ঠ গঙ্গার বরফগলা জলে ডুবে বসে থাকেন।

এঁকেই দেখতে গেছি। কিন্তু সে কাল ভোরের আগে হবে না, কারণ পৌঁছতেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অতিথিশালায় গুছিয়ে বসে স্নান ক'রে বাইরে বেরিয়ে দেখি, রাত্রে যোগিনী উত্তরকাশী যেন মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছে। চারিদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে নক্ষত্র-বিন্দুর মতো বিজলী বাতির আলো; সেই সঙ্গে এখানের বিখ্যাত নৈশ বাতাস, সাঁ সাঁ ক'রে পত্র-পল্লবে এক অপূর্ব সুর-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে, নিচে থেকে গঙ্গায় একটানা একটা মৃদু গুঞ্জন—সবটা জড়িয়ে যেন মায়ালোক মনে হ'ল। এই স্বপ্নের মধ্যে একটু ঘুরে আসার লোভ সামলানো গেল না। প্রকৃতির এই মহোৎসবের সামিল না হতে পারলে যেন শান্তি হচ্ছে না। খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে মণীশ ও আমি আন্দাজে আন্দাজে পথ খুঁজে খুঁজে গঙ্গার দিকে রওনা দিলুম। সঙ্গে টর্চ ছিল তাই রক্ষা, কারণ পথের আলোর সুবিধা সর্বত্র নেই। কোন পথে যাচ্ছি তা জানি না। সবটাই অবশ্য—চলার আনন্দে, ঘুরে বেড়ানোর আনন্দেই, বেরনো। তবে এক সময় সত্যিই গঙ্গার তীরে গিয়ে পৌঁছলুম এবং ভিজে বালি ও উপলের বাধা অতিক্রম ক'রে একেবারে জলের ধারে একটা পাথরও খুঁজে পেলুম—দুজনে বসবার মতো।

প্রথম প্রথম দু চারটে কথা বলেছিলুম, একটু পরে মণীশই স্তব্ধ হয়ে গেল,

তারপর আমিও। সত্যিই এখানে বসে সাধারণ কথাবার্তা যেন মনে হয় অনাচার—স্যাক্রিলেজ। চুপ ক'রে দুজনে সেই অন্ধকারের মধ্যেই গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলুম। একটু একটু ক'রে দৃষ্টি সয়ে যেতে নক্ষত্রের আলোতেই গঙ্গা, ওপারের পাহাড়, গাছপালা, এপারে আশপাশের বাড়ি, কুঠিয়া অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সেও এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা—বাস্তবে মায়ায় মেশা, সত্যি কল্পনায় তৈরী এ কোন্ রূপজগতে এসে পড়লুম আমরা। কতক্ষণ এইভাবে বসে-ছিলুম জানি না, হঠাৎ একটা শব্দে একটু ভয় পেয়েই চমকে চেয়ে দেখি একটি মানুষ জল থেকে উঠে পাড়ের দিকে আসছে। এতক্ষণ বোধহয় স্থির হয়ে পাথরের মতোই জলে ডুবে বসে ছিল, এইবার উঠে যাচ্ছে।

টর্চ ফেলে ভাল ক'রে দেখে আরও চমকে উঠলুম। পুরুষ নয়—নারী। পরণে গেরুয়া থান কাপড়, অতি সামান্যই—মাথার চুল খানিকটা জট পাকানো গলায় রুদ্রাক্ষর মালা, অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী। তিনি উঠে কাছে এসে পরিষ্কার বাংলাতেই বললেন, 'আপনাদের কথা কানে গিছল তাতেই বুঝলুম আপনারা বাঙালী। কিছু মনে করবেন না বাবা, অনেক রাত হ'ল, এইবার আপনারা বাসায় যান।'

চমকের ওপর চমক। একটু সময় লাগল উত্তর দিতে। পাঁচ সাত মুহূর্ত চুপ করে থেকে মণীশই প্রশ্ন করল, 'কেন—কোন ভয় টয় আছে নাকি? জন্তু-জানোয়ারের? বাঘ বেরোয়?'

"ভয় আছে বলেই বলছি, তবে সে বাঘের না। এ পারে বাঘ বড় একটা আসে না। কাউকে মেরেছে বলেও শুনি নি। না বাবা, জন্তু নয়—আসেন দেবতারা, শুনেছি—জানি না—স্বয়ং ভগবতী আসেন গভীর রাত্রে, এখানে স্নান ক'রে বিশ্বনাথের অর্চনা ক'রে যান। আরও অনেক দেবতাও নাকি আসেন। গভীর রাত্রে আসেন তাঁরা—যারা দেখে তারা নাকি পাগল হয়ে যায়। একবার একজন ইচ্ছে ক'রে বসে ছিল, আর একজন তোমাদের মতো বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল—দু'জনেই উন্মাদ হয়ে গেছে। সত্যি মিথ্যে জানি না, তা নাই বা থাকলে আর?'

বিশ্বাস করি বা না করি—এমন মিষ্টি ক'রে বললেন ভদ্র মহিলা যে আর উপেক্ষা করতে পারলুম না। তা ছাড়া রাতও হয়েছে, ঘড়িতে দেখলুম

এগারোটা বেজে গেছে, এবার ফেরাই তো উচিত। সুতরাং উঠেই পড়লুম। কিন্তু আমরা ঘড়ি দেখে মনস্থির করতে করতেই সে সন্ন্যাসিনী কোথায় উঠে গেছেন, কোন দিকে—আর তাঁকে দেখতে পেলুম না।

দেখা হ'ল পরের দিন সকালে। সাধু-দর্শন, গঙ্গাস্নান শেষ ক'রে বিশ্বনাথের মন্দিরে পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। এ রকম পার্বত্য শহরে এত ভীড় তো হবার কথা নয়। বিশেষ কোন যোগও তো নেই আজ। তবে? কী ব্যাপার—দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে একজনের মুখে শুনলুম, 'এক মাতাজী আয়ী, বড়ি উচ্চ কোটিকী সাধিকা, উনকী সাথ বহুৎ সে চেলা আউর চেলী, ভকৎ ভি বহুৎ—ইসিকে লিয়ে মন্দর মে সবকোই কো নিকাল দিয়া গিয়া। ইন লোক কি পূজা হোগা—তব মন্দর খুলে গা আউর সবকো লিয়ে।'

মনটা খিঁচড়ে গেল। এ আবার কি উৎপাত।

কৌতূহলও হ'ল, একটু ঠেলে ঠুলে দু'চার জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি মাতাজী তখন নন্দীকে প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে মূল মন্দিরে ঢুকছেন।

কিন্তু এ কে! এ আবার কোন্ মাতাজী! এ মুখ তো ভুল হবার নয়, এঁকে যে বিলক্ষণ জানি।

সঙ্গে সঙ্গে ছায়াছবির মতোই স্মৃতিগুলো মনের পর্দায় খেলে গেল।

যখন প্রথম ওঁকে দেখি তখন ওঁর বয়স উনিশ কুড়ির বেশি নয়, আমারও চব্বিশ পঁচিশ। বোম্বাইতে প্রথম দেখা বান্দ্রায় সেণ্টমেরীর গির্জায়, একান্ত অসহায় নিরাশ্রয় হয়ে আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থিনী হয়েছিলেন। ছায়াছবির তারকা হবার আশায় একটি প্রৌঢ়, ফুরিয়ে-যাওয়া ডিরেক্টরের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন। তার দ্বারা কোন সুবিধা হয় নি, অসুবিধা যেটুকু হবার কথা হয়েছিল! মিথ্যা মোহের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।...তার পর ঐ অবস্থা। একেবারে ভিক্ষার পর্যায়ে নামতে হয়েছে। আমার তখন আর কী সামর্থ্য—পাঁচ-সাত টাকা দিয়েছিলুম, তিরস্কার করেছিলুম প্রচুর।

তারপর দেখা—বছর দুই পরে দিল্লীর কনটসার্কাসে, বড় একটা দোকানে। বিখ্যাত এক ফিল্ম ফিনান্সিয়ার-এর সঙ্গে প্রকাণ্ড গাড়ি থেকে নামলেন। ঝলমল করছেন গয়নায় আর পোশাকে। দেখেই মুখটা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল সম্প্রতি দু' একটা ছবিতে নেমেছেন—উপনায়িকা শব্দটা খারাপ, দু' নম্বর নায়িকার ভূমিকায়—তাও সুবিধা হয় নি। মানে জমাতে

পারেন নি। চেহারা ভাল কিন্তু অভিনয় আলাদা জিনিস। যাক, সেই সুযোগটুকু পাবার ইতিহাসটা জানলুম এতদিনে।

ভদ্রমহিলাও চিনেছিলেন আমাকে। সামান্য একটু চোখের ভঙ্গী ক'রে সেই চেনার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তবে ঐ পর্যন্তই। আমিও অবস্থা বুঝে আর সে আগের পরিচয় ঝালাবার চেষ্টা করিনি, তিনি তো করবেনই না।

এরপর কাগজে দেখেছি, সামান্য দু' একটা ছোট খাটো ভূমিকায় নেমেছেন —তারপর একেবারে মুছে গেছেন ও জগতের আকাশ থেকে। একেবারে অনেকদিন পরে দেখেছিলুম এক সচিত্র হিন্দী মাসিকে এক বিখ্যাত চিত্রকরের ছবির প্রতিলিপি—সদ্যস্নাতা-সিক্ত-বসনা রূপসী নারীর অপরূপ চিত্র, চিনতে দেরি হয়নি তার মডেলকে। শেষে এই পর্যায় এসে নামল মেয়েটি—একবার মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল—কে জানে, আরও নিচে নামতে হয়েছে কিনা।

তারপর এই।

বিস্মিত যতই হই, সেটা প্রকাশ করলুম না। এতগুলি ভক্ত ওকে মহাসাধিকারূপে স্বীকার করেছে—নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ আছে।

দাঁড়িয়েই আছি—ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয়ে—হঠাৎ চোখে পড়ল, বাইরে এক. কোণে একটি সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে আছেন, শান্ত, সমাহিত হয়ে। ক্ষোভ নেই, বিরক্তি নেই—কোন উৎকণ্ঠাও নেই। আর একটু দেখে মনে হ'ল কাল রাত্রের সেই সন্ন্যাসিনীই হবেন।

কাছে গিয়ে নমস্কার করলুম। তিনিও বিস্মিত প্রসন্ন মুখে মাথা নিচু করলেন! মনে হল অস্ফুট স্বরে 'শিব' 'শিব' করলেন।

মণীশ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে এতক্ষণে, সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনাদের তো ছত্র থেকে ভিক্ষা আনতে হয় এখানে, ভিক্ষা আনতে যাবেন না?'

তিনি হাসলেন। বললেন, 'কী করব বাবা, দর্শন না ক'রে তো যাই না, একটা নিয়ম করেছি।...ও একদিন না খেলে কোন ক্ষতি হবে না।'

মণীশ বলল, 'দেখুন দেখি একি অন্যায়। কত লোকের কত অসুবিধা হচ্ছে! এখানে এ ধরনের পার্শ্যালিটি তো ভাল নয়।

সন্ন্যাসিনী সঙ্গে সঙ্গে জীভ কাটলেন 'না না ওসব বলতে নেই বাবা। সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে। এঁরা বড় স্তরের সাধিকা—এঁদেরই তো পূজার

অগ্রাধিকার।···বাবার দর্শনের জন্যে একটু অপেক্ষা করা এ আর এমন কি কষ্ট। বেশ ভালই তো লাগছে, তাঁরই চিন্তায় আছি।'

আমরা আর ওখানে দাঁড়ালুম না, তখনকার মতো চলে এলুম। খানিকটা ঘুরে ফিরে আবার মন্দিরে এসে দর্শন ক'রে যখন আমাদের বাসার পথ ধরেছি —আবার দেখা হ'ল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। অতিথিশালা ছাড়িয়ে খানিকটা দূর গিয়ে যে বড় গাছটা, তারই তলায় দেখি একটি অতি-বৃদ্ধ লোক বসে আছে। সন্ন্যাসীর মতোই আকৃতি, জটা নেই, তবে গৈরিক বসন এবং একটি লাউয়ের খোলার কমণ্ডলু আছে সঙ্গে। মুখ দেখেই মনে হ'ল লোকটি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। করুণ অসহায় এক রকমের উদাস দৃষ্টি মেলে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। আর চলবারও ক্ষমতা নেই, খাদ্য সংগ্রহেরও মনে হয় কোন আগ্রহ নেই।

সন্ন্যাসিনীকেও দেখেছি, অনেক দূর থেকেই দেখছি। বোধহয় এতক্ষণে ছত্র থেকে ভিক্ষা নিয়ে আসছেন। একটা ঝোলায় খুব সম্ভব ভাত আর রুটি, —সাধুরা এইভাবে এখানে নিয়ে থাকেন—সেই সঙ্গে ছোট্ট একটি পেতলের বালতিতে সম্ভবতঃ ডাল।

উনি কিন্তু আমাদের দেখতে পান নি, সেই দূর থেকেই একাগ্র ভাবে সাধুটিকে দেখছিলেন। কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'ভোজন হুয়া বাবা।' সাধুটি ঘাড় নাড়লেন, অর্থাৎ হয় নি। সন্ন্যাসিনী বিনাবাক্যে বিনা দ্বিধায় কাঁধের সেই ঝোলাটা আর বালতিটা নামিয়ে সেইখানেই খাবারগুলো নামিয়ে দিয়ে আবারও দুহাত জোড় ক'রে বললেন, 'কৃপা করিয়ে।'

তারপর নিজের কমণ্ডলু থেকে সাধুর কমণ্ডলুতে জলটুকুও ঢেলে দিয়ে বেশ তৃপ্ত প্রসন্ন মুখে একটু দূরে গিয়ে বসলেন। তাঁরও যে খাওয়ার প্রয়োজন আছে, আজ যে আর সে কাজটার কোন সম্ভাবনাই রইল না—তাঁর মুখ দেখে তার একটুও বোঝা গেল না। বরং মনে হ'ল—এই অসহায় বৃদ্ধটির জন্যই তিনি ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন, এ যেন তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য।

গিয়ে একটা প্রণাম করার খুব লোভ হ'ল। কিন্তু সুযোগ পেলুম না। দেখি ওদিক থেকে সেই মহাসাধিকা মাতাজী সদলবলে এই দিকে আসছেন। চারিদিকে ভক্তের ভিড়, সেই ভিড়ের মধ্যে পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি অতিথিশালায় ফিরে এলুম।

সন্ন্যাসের শুরু

বছর তিনেক আগের কথা। দুন এক্‌স্‌প্রেস তখন রাত দশটা নাগাদ হাওড়া ছাড়ে, কি আরও কিছু পরে।

এ ট্রেনে ভিড় হবে সে তো জানা-কথাই। প্ল্যাটফর্ম এমনিতেই জনারণ্য, তার ওপর কুলিটি যেখানে মাল নিয়ে গিয়ে নামাল—সেখানটায় আরও, বলা যায় নিশ্ছিদ্র ভিড়। মাল নামাবার জায়গা মেলে না, নিজেরই স্থির থাকা মুশকিল। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি, কালীঘাটের মতো অবস্থা।

একটু পরে মনে হল সেখানে একটা কি জটলার মতো চলছে। আর সেটা ঠিক সাধারণ যাত্রীদের নয়—সুবেশ নরনারীর সমাবেশই বেশির ভাগ। মহিলাদের দামী শাড়ি ও মূল্যবান অলঙ্কারের চাকচিক্যের সঙ্গে একটা ভক্তিগদগদ ভাবের প্রতিযোগিতা—সেই সঙ্গে সাহেবী পোশাক পরা কিছু অফিসার-ডাক্তার-উকিল বা বড় ব্যবসাদার গোছের পুরুষদের ঈষৎ দূরে থেকে দাম্পত্য শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা—এসব দেখে মনে হ'ল এর সঙ্গে কোন মহাপুরুষের যোগাযোগ আছে।

কৌতূহল হ'তে একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখি ঠিক তাই। সেই জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে একখানা চেয়ারে বসে আছেন এক সাধু—অন্ততঃ তাঁর সিল্কের বহির্বাস ও চাদর—দীর্ঘ কেশ, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফে তাই বোঝায়; তাঁর পিছনে পাশে দাঁড়িয়ে তিন-চারজন ধনী গৃহিণী গলদঘর্ম হয়ে পাখার বাতাস করছেন, বাকি অনেকেই কৃতাঞ্জলিপুটে ঘিরে দাঁড়িয়ে; চেয়ারের হাতায় ফুলের মালার স্তূপ।

গুরুদেব স্মিত প্রসন্ন মুখে মৃদু কণ্ঠে কী সব বলছেন—শিষ্যারা উৎকণ্ঠ হয়ে শুনে ব্যগ্র কৃতার্থ ভাবে তার উত্তর দিচ্ছেন। কানে গেল এক বৃদ্ধা মহিলা বলছেন, 'আপনি যখন যাচ্ছেন বাবা, উৎসবের কোন অঙ্গহানি হবে না। সব ঠিক যোগাড় হয়ে য'বে।'

গুরুদেব হাসি হাসি মুখে বল্লেন, 'আর আমি যদি না থাকি? উৎসব হবে না? তোরা পারবি না চালাতে? তবে এতদিন কি শেখালুম!'

বৃদ্ধা বেশ গুছিয়ে বলতে গেলেন, 'বাবা আমরা যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী, আপনি ছাড়া এত বড় কাজ—' কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেল। প্রচণ্ডতর ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি, দেখলে মনে হয় গাড়িতে আগে ওঠার ওপরই এদের জীবনমরণ নির্ভর করছে।

আমার এযাত্রা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট, চার্ট মিলিয়ে একটা কামরায় উঠলুম কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখি ষাঁড়াষাঁড়ির বানের মতো সেই দলটি এই বগির ওপরই আছড়ে পড়ল।

উঃ—সে কী প্রচণ্ড গোলমাল! প্রায় সবাই অপর সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে, কোন্ মাল কোথায় রাখা হবে, কে কোন্ কামরায় যাবে। তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। দেখলাম গুরুদেব একা নন—বেশ একদল শিষ্যশিষ্যাও যাচ্ছেন। কথাবার্তার ভাঙা টুকরো থেকে যা বোঝা গেল, কোন আশ্রমে কিছু উৎসব আছে, সেই উপলক্ষেই যাচ্ছেন এঁরা। তারই প্রচুর উপকরণ সঙ্গে যাচ্ছে—ফল মিষ্টি আনাজ, হ্যাজাগ আলো থেকে কলাপাতার বস্তা পর্যন্ত—কিছু বাকি নেই।

মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। এই হট্টগোল সঙ্গে সঙ্গে যাবে—সারাটা পথ! সে যে সাংঘাতিক কথা। এ অভিজ্ঞতা আগেও একবার হয়েছে—জানি তো, স্টেশনে স্টেশনে ভক্তদের আগমন আর ভক্তির প্রতিযোগিতা—গুরুর তো জীবনান্ত বটেই, গাড়ির অন্য যাত্রীদেরও প্রাণান্ত।

সৌভাগ্যক্রমে আমার কামরায় অন্য যাত্রী ছিল না। চার্টে নাম আছে, বোধহয় বর্ধমান কি আসানসোল থেকে উঠবে। তা হোক—আপাতত তো একটু শান্তি।

বিছানা পেতে জামা প্যান্ট খুলে সবে একটু আরাম ক'রে বসেছি, ট্রেন ছাড়ার পর কোলাহলটাও একটু থিতিয়ে এসেছে—হঠাৎ দরজার কাছে দেখি সেই সাধুটির আবির্ভাব।

'একটু আসতে পারি ?' প্রসন্ন প্রশান্ত মুখ, দেখলে সম্ভ্রমবোধ হয় তাতে সন্দেহ নেই।

'আসুন আসুন' ব্যস্ত হয়েই বলি, 'গাড়ি তো খালিই—'

সাধু ভেতরে এসে সাবধানে দরজাটা টেনে দিলেন, তারপর সামনের বার্থে

বসে পড়ে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে একটা আমার দিকে এগিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

এর পর—কোথায় যাব, কি করি ইত্যাদি দু-একটা খুচরো প্রশ্নের পর হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললেন, 'বাবা, এভাবে হঠাৎ আপনাকে পাওয়া আমার কাছে ভগবানেরই যোগাযোগ মনে হচ্ছে।···একটা বড্ড দায়ে ঠেকেছি। মোটামুটি আমার সঙ্গে আপনার স্ট্যাচারের মিল আছে।···আপনার কাছে বাড়তি একসেট জামা কাপড় হবে বাবা? ধুতি পাঞ্জাবি হলেই ভাল হয়—নিদেন প্যাণ্ট শার্ট? আপনি যে দাম বলবেন আমি তাই দেব, আপনি আবার করিয়ে নেবেন—'

'তার মানে?'—বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করি। প্রস্তাবটা ঠিক কী—বুঝতেই দেরি হয়; নানা রকম অস্পষ্ট সন্দেহও মনে উঁকি মারে।

'বলছি বাবা, খুলেই বলছি। নইলে আপনি বুঝবেনই বা কেমন ক'রে। আসলে কি জানেন, আমি এবার সন্ন্যাস নিতে চাই। সত্যিকারের সন্ন্যাস। কিন্তু সে—এই নিজেরই তৈরী জাল ছিঁড়তে না পারলে তো হবে না। আর—এই পোশাকে এ চেহারায় পালিয়ে কতদূর যাব?'

'কিন্তু—' আরও যেন ঘুলিয়ে যায় মাথাটা, 'আপনি কি সন্ন্যাসী নন?'

'না। আর মিথ্যা বলব না। ঠিক করেছি আজই শেষ করব যাত্রার এ গাওনা। এ আমার সন্ন্যাসীর সাজ। আমি ব্রাহ্মণ, গুরুবংশের ছেলে, দেশে জমিজমা ছিল, তাই বাবা যখন বিয়ে দিলেন, সুপাত্রীর অভাব হয় নি। সুন্দরী বৌ, বি. এ. পাস, ভাল গাইতে পারে—এসে জুটল আমার ঘরে—যে আমি ম্যাট্রিকের ওপারে যেতে পারি নি। কিছু কিছু সংস্কৃত পড়েছিলুম এক পণ্ডিতের কাছে, সেও বলার মতো কিছু নয়।

'তা মিছে বলব না, বৌ হয়ত মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—তবে আমাকে অযত্ন কি অবহেলা করে নি। বাপের পয়সার অভাবেই তাকে এ ঘরে এসে পড়তে হয়েছিল—তবে, সে পষ্টই বলত, মাতাল গেঁজেলের হাতে যে পড়ি নি, কিংবা দোজবরে—এই তো আমার ঢের।

'বছর তিন-চার বেশ কেটেছিল বাবা, একটি ছেলেও হয়েছিল, ফুটফুটে। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যেতে—মা আগেই গিছলেন—চোখে অন্ধকার দেখলুম। জমিজমার আয় যা, তাতে সচ্ছলে চলে না—গুরুগিরির আয়টাও কমে গেল

হঠাৎ। এখনকার লোক কেউ কুলগুরু পছন্দ করে না, সবাই মহাপুরুষ ধরতে চায়। আগে যে সব শিষ্যরা বাবাকে বার্ষিক পাঠাত, তারা হাত বন্ধ করলে। এধারে সকলেই বলতে লাগল—আমার ছেলেটার মাথা নাকি খুব সাফ, ভাল ভাবে পড়ালে একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু সে পয়সা কই ? আমার স্ত্রী আড়ালে কাঁদেন আর সামনে নিঃশ্বেস ফেলেন। আমি কি করব তা কিছুই ভেবে পাই না।

'এই যখন অবস্থা, একদিন কলকাতায় ঘুরতে ঘুরতে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছোটবেলায় একটা ছেলেকে গোবেড়েন দিয়ে তার হাত ভেঙে দিয়েছিল। ঘরে বাইরে মার খাবার ভয়ে সেই দিনই উধাও হয়ে যায়। বছর ছ-সাত পরে দেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্যানাডায় দেখা হয়েছিল, শোনা গেল, সেখানে কী ব্যবসা ফেঁদে বসে বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে। সেই যা খবর পাওয়া গিছল—একেবারে এই দেখা। রঘু নাম—চেহারা পোশাক গাড়ি দেখে বুঝলুম এখানেও ভাল রোজগার করে। কী জানি কি হ'ল তার, আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াল। রঘুর সব কাজই তড়িঘড়ি—আমার অবস্থার কথা শুনে বললে, "এই, গুরুগিরি করবি ? ছাখ্, ভাল বিজনেস। খরচ-খরচা পাব্লিসিটি সব আমার—লাভের আধাআধি চাই"।

'বললুম, দূর আমি তো বর্ন গুরু—কিন্তু এখন কেউ পোঁছে না।

'রঘু বলল, "ফুঃ। ওসব গুরুর কাল চলে গেছে। মডার্ন গুরু চাই। সে তুই বুঝ ব না। যা করবার আমি করব—তুই শুধু দুটো হেঁয়ালি হেঁয়ালি ধর্মকথা আওড়াতে পারবি তো ? বই চাস—দু-পাঁচশো টাকার বই আনিয়ে দেব। চেহারা ভাল আছে—লেগে যাবে"।

'তা বাবা, খেল দেখাল বটে রঘু। নিজের বাড়িতে রেখে এই সব সাজ-পোশাকে সাজিয়ে রটিয়ে দিলে, এক সিদ্ধ মহাপুরুষ হিমালয়ে সাধনা করতেন, জনসমাজে আসতে চান না—সে জোর ক'রে ধরে এনেছে! ব্যস, আর যায় কোথায়। বড়লোকের বড়লোক বন্ধু সব—পিলপিল ক'রে আসতে লাগল। পসার জমে উঠল দেখতে দেখতে। পাঁচ-ছটা আশ্রম হয়ে গেল দু বছরের মধ্যে। রঘু পাকা ব্যবসাদার, হিসেব ক'রে আয়ের অর্ধেক নিজে রেখে—বাকি টাকা থেকে নিজের নামে আমার স্ত্রীর কাছে টাকা পাঠাতে লাগল।

তাকে জানাল যে আমি দুর্গম পাহাড়ে তপস্যা করতে গেছি, ওকে বলে গেছি সংসারটা দেখতে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ওর অভাব নেই, আর আমি ওর প্রিয় বন্ধু, এটাও তার দায়িত্ব বলে মনে করে।

'না, সেদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ছেলে ভাল লেখাপড়া শিখে বিলেত গেছে। সেখানেই এক কোটিপতি গুজরাটির মেয়ে বিয়ে ক'রে বাসা বেঁধেছে। স্ত্রীও বছর পাঁচেক দেখে 'স্বামী ত্যাগ ক'রে গেছেন' এই কারণ দেখিয়ে ডিভোর্স নিয়ে এক মিউজিক ডিরেক্টারকে বিয়ে করেছেন। সেজন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই, আমি খুব খুশী। তিনিও ভাল আছেন, মাত্র দিন-সাতেক আগে তাঁকে দেখেওছি—রূপে রসে বেশ ঝলমল করছেন এখনও।

'এক কথায়—এদিকের কাজ শেষ। এখনও আর এ জুচ্চুরি, এ অভিনয় করতে মন সায় দেয় না। মনে হয় যার নকলেই এই—তার আসলে না জানি আরও কী আরও কত আছে। সেই পরমানন্দ, সেই পরমবিভূতি—ঐশ্বর্যের জন্যে মনটা লালায়িত হয়েছে।···কিন্তু এমনই জাল বিস্তার করেছি যে, আমি ছাড়তে চাইলেও কম্‌লী ছাড়বে না। আমি এ ঠাট ছেড়ে যেতে চাইছি শুনলে আরও বড় মহাপুরুষ ভাববে, আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরবে। তাই ঠিক করেছি—এবার পালাব। পালাতেই হবে। এক কাপড়ে, একা। সৎ গুরুর সন্ধানে যাব, ভিক্ষা করতে করতে—যিনি সে আনন্দের স্বাদ দেওয়াতে পারবেন। সেই জন্যেই এই সাহায্যটুকু চাইছি।'

দিলাম একসেট ধুতি পাঞ্জাবি বার ক'রে। টাকা বার করেছিলেন—নিই নি। লোকটিকে ভাল লেগে গিছল। ওঁর নির্দেশেই বর্ধমান ছাড়াবার পর একটা বাথরুমে রেখে এসেছিলুম সেগুলো, সেই সঙ্গে আমার ক্ষুর আর কাঁচি। অত বড় দাড়ি আগে ছেঁটে না নিলে কামানো যাবে না।

রাত তিনটেয় একবার বাথরুম যাবার সময় বেরিয়ে দেখি ভদ্রলোক স্থির হয়ে করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে তার দাড়ি-গোঁফ কামানো হয়ে গেছে। নিঃশব্দে ক্ষুর আর কাঁচি ফেরত দিয়ে একটু হাসলেন—আনন্দ-উত্তেজনা-কৃতজ্ঞতা মেশানো বিচিত্র হাসি।

ভোরবেলা নাজিবাবাদে পৌঁছে একটা চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল।

ওঁর শিষ্য-শিষ্যারা হাহাকার করছেন। বাবা নাকি অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর কৌপীন বহির্বাস চাদর, মায় জুতো, সিগারেটের কেস সব পড়ে আছে,

তাঁর চিহ্ন নেই। ফলে আরও বড় হয়ে গেলেন তিনি। এই ভাবে সশরীরে অন্তর্ধান করায় মহামানবত্ব নয় পুরোপুরি দেবত্বই প্রমাণ হয়ে গেল। এত হাতের কাছে পেয়েও তারা চিনতে পারে নি—হাহাকার আরও সেই জন্যেই।

পরিপূর্ণ ভরসা

পুরীতে গিয়ে শুধুই কাপড়ের দোকান বাসনের দোকান না ঘুরে অথবা স্বর্গদ্বারে নিশ্চল হয়ে ভীড় না বাড়িয়ে যাঁরা সমুদ্রের ধারে একটু আধটু বেড়াতে যান তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, অনেক বড় বড় বাড়ি, সম্ভবত অবিরাম সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় আপনিই ভেঙ্গে পড়ে গেছে, সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে, আরও ভাঙ্গছে। যাঁরা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয় অনেক শখ ক'রেই করিয়ে ছিলেন, মনের মতো ক'রে, পয়সাও খরচ করেছেন ঢের সে সময়ের হিসেবে, কিন্তু পরে হয় তাদেরই শখ ফুরিয়ে গেছে অথবা পরবর্তী পুরুষ যারা মালিক হয়ে বসেছে তাদের অত শখও নেই, যে নিয়মিত মেরামত করায়, আবার এত অভাবও নেই যে গরজ করে বিক্রী করে। অথচ এখানে অন্তত দু'বছর অন্তর মিস্ত্রি না লাগালে বাড়ি রক্ষা করা কঠিন। এখন বড় বড় বাড়িগুলো—ভাড়াটেরাই গরজ করে বাড়িগুলাকে খুঁজে বার ক'রে লীজ নিচ্ছে, বাড়ি তারাই রক্ষা করে। কিছু বড় বড় মার্কেন্টাইল ফার্ম অথবা বিভিন্ন সরকারী আপিসের কো-অপারেটিভ সোসাইটি এই সব বাড়ি ভাড়া নিয়ে রেষ্ট হাউস ক'রে রেখেছে। কর্মচারীদের সুবিধে তো হয়ই, কোন কোন ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্সের শ্ল্যাব কমে।

যাই হোক, সে জমা-খরচে আমাদের দরকার নেই। আমরা বলছিলুম ভাঙা বাড়িগুলোর কথা।

এই সব বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার পিছনে নিশ্চয় ভিন্ন ভিন্ন কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস আছে, যেমন গড়ার সময়ও ভিন্ন ভিন্ন উৎসাহ আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কত সুখ দুঃখ ঝগড়াঝাটি প্রণয় ও মনোমালিন্যের কাহিনী না জানি জড়িয়ে আছে ঐ ভাঙ্গা বাড়িগুলোর এক একটা ইটে—বেড়াতে বেড়াতে সেই কথাই ভাবি। মোদ্দা কথা আমাদের এই ভাঙ্গা বাড়িগুলো এক বিচিত্র আকর্ষণে টানত,

কে জানে কেন। আমাদের সঙ্গীরা বুঝতেন না, তাদের বোঝাতেও পারতাম না, কী আছে ওগুলোর মধ্যে, কী এত ঘুরে ঘুরে দেখি।

আমরা দেখতাম এক একটা বাড়ি এক এক রকম ভাবে ভেঙেছে। কোথাও এখনও দোতলার একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সামনের দিকের একতলা পর্যন্ত সমভূমি, কোথাও বা শুধুই ওপর তলাগুলো ভেঙেছে, এখনও কিছু খরচ করলে নিচের তলাটা রক্ষা পায়—এই অবস্থায় আছে। কোথাও শুধু একটা কুলুঙ্গীর সঙ্গে একফালি দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কে কবে বাতি বা কুপি জ্বেলেছিল, এখনও সে কালিমার চিহ্নটুকু থেকে গিয়েছে।

এই ভাবে ভাঙ্গা বাড়ি দেখে বেড়ানোর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী তো আছেই। কিন্তু আমার বোন সুপ্তি আরও ছেলেমানুষ। কে বলবে তার এতটা বয়স হয়েছে, এম এ পাস করে স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা করছে। আমি তো এমনি দেখেই ছেড়ে দিই, দূর থেকেই নানান সম্ভাবনা কল্পনা করি, সুপ্তির কিন্তু ছুটে প্রত্যেকের কাছে যাওয়া চাই, সম্ভব হলে ভেতরে ঢুকেও দেখবে। কত বারণ করি, বোঝাই যে পুরণো পড়ো ভাঙ্গা বাড়ি, সাপ আছে কি বিছে আছে—দুটি প্রাণীরই এদিকে খুব বাড়বাড়ন্ত, কাল-নাগিনী, গোখরো, কেউটে যত রকম বিষাক্ত সাপের আড্ডা ছিল এদিকটায় এককালে; এখন অনেক বাড়ি, অনেক লোকজন হওয়াতে অনেক কমেছে হয়তো, তবে একেবারে কি আর গেছে; আর, যারা আছে তাদের এই রকম পড়ো ভাঙ্গা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়াই সুবিধে, তা এসব কথা কে শোনে! সে যাবেই। আর তার দেখার সঙ্গে ব্যাখ্যাগুলিও বড় অদ্ভুত, 'ঐ যে ওধারের ছাদটা, মানে ছাদের যে পোস্টটা দাঁড়িয়ে আছে এখনও দেখে যেন মনে হচ্ছে না যে একটা বুড়ো হুঁকো হাতে তামাক খাচ্ছে? ছাখ না ছোড়দা, উঁহু উঁহু, ওখান থেকে নয়, এদিকে থেকে ছাখ' কিম্বা, 'ও ছোড়দা ছাখ ছাখ, এই বাড়িটার দক্ষিণ দিকের ঘরখানার প্লাস্টার কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যতটুকু আছে, ঠিক যেন মনে হচ্ছে না একটা বাঘ কিসের ওপর লাফিয়ে পড়বে বলে তৈরী হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি না বললে কি হবে, ঠিক সেই রকম'।

সুপ্তিটা চিরদিনই এই রকম। আকাশে মেঘ উঠলে ও কোনদিন দেখে খরগোশ, কোনদিন সিংহ, কোনদিন বা দেখে হাঁড়িমুখো একটা মানুষ। আমগাছের সঙ্গে পেছনের তালগাছের মাথাটা মিশে একটা ছায়ার সৃষ্টি

করেছে, ও তার মধ্যে দুর্গ দেখবে কিম্বা আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পাহাড় আবিষ্কার করবে।

কিন্তু সেদিন ঐ রকম একটা ভাঙ্গা বাড়ি দেখতে গিয়েই একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কতকটা সেই কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরনোর মতো।

সেদিন আমরা বেড়াতে বেড়াতে চক্রতীর্থ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা বাড়ি বড় অদ্ভুত ভাবে ভেঙ্গেছে। মাঝের আসল বাড়িটা—দুর্গের আদলে তৈরি ছিল অনেকটা, টুকরো-টাকরা এখনও যা দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো দেখলে তাই মনে হয়—ভেঙ্গে পড়ে গেছে সম্পূর্ণ, ভেঙ্গেছে সাধারণ-ভাবেই। কিন্তু বাইরে যে নিচু আউট-হাউস-মতো ছিল, চাকর-বাকরদের থাকার জন্যেই হোক বা ভাড়া দেবার জন্যেই হোক, সেটা গোটাই আছে, অথচ আবার নেইও। ঠিক ভেঙ্গে পড়া যাকে বলে তা পড়েনি, এক দিকের দেওয়াল বসে বা ঘূর্ণিঝড়ে অপর দিকের দেওয়ালের মূল উপড়ে, গোটাটাই তিন চারটে খুপরি ঘর সুদ্ধ একদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সুপ্তির ভাষায়, আসল বাড়িটা চলে যাচ্ছে দেখে তার পায়ে আছড়ে পড়েছে, বলছে, 'ও বাবা আমাকে ফেলে যাস নি, আমাকে ফেলে যাস নি'।

এর আগেও একদিন চোখে পড়েছে, তবে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে সুপ্তিকে আটক করেছিলুম, কাছে গিয়ে দেখতে দিই নি। আজ আর ঠেকানো গেল না, আমরা ওর মতলব বোঝার আগেই এক রকম ছুটে বালি ভেঙ্গে উঠে গেল। কিন্তু ঘরগুলোর সেই অর্ধেক-বালিতে-বুজে-যাওয়া দরজার একটাতে উঁকি মেরেই একটা, 'ও বাবা'! কি ঐ ধরনের অস্ফুট শব্দ ক'রে তেমনিই পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে নেমে এল আবার—'ও মাসিমা গো, ওর মধ্যে একটা জ্যান্ত মানুষ!'

'মানুষ! যাঃ, ওর মধ্যে কখনও মানুষ থাকতে পারে?' আমি বলি।

মাসিমা কিন্তু গম্ভীর মুখে বলেন, 'থাকবে না? ওখানেই তো থাকবে, থাকবার কথা! তোদের লেখাপড়া শিখে বুঝি এই বুদ্ধি হচ্ছে সব! এই রকমের পোড়ো বাড়িই তো ওদের আইডিয়াল আড্ডা। সাধারণ লোক থাকতে পারে না, অথচ ঘরটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে, মানে রোদটা জলটা আটকায়, কেউ খোঁজও করবে না কোন দিন, উঁকি মেরে দেখবেও না—এই রকমই তো খোঁজে ওরা। এ তো জানা কথাই যে এখানে একটা আড্ডা থাকবে!'

'কারা মাসিমা ? কাদের আড্ডার কথা বলছ ?' বোকার মতো প্রশ্ন করি।

মাসিমা আমার নিবুদ্ধিতায় হতাশ হয়ে পড়েন। নিবুদ্ধিতা হয়তো তত নয়—যত অজ্ঞানতা। হাল-ছেড়ে-দেওয়ার মতো কাঁধের আর হাত দুটোর একটা ভঙ্গী ক'রে বলেন, 'চোর ডাকাতদের আড্ডা। কিম্বা স্মাগলারদের—আবার কাদের! এরকম একটা আড্ডা না থাকলে চলে ওদের ? দিনের বেলায় ঘাপটি মেরে থাকবে, রাত্রে চোরাই মাল এনে তুলবে—ভোরবেলা কেনা-বেচা ভাগ-বাটোয়ারা করবে—তার একটা জায়গা চাই না ? তোরা কি এটাও বুঝতে পারিস না ? হা ভগবান।'

কিন্তু তাঁর এই উচ্চমার্গের বুদ্ধির অহঙ্কারের বেলুনে পিন ফোটানোর মতো ফুটো করার চেষ্টা করে স্বপ্তি, 'না মাসিমা, ঠিক চোর ডাকাত বলে মনে হ'ল না, বরং অনেকটা সাধু সন্ন্যিসীর মতো দেখতে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায়, কতকটা সিংহের কেশরের মতো, তেমনি গোঁফ দাড়ি—এতখানি দশাসই চেহারা, তার ভেতরই গলায় কী সব মালা, বোধহয় মোটা মোটা তুলসীর মালা হবে। কপালে তিলক, নইলে ভাবতুম দরবেশ ফকির কেউ হবে, কাপড়টার দিকে চাইবার সময় হয় নি, তবে এক ঝলক যা দেখেছি গেরুয়াই মনে হল। আমার দিকে ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে আছে দেখেই ভয়ে আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হবার যোগাড়, ছুটে পালিয়ে আসতে পথ পাই না, অত ভাল ক'রে আর দেখাও হল না তাই।'

আবারও সেই করুণার হাসি মাসিমার, 'সত্যি, তোরা যা মানুষ হয়েছিস না। কোনদিন না বাছুরে খেয়ে যায় ঘাস মনে করে। কোনো কালে ক'রে-খেতে পারবি না এই বলে দিলুম। সংসার করা তো দূরের কথা! চোর ডাকাতরা তো বেশির ভাগই অমনি সন্ন্যিসী ফকির সেজে থাকে, যাতে লোকে বা পুলিশে না সন্দেহ করতে পারে। ওরা বুঝি, তোদের বিশ্বাস, যেমন কালি-ঝুলি, গাময় তেল মেখে ছিঁচকে চোর কি সিঁধেল চোররা চুরি করতে যায়, তেমনি ভাবেই সেজে থাকে সব সময় ? না চোর ডাকাতের কোন আলাদা পোশাক আছে যাতে দেখলেই চোর বলে চিনতে পারা যায় ?…নে চ এখন, আর দাঁড়াস না। আমাদের সন্দেহ হয়েছে পুলিশে খবর দিতে পারি, এ বুঝলে আর রক্ষে রাখবে না।'

'কী করবে ? মারধোর ?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করে সুপ্তি।

'মারধোর ? এখেনে এই নির্জনে কেটে সমুদ্দুরের জলে ভাসিয়ে দিলেই বা কে জানছে বল ?' বলতে বলতেই সম্ভাবনাটা কল্পনায় দেখে আরও ভীত হয়ে পড়েন, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। তোদের যেমন বিদঘুটে বেড়ানো! চ, চ—'

সেদিন চলে আসতেই হল। কিন্তু সুপ্তির ঘুম নেই। ওর কৌতূহলটা শিশুর মতোই আছে এখনও। তেমনি প্রবল এবং সক্রিয়। পরের দিন বেলা তিনটের সময়ই আমাকে জাগিয়ে খোশামোদ ক'রে, অসময়ে চায়ের ঘুষ দিয়ে টেনে বার করল। বেশি দেরি করলে মাসিমারা উঠে পড়বেন, তাহলেই নানান কৈফিয়ৎ, আর যাওয়া হবে না।

তবু আমি একটু ভয় দেখাবার চেষ্টা করলুম, 'যদি সত্যিই ওটা কোন চোর-ডাকাতের গোপন আড্ডা হয় ? আমরা ওর সন্ধান পেয়েছি, আবার আজও যাচ্ছি, যদি আমাদের গোয়েন্দা ভেবে সত্যিই খুন-টুন করে ?'

'যাও যাও!' সুপ্তি গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে আতঙ্কটা উড়িয়ে দিল, 'তাহলে তো ওরাই বরং ভয় পাবে। পুলিশের লোক ভাবলে তো কথাই নেই।'

'তুই জানিস না। দুজন একজনকে সরিয়ে ফেলা কিছুই নয় ওদের পক্ষে।'

'আমি বলছি ছোড়দা, চোর ডাকাতের আড্ডা হলে—আমরা হঠাৎ সন্ধান পেয়ে গেছি জানলে তারা কেউ আবার আমরা যাব কিনা সে অপেক্ষায় বসে থাকবে না। আলিবাবার গুহা ফাঁকা ক'রে দিয়ে সরে পড়বে।'

যুক্তিটা আমারও মনে লাগল। আর কথা বাড়ালুম না।

তবু কাছাকাছি গিয়ে একটু ভয় যে না হয়েছিল তা নয়। আলিবাবার মতো গুহা ফাঁকা ক'রেও আশপাশে ওৎ পেতে থাকতে পারে, কারা সন্ধান পেল জেনে সাবাড় ক'রে দেবে।...কিন্তু একেবারে সামনে পৌঁছবার খানিকটা আগেই সে লোকটিকে দেখা গেল—মাসিমার 'খুনে ডাকাত', সুপ্তির সাধু ফকির। ঐ হেলে-পড়া ঘরগুলোর সামনে একটা বালির ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। স্থির পাথরের মতো। দৃষ্টি সামনে সমুদ্রের দিকে নয়, তার

একটু ওপরে, আকাশে বদ্ধ। যেন ঐ দূর দিগন্তের চক্রবালরেখার ওপর নীল আকাশ থেকে কিছু একটা উড়ে আসবে বা কিছুর উদয় হবে, তারই প্রতীক্ষা করছে।

দাড়ি গোঁফ ঝাঁকড়া চুল মিলিয়ে ভয়াবহ চেহারা তাতে সন্দেহ নেই, চেহারাটাও বেশ শক্ত ধরনের, মুখখানা এতখানি। স্বপ্তির অনুমান ঠিক নয়, পরনে গেরুয়া কাপড় নেই, সাদা কাপড়ই পাট ক'রে পরা, কতকটা বৈষ্ণব সাধকের বহির্বাসের মতো।

সেটাও ছেঁড়া, আর খুব একটা ফর্সাও নয়।

'কাজ নেই রে স্বপু। চলে আয়। সাধু না ছাই, নিশ্চয় পাগল।'

'পাগল তো গলায় অতগুলো মালা কেন?'

'ঐটেই পাগলামি। এক একটা ঝোঁক চাপে পাগলদের জানিস না? ঐ মালা পরাও ঝোঁক। শুনেছি কলকাতায় আগে একটা পাগলী ছিল, সে যোগাড় ক'রে ক'রে অসংখ্য চুড়ি আর হার করিয়ে পরত শুধু। সোনা রূপো নয় অবিশ্যি, পেতল কাঁসাই, কিন্তু সে এত হয়ে গিয়েছিল যে তার ওজনেই বুড়িটা নড়তে পারত না, সর্বদা রিক্শা ক'রে যাতায়াত করত।

স্বপ্তির কিন্তু অসীম সাহস। বলে, 'দেখিই না। পাগল হলেও শান্ত পাগল। ছাখ না, চেঁচাচ্ছেও না কিম্বা আপনা আপনি ঝগড়াও করছে না রাস্তার পাগলদের মতো। আর, দুজন তো আছি আমরা, একা আর ও কী করবে?'

আমি আর কোন যুক্তির অবতারণা করা কি বাধা দেবার আগেই সে এগিয়ে চলে গেল কথাগুলো বলতে বলতেই। আমি আর কি করতে পারি এক্ষেত্রে, পিছু পিছু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া?

সামনে সে গেল, কিন্তু কী কথা কইবে তা বোধ হয় স্বপ্তিও জানত না, কি ভাষায় কথা বলা উচিত তাও না। শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা সম্বল ক'রেই ডাকল, বাবা, শুনছেন?

এবার লোকটি মুখ ফেরাল—সুদূর দিগন্ত থেকে কাছের মানুষটির দিকে।

খুবই শান্ত গলায় বলল, 'বলুন মা'?

বাংলায়ই বললেন, তবে ঈষৎ একটু বাঁকা টান। মানে বাঙালী নন বাংলা ভাল জানেন, এই মাত্র। উড়িয়া কি বিহারী তা অবশ্য বোঝা গেল না।

মোদ্দা ততক্ষণে সুপ্তির বুদ্ধি সুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। সে বোধ হয় ঠিক এই ধরনের শান্ত ভদ্র উত্তর আশা করে নি। অথচ কি আশা করেছিল তা সে নিজেও জানে না। ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে গেছে শুধু, বারণ করেছি ভয় দেখিয়েছি বলেই জেদ ক'রে বাহবা নেবার ঝোঁকে।

এবার বেশ একটু থতমত খেয়ে বললে, 'আপনি—আপনি এইখানে থাকেন? এই ভাঙ্গা ঘরে?'

'যখন যেখানে মাথা গোঁজার মতো জায়গা পাই তখন সেখানেই থাকি মা। ভগবানই ব্যবস্থা ক'রে দেন দরকার মতো, কোথাও না কোথাও। ও আমি তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছি, এখন তাঁরই গরজ।'

'তা, তা আপনি কি করেন? মানে—চলে কিসে?'

'সেও আমি খবর রাখি না মা। সে ভারও ওঁর ওপরই চাপিয়ে দিয়েছি।' জগন্নাথের মন্দিরের দিকটা দেখিয়ে দেয় লোকটি।

'তার মানে কিছুই করেন না! বেশ আছেন যা হোক।' সুপ্তি বলে ফেলে, তার পরই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে ছোট্ট ক'রে জিভ কামড়ে বলে, 'আজ আপনার খাওয়া হয়েছে? মুখ তো শুকনো দেখছি।'

'না মা। এখনও পর্যন্ত খাওয়া হয়নি।' লোকটি সহজ ভাবেই স্বীকার করে।

'ঠিক ধরেছি! তাই তো বলি। কিন্তু এধারেও তো মুশকিল, আমাদের সঙ্গে তো খাবার জিনিস কিছু নেই। পয়সা দেব, কিনে খাবেন?'

'কে কিনতে যাবে মা? তা ছাড়া ও পয়সার কারবার আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।'

'তাই তো।' সুপ্তির চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, 'দেখুন, আমার ব্যাগে গোটাকতক টফি আছে, খাবেন?'

এবার লোকটি হাত জোড় করে।

'কিছু মনে করবেন না মা, প্রসাদ ছাড়া আমি আর কিছু খাই না।'

'সে কি! কে আবার এত গরজ ক'রে আপনাকে রোজ রোজ প্রসাদ পৌঁছে দেয় শুনি! আজ তো এই সন্ধ্যে হয়ে গেল, কেউ তো এল না— কী খাবেন এখন? উপোস ক'রে থাকতে হবে তো?' সুপ্তি যেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'দু-একদিন উপোস দিলেই বা ক্ষতি কি মা ? ব্রত পার্বণে তো কত লোক কত উপোস করে। আপনি ও নিয়ে এত ব্যস্ত হবেন না। ভগবান অন্ন মাপছেন, ঠিক এসে পৌঁছবে, না মাপিয়ে থাকলে আপনি আমি কি করতে পারি বলুন ?'

এরপর আর কি বলার থাকতে পারে ? আগত্যা ফিরতে হল। এসব কথা-বার্তায় আমাকে খুব বিচলিত করতে পারে নি, পৃথিবীর তাবৎ ভণ্ডই এই ভাবে কথা বলে বোধহয়—ওর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচলুম, আমার এই মনের ভাব ; কিন্তু স্বপ্তি দেখলুম বেজায় চটে গেছে লোকটার ওপর, তবে সে অন্য ধরনের চটা, আসলে সে উদ্বিগ্নই বেশী। সে গজগজ করতে করতে বলল—

'কী রকম লোক রে বাবা। কিছু করব না, কোথাও যাব না, পয়সাও নেবো না। কত ভিরকুটি। কে বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওর জন্যে এই তেপান্তরের মাঠ আর সাহারার বালি ভেঙ্গে এই ভাঙ্গা হেলে পড়া ভূতুড়ে বাড়িতে প্রসাদ পৌঁছে দিয়ে যাবে তাই শুনি ? যতো সব বাজে কথা, বাজে বায়নাক্কা। ভড়ং দেখানো আর কি—'

'কেন ওর কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস ! তুইও যেমন। বাজে লোক একটা। হয় মহা ধড়িবাজ, নয়তো পাগল।'

'কৈ, পাগলের মতো তো কথাবার্তা নয়। বেশ শেয়ানার মতোই তো বুঝে সুঝে কথা বলছে !'

'আরে, সবাই কি আর চেঁচানো পাগল হয়, না সবাই গায়ে কাদা মেখে ঘুরে বেড়ায় ! এও এক রকমের পাগলামি। এক এক জনের এক এক দিকে মাথার ইস্ক্রুপ ঢিলে থাকে। একটা ছেমো চাপে মাথায়, শুধু সেই দিকটা ছাড়া আর সব দিকে দেখবে ঠিক আছে। এইরকম পাগলই তো এখন পৃথিবীতে বেশী !'

আমি বিজ্ঞ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি। পাগলের সম্ভাবনাটার ওপরই জোর দিই। যে সম্ভাবনাটা আমার কাছে বেশি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে— সেটা ও বিশ্বাস করবে না, তা এতক্ষণে বেশ বুঝে নিয়েছি।

স্বপ্তির এসব দিকে খেয়ালও নেই অবশ্য। সে গজগজ ক'রেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, ব্যক্তিগত ভাবে ওর কোন ক্ষতি হয়েছে, কিম্বা কোন অপমানবোধ।···

বাড়ি ফিরে যথারীতি একচোট বকুনিও খেল মাসিমার কাছ থেকে। আরও যাঁরা ছিলেন, মানে, যেখানে আমরা উঠেছিলাম—তাঁরাও খুব বকলেন। যদি পাগল না হয়ে সত্যিই ওটা চোর ডাকাতের আড্ডা হত? হয়তো চোরাই মাল জড়ো করার জায়গা। তাই যে নয়—এখনও নিশ্চিত করে বলা শক্ত। হয়তো ওদের ওপর থেকে সন্দেহটা ঘুরিয়ে দিতেই লোকটা সাধু-সন্ন্যিসীর ভান করেছে। স্বপ্তি নীরবে সব তিরস্কারই হজম করল, তবে অন্যদিনের মতো হেসে উড়িয়ে দিল না, অনেকক্ষণ মুখটা গোঁজ করে রইল।

আমার বিশ্বাস ও এখনও সেই লোকটার কথাই ভাবছে। এসব তিরস্কার বা বকুনি ওর কানেই পোঁছয় নি ভাল ক'রে।

তাই বলে ও যে মনে মনে এই মতলব আঁটছিল তা কে জানে!

তিন চারদিন পরে একদিন সকালে মন্দিরে গিয়ে দর্শন শেষ করে আনন্দ-বাজারে ঢুকে পাগলের মতো মিষ্টি প্রসাদ কিনতে লাগল। খাজা, জগন্নাথ বল্লভ, ফেনি, মগজ লাড়ু, পারিজাত—নোনতাও কিনল কিছু, নুনখুর্মা ইত্যাদি—অনেক টাকার খাবার।

কি হবে রে এত? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

তার উত্তরে শুধু বলল, 'কি আবার হবে। সবাই খাবে। বাঃ।...রোজ রোজ তোমাদের ঐ বাঁকওলা ভারীকে ডেকে কতকগুলো বাজে সিঙ্গাড়া আর চালের গুঁড়ির পান্তুয়া-না খেলেবুঝিহয় না? এ কত ভাল খাবার ছাখ দিকি!'

আমি আর কথা বাড়ালুম না। স্কলারশিপের টাকাটা ক'মাসের এক সঙ্গে পেয়েছে, ওর এখন ট্যাঁক ভারী, খরচ করতে চায় তো করুক না।...

ফলে বেরোলাম যখন তখনই সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়' স্বপ্তি আজ ওর সাধারণ ছোট সাদা ব্যাগটা না নিয়ে বড় নতুন ব্যাগ, যেটা ওকে বড়দা দিয়েছিলেন স্কলারশিপের খবর পেয়ে টিফিন বাক্স নিয়ে যাবে এই আশায়,' সেটা নিতে গেল কেন তা অত কারুরই খেয়াল হয় নি। সে ব্যাগও যেন বেশ ভর্তি। সেটা চোখে পড়লেও ভেবেছি অন্ধকার হয়ে আসছে বলে বড় টর্চটা নিয়েছে হয়তো, তাই অত পেটমোটা দেখাচ্ছে।

খানিকটা চলার পর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বপ্তির দিকে ফিরে বললুম, 'তোর ব্যাগে কি, সত্যি করে বল তো! প্রশান্ত মুখে ও উত্তর দিল, 'এ হাতে নিয়ে

মিথ্যে বলার তো জো নেই, আগে জিজ্ঞেস করলে বিপদে পড়তাম। প্রসাদ আছে।'

'ও! তাই সকালে অত প্রসাদ কেনা হল, ঐ পরিমাণ! সেই হতভাগা লোফারটাকে দেবার জন্যে বয়ে বয়ে নিয়ে আসছিস! ধন্য তুই। আসলে সে নয়, তুই-ই পাগল!'

'চুপ চুপ! ছিঃ, যতক্ষণ না ঠিক জানছি ততক্ষণ ওভাবে বলতে নেই কারও নামে। এই তো এসেই গেছি।'

ততক্ষণে বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। আর একটু আলো থাকত হয়তো. কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই একটু একটু ক'রে মেঘ জমছে আকাশে, তাতেই অন্ধকার লাগছে। তবু তার মধ্যেই দেখা গেল, আবছা আবছা, লোকটি সেই বালির ঢিপির ওপরই বসে আছে চুপ ক'রে। কাছে যেতেই হেসে বললে, 'এস মা। বুঝতে পারছি আজ প্রসাদ এনেছ আমার জন্যে। তা দাও—'

বলে খুব সহজেই হাত বাড়িয়ে দিলে।

সুপ্তি এনেছেও একগাদা খাবার। দু'হাতে কুলোবার কথা নয়। বেগতিক দেখে লোকটা সে সব নিয়ে পাশে বালিতেই নামিয়ে রাখতে লাগল।

'আহা হা, মাটিতে রাখছেন! একটা জায়গা টায়গা নেই?' সুপ্তি ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'মাটি নয় মা, বালি। পরিষ্কার বড় বড় বালি,। ঝেড়ে ফেললেই চলে যায়। এখানে কোন রুগী এসে থুথুও ফেলে না কি কুকুর-টুকুরও আসে না।' এই বলে লোকটি হাসল বোধহয় একটু। অন্ধকারে অত ভাল দেখা যায় না, মনে হল যা। এমনিতেই নির্বিকার, বৃথা কোন লজ্জা নেই, ততক্ষণে খেতেও শুরু ক'রে দিয়েছে।

খেতে খেতেই বলল, 'তাহলে মা সেদিনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলে নিজেই। কে গরজ ক'রে এখানে প্রসাদ পৌঁছে দিয়ে যায়, সেই প্রশ্নটার?'

বলে ভরা গলাতেই খুব খানিকটা হেসে নিল সে।

অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু বেশ অনুমান করতে পারলুম, সুপ্তির মুখ লাল হয়ে উঠল। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিন্তু এ তো একদিন।'

'বিরাট যন্ত্র চলছে মা, যিনি চালাচ্ছেন তিনি জানেন এর কোন্ নাটবলটু দিয়ে কবে কতটুকু কাজ হয়। তুমিও এর তেমনি একটা বোলটু কিংবা অন্ত

কোন অংশ। এমন আরও ঢের আছে। কাজ ঠিকই চলছে। আজ তোমার ওপর তিনি ভর করেছেন এই মাত্র। কোন দিন কাকে দিয়ে করাবেন সে তো ঠিক করাই থাকে মা।'

স্বপ্তি যেন একটু আহত হল। কে জানে এতখানি হৃদয়বত্তার পরিচয়ের পরিবর্তে সে উচ্ছ্বসিত কোন কৃতজ্ঞতা আশা করেছিল কিনা। সে বালিতে বসে পড়েছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আমরা যাই, ওঁরা হয়তো ভাবছেন।'

'যাও মা।' খেতে খেতেই সহজভাবে উত্তর দিল লোকটি।

'ভাবছেন শুধু নয়, হয়তো এতক্ষণে পুলিসে ছুটেছেন।' অকারণেই বলি, স্বপ্তির সূক্ষ্ম অভিমান বা অপমান-বোধে প্রলেপ দিতেই কিছুটা, 'নে, টর্চটা বের কর, যাই।'

'ঐরে, টর্চ তো আনি নি। মনে করিয়েও তো দাও নি।'

'সে কি! তুইই তো নিস রোজ। মনে আবার কবে করাই? অত বড় ব্যাগ নিয়েছিস, আমি তো আরও তাই নিশ্চিন্ত আছি যে টর্চটাই নিয়েছিস, তার বদলে যে খাবারেই বোঝাই করেছিস কী ক'রে জানব?'

'তা একটা লোকের পেট ভরার মতো' স্বপু যেন একটু 'কিন্তু' হয়ে বলতে যায়—

'তা তো জানি না দিদিমণি। তুমি তো সে কথাটা ঘুণাক্ষরেও ভাঙো নি কারও কাছে। আমরা কি আর হাত গুনব!'

কিন্তু কথা কয়ে কোন কাজ হবে না। অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওদিকে মেঘ, এদিকে সরকারের নির্দেশে রাস্তা নিষ্প্রদীপ। দেখতে দেখতে এই ক'মিনিটেই এত অন্ধকার হয়ে এসেছে যে স্বপ্তির মুখটা এত কাছে থেকেও দেখা যাচ্ছে না। ঐ লোকটারও সাদা কাপড়টা মাত্র বোঝা যাচ্ছে। সমুদ্রের ধার ধরে এ সময় ফেরা একেবারেই উচিত নয়, উঠে গিয়ে রাস্তাই ধরতে হবে, কিন্তু তাও কি বিনা আলোয় যাওয়া নিরাপদ হবে? রাস্তা পর্যন্ত যাবই বা কি ক'রে?

এমনই অসহায় বোধ হল সে সময়টায় যে বৃথা জেনেও প্রশ্ন করলুম, 'আপনার কাছে কোন আলো-টালো নেই, না? নিদেন দেশলাই? এখন উপায়? বোনটি টর্চ ফেলে এসেছে, এদিকে তো বেশ অন্ধকার হয়ে গেল দেখছি।'

অন্ধকারেই নিরুদ্বিগ্ন উত্তর এল, 'জগন্নাথের দেশে এসেছ, তাঁর ওপরই পরিপূর্ণ ভরসা রেখে চলে যাও বাবা, কোন ভয় নেই। তিনিই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন নিশ্চয়।'

অগত্যা।

সুপুর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কে কার হাত ধরে, আমিই তিনবার হোঁচট খেলুম—পাঁচ পা না যেতে যেতেই। বালিতে হোঁচট লাগে না ঠিকই, তবে পা মচকে যাওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। আকাশে তারা থাকলেও তবু একটা আলোর আভা আসে, উঁচু নিচু বোঝা যায়, এখন এসবই একাকার।

আরও একটু গেছি, হঠাৎ একেবারে পাশে দপ করে একটা টর্চ জ্বলে উঠল।

ভয় পেয়ে চমকে ওঠার কথা, উঠলুমও। সুপ্তি তো সোজাসুজি 'বাবা রে' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু দেখা গেল তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। একটি বছর চৌদ্দ পনেরোর উড়িয়া ছেলে টর্চ নিয়ে বোধহয় ছুটেই এসেছে, কারণ হাঁপাচ্ছে তখনও। বললে, 'বাবা এই টর্চটা পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের।'

'তবে যে, উনি বললেন, কিছু নেই ওঁর কাছে? কোন কিছুই থাকে না?' সুপ্তির কণ্ঠস্বরে কি একটু অকারণ তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়?

'না, ওঁর কাছে কিছুই নেই। মাচিসও থাকে না। এ আমার টর্চ, আমি এই এলুম। ওদিকে দিয়ে এসেছি, আমি দেখেছি আপনাদের। আপনারা লক্ষ্য করেন নি! তাতেই বাবা বললেন, ওদের দিয়ে আয় বাত্তিটা, ওদের আলোর বড্ড দরকার।'

'তা তুমি? তোমার লাগবে না?'

'না না, আমি টর্চ থাকলেও কখনও জ্বালি না। জানা জায়গায়, অন্ধকারেই বেশ যাতায়াত করি। আর খানিক পরেই তো চাঁদ উঠবে, মেঘ থাকলেও পথ-ঘাট বোঝা যাবে তখন।'

সে পিছন ফিরেছে বলতে বলতেই।

'এটা তোমাকে ফেরৎ দেব কী ক'রে?'

'সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনাদের কাছেই রেখে দেবেন। আমি আপনাদের বাসা জানি, আমি নিয়ে নেব।'

বাড়ি পৌঁছে প্রাথমিক ঝড়টা কাটার পর মেজাজ একটু থিতিয়ে যেতে মাসিমা প্রশ্ন করলেন, 'তা সে ছোঁড়া আমাদের ঠিকানাই বা জানল কি ক'রে ? ঐটুকু ছেলে, যা শুনছি ও-পাড়াতেই বাড়ি—য়্যাঁ ?'

'না জানে না জানল। কাল পরশু দেখে, কেউ না আসে, একদিন বেলাবেলি গিয়ে ঐ মিনসেটাকে দিয়ে এলেই হবে। ওর তো জানা-শুনো !

তারপর টর্চটা অকারণেই হাতে ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'টর্চটা কিন্তু বেশ দামী, কতখানি লম্বা দেখেছিস ? কত দূর পর্যন্ত আলো যায় ? নতুনও, না ? আমাদের এমনি একটা কিনলে হয়।'

'তুমি কি এটা মেরে দেবার তালে আছ নাকি ?' হেসেই বলি।

'না না, যাঃ ! অসময়ে এতটা উপকার করেছে। না না, একদিন ফিরিয়ে দিয়ে আসিস গিয়ে।'

কিন্তু এই অনিশ্চিত একদিনের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য তৃপ্তির ছিল না, সত্যি কথা বলতে কি, আমারও না। কৌতূহল প্রবল। একটা যেন কেমন অবর্ণনীয় অজ্ঞাত সংশয়। পরের দিন সবাই ঘুমিয়ে পড়তে বেলা তিনটে নাগাদ আমরা দুই ভাইবোনে বেরিয়ে পড়লুম টর্চটা নিয়ে।

গিয়ে দেখলুম সে ঘর একেবারে খালি। সেটা এবং তার পাশাপাশি বাকী দুটো ঘরও। কেউ নেই, কিছুই নেই। তথাকথিত বাবার এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু সেই প্রথম দিন যে ঘরে তাকে দেখা গিয়েছিল সেই ঘরের কোণে বালির ওপর স্তূপাকার অনেকগুলি আধভাঙ্গা প্রসাদের পাত্র, যেমন হাঁড়ি বা গুণ্ডির আধখানা ভেঙ্গে এদেশে এক-জনের মতো প্রসাদ দেয় তেমনি, কতকগুলো কালিঝুলি মাখা পোড়া হাঁড়ি ভাঙ্গা, কতকগুলো সাদা।

কতদিন ধরে জমেছে এগুলো কে জানে, ফেলেই বা দেয় নি কেন ?

এ কি আমাদের দেখাতেই জমানো ছিল এমন ক'রে ?

আশপাশের বাড়িতে, সোনার-গৌরাঙ্গে, অন্য মন্দিরে—অনেক খোঁজা হল। ঐ বর্ণনার চোদ্দ পনেরো বছরের উড়িয়া ছেলেরও খবর কেউ দিতে পারল না। কেউই দেখে নি। কেউ জানেও না।

প্রায়োপবেশন

স্বামী অগেহানন্দ গিরি মহারাজ এই মরদেহটা সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়েছিলেন অনেক দিন আগেই, এটা ত্যাগ করবেন একথাও ঘোষণা করেছিলেন, সে জন্য যা যা করা দরকার তাও সব করেছেন। তাঁর অবর্তমানে উত্তরাধিকার নিয়ে পাছে মনোমালিন্য হয়—মামলা মোকদ্দমা, এমন কি খুনজখম হওয়াও আশ্চর্য নয়, তা তো নিজের চোখেই দেখলেন কতবার—তাই অধিকাংশ প্রবীণ শিষ্যর মত নিয়ে পরবর্তী মোহান্ত নির্বাচন ক'রে তাঁকে সব বুঝিয়েও দিয়েছেন। এমন কি ব্যাঙ্কের খাতাপত্রে সই করার অধিকার দান, দলিলাদি হস্তান্তর সবই ঠিক—অতঃপর তিনি বাকী মাস-দুই সময় কেদারনাথে গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করবেন এ কথাও বলেছেন প্রিয় ও অন্তরঙ্গ শিষ্যদের (কারণ ঐখানেই তিনি তাঁর গুরু মহারাজ শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরির কৃপালাভ করেন) —কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন যে মতি পরিবর্তন ক'রে একাদশ দিন প্রায়োপবেশনে এই ঋষিকেশেই প্রাণত্যাগ করলেন, সেটা আজও সকলের কাছে দুর্বোধ্য।

এ নিয়ে অবশ্য কল্পনা অনুমানের অন্ত ছিল না। আজও, তাঁর তিরোধানের এই দশ বছর পরেও, কিছু কিছু আলোচনা অনুমান যে না চলে এমন নয়—কিন্তু তার কোনটাই তো কেউ সত্য বলে স্থির নিশ্চয় করতে পারেন না। স্বর্গত গুরু মহারাজের অন্তরঙ্গ শিষ্য-সেবকরাও না।

তবে ঐ যে মহিলা—বিদেশে শিক্ষিতা, চোস্ত ইংরেজী উচ্চারণে দক্ষা, অতি আধুনিকা ভদ্রমহিলা—যিনি বাঙ্গালী হয়েও বাংলা উচ্চারণ করেন অতিকষ্টে, বিদেশীর উচ্চারণের মতোই আড়ষ্ট ও বিকৃত শোনায়—বন্যা সচদেব, গিরি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে এ প্রায়োপবেশনের, মৃত্যু ত্বরান্বিত করার সঙ্কল্পের কোন যোগসূত্র থাকতে পারে—তা কেউ কিন্তু কোন দিন কল্পনাও করতে পারেন নি, পারবেনও না। সে মহিলা নিজেও না।

অগেহানন্দ ক'রেও গেছেন অনেক কাজ। অপূর্ণ কিছু রেখে যান নি, অতৃপ্তির কোন কারণ নেই। অখণ্ডানন্দ সাধনভজন নিয়েই থাকতেন,

অধিকাংশ দিনই তাঁর কেটেছে তপস্যায়, হিমালয়ের দুর্গমতম স্থানে। মোট এগারো বারোটি শিষ্য সংখ্যা ছিল তাঁর। সকলেই সন্ন্যাস নিয়েছেন—তাও বহুকাল বাজিয়ে দেখে সন্ন্যাস দিয়েছেন তাঁদের, দীর্ঘকাল কঠিন ব্রহ্মচর্য, কঠোর সাধনা করার পর। কিন্তু অগেহানন্দের এই কৃপণতা ভাল লাগে নি। ব্রহ্ম-সংস্পর্শের এই অত্যাশ্চর্য আনন্দ সংগোপনে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেন নি। গুরুর অনুমতি নিয়ে লোক-সমাজের মধ্যে এসেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ গৃহীকে দীক্ষা দিয়েছেন, সন্ন্যাস দিয়েছেন চার শতাধিক শিষ্যকে, শিষ্যা সন্ন্যাসিনীর সংখ্যাও কম নয়। তার জন্য একটি মঠও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেও ছাব্বিশ সাতাশটি, ঠিক কোথায় কি আছে ইদানীং অত খেয়ালও থাকত না তাঁর—এসব পরিচালনার জন্য বহু লক্ষ টাকা লগ্নী করেছেন বিভিন্ন আমানতে সম্পত্তিতে। অর্থাৎ কাজ তাঁর সবই শেষ হয়েছিল, অন্তত তাঁর মতে। আর এ দেহটা বয়ে বেড়াবার কোন প্রয়োজন নেই এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল, তাই এদিককার পার্থিব সব দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হবার একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন—কেদারনাথে গিয়ে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও পরমেশ্বরের চিন্তা করবেন নির্জনে মাস দুই কাল, তার পর একটি শুভদিন দেখে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের আহ্বান ক'রে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো এই দেহটাকে ছেড়ে চলে যাবেন, পরম শান্তিতে, পরম তৃপ্তিতে—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

কিন্তু সব ওলট পালট হয়ে গেল বন্যা সচদেবের এই আকস্মিক আগমনে।

মনে পড়ে গেল—বোধ করি শ্রীগুরু মহারাজই স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এই একটি কাজ এখনও বাকী আছে, শুদ্ধ দেহ মন নিয়ে মহাপরিনির্বাণে যাত্রা করার আগে—এই প্রায়শ্চিত্ত।

না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। কোন রোম্যান্সের প্রসঙ্গ তুলছি না।

বন্যা সচদেব দেখতে শুনতে ভাল হলেও, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স তাঁর, বিধবা, দুটি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জননী।

তিনি এসেছিলেন—লোকমুখে মহারাজের দেহত্যাগের সঙ্কল্প জানতে পেরে—প্রণাম জানাতে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ—এবং প্রসঙ্গক্রমে কিছু ঐহিক জীবনের ব্যথা ও বেদনাও।

পাঁচ বছর বয়সের অনাথ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে এক পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা এসেছিলেন তখনও প্রায়-তরুণ সন্ন্যাসী অগেহানন্দের কাছে। সঙ্গে মেয়েটির মায়ের এক চিঠি। এই মেয়েটি ও চিঠিটি ভদ্রমহিলার কাছে দিয়ে, ওঁর কাছে পৌঁছে দেবার ভিক্ষা জানিয়ে মেয়ের মা কদিন আগে নাকি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। আর কেউ নেই এদের—যে একে মানুষ করতে পারে। চিঠি পড়ে তখনকার মতো যথাযোগ্য সম্ভাবণাদি সেরে কিছুক্ষণ নির্জনে কুঠিয়ার দ্বার বন্ধ ক'রে বসে ছিলেন মহারাজ, তারপর বেরিয়ে এসে লোক দিয়ে এক গৃহী শিষ্যার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন মেয়েটিকে। সে শিষ্যা আরও বছর-দুই পালন ক'রে এক ক্রীশ্চান মিশনারী স্কুলে পাঠিয়ে দেন, সেখান থেকে কিছুদিন পড়াশুনো করার পর—সেই স্কুলের অধ্যক্ষার সঙ্গেই বিলেত চলে যায় মেয়েটি, সেখানেই অধ্যাপক সচদেবের সঙ্গে আলাপ হয়, দুজনের বিবাহও হয়। এতাবৎ সব ব্যয়, মানে স্কুলের ও বোর্ডিং-এর ব্যয়, স্বামীজী মহারাজই বহন করেছিলেন, অধ্যক্ষার অতি প্রিয়, কন্যাসম হয়ে পড়ায় তিনিই ইচ্ছা ক'রে বিলেত নিয়ে গিছলেন, সুতরাং আর আর্থিক সাহায্যের কোন প্রয়োজনও হয় নি। কোন সংবাদও রাখতেন না মহারাজ। ক্রমশ ভুলেই গিছলেন ওর কথা।

অকস্মাৎ যেন গুরু বা ইষ্টের প্রত্যক্ষ বিদ্রূপের মতোই—পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে শুদ্ধ চিত্তে বিদায় নেবেন এই অহঙ্কার চূর্ণ করতেই—সেই মেয়ে এতকাল পরে এসে দেখা করল, পরিচয় দিয়ে কৃতজ্ঞতা, প্রণাম ও নিজের সমস্যা নিবেদন ক'রে বিদায় নিল। মাত্র আধঘণ্টা ছিল মেয়েটি, তাতেই যেন এক বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল, গুরু মহারাজের মানসিক শান্তি উত্তাল উদ্বেগ হয়ে উঠল অশান্তি ও অপরাধবোধের এক আকস্মিক তুফানে।

সমস্যা অবশ্য এমন কিছু নয়। সচদেবের অকালমৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু তিনি টাকা-কড়ি যা রেখে গিছলেন, ছেলেদের মানুষ করার পক্ষে যথেষ্টই। মানুষ করেছেনও ভদ্রমহিলা, সাধারণ অর্থে। বড় ছেলেটি ডাক্তারী পাস ক'রে আমেরিকা গিছল, সেখানেই এক ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে, তবে তাতে সুখী নয়, মেয়েটি নাকি ভাগ্যান্বেষিণী পর্যায়ের, সে এক অভিনেতা তরুণের সঙ্গে প্রত্যক্ষেই ঢলাঢলি করে—তাতে ছেলেটার দুঃখের অন্ত নেই। মধ্যে মারামারিও হয়ে গেছে—তা নিয়ে পুলিশ কেস জরিমানা—সে সব সংবাদই

মহিলা পেয়েছেন। ছোট ছেলেটি ভালভাবে এম-এ পাস ক'রে সরকারী অধ্যাপকের চাকরি পেয়েছিল, তা ছেড়ে রাজনীতিতে নেমেছে, বর্তমানের পঙ্কিল রাজনীতি, নিজেদের দলের ছেলেদেরই সংশয়বাদী বা বিদ্রোহী সন্দেহে খুন ক'রে বেড়াচ্ছে—সে খবরও মার কানে পৌঁছে দেবার কোন অসুবিধা নেই। এই সব নানা কারণেই বড় অশান্তি যাচ্ছে তাঁর—গুরু মহারাজ আশীর্বাদ করুন তাদের সুমতি হোক। ইত্যাদি—

এসব কোন কথাই অগেহানন্দর কানে বা মনে পৌঁছয় নি। তিনি যেন নিতান্ত দীর্ঘকালের অভ্যাসবশেই মৌখিক দু-চারটি সান্ত্বনা বাক্য বা আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলাকে।

মন তাঁর চলে গিয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের এক মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশীথে, যেখানে তিনি প্রথম মৃত্যুর স্বাদ পান, যে মৃত্যুর পরও জীবিত থেকে তার সেই ভয়াবহ পরিচয় স্মরণ করা যায়। সে মৃত্যু তাঁর বুঝি আত্মারও।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের গঙ্গা-যমুনার সেই প্রলয়ঙ্কর বন্যার সব চেয়ে সাংঘাতিক একটি রাত্রি।

গঙ্গার জল বাড়ছে সে সংবাদ পেয়েছিলেন বৈ কি! অনেকে বলেছে। নিচে ঋষিকেশে নাকি সরকার ঢোলশোহরৎ করে জানিয়েও দিয়েছেন, সতর্ক হ'তে বলেছেন গৃহীদের, সাধুদেরও। সাবধান করার প্রয়োজনও ছিল, তখন বহু সাধুই গঙ্গার ধারে বাস করতেন, কেউ ঝোপড়া বেঁধে কেউ বা পাহাড়ের কোন বিশেষ খাঁজে-কোণে—সামান্য গুহামতো স্থানে, কোন মতে একটু আচ্ছাদন পেলে তারই নিচে।

একেবারে জলের ধারে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ সাবধান হয়ে ছিলেন, তাও সবাই নয়। একটু উঁচু জায়গায় যাঁরা থাকতেন তাঁরা কানই দেন নি। অথচ কালী-কমলি ছত্রে ভিক্ষা নিতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই জানিয়ে দিয়েছেন ওখানকার মুন্সীজী। এখানের এই পার্বত্য বন্যার আকস্মিক মৃত্যু-রূপিণী মূর্তিধরার ইতিহাস বহুবার রচিত হয়েছে, বহুদিন ধরেই শুনছেন তাঁরা। সামান্য পাহাড়ি ঝরণা চন্দ্রভাগা * প্রতিদিনই পার হয়ে আসতেন বহু সন্ন্যাসী, বোধ হয় একশো। হাতও হবে না চওড়ায়,

* ঋষিকেশ ও লছমনঝুলার মধ্যে, এখন পাকা পুল হয়েছে।

পায়ের চেটো-ভর জল থাকত—একবার তার মাঝামাঝি পৌঁছতে খররৌদ্রের মধ্যেই এমন জল এসে পড়ল, শতাধিক সন্ন্যাসী তাতে ভেসে চলে গেলেন। সে তো এই মাত্র চার পাঁচ বছর আগের কথা।

এসবই জানতেন তাঁরা, শুনেছেন। অনেকেরই সেদিনের ঘটনা মনে আছে তবু সাবধান হন নি। ভেবেছিলেন গঙ্গার তল অনেক গভীরে, তা এত সহজে পূর্ণ হয়ে চারিদিক ভাসাবে না। অন্তত তেমন বাড়ছে দেখলে ওপারে চলে যাবার যথেষ্ট সময় পাবেন তাঁরা।

বিশেষ অগেহানন্দ থাকতেন লছমনঝুলা যাবার পথে বেশ একটু উঁচু জায়গায়, একটা বড় পাথর বেরিয়ে আসা আচ্ছাদনের নিচে। তখনই তাঁর কিছু কিছু শিষ্য ভক্ত হয়েছে, কুঠিয়া ভেঙ্গে ঋষিকেশে আশ্রম তৈরী হচ্ছে, তবু তিনি ইচ্ছে ক'রেই—তপস্যা করার জন্য ওখানে বাস করছিলেন; তাঁর গুরু মহারাজ ভৈরো-ঘাঁটিতে তখন আস্তানা গেড়েছিলেন কিছুদিন, .তপস্যায় কোন বাধা এলে কি কোন সমস্যা দেখা দিলে বিনা বিজ্ঞাপনে যাতে নিঃশব্দে সেখানে চলে যেতে পারেন, এই গোপন কারণেই জনমানব-বাস-শূন্য স্থানে থাকা আরও।

অগেহানন্দ ভিক্ষা করতে যেতেন না। এক পাহাড়ী ভক্ত একটু দুধ বা একটু ঘোল দিয়ে যেত প্রত্যহ, তাই খেয়েই জীবন ধারণ করতেন। কাজেই ঢেঁড়ার কথাটা শোনেন নি। তবে গঙ্গার জল দ্রুত বাড়ছে সেটা নিজের চোখেই দেখেছিলেন। ভেবেও ছিলেন পরের দিন সকালে অবস্থা বুঝে আর একটু উঁচুতে উঠে যাবেন। কিন্তু পাহাড়ে-নদীর জল হিসেব ক'রে নামে না—এ কথাটা ভুলে যায় অনেকেই। নইলে এই সাম্প্রতিক কালেও, এত দুর্ঘটনার ইতিহাস পড়ে শুনেও বদরীনাথের পথে বেলাকুঁচিতে বাস-এ বসে থেকে ভেসে যেতেন না অতগুলি যাত্রী। ভেবেছিলেন জল যতই বাড়ুক তাঁরা এত উঁচু আর ভারী বাস-এ বসে আছেন তা'দের কী ভয়?

এই ভ্রান্তি হল অগেহানন্দেরও। তখনও তিনি বসে ধ্যান করছেন, জলের গম্ভীর বিরাট গর্জন সমীপবর্তী হচ্ছে জেনেও অতটা নিকটে এসেছে বোঝার অবস্থা ছিল না তাঁর। একেবারে যখন সে ঘূর্ণি জল সামান্য শুষ্ক তৃণখণ্ডের মতোই ভাসিয়ে নিয়ে চলল তখনই বুঝতে পারলেন।

তখন আর সাবধান হওয়ার সময় ছিল না। নিতান্ত বহুদিনের

যোগাভ্যাস করা শরীর বলেই তখন-তখনই তলিয়ে গেলেন না—এবং অসম্ভব জেনে সাঁতার দেবার বা পাড়ে আসারও চেষ্টা করলেন না—তাতে মিছিমিছি শক্তি ক্ষয় করা হ'ত—কোন মতে প্রাণপণে শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখারই চেষ্টা করলেন শুধু। তাও বোধ করি অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হ'ত না। বাল্যে ও কৈশোরে কঠোর ব্যায়াম করেছেন, প্রথম যৌবন থেকেই, দীক্ষা নিয়ে পর্যন্ত কঠিন, যোগসাধনা ক'রে আসছেন—বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে রাখলেও কোন অসুবিধা হয় না তাঁর—এই জন্যই পারলেন। তাছাড়া তখনও তাঁর যৌবন যায় নি, ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স তাঁর, আঠারো-উনিশের মতো দেহের বাঁধন। সাধারণ কুড়িজন যুবকের শক্তি ধরেন তখনও।

কতক্ষণ ভেসে ছিলেন তা তিনি জানেন না। নিচে ঘন কৃষ্ণ ঘূর্ণ্যমান জল, উপরে মসীকৃষ্ণ আকাশ, কোথাও এক বিন্দু আলো চোখে পড়ে না, কোন্‌টা জঙ্গল কোন্‌টা জনপদ কিছুই বুঝতে পারেন না। জলের বেগ মন্দীভূত হওয়ার বা কোন নিরাপদ মৃত্তিকা কি প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় পাবার কোন আশ্বাস পাচ্ছেন না মনে। আসুরিক শক্তিরও ক্ষয় আছে। তাঁর তো মানুষের শরীর—যতই না যোগাভ্যাসের শক্তি যুক্ত হোক। ক্রমশ অবসন্নই হয়ে আসছেন এমন সময় চোখে পড়ল একটা ঘরের চালা ভেসে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কোনমতে গিয়ে সেটাকে ধরে—শেষ চেষ্টার মতোই—প্রাণপণে সেটার ওপরে উঠে এলিয়ে পড়লেন। তারপর আর কিছু মনে নেই। তখন কত রাত, আনুমানিক কতটা দূরে এসেছেন হরিদ্বার থেকে—এসব হিসাব করার মতো দৈহিক বা মানসিক শক্তি তো থাকা সম্ভবই না। ঐ চালায় তিনি ছাড়া অপর কোন প্রাণী ছিল কিনা—মানুষ বা হিংস্র পশু বা সরীসৃপ—তাও চোখ মেলে দেখেন নি। দেখতে পারেন নি।

চেতনা ফিরে পেলেন অনেক পরে। প্রথম যে অনুভূতিটা হল তাঁর—প্রচণ্ড শীতের। ঠকঠক ক'রে কাঁপছেন তিনি। প্রবল কাঁপুনি। আপনিই দাঁতে দাঁতে লাগছে ঠকঠক ক'রে। একবার চোখ মেলে দেখবারও চেষ্টা করলেন—সেই, যেন সর্ব-সৃষ্টি-আবরিত-করা, অন্ধকার ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। কোথায় আছেন তাও বুঝলেন না, চেয়েও থাকতে পারলেন না। তারপর একটু একটু ক'রে অনুভূতি ফিরে পেতে যেটা অনুভব করলেন—

কার একটা উষ্ণ স্পর্শ। বড় আরামদায়ক সে স্পর্শ, সেই প্রায়-মরণ-হিম-শৈত্যের মধ্যে সে যেন সঞ্জীবনী স্পর্শ।

আরও একটু পরে মনে হ'ল কোন মানুষই জড়িয়েছে তাঁকে। জড়িয়ে ধরে আছে। তাঁর অবস্থা দেখে শীতবোধের কষ্ট দেখে কৃপা ক'রে একটু উষ্ণতা দেবার চেষ্টা করছে। বস্ত্রাদির অভাবে নিজের দেহের উষ্ণতা সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছে।

আরও পরে বুঝলেন পুরুষের স্পর্শ এ নয়। এত কোমল এত উষ্ণ পুরুষের দেহ হতে পারে না।

তখনই চমকে উঠে সে আলিঙ্গন মুক্ত হবার কথা, একটা ক্ষীণ চেষ্টাও করলেন কিন্তু সে শক্তি ছিল না, কোন শক্তিই ছিল না। চোখই চাইতে পারছেন না—হাত পা নাড়া তো দূরের কথা।

শুধু শীত, প্রচণ্ড শীত। শীতেই মরে যাবেন।

কণ্ঠস্বরও বসে গেছে, ফিসফিস ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'এ আমি কোথায়' ?

উত্তর এল তেমনি ফিসফিস ক'রেই, 'ও আপনিও বাঙালী ? বাঁচা গেল। আমরা সেই চালার ওপরেই আছি এখনও। চালাটা একটা বড় পিপল গাছে আটকে গেছে বলেই বেঁচে গেছি। কিন্তু তার চারিদিকে জল। এটা আমারই ঘরের চালা। বিপদ দেখে চালে উঠেছিলাম, চালাটা পুরো ভাসিয়ে নিয়েছে তাই রক্ষা, নইলে ডুবতাম। জল আরও উপরে উঠেছে—অনেক উপরে। আমারও শীত করছে। দু-একটা লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই ভেসেছি, তাদের তুলতে পারি নি। আপনি নিজে না উঠলে আপনাকেই কি টেনে তুলতে পারতাম ? ভিজে কাপড়েই এতক্ষণ ছিলাম আপনার অবস্থা দেখে সে কাপড় সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। অন্য কিছু ভাববেন না। কোন সঙ্কোচ করবেন না। এ সে অবস্থা নয়। এইটুকু তাপ না পেলে বাঁচবেন না কোনমতেই—'

সঙ্কোচ করেন নি অগেহানন্দ গিরি সন্ন্যাসী। করার অবস্থা ছিল না। কিছুই করেন নি। সেই অন্ধকারেই ঐ মানুষটা তাঁকে জড়িয়েছে। তাঁর কাঁপুনি যত প্রবল হয়েছে ততই সে আরও কঠিনভাবে জড়াবার চেষ্টা করেছে, যেন নিজের সমস্তটুকু দেহের উত্তাপ দিয়ে তাঁর দেহের সজীবতা সক্রিয়তা—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে।…তারপর, যখন সত্যিই একটু উষ্ণতা

ফিরে এসেছে, ইন্দ্রিয়ের সচেতনতা—তা ভাল ক'রে বোঝার আগেই দুটি দেহ দেহের ধর্ম পালন করেছে। পালন যে করছে তাও তো তখন বোঝেন নি সবটা।

এর পর কি হয়েছে, কেমন ক'রে দুদিন পরে সরকারী নৌকা এসে উদ্ধার করেছে তাঁদের সেই জলবেষ্টিত চালা থেকে—সে সব তথ্য মনে ছিল না। প্রবল আত্মগ্লানি ও হতাশা ছাড়া আর কোন অনুভূতিই ছিল না। মেয়েটার দিকেও ফিরে তাকান নি। সেও দিনের আলো ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিত্যক্ত কাপড় জড়িয়ে মুখ নামিয়ে বসে ছিল।......

তুষানলে প্রাণত্যাগ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করবেন কিনা, অথবা আর কি করা উচিত গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি হা-হা ক'রে হেসেছিলেন। বলে-ছিলেন, 'তুই এখনও ছেলেমানুষ আছিস বেটা! আমাদের পুরাণে যে সব বড় বড় ঋষিদের পদস্খলনের গল্প দেওয়া আছে সে কি সব সত্যি? আমাদের পথ দেখানোর জন্যেই রূপক কাহিনী ওসব। তোর সারা জীবনের তপস্যা, তীব্র বৈরাগ্য, ঈশ্বর-পিপাসা এ সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেল ঐ এক মুহূর্তের সামান্য একটু ভ্রান্তিতে? ভ্রান্তিও তো নয়—তোরা দুজনেই তো তখন আধা অজ্ঞান ছিলি, কে জানে তখন ওটার হয়ত দরকারই ঘটেছিল। আমি ভাবছি সেই মায়ের কথাটা। তুই ঘেন্না করছিস বেটা—সে তোর দেহটা ফিরিয়ে দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে জননীর মতো, সেটা ভাবছিস না। খবরও নিলি না একটু—সে কোথায় থাকে, কী তার পরিচয়! আমি ডেকে তাকে সান্ত্বনা দিতাম। ছি ছি, সেও হয়ত মিথ্যা লজ্জায় কষ্ট পাচ্ছে। যা যা, যা করছিলি তাই করগে যা। তোকে কোন পাপ স্পর্শ করে নি এতে।

গুরুদেবের দৃষ্টি যে কত দূরপ্রসারী সেটা বুঝেছিলেন অগেহানন্দজী আরও পাঁচ বছর পরে—যখন একটি পাঞ্জাবী বৃদ্ধা মহিলা ঐ বন্যা মেয়েটিকে আর তার মায়ের চিঠি এনে ওঁর পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।

চিঠিতে লেখা ছিল—

'শ্রীচরণেষু, আমি বাল্যবিধবা। আমার বিধবা মায়ের এমন সঙ্গতি ছিল না যে অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ দেন। রোগগ্রস্ত দোজবর বর, বিবাহের পরেই তিনি মারা যান। অগত্যা মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসিতে হয়। বছর

কতক ভিক্ষা দুঃখ করিয়া কাটে, শেষে আমাকে রক্ষা করিতেই মা ঋষিকেশে থাকেন। তীর্থস্থান—সাধন-ভজন করিয়া ছত্রের অন্নে বাকী জীবনটা কাটিয়া যাইবে এই আশায়। সে আশা মেটে নাই। ছত্রের ভিক্ষা সাধুদের জন্য। আমাদের জীবনধারণের উপায় মুষ্টি ভিক্ষা—অথবা বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ। তাই করিতেছিলাম—লোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই নাই। ধনী মোহান্তদের শক্তি ও প্রভাবের অন্ত নাই, প্রাণরক্ষা করিতে দেহটা দিতে হইয়াছে। মা জীবিত থাকিতেই এ পথে নামিতে হয়। সে ব্যথা মাকে বড় বাজিয়াছিল। তবে বহুভোগ্যা হই নাই — এই যা সান্ত্বনা।

'কিন্তু যেদিন আপনার সন্তান গর্ভে আসিল—দৈব প্রেরিত বলিয়াই আমার ধারণা—সেদিন হইতে মনের ভিতরটায় যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। বিশেষ আপনার চোখে যে গ্লানিভরা দৃষ্টি দেখি—পরে পরিচয় পাইয়া বুঝি তাহার অর্থ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আপনার সম্মান রক্ষা করিবই। এ সন্তানকে পাপ-অন্নে বাঁচাইব না, মানুষ করিয়া তুলিব। এই গত পাঁচ বছর প্রাণপণে লড়িয়াছি দারিদ্র্যের সঙ্গে, পুরুষের সঙ্গে, বোধকরি আমার মতো মেয়েছেলের যাহা সাধ্য তাহার অনেক বেশি করিয়াছি। কিন্তু আর পারিলাম না। লোকে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ—সে কি গঙ্গার জলে ডুবিলেও? তবে গঙ্গার কী এত মহিমা? তাছাড়া ভগবান অন্তর্যামী, অবস্থা বুঝিয়া তিনি মাফ করিবেন। আপনার তো এখন বহু শিষ্য হইয়াছে শুনিতে পাই—মেয়েটা যাতে ভাল শিক্ষা পাইয়া নিজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে, কোন গৌরবজনক বৃত্তি ধরিয়া সৎপথে উপার্জন করিতে শেখে—কাহাকেও দিয়া এইটুকু শুধু ব্যবস্থা করিয়া দিবেন—অভাগিনীর এই প্রার্থনা। মায়ের পাপে মেয়ের না শাস্তি হয়, দয়া করিয়া সেইটা দেখিবেন। ইতি—প্রণতা বকুলমালা।'

সেদিন বকুলের জন্যে দুঃখ হলেও নিজের কতটা দায়িত্ব-দুর্ভাগিনীর অকাল-মৃত্যু, এই আত্মহত্যার জন্যে—অত তলিয়ে ভাবেন নি, মেয়েটার চিন্তাই বড় হয়েছিল। সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে, তারও বেশী আশাতীত-ভাবে, উচ্চ শিক্ষা, সৎ পাত্রে বিবাহ, দুটি উপযুক্ত ছেলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—কোনদিকেই কোন অভাব থাকে নি তার। এসব খবরই পেয়েছেন মধ্যে মধ্যে, আর ও চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোঝেন নি।

কিন্তু আজ বন্যার এই আকস্মিক আগমন—পরলোকের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যখন পা বাড়াতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে—ইষ্ট বা গুরুর নির্দেশ বলেই মনে হয়েছে।

উনি সমস্ত দায়িত্ব পালন ক'রে সর্ব বন্ধন মুক্ত হয়ে শুদ্ধ দেহমন নিয়ে ইষ্টের মুখোমুখি দাঁড়াবেন—তিনি আর উনি—এই না ভেবেছিলেন! হায় রে মানুষের অহঙ্কার!

এই যে একটা অকালমৃত্যুর বোঝা, একটা মানুষের—তাও নয়, ওঁর জীবনদাত্রীর আত্মহত্যায় দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসে আছে—সে কথা ভুলেই গিছলেন। সেদিনের সে পদস্খলন, তাও ঠিক না, এক মুহূর্তের উত্তেজনার দায়িত্ব—দুজনেরই সমান। বরং তারই কম, ওঁর বেশী। সে যা করেছে ওঁর প্রতি দয়া ক'রে। ওঁর এই দেহটা এই প্রাণটা রক্ষা করার জন্যে। অতটা তাকে ঘৃণ্য অবজ্ঞেয়, নরকের দ্বার মনে করার কোন অধিকার ছিল না, যেমন অধিকার ছিল না নিজের কর্মের বোঝাটাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার। এর কোন জৈবিক ফল হতে পারে তাও ভাবা উচিত ছিল। উচিত ছিল খোঁজ নেওয়া। তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না, কারণ থাকত না ঘটার। গুরুও সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অথচ সে ওঁর সম্মান বজায় রাখার জন্যে, ওঁর সন্তানকে কলঙ্কিত অর্থে পুষ্ট না করার জন্যে কী না করেছে, কত কষ্ট—

না, এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে, জীবনের এক বিরাট ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। তার আগে ইষ্টপথে যাত্রার কোন অধিকার নেই তাঁর।

পুষ্পে কীট সম

চোলরাজ রাজা রতিসেন স্তম্ভিতর্ভাবে চেয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। শুধু যে তাঁর দেহটা জড় হয়ে গেছে তাই নয়, বাক্‌শক্তিও যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা ক'রেও কোন কথা বলতে পারলেন না, এমন কি সে প্রাণপণ চেষ্টাতে তাঁর ঠোঁট-দুটিও নড়ল না। সবটা যেন পাষাণে পরিণত হয়েছে—সম্পূর্ণ দেহটা—সেই সঙ্গে বুঝি মনও। কি শুনলেন, কি বলা উচিত, তিরস্কার করবেন, না নিশ্চিন্ত হবেন, আনন্দ করবেন—কিছুই ভেবে পেলেন

না। ঠিক যে কোন আশাভঙ্গের বেদনা বোধ করছেন তাও নয়—শুধুই বিস্ময়, বিস্ময়। অভাবনীয়, অকল্পিত অপরিমাণ বিস্ময়।

স্তব্ধ স্তম্ভিত সকলেই ঃ অস্বাভাবিক নীরবতা ঘরের মধ্যে। এ নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রী দুজন—পিতা ও পুত্রী তো বটেই, এই যে সব দাসদাসী-পরিজন চারিদিকে সাক্ষী বা দর্শক রূপে দাঁড়িয়ে আছে ওঁদের ঘিরে—তারাও নির্বাক জড়বৎ হয়ে গেছে বিস্ময়ে। ব্যজনকারিণীর হাতে চম্পক-যুথিকা-খচিত কেতকীপত্রের সুগন্ধি ব্যজনী উদ্যত হয়েই আছে রাজদুহিতার কথাটা শোনার পর থেকে—ব্যজন করার কথা আর তাদের মনে পড়ে নি, অথবা সে শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে ঃ তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীরা, পানপাত্রবাহিনীরা দ্বার প্রান্তে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় যেন পাষাণে পরিণত—যে এক পা ভেতরে দিয়েছিল সে সেইভাবেই স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর এক পা টেনে এগোতে পারে নি ; একে-বারে বাইরে যে সংবাদদাতা দাঁড়িয়ে রাজার আদেশ বা ইচ্ছার প্রতীক্ষা করছিল—বিস্ময়ে তারও ওষ্ঠদুটি ব্যাদিত হয়ে সেইভাবেই স্থির হয়ে আছে, মুখ বন্ধ করার কথাও মনে নেই আর। 'বিস্ময়ের আঘাত' কথাটা বুঝি এতকাল শোনাই ছিল, তার সম্যক অর্থ—আজ এই অতর্কিত আঘাত লাগার পর—প্রতিভাত হ'ল তাদের কাছে।

অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে রাজা রতিসেন তাঁর বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করলেন—অথবা প্রশ্নও তাকে বলা যায় না, বিস্ময় প্রকাশই—'কী বলছ বৎসে। আমি কি ঠিক শুনছি তোমার কথাগুলো, না আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন দোষ ঘটেছে ? না কি তুমি পরিহাস করছ ?'

দুই কর জোড় ক'রে নতমুখী রাজদুহিতা রণরম্ভা বললেন, 'এ কী বলছেন পিতা! এত বড় ধিক্কারের মতো কোন অপরাধ অবশ্যই আমি করি নি। আপনার সঙ্গে পরিহাস করার মতো ধৃষ্টতা প্রকাশের পূর্বে আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। আপনি এ অনুমানই বা করলেন কী ক'রে! এমন কুশিক্ষা আপনার কাছে অবশ্যই আমি পাই নি।'...

তারপর একটু থেমে, সম্ভবত উদ্বেলিত অভিমান কিছুটা সামলে নিয়েই বললেন—'আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন দোষ ঘটে নি পিতা। গোনন্দ বংশের রাজা রণাদিত্যই আমার বিধাতানির্দিষ্ট স্বামী, সত্য কথা বলতে কি—এতকাল আমি তাঁর কাছ থেকে এই প্রস্তাব আসারই অপেক্ষা করছিলাম।'

আবারও সেই জড়বৎ স্তম্ভিত অবস্থা। কিছুকাল তেমনিই নির্বাক হয়ে রইলেন চোলরাজ রতিসেন, তার পর যেন কতকটা স্খলিত কণ্ঠে বললেন, মনে হ'ল ক্ষোভে আহত-অভিমানে রুদ্ধ হয়ে আসছে তাঁর কণ্ঠস্বর—'কিন্তু মা, তুমি—তোমার সঙ্গে সাধারণ একজন মানুষের বিবাহ হবে—এ যে আমি ভাবতেই পারি না! এতকাল যে অন্য কথাই চিন্তা ক'রে এসেছি! তুমি—! না না, এ হ'তে পারে না, দেবঅংশে তোমার জন্ম, তুমি অযোনি-সম্ভবা, মা জানকীর মতো বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা তুমি— অংশ বলি কেন—তুমি সাক্ষাৎ কমলা, নব রূপ ধারণ ক'রে মানবীর রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসেছ মাত্র। সেইভাবেই, ইষ্টদেবী হিসেবেই তোমাকে দেখেছি চিরদিন, সেবার মতো, পূজার মতো ক'রেই লালন পালন করেছি, মহামায়া আদ্যাশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেছি তোমার মধ্যে—সে কি একটা সাধারণ মানুষের কামা-সক্তিপূর্ণ বাহুবন্ধনে, ইতর লালসার মধ্যে তোমাকে নিক্ষেপ করব বলে!··· তাই যদি হয়—এতকাল নির্বিচারে এত নৃপতি বা রাজকুমারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম কেন?'

হাসলেন রাজপুত্রী রণরম্ভা; মধুর বরাভয় মিশ্রিত হাসি। বললেন, 'এই আমার ভাগ্যলিপি, মহারাজ—ভবিতব্য। এঁকে বরণ করব বলেই—অন্য পাণিপ্রার্থীদের যখন প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন আপনাকে বাধা দিই নি। এ প্রস্তাব যে আসবে—যথাসময়ে, যথানিয়মে—তা আমি জানতাম, সেই জন্যই প্রতীক্ষা করছিলাম। দেহ ধারণ করলেই দেহের নিয়ম মানতে হয়, নারীজন্ম যখন নিয়েছি, তখন বিবাহও করতে হবে বৈকি!···আর আপনি যা বলছেন পিতা, যদি সত্যিই আমাকে দেবীর অংশসম্ভূতা বা দেবী বলেই জেনে থাকেন—তাহ'লে এত অধীর হচ্ছেন কেন? আমাকে এত অসহায়, নাবালিকা, আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ বলেই বা ভাবছেন কেন? যদি দেবী বলেই মনে করেন তো নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার অভিলাষ-মতো ঈপ্সিত পাত্রে সম্প্রদান করুন। আর যদি সাধারণ মানবী বলেই ভেবে থাকেন—তাহ'লে তো বিবাহ দেওয়াই উচিত। নয় কি? আর তা দিতে গেলে কাশ্মীরাধিপতি গোনন্দ-বংশসম্ভূত রাজা রণাদিত্যের থেকে যোগ্যতর পাত্র কোথায় পাবেন? ঈশ্বর তাঁকে রাজচক্রবর্তী হওয়ার সমস্ত সুলক্ষণ ও যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠের কম্বুচিহ্নই কি বিধাতাপ্রদত্ত চক্রবর্তী লক্ষণ

নয়? এই তো এই মাত্র দূতমুখে তাঁর বীর্য-শৌর্যের বহু বিবরণ শুনলেন পিতা।'

না, আর কোন সংশয়ের অবকাশ রইল না কোথাও। অবিশ্বাস করার কোন হেতু তো নয়ই। ভুল শোনা বা ভুল বোঝার যে সম্ভাবনাটুকু শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন করে ছিলেন নৃপতি রতিসেন—সে আশ্রয়ও অবলুপ্ত হ'ল। বাস্তব সত্য ও আসন্ন তিক্ত কর্তব্যের চেহারাটা প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন এবার।

ভাগ্যে তিনি প্রস্তাব শোনা মাত্র দূতকে তাঁর অভ্যস্ত উত্তর দিয়ে দেন নি। তাহ'লে তাঁকে কী অপ্রতিভই না হ'তে হত! কন্যার এ মনের ভাব—তাঁকে আবার নিজের উত্তর হয়ত ফিরিয়ে নিতে হ'ত, থুথু ফেলে সেই থুথু চাটার মতো।

নিছক সৌজন্যের খাতিরেই পরদিন প্রভাত পর্যন্ত সময় নিয়েছিলেন তাই রক্ষা। বলেছিলেন, 'এখন আপনি স্নানাহার ক'রে বিশ্রাম করুন, পথশ্রান্তি অপনোদিত হলে অপরাহ্ণে কিছু, নৃত্যগীতাদির আয়োজন আছে—আশাকরি তাতে আপনার চিত্ত প্রসাদিত হ'তে পারবে। আর যদি এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি উপভোগ করতে চান—সে ব্যবস্থাও হ'তে পারবে। রথ প্রস্তুতই থাকবে অতিথি-নিবাসের দ্বারে।···আমিও প্রস্তাবটা বিবেচনা করার একটু সময় প্রার্থনা করি। রাত্রিটা চিন্তা করার অবসর পেলে, কাল প্রভাতে আপনি যখন অনুগ্রহ ক'রে রাজসভায় পদার্পণ করবেন তখন এর লিখিত এবং মৌখিক উত্তর আপনাকে দিতে পরব।'

এ কিন্তু নিতান্তই কথার কথা। ভদ্রতাব, রাজনৈতিক সৌজন্যের বাঁধা গৎ।

উত্তর কি দেবেন সে তো জানাই। যে উত্তর এতাবৎ সব প্রস্তাব-বাহক দূতদেরই দিয়ে আসছেন। তাঁর বিদুষী, নৃত্যগীত-শিল্পকলা-পারদর্শিনী লোকললামভূতা অসামান্যা সুন্দরী দুহিতার জন্য ভারতের সর্বপ্রান্ত থেকেই দূত আসছে—সেই প্রায়-অপার্থিব পাণি প্রার্থনা ক'রে। আর তা আসছে বলতে গেলে নিত্যই। সুতরাং কী বলবেন, কেমন ক'রে প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তাকে মেজেঘষে ধারগুলোকে মসৃণ ক'রে, কোমল ও সুসহ ক'রে তুলবেন—তা তো জানাই। সে ভাষাও মুখস্থ হয়ে আছে। সে-ই একই উত্তর। এক্ষেত্রে যে অন্য কথা বলার প্রয়োজন হবে—হ'তে পারে তা কখনও ভাবেন নি।

প্রকাশ্য সভাকক্ষ বা নিভৃত মন্ত্রণালয়—যেখানে তিনি অপর রাজ্যের

সাধারণ সংবাদবাহী দূত বা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেন—সর্বত্রই রাজপুত্রী রণরম্ভার প্রবেশাধিকার আছে। সেইভাবেই রাজা তৈরী করেছেন নিজের কন্যাকে। তার জন্য একটি আসনও নির্দিষ্ট থাকে—ঈষৎ একটি সূক্ষ্মবস্ত্রের অন্তরালে। কিন্তু তিনি প্রকাশ্য সভায় না এসেও যাতে সভার আলোচনা শুনতে পারেন—এমন ব্যবস্থাও আছে। প্রস্তর-জালিকার যবনিকা দিয়ে আড়াল করা সে কক্ষে রাজ্ঞী বা রাজকুমারী ছাড়া কারও যাওয়ার অধিকার বা উপায় নেই।

আজও কাশ্মীরাধিপতির প্রেরিত বিশেষ বার্তাবাহক দূত রাজার দর্শনার্থী শুনে সেই যবনিকার অন্তরালেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন রাজপুত্রী, স্থিরভাবেই দূতের প্রস্তাব ও পিতার উত্তর শুনেছেন। কাল প্রভাতে কী উত্তর দেবেন পিতা—তা কন্যার জানাই আছে। সেই কারণেই দূত বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তিনি অবিলম্বে রাজার দর্শ-নাভিলাষিণী।...তার পর রতিসেন এলে তাঁকে স্তম্ভিত বুদ্ধিহত ক'রে দিয়ে জানিয়েছেন, এতকাল রাজা যে উত্তর তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থীদের দিয়ে আসছেন—এই বিশেষ প্রস্তাবে সে উত্তর দেওয়া চলবে না। এ বিবাহে তাঁকে সম্মতিই দিতে হবে এবং অচিরকাল মধ্যে সে বিবাহের যাবতীয় আলোচনা ও আয়োজন শেষ ক'রে ফেলতে হবে।

সাধারণত কোন সুপাত্রের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এলে ধনী দরিদ্র-নির্বিশেষে কন্যার পিতারা আহ্লাদিত হন এবং সে বিবাহের কথাবার্তা উভয়-পক্ষের অনুমোদন লাভ করলে নিশ্চিন্ত হন, নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন। এমন কি নৃপতিদের পক্ষেও এ কথাটা সমান সত্য।

শুধুমাত্র চোল-রাজই বুঝি এ নিয়মের ব্যতিক্রম। তার কারণ রাজনন্দিনী রণরম্ভাও ঠিক সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়েন না। বরং বলা যেতে পারে প্রচণ্ড ব্যতিক্রম।

তাঁর জন্ম থেকেই তিনি অসাধারণ, অনন্য।

সাধারণ মানবদুহিতার মতো তিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন-নি, তাঁকে কেউ ভূমিষ্ঠ হতে দেখেও নি। কার ঔরসজাতা সে প্রশ্ন তো নিরর্থক। মনে হয় যেন রতিসেনকে অনুগৃহীত কৃতার্থ করতে সত্যই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে এসে দ্বিতীয়বারের মতো সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন। আর,

তা যদি না হবে, তাহ'লে—তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই চোল নৃপতির ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি শক্তি ও রাজ্যসীমার এমন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হবে কেন?···কে জানে, হয়ত সেই কারণেই কন্যার বিবাহ দেওয়াতে তাঁর এত অনীহা।

রণরম্ভার জন্মকাহিনী সত্যই অবিশ্বাস্য।

রাজা রতিসেন প্রতি বছর লক্ষ্মীদেবীর জন্মতিথিতে সমুদ্রপূজা দিতে যান। মহিষী ও স্বল্পসংখ্যক অনুচর পরিজন নিয়ে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের মতোই যান তিনি। সর্বপ্রকার রাজ-আড়ম্বর বর্জন ক'রে, উপবাসী থেকে শেষ এক যোজন পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন—এই তাঁর নিয়ম। শুধু মহিষীরা—যাঁরা খুব অশক্ত কি অসুস্থবোধ করেন তাঁদের জন্য শিবিকার ব্যবস্থা থাকে, নতুবা সকলেই রাজার সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাত্রার এই শেষ পর্ব সমাপন করেন।

সেবারও এইভাবেই পূজা দিতে গিয়েছিলেন রাজা। প্রত্যূষে সূর্য-অনুদয়ে যাত্রা ক'রে দ্বিতীয় প্রহরের পূর্বেই সমুদ্রতীরে পৌঁছেছিলেন তিনি। স্নান-পূজা-হোম সেরে, সমুদ্রবন্দনার সময় যখন তিনি চরম অর্ঘটি নিবেদন করার জন্য জলের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন—ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকারণেই—কারণ জোয়ার বা বানের সময় সেটা নয়, বাতাসেরও তেমন উন্মত্ত প্রবলতা ছিল না—একটি বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গ ঘটল এবং সেই তরঙ্গের শিখরে ভেসে-আসা দেবশিশুর মতো সদ্যোজাতা কন্যা—সাক্ষাৎ ওঁর ইষ্টদেবী পদ্মালয়া পদ্মিনীর মতোই—প্রায় আছড়ে এসে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে, আর সেই অভিঘাতে হাত নড়ে গিয়ে সমুদ্রের উদ্দেশে নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য গিয়ে পড়ল ঐ নবজাতিকার পায়ে।

আরও বিস্ময়ের কথা—দেখা গেল, কন্যাটি তখনও জীবিতা, কারণ বালু-বেলার পড়েই কেঁদে উঠল—অর্থাৎ এই লবণ জলেও তার প্রাণহানি ঘটে নি, সজোরে আছড়ে পড়ার জন্যও না।

সুতরাং, এই ঘটনাকে যদি বিধাতার ইঙ্গিত বলেই ধরে নিয়ে থাকেন রাজা রতিসেন তো তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অতঃপর সে কন্যাকে যে স্বীয় ইষ্টদেবী কমলালয়া লক্ষ্মীদেবীর মতোই মাথায় ক'রে ঘরে নিয়ে আসবেন—এও স্বাভাবিক।

প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় দেবী জেনেও হয়ত মানবীর মতোই আচরণ

করেছেন চোলরাজ ও তাঁর প্রধানামহিষী রত্নাদেবী—সাধারণ মেয়ের মতোই তাড়না করেছেন, তিরস্কার করেছেন। প্রত্যহের মালিন্যে দেবী-বিশ্বাসের দীপ্তি সব সময় অম্লান থাকে নি। তবু যখন কন্যা কৈশোরে পদার্পণ করেছে, তার রূপগুণ শিল্পপ্রতিভা ও মণীষার খ্যাতি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে কিংবদন্তীর মতোই—এসেছে অগণিত নৃপতি বা রাজকুমারদের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব—তখন ঠিক অপর কন্যার পিতাদের মতো উল্লসিত হয়ে উঠতে পারেন নি। দেবীর অংশে সম্ভূতা, হয়ত বা সাক্ষাৎ দেবীই—তাকে সাধারণ মানুষের হাতে—কামক্রোধলোভের অধীন, ষড়রিপুর দাস, অসূয়াপরায়ণ, নীচ, লোভী, ক্ষুদ্র-স্বার্থসর্বস্ব এই সব নরপতির হাতে তুলে দিতে মন সরে নি। অলস ইন্দ্রিয়দাস, আরামপ্রিয়, বিলাসব্যসনমগ্ন ঐ সব মানুষ এ কন্যাকে স্পর্শ করলেও যে এর অপমান!

'তবে কি এ কন্যার বিবাহ দেবেন না কোন দিন?' এ প্রশ্ন উঠেছে বৈকি!

মহিষী ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করেছেন।

তার উত্তরে রাজা জানিয়েছেন—কোন মহান যোগী কি সাধক—কোন যথার্থ মহাপুরুষের যদি সাক্ষাৎ পান কোন দিন, তারা যদি কেউ নিতে রাজী থাকে তাঁর কন্যাকে—তবে তার হাতেই তিনি এই কন্যাকে দিতে পারেন, সাধারণ কোন ভোগোন্মত্ত গৃহীকে নয়।

'সে কি! আমার মেয়ে সন্ন্যাসিনী হবে! কী বলছেন আপনি!'

'কেন—নগেন্দ্রনন্দিনী গৌরী কি সন্ন্যাসিনী হন নি? তিনিই তো আমাদের সবার পূজ্যা, সব সতীর আদর্শ—নয় কি?'

'কিন্তু সাধক যোগী—বিবাহ করবে?'

'কেন করবে না মহিষী? পুরাণ পড়ো নি? সেকালের কোন্ মহর্ষি অবিবাহিত ছিলেন—এক শুকদেব ছাড়া? আর, যিনি যথার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি আমার মায়ের স্বরূপ নিশ্চয়ই বুঝবেন, বুঝে মাথায় ক'রেই রাখবেন। এমনি কোন লোক—অথবা মা কমলা যখন দয়া ক'রে এই মর্ত্যে এসেছেন তখন ভগবানও কোথাও এসে আছেন নিশ্চয় মানবদেহ ধারণ ক'রে—সেই রকম কোন অবতার-সদৃশ মানুষ পেলে আমি সানন্দে সসম্মানে তার হাতে কন্যাকে তুলে দেব রাজ্ঞী!'

কিন্তু এ সব আশাই ধূলিসাৎ হয়ে গেল রাজা রতিসেনের। স্বয়ং কন্যা রণরম্ভাই ক'রে দিলেন তা।

রাজার মনে, ভক্তি সম্ভ্রম উচ্চাশা দিয়ে যে এক মোহের স্বপ্নজাল রচিত হয়েছিল—তা এক কথায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। অপ্রতিভ অপ্রস্তুত হলেন তিনি তাঁর অন্তপুরে আত্মীয়-পরিজন-সভাসদ সবার কাছে। অপরাধী হয়ে রইলেন ভারতের রাজন্যসমাজেও। সেই এক সাধারণ রাজার হাতেই সম্প্রদান করতে হ'ল কন্যাকে!

না দিয়েও উপায় নেই—তা তিনি জানেন। মেয়েকে বলতে গেলে ইষ্টদেবীর আসনে বসিয়ে প্রতিপালন করেছেন, তার ইচ্ছা দৈব-অনুজ্ঞার মতো সম্মানিত হয়েছে এ রাজ্যে এতকাল। বুদ্ধিমতী মেয়ে—কখনও খামখেয়ালের বশে কিছু করে না, অনেক ভেবে অনেক বিবেচনা ক'রেই কথা বলে; তাই ইদানীং রাজকার্যেও তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং নির্বিচারে সেই মতোই চলতেন। আজ আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং পরের দিন—এই প্রথম—কাশ্মীরের দূত সুসংবাদ নিয়ে ফিরে গেল। রাজ্যে উৎসবের সাড়া পড়ল, পণ্ডিত জ্যোতিষীরা খুঙ্গি-পুঁথি খুলে দিন-ক্ষণ-লগ্ন বিচারের নামে মহাতর্ক জুড়ে দিলেন, নানা আয়োজন শুরু হয়ে গেল নানা দিকে। রাজার আদরিণী জননীস্বরূপা কন্যার বিবাহে কোন ত্রুটি কোন দীনতা অসম্পূর্ণতা না ঘটে—সে বিষয়ে সকলেই সচেতন, ব্যস্ত।

আয়োজনও তো বড় কম নয়। অন্য এক দেশের রাজা আসছেন বিবাহ করতে (এই বিষয়ে রতি সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রতিভূ পাঠিয়ে বিবাহ করা চলবে না, অথবা প্রথামতো তিনিও কন্যাকে তুলে দিয়ে আসবেন না সেদেশে—অন্তত এ ক্ষেত্রে—পাত্রকে নিজে এসে নিয়ে যেতে হবে। কার হাতে তুলে দিচ্ছেন এ দেবী প্রতিমাকে—নিজের চোখে দেখে নিতে চান), সঙ্গে কোন্ না দ্বিসহস্রাধিক লোক থাকবে সৈন্যসামন্ত দাসদাসী মিলিয়ে। তাদের বাসস্থান, উত্তম আহার্যের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, সেবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক দাসদাসী পরিদর্শক, আদর-আপ্যায়নের সহস্রবিধ খুঁটিনাটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। রাজ্য রাজধানীর পথঘাটের সংস্কার প্রয়োজন, দেখা দরকার অতিথিশালাগুলি জলাশয়গুলি ব্যবহারোপযোগী আছে কিনা—সর্বাধিক প্রয়োজন এ নগরীকে সংস্কারের দ্বারা যৌবনবতী ক'রে তুলে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত ক'রে তোলার।

সবই চলতে লাগল। সব কাজ, সব আয়োজন। সমগ্র রাজ্য আসন্ন উৎসব-আনন্দমুখর হয়ে রইল। কেবল স্বয়ং কন্যার পিতা—এই বিবাহে যার সর্বাধিক আনন্দিত হবার কথা—সেই রাজা রতিসেনই যেন কোন উৎসাহ পেলেন না কোথাও, চিন্তা, অস্বস্তি ও ক্ষোভের পরিসীমা রইল না তঁার।

অস্বস্তি ও ক্ষোভ কি রাজনন্দিনী রণরম্ভারই কম। তিনিই কি খুব উৎসাহ বোধ করছেন তাঁরই আদিষ্ট এই প্রত্যাসন্ন উৎসবে?—তাঁরই নির্বন্ধাতিশয্যে যে শুভ বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, সেই আপাতবাঞ্ছিত প্রিয়-মিলন-ক্ষণটির কল্পনার?

না, আদেশ করেছেন ঠিকই, নির্বন্ধ প্রকাশ করেছেন তাও অনস্বীকার্য—কিন্তু ঘটনাটা যা হতে চলেছে তা ঈপ্সিত নয় আদৌ। অথচ কেন যে নয়, সে কথাটা কাউকে জানানো যাবে না কোন দিন। এমনকি যে এই উৎসবের প্রধান পাত্র, তাঁরই আকাঙ্ক্ষিত জীবনদেবতা—ইহজীবনের তো বটেই, লোকে বলে জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী—তাকেও না।

তাকে বললেও সে বিশ্বাস করবে না, কারণ ওঁর মতো পূর্বজন্মের স্মৃতি নিয়ে সে জন্মায় নি। গত জন্মের সুকৃতির ফল ভোগ করতে এসেছে, করবেও—কিন্তু সে কথাটা জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না কখনও। ওঁরই যে হচ্ছে বিপদ, উনি যে সবই জানেন, সেই জন্মক্ষণ থেকে, শিশুকাল থেকেই সমস্ত অবগত আছেন। জানেন উনি পিতামাতার মনোভাবও, তাঁদের অভিমান, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা সব।

তবু তাঁদেরও কিছু জানানো সম্ভব নয়। এ রহস্য অমুন্মোচিতই থাকবে—তাঁদের কাছেও।

তিনি যে কত নিরুপায়, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যে এই কাজ করছেন—যে কাজকে লোকে তাঁর সুখভোগ বিলাসাসক্তি বলে মনে করছে—সেটা যে তা নয়, লোকের অনুমান যে সর্বৈব ভুল—সে কথাটা তাদের খুলে বলা যাবে না। তাঁদের একটু সান্ত্বনা স্বস্তি ও শান্তি দেওয়া যাবে না। যে কথা জানলে তাঁরা নিশ্চিন্ত সমব্যথী হতেন—সেকথা না জানাতে পারার ফলেই তাঁরা ক্ষুব্ধ ও অভিমানাহত হয়ে রইলেন। এমনকি তাঁদের ক্ষুব্ধ দেখে উনি যে কী পরিমাণ দুঃখিত ও লজ্জিত সে কথাটাও তাঁরা বুঝবেন না

বা অনুমান করতে পারবে না কোনদিন। তিনি যে ওঁদের এই শ্রদ্ধা ও স্নেহে প্রীত, অভিভূত সে কথাটাও যদি কোনদিন ওঁরা জেনে যেতে পারতেন! তা হয়ত কোনদিনই হবে না, এই অমূলক অভিমান নিয়েই একদিন তাঁরা ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবেন—এই ভুল বোঝার ব্যথা ও আঘাত এঁদের আর ওঁকেও বহন করতে হবে চিরদিন—আমরণ।

অথচ ঈশ্বর জানেন তিনি কত নিরুপায়, নিজেরই করুণার বন্ধনে কী কঠিনভাবে বন্দিনী। নাগপাশেরও বুঝি বেশী কঠিন সে বন্ধন।

যখন মনে হয় সে কথাটা—নিজের নির্বুদ্ধিতা স্মরণ ক'রে তখন সাধারণ মানবীর মতোই এই প্রাসাদের পাষাণকুট্টিমে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করে।

নির্বুদ্ধিতা বৈকি।

একটা অতি সাধারণ—না, সাধারণ মানুষের থেকেও ছোট—ধূর্ত, লোভী, দ্যূতাসক্ত মানুষের চতুরতার কাছে হেরে গিয়ে, অপাত্রে অযাচিত করুণা দেখাতে গিয়েই আজ তাঁর এই অবস্থা। ওঁরা যে সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ—এ বড়াই আর করা চলে না এর পর।···

এই যে রাজা রণাদিত্য—স্বেচ্ছায় যাকে পতিত্বে বরণ করতে যাচ্ছেন দেবী রণরম্ভা, এ লোকটা পূর্বজন্মে অতি সাধারণ—আবারও সাধারণ কথাটার অপব্যবহার হ'ল—অতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ছিল; জুয়াড়ী, মদ্যপ, ভবিষ্যৎ-চিন্তাহীন, খেয়ালী, ভবঘুরে।

জুয়ার নেশাতে সর্বস্বান্ত ও আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত হয়ে শেষে এমন একটা অবস্থা এল যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ কোথাও খোলা রইল না লোকটার। আত্মঘাতীই হতে যাবে—হঠাৎ জুয়াড়ীর স্বভাব নিজের স্বধর্মে প্রবল হয়ে উঠল। শেষই তো করতে যাচ্ছে জীবন, তার আগে শেষ বারের মতো সেটা নিয়ে জুয়া খেলতে দোষ কি? সে শুনেছে, বহু লোকের মুখেই শুনেছে—বিন্ধ্যাচলে দেবী ভ্রমরবাসিনী আছেন, তিনি নাকি মহাজাগ্রত, কেউ যদি কষ্ট ক'রে তাঁর স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তাহলে তার আর ভাবনা নেই, যার যা অভীষ্ট তা দেবী তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন।

তবে সেখানে পৌঁছনোই খুব কঠিন, লোকে বলে প্রায় অসাধ্য।

অতি দুর্গম পথ। দুরারোহ, বিপদসঙ্কুল। বিজন গভীর অরণ্যের মধ্য

দিয়ে দীর্ঘ পার্বত্য সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে সে যাত্রা, নানা প্রকার হিংস্র বন্যজন্তু-অধ্যুষিত পিশাচে পূর্ণ সে পথ। তাও যদি বা সাহস ক'রে কষ্ট ক'রে খানিকটা যায়—শেষ পাঁচ যোজন পথ একেবারেই অনতিক্রম্য। লক্ষ কোটি বরটা ও ভৃঙ্গরোলে* আচ্ছন্ন পথের সেই শেষ অংশটুকু; কোন জীব, কোন জীবিত প্রাণী তাদের এলাকায় পদার্পণ মাত্র তারা সেই হতভাগ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিমেষে তাকে অস্থিসার ক'রে দেয়। সেখানে তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল নাকি মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুকে হয়ত সবাই অত ভয় করে না—কিন্তু অতি যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ এ মৃত্যু। জীবনের, এই দেহের এক অতি বীভৎস পরিণতি।

সে পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। নিতান্তই পতঙ্গ—কিন্তু তবু কোন মানুষের সাধ্য নেই ঐ লক্ষ লক্ষ দংশক পতঙ্গের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তার চেয়ে বাঘ কি সিংহ কি সাক্ষাৎ যমদূতের সঙ্গেও লড়াই করা ঢের সহজ। অতি বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ মানুষের শরীরও কয়েক লহমার মধ্যে কয়েকখানা অস্থিতে পর্যবসিত হয়, রেণু রেণু হয়ে যেন উবে যায় তার মাংস-মজ্জা-পেশী।

এ সবই শোনা ছিল লোকটার। এখনও অনেকেই তাকে নিষেধ করল, নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল, এমন দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হবার বাতুলতা প্রকাশ করতে না যায়। কিন্তু তার ধারণা—যেখানে অপায় সেখানে উপায়ও কিছু আছে। তাছাড়া মানুষের বুদ্ধি যদি ক'টা নগণ্য পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারে, তবে সে কিসের বুদ্ধি? বিশেষত, বিপদটা যে কি আর কত সেটাই যখন জানা হয়ে গেল তখন আর অত ভয় কিসের?

আর, মরতেই তো যাচ্ছে, হয় দেবী ভ্রমরবাসিনীর কৃপা—না হয় মৃত্যু, এ দুয়ের মধ্যে তো আর কোন মধ্যপন্থা নেই—সুতরাং ভয় ক'রেও কোন লাভ নেই। ভীমরুল বোলতার হাতেই যদি নিহত হয় শেষ পর্যন্ত, সেইটেই না হয় আত্মহত্যা বলে মনে করবে।

অনেক চিন্তা ক'রে সে এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাও অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

প্রথম এক প্রস্থ পুরু লোহার বর্ম তৈরী করাল নিজের মাপে। তাতে

---

* বোলতা ও ভিমরুল।

দেহ আবৃত করার পর তার ওপর মহিষচর্মের আবরণ রচনা করল। তারও ওপর পুরু ক'রে মাটি লেপে নিল। তুষ ও গোবরের সঙ্গে পচিয়ে কঠিন ক'রে নিল সে মাটি—লোহার মতোই। এইভাবে নিজের দেহকে সম্পূর্ণ যেন অবলুপ্ত ক'রে দিল সে।···

সবই ক'রে ছিল—কিন্তু পাঁচ যোজন পথও যে বড় কম নয়—বিশ ক্রোশ, সেই হিসেবটাই ভাল করে কষে দেখে নি।

প্রথমটা বেশ নির্বিঘ্নেই গেল। বন্য শ্বাপদ কি পিশাচ তার কিছু করতে পারবে না সে জানত। অন্য বাধাও বড় কম নয়—বিন্ধ্য পর্বতের বিজনতম ও গভীরতম প্রদেশে দেবী ভ্রমরবাসিনীর পীঠস্থান, শেষ খানিকটা পথে কোন খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই—আছে শুধু নানা প্রকারের আতঙ্ক, অপরিসীম কষ্ট এবং প্রতিপদে মৃত্যুর সম্ভাবনা। তবু একমনে দেবীকে ডাকতে ডাকতে অনায়াসে পথের সে অংশও একসময় অতিক্রম করল। কিন্তু ঐ শেষ পঞ্চ যোজন পথ শুরু হতেই বুঝল সে কী নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে—হিসেবে তার কতখানি ফাঁক ছিল।

আগে কিছুই বোঝা যায় না—কিন্তু তাদের সীমানায় পা দেওয়া মাত্র যেন কোন মন্ত্রবলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভীমরুল ও বোলতা এসে হাজির হয়, যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠে, অথবা বাতাসেই জন্ম নেয়, সেই অগণিত পতঙ্গের ছায়ায় সূর্যও আবৃত হয়ে যান, মনে হয় দিবাভাগে রাত্রি নেমে এসেছে—শুধুমাত্র তাদের পক্ষসঞ্চালনের মিলিত শব্দই দূরশ্রুত মেঘ-গর্জনের মতো মনে হয়, মনে হয় কোথায় বুঝি প্রবল ঝড় উঠেছে।

লোকটি কিন্তু শুধু দৃঢ়চেতা নয়—করিৎকর্মাও। বিপদ বুঝে সে প্রাণ-পণেই অন্তিম লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল। যথাসাধ্য দৌড়তে লাগল সে! কিন্তু দৌড়ুক—তাকে মাটি পেরিয়ে যেতে হচ্ছে, অতখানি বোঝা বহন করে। বোলতাদের পায়ের ওপর ভরসা নয়—তাদের পাখা আছে, অনায়াসেই তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে তারা। পঙ্গপালের মতো চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, অবিরত হুল ফোটাচ্ছে। সে আক্রমণের মুখে মাটির আস্তরণ কতক্ষণ থাকে? দেখতে দেখতে মাটি গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল, ধুলো হয়ে বাতাসে মিশে গেল। তখন আঘাত শুরু হল মহিষচর্মের ওপর। ক্রমাগত সে দংশনে এক সময় সে স্থূল মহিষচর্মও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপরই ঠন্ ঠন—লোহার ওপর

এসে পড়তে লাগল পতঙ্গগুলো। লোহা কঠিন বস্তু ঠিকই কিন্তু লক্ষ লক্ষ মরীয়া বোলতা ও ভীমরুলের কাছে তার কাঠিন্যই বা কতক্ষণ টেঁকে? লোহাও ক্ষয় হতে শুরু হ'ল। শেষ পর্যন্ত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

লোকটিও অবশ্য স্থির হয়ে নেই; সেও প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, কোন দিকে না চেয়ে, কোন চিন্তায় সময় নষ্ট না ক'রে। পা আর চলে না—কিন্তু থামলে যেখানে মৃত্যু অনিবার্য, অনতিবিলম্বিত, সেখানে চলতে হবে বৈকি। তৃষ্ণায় আকণ্ঠ আবক্ষ শুষ্ক হয়ে গেছে, তা যাক, বেঁচে থাকলে জল খাওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, এখন শুধু সেই বেঁচে থাকার কথাটাই ভাবো। বাঁচতে যদি চাও তো দৌড়ও, দৌড়ও। আরও, আরও জোরে। আর একটু, আর একটু গেলেই মন্দির পাওয়া যাবে, মিলবে দেবী দর্শন। তারপরেই শান্তি, সমৃদ্ধি, ইহজীবনের যা কিছু কাম্য—সব মিলবে। আর কোন ভয় থাকবে না।···

লোহাও যখন ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেল—তখন শুরু হল মাংসনাশ। অসংখ্য তীক্ষ্ণ দ্রংষ্টাঘাতে চর্ম গেল—মাংস-বসা স্নায়ু-পেশী সব গেল। তবু দৌড়চ্ছে লোকটা দু হাতে মুখ ঢেকে, মানে হাতের হাড় ও ভেতর দিকের সামান্য কিছু চামড়ায় ঢেকে—বাকীটা তো চলে গেছে কখনই। আর একটু, আর একটু। হে ভগবান, হে দেবী ভ্রমরবাসিনী, আর একটুখানি বাঁচিয়ে রাখো, এইটুকু যাওয়ার মতো শক্তি দাও। আর একটু। এত কষ্ট, অমানুষিক, কল্পনাতীত কণ্ট—যেন বৃথা না যায়।

অবশেষে একসময় সত্যিই সেই স্থান' বা মন্দিরের সীমান্ত পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছনো মাত্র সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র পতঙ্গগুলো যেন কোন জাদুমন্ত্র-বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটিও সেই সঙ্গে শান্তিতে ও শ্রান্তিতে আছড়ে পড়ল—মৃতের মতোই। অবশ্য মানুষ বা জীবিত প্রাণী সম্বন্ধেই মৃত্যুর কথা ওঠে, এ কোন প্রাণী আর নেই তখন, শুধু একটা নরকঙ্কাল আর তার মধ্যে সামান্য পতঙ্গভুক্তাবশিষ্ট দেহযন্ত্রাবশেষ; হয়ত সত্যিই প্রাণ তখন আর ছিল না, থাকা সম্ভব নয়।

বহু যুগ, বহু শতাব্দী পরে এই দুঃসাধ্য সাধন করল একজন। দেবী ভ্রমরবাসিনী কত বৎসর ধরে নিঃসঙ্গ বসে আছেন এখানে, কোন ভক্ত

পূজার্থীর প্রত্যাশায়—কেউ আসে নি, আসতে পারে নি। আজ এতকাল পরে এই একটি ভক্তের কঠোর সঙ্কল্প ও একনিষ্ঠতা দেখে দেবী যে করুণার্দ্র হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে তাঁর অভয়পূর্ণ স্নেহ ও প্রশ্রয়ভরা বাম হাতখানি রাখলেন সেই কঙ্কালের ওপর। দেবীর কৃপায় ও ইচ্ছায় দেখতে দেখতে এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল—যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, কাউকে বিশ্বাস করানো তো যায়ই না। সেই কঙ্কালের ওপরই আবার ধীরে ধীরে মাংস-পেশী শিরা-উপশিরা গড়ে উঠল। পুরে উঠল অস্থি-পঞ্জরের মধ্যেকার শূন্যতা; ধমনীতে হ'ল শোণিত সঞ্চার; সেই মাংসপিণ্ড ক্রমে চর্মে আবৃত হ'ল, মাথায় কেশ, দেহে লোম দেখা দিল আবার—দেখতে দেখতে পূর্ণাঙ্গ মানুষটা প্রাণ পেয়ে উঠে বসল এক সময়।

এই পুনর্জন্মে কিছু-পূর্বের ঘটনাও স্মরণ করা কঠিন।

লোকটি উঠে বসে বিহ্বলভাবে চারদিকে চাইতে লাগল শুধু। দেবীর অসীম করুণায় কেবলমাত্র সে প্রাণ পেয়েছে তাই না—এই মৃত্যু-পণ-করা সুকঠিন যাত্রার প্রাণঘাতী পথশ্রমও অপনোদিত হয়েছে, সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে আবার।

বিহ্বল হবার কথাই যে।

মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছবার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বুঝি অবশিষ্ট ছিল তার চোখ দুটিই। শেষ পর্যন্তও হাতের অস্থি দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছিল; মরে বা মূর্ছিত হয়ে পড়ার আগে একবার মাত্র চেয়ে দেখতে পেরেছিল—দেখেছিল সামনেই মৃতাস্থিনির্মিত সিংহাসনে এক ভয়ঙ্করী ভীষণ-দর্শনা মূর্তি, সম্ভবত তিনিই দেবী ভ্রমরবাসিনী।

কিন্তু এখন জ্ঞান হয়ে চেয়ে দেখল সে সিংহাসন শূন্য, মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্তিই নেই। তবে কি সে আগেই ভুল দেখেছিল? অথবা তখনই তার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়েছে, মৃত্যুর আঁধারে আচ্ছন্ন হয়েছে চক্ষু—যা দেখছে তা নেহাৎই মৃত্যুপূর্ব মস্তিষ্ক-বিকৃতি?

তবে সে অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর রইল না বেশীক্ষণ। সেই মূর্তির খোঁজেই—এদিক ওদিক চাইতে গিয়ে—দৃষ্টি ও মন অপর এক স্থানে, অপর এক দৃশ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল।...

দেখল তার অদূরে একটি ছোট্ট জলাশয়ের ধারে হাতে একটি সমৃণাল পদ্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পদ্মালয়া কমলার মতোই অপরূপা এক নারীমূর্তি ! !

এমন মেয়ে সে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি। এত সুন্দর যে কেউ হয় তাও জানত না।

এই কি অপ্সরা তাহ'লে—ওর প্রতি দেবতার মূর্তিমতী আশীর্বাদের মতো স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে ? এই কি উর্বশী অথবা তিলোত্তমা ? এদেরই কি সুরকন্যা বলে ?

সেদিকে চেয়ে বিহ্বলতা বাড়ল বই কমল না ! মাথা ঝিমঝিম করছে ওর, কিছু যেন মাথায় ঢুকছে না। আবারও মনে হ'তে লাগল যে হয়ত সে মরেই গেছে। যেখানে এসে পৌঁচেছে এইটাই স্বর্গ।

অথবা বিকারের ঘোর এটা। মৃত্যু-পূর্ব বিকার।

তবে বেশীক্ষণ তাকে দ্বিধা বা বিহ্বলতার মধ্যে রাখল না—সেই কবি-কল্পনা-গঠিতা অনিন্দ্যসুন্দরী নারী-মূর্তি। অতি, অতি মধুর, অপার্থিব সুর-সঙ্গীতের সুরে কথা বলে উঠল, 'ভদ্র তুমি বড়ই কস্ট পেয়েছ, না ? পথ যেমন দুর্গম, তেমনই কস্টদায়ক। এত ক্লেশ স্বীকার ক'রে কেন এলে তুমি ? বুঝতে পারছি, কথা কইতে এখনও তোমার কষ্ট হচ্ছে। এক কাজ করো বরং—এই সরোবরের জল পান করো—সমস্ত শ্রান্তি এখনই দূর হবে। বিশ্রামের সুব্যবস্থাও আছে। পথকস্ট দূর হ'লে যেজন্যে এসেছ তা শুনব। যদি কোন অভীপ্সা থাকে, মনের কোন গোপন বাসনা—নিঃসঙ্কোচে জানিও, যে বর ইচ্ছা নির্ভয়ে প্রার্থনা ক'রো।'

লোকটি উত্তর দিল, 'বরাঙ্গণে, কষ্ট খুবই পেয়েছি বটে, তবে তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে সব কষ্ট আর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ক্ষুধা-পিপাসাও—বিশ্রামেরও আর প্রয়োজন বোধ করছি না। কিন্তু তুমি কে যে আমাকে বর দিতে চাইছ ? তোমার পরিচয় জানতে বড়ই কৌতূহল হচ্ছে। তুমি কি মানবী না সুরকন্যা ? কিম্বা অপ্সরা ? অথবা কোন দেবী মানবীরূপ নিয়ে এসেছ ?'

মেয়েটি যেন ওর মূঢ়তায় কৌতুক বোধ করল। হেসে বলল, 'বন্ধু, তুমি দেখছি এই অমানুষিক পথশ্রমে বড়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছ। নইলে হাতের কাছে অমৃত ফল সহজলভ্য থাকতে তুমি তার বৃক্ষের পরিচয় নিতে ব্যস্ত হবে

কেন ? আমি দেবীই হই আর মানবীই হই—বর যখন দিতে চাইছি, তখন কী তোমার প্রার্থনা সেইটেই আগে জানাও না। দেবার ক্ষমতা না থাকলে একথা বলবই বা কেন ?'

সেই সুরদুর্লভ রূপের অসহ বিদ্যুদ্দীপ্তিতে মুগ্ধ লোকটির দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেও—তার চিন্তাশক্তির আচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ কেটে এসেছে এতক্ষণে, পূর্ব দেহ ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব সংস্কার ও বৈষয়িক বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে আবার। সে বলল, 'যা চাইব দেবে ? বঞ্চনা করবে না ?'

'আঃ! তুমি বড় অবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়হীন। বলছি তো দেব।'

'তাহলে তোমাকেই চাই আমি, আর কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই। প্রিয়ারূপে বা জায়ারূপে প্রার্থনা করছি তোমাকে। এই বর দিয়ে তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো।'

এইবার সেই নিরুপমা কন্যার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন, 'মূঢ়, এ তোমার কেমন দুর্বুদ্ধি ! তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমিই দেবী ভ্রমরবাসিনী, তোমার নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও এই প্রভূত ক্লেশ-স্বীকারে প্রসন্ন হয়ে তোমাকে দেখা দিতে এসেছি ! তুমি অন্য কোন বর চাও, রূপ যৌবন বিত্ত রাজ্য—যা চাও দেব।'

'উঁহু। আমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি দেবীই হও আর মানবীই হও—তোমাকেই আমি চাই। তুমি কথা দিয়েছ, বাক্য-দত্ত—আশা করি কিছু পূর্বের উদার অভয় মিথ্যা হ'তে দেবে না।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল লোকটি। বরবর্ণিনী নারীর রূপলালসায় তার তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

অনেক বোঝালেন দেবী, অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, বিস্তর লোভ দেখালেন। অপর সুন্দরী মেয়ে যোগাড় ক'রে দিতে চাইলেন। লোকটার কিন্তু এক কথা—'তোমাকেই চাই। আর কিছুতে আমার তৃপ্তি নেই। দিতে হয় তো নিজেকেই দাও।'

নিজের উদারতা ও সহানুভূতির ফাঁদে নিজেই তখন জড়িয়ে পড়েছেন দেবী ভ্রমরবাসিনী। তাঁর কথা মিথ্যা হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা একটা দীর্ঘঃনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, তাই হবে। তবে ইহজন্মে নয়, এই কলুষিত দেহ ও মনের সংস্কার বা শোধনের আগে নয়। জন্মান্তরে তুমি কোন রাজবংশে জন্ম নিলে আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করব।'

এই বলে তিনি—আর কোন বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই অন্তর্হিত হলেন।

লোকটিও আর অপেক্ষা করা বৃথা জেনে সেখান থেকে রওনা দিল। পাশার দান পড়ে গেছে, বাজীও হস্তগত। অবশ্য যা চাইতে এসেছিল তা আর চাওয়া হ'ল না, ঐহিক কোন সুবিধাই পাওয়া গেল না। অসুবিধা যা ছিল, যে জন্য জীবন পণ করে এসেছিল—তা রয়েই গেল। আর কোন সম্ভাবনাও নেই সে সব সুবিধা লাভের। তা না হোক, তার চেয়ে ঢের মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে—অথবা বলা উচিত পরজন্মে পাওয়া যাবে। পাওয়া যে যাবে সে সম্বন্ধে যখন নিশ্চিত, তখন সেই আগামী জন্মগুলোই ত্বরান্বিত করা উচিত। মিছিমিছি এ জীবন বিলম্বিত ক'রে লাভ নেই। পথে যদি আবারও বোলতা ভীমরুলে শেষ ক'রে দেয় সে-ই ভাল। এবার আর বিলম্বও হবে না, বর্মচর্ম কিছুই নেই।···

কিন্তু দেবীর কৃপা লাভ করেছে বলেই হোক, বা শুধু আসার পথটা অগম্য ক'রে তোলাই উদ্দেশ্য বলে হোক—ফেরার পথে কোন কষ্টই হ'ল না—একটি বোলতা কি ভীমরুলও দেখা গেল না কোথাও। বরং মনে হল পথ অনেক সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সুখকর হয়ে উঠছে। অনায়াসে, অল্প কয়েক দিনেই লোকালয়ে ফিরে এল আবার।

কিন্তু লোকালয়ে বা সংসারে ফিরে আসা মানেই তো জীবনে নানা সমস্যা। অন্তত ওর জীবনে। পাওনাদাররা তেমনি উগ্র ও রূঢ় হয়ে উঠবে, লাঞ্ছনা অপমানের শেষ থাকবে না। সে আর দেশে ফিরল না, প্রয়াগে অক্ষয়বটের নিচে বসে—দেবী ভ্রমরবাসিনীর সেই অলৌকিক অবিশ্বাস্য রূপ ধ্যান করার চেষ্টা করতে করতে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করল।

সেই লোকটিই এ জন্মে নৃপতি রণাদিত্য হয়েছে। আর তার জন্যেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধা দেবী ভ্রমরবাসিনীকে রণরম্ভা রূপে পৃথিবীতে, মানব সংসারে আসতে হয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রণরম্ভা অলিন্দ থেকে সরে ঘরে এসে বসলেন। বড়ই অবসন্ন বোধ করছেন তিনি, বড়ই যেন ক্লান্ত।

আসন্ন বিবাহিত জীবনের দুর্বিপাক কল্পনা ক'রেই এত অবসাদ বোধ করছেন।

সংসারের বাতাসেই বিষ আছে ; মিথ্যা, কপটাচার—এগুলো যেন অঙ্গাঙ্গী জড়িত এখানের জীবনের সঙ্গে। এই যে স্নেহশীল পিতৃসদৃশ, হয়ত বা পিতার অধিক রাজা রতিসেন, তাঁর কাছেও আগাগোড়াই সত্য গোপন করতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আসল সত্যটা কোন দিনই বলা চলবে না। আর সত্য আবৃত রাখা কপটতা ছাড়া কি ?

কপটাচার মিথ্যাচার করতে হবে তাঁর ইহলৌকিক স্বামীর সঙ্গেও। আত্মরক্ষার জন্যেই করতে হবে। যে লোকটা সরল বিশ্বাসে সমাদর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, যে হয়ত তাঁকে প্রিয়তমা জেনে শিরোধার্য করবে, বক্ষলগ্ন ক'রে রাখবে চিরকাল—তার সঙ্গেও প্রতারণা করতে হবে হয়ত—এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হ'তে পারে ?

নিজেরই সৃষ্ট মায়া—স্নেহ দয়া সহানুভূতি প্রেম—সবই তাঁর মায়ার বিভিন্ন রূপ—সেই মায়াতে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়লেন! নিজের শক্তির কাছে নিজেকে হার মানতে হ'ল। এর চেয়ে কৌতুকের ব্যাপার আর কি হতে পারে ?

ম্লান একটু আত্ম-অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল রণরম্ভার সুরবাঞ্ছিত ওষ্ঠাধরে।

* * *

মহাসমারোহে বিবাহ নিষ্পন্ন হল রণরম্ভার। তাঁর পিতৃরাজ্যের রাজধানী ও কাশ্মীর—দু'জায়গাতেই বিপুল উৎসব-আড়ম্বর প্রতিপালিত হ'ল। রতি-সেনের যত অনিচ্ছা বা অনুযোগই থাক—ইষ্টসমা আদরিণী কন্যার বিবাহে কোথাও কোন ত্রুটি রাখতে দিলেন না। রণাদিত্যের তো কথাই নেই, যে আলোকসামান্যা রূপবতী কন্যার জন্য ভারতবর্ষের তাবৎ নৃপতি লুব্ধ লালায়িত —সেই কন্যা তাঁর গৃহাগত হস্তগত, স্বেচ্ছায় সানন্দে বরমাল্য অর্পন করেছে তাঁর কণ্ঠে, এ সৌভাগ্যের উপযুক্ত সমারোহ করবেন বৈকি—এই স্মরণীয় দিনের স্মৃতি অভূতপূর্ব উৎসবের স্মৃতির মধ্যে চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন, সেই তো স্বাভাবিক।

রণাদিত্যর নিজেকে ভাগ্যবান মনে করার আরও কারণ—নবনীতা মহিষী

রাজ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে লাগল, রাজ্যসীমা বিস্তার লাভ করতে লাগল। যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল স্বপ্নেরও অতীত—তাই বাস্তব হয়ে উঠল। প্রজারা সুখী, চারিদিকে নূতন নূতন হর্ম্য নির্মিত হচ্ছে, উঠছে নূতন নূতন দেউল—দেব-মন্দির। চতুর্দিগন্তে রণাদিত্যর জয়-জয়কার ধ্বনি।

কিন্তু এই সমস্ত সৌভাগ্য ও সুখের যিনি উৎস—কেন্দ্রমণি—তাঁর মনে সুখ নেই।

কিসের একটা অস্থিরতা, অস্বস্তি ও অতৃপ্তি বোধ তাঁকে যেন সর্বদা পীড়া দিচ্ছে—বিষণ্ণ ক'রে রেখেছে।

অথচ এমন হবার কোন কারণ নেই। এতকাল অবধি তাঁর যে দুশ্চিন্তা ছিল—তা দূর হয়েছে। সামান্য একটু মিথ্যাচরণ করতে হয়েছে ঠিকই—তবে এক্ষেত্রে এটুকু করতে তিনি বাধ্য—কিন্তু তাঁর সম্ভ্রম ও মহিমা রক্ষা পেয়েছে। তিনি রণাদিত্যর সঙ্গে ঘর করেন, ধর্মকার্যে অনুপ্রাণিত করেন—বিরাট যুগ্মমন্দির নির্মিত হ'য়ে হরি-হরের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন রাণী রণরম্ভার প্রভাবেই, জাগ্রত দেবতা—এক কথায় সহধর্মিণীর সমস্ত কর্তব্যই পালন করেন; অন্যান্য মহিষী ও রাজ-অন্তঃপুরিকারা সহজেই তাঁকে নেত্রী ও শ্রেষ্ঠা বলে মেনে নিয়েছেন—কিন্তু তাই বলে তিনি মানুষের সম্ভোগ্যা হন নি, হ'তে পারেন নি। প্রতি রাত্রেই—প্রায় প্রতি রাত্রে, কারণ রণরম্ভার আগমনের পর থেকে রাজা অন্য মহিষীর শয়নকক্ষে যান কদাচিৎ—তাঁর একটি নায়িকা তাঁর মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁরই পর্যঙ্কে রাজভর্তার প্রতীক্ষা করে, দেবী রণরম্ভা সূক্ষ্ম শরীরে বাতায়ন পথে নির্গত হন —অদৃশ্য হয়ে যান রাজার কাছে। আবার, ঊষার আভাস জাগারও পূর্বে—রতিরণশ্রান্ত নিদ্রিত রণাদিত্যর শিথিল আলিঙ্গন মোচন ক'রে সে নায়িকা শয্যা থেকে নেমে আসে, রণরম্ভা তার স্থান অধিকার করেন।

স্বামী প্রত্যহই ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখেন তাঁর প্রিয়তমা স্নান পূজা শেষ ক'রে সদ্যপ্রস্ফুটিত প্রফুল্ল শতদলের মতো জ্যোতির্ময়ী রূপে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

দাঁড়িয়ে আছেন—তবু রাজার যেন মনে হয় তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন, তাঁকে ঘিরে সর্বদা এমনই একটি দীপ্তি ও পবিত্রতা বিরাজ করতে থাকে।

এ চলছে সেই প্রথম মিলনরাত্রিটি থেকেই।

যেমন চেয়েছিলেন রণরম্ভা—তেমনিই। কোথাও কোন ত্রুটি নেই, কোন শৈথিল্য নেই। কেউই জানতে পারে নি এই বৈসূচনকথা। দুই দিকই রক্ষা পেয়েছে এতে। রণাদিত্যর কোন অসুবিধা হয় নি, কোন ক্ষতিও না। তিনি যাকে চান তাকেই পেয়েছেন। সেই দেহটা অন্তত।

তবে রণরম্ভার মনে এ কিসের অতৃপ্তি, কিসের অপূর্ণতা?

কী চান তিনি? কী চেয়েছিলেন?

বাক্যদত্ত—আসতেই হবে মর্ত্যে। মর্ত্যবাসীর ঘরও করতে হবে। তার মধ্যেই যেটুকু নিজেকে বাঁচানো সম্ভব—বাঁচাতে পেরেছেন। তবে?

কাল পূর্ণ হলেই স্বধামে চলে যাবেন। নিয়ম অনুসারে দ্বাদশবর্ষ তিনি রণাদিত্যর ঘর করতে বাধ্য। তার মধ্যে তো দেখতে দেখতে চার পাঁচ বছর কেটেই গেল। তবে?

এই তবেটা যে কি তা তিনি নিজেই জানেন না।

অথবা জানতে সাহস হয় না।

নিজের মনে সত্যটা স্বীকার করতে সঙ্কোচে বাধে। বিপন্ন বোধ করেন। তাই আরও এই অস্থিরতা।

আবারও হিসেবে ভুল করেছিলেন দেবী ভ্রমরবাসিনী।

কোন ভুল করলে ভুলের মাশুল পুরোই দিতে হয়—তা কে জানে সুর, অসুর—কে জানে মানুষ। ঈশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম কাউকে অব্যাহতি দেয় না। সেই সত্যটাই ভুলে গিয়েছিলেন।

দেহ ধারণ করলে দেহের ধর্মকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

সেটা মনে ছিল না। ভ্রমরবাসিনী যে মহামায়া আদ্যাশক্তির অংশ—অথবা বলা উচিত যে মহামায়ার এক প্রকাশ—সেই মহাশক্তিই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

প্রথমটা অত বুঝতে পারেন নি।

আগে আগে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ ক'রে রাণী রণরম্ভা শয়নমন্দির থেকে বেরিয়ে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে অথবা দেবদেউলে অবস্থান করতেন। সেখানে

মহাযোগিনী যোগে নিমগ্ন রাখতেন নিজেকে—আত্মতপস্যায় আত্মাকে স্থির স্তব্ধ ক'রে এক অননুভূত রসাস্বাদ করতেন।

এইভাবেই চলেছিল দীর্ঘদিন।

অনেক দিন পরে একটু একটু ক'রে একটা ইতরবৃত্তি মাথা তুলল তাঁর ভিতর, কৌতূহল দেখা দিল। দেহের ঋণ।

প্রথমটা নিজেই বুঝতে পারেন নি নিজের ভাবনার মধ্যে সে মানবজনোচিত বৃত্তির অস্তিত্ব।

আত্মস্থ আর থাকতে পারছেন না—নিজেতে নিজে সমাহিত—এই জ্ঞানটাও প্রথমে আসে নি। কবে যে প্রথম এই পার্থিব বৃত্তি তাঁর চিত্তের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বটবৃক্ষের সামান্য বীজের ন্যায়—তাও জানেন না। সহসাই বোধ করলেন একদিন সে অস্থিরতা, অস্বস্তি। কূটস্থ হওয়ার বাধা অনুভব করলেন একটা। অনুভব করলেন মানবজনোচিত কৌতূহল দেখা দিয়েছে তাঁর এই মানবদেহের অস্তিত্বে, অনুভূতিতে।

আচ্ছা, ওরা ঠিক কি করে সারা রাত ধরে? —ওঁরই সৃষ্ট মায়া-নায়িকা আর ঐ মানব নৃপতিটা? এত প্রবল আসক্তির কারণ কি পুরুষটির?

তবু তখনও সে কৌতূহলকে আমল দেন নি অতটা।

কিন্তু দেখা গেল এই ইতর প্রাণীগুলোর বৃত্তিও কম বলবান নয়। কৌতূহলটা ক্রমে ক্রমে পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। স্থির থাকতে দেয় না তাঁকে। রাত্রে যদি বা জোর ক'রে তাকে অবদমিত রাখেন, দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় তা পূর্ণভাবে পেয়ে বসে তাঁকে। সারাদিন ধরেই চিন্তাটা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—তাঁর সহজ প্রসন্নতা ও প্রশান্তি নষ্ট ক'রে দেয়।

আরও কিছুদিন পরে সত্যই অস্থির হয়ে উঠলেন।

একদিন আর রণরম্ভা শয়নকক্ষ থেকে বাইরে গিয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন আবার। ঘরের মধ্যেই অদৃশ্য থেকে প্রত্যক্ষ করলেন আদিম নরলীলা।...

তার পরদিন আর বাইরে যেতেই পারলেন না।

আর কোন দিনই না।

এই শয়নকক্ষেই বন্দিনী হয়ে পড়লেন তিনি। স্বেচ্ছা-বন্দিনী। দু চোখ ভরে দেখেন এই মানবলীলা, মহামায়ার সৃষ্ট এক অদ্ভুত দেহযন্ত্রণা। যা তুচ্ছ,

যা জঘন্য, মানুষকে দেহাতীত জীবনে উন্নীত করার, আত্মসত্তায় অবহিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্যেই যা সৃষ্টি হয়েছিল—যাতে মানুষের মধ্যেকার ঐশী অস্তিত্ব কঠোর সংগ্রাম ক'রে নিজেকে স্ব-রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা ও গৌরব অর্জন করতে পারে—তার জন্যেই অতিমানস স্তরে অতিক্রান্ত হওয়ার পথে কঠিন ও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রচনা করা এটা—সেই অতি হেয়, অতি বীভৎস কুৎসিত দৃশ্যের বন্ধন, এর আকর্ষণ যে তাঁকেও এমন মুগ্ধ ও বদ্ধ করবে—তা কে জানত!

আসল শব্দটাকেও অস্বীকার করার শক্তি নেই দেবীর—লুব্ধই করেছে তাঁকে ঐ দৃশ্যটা। ঐ অতি ইতর কামলীলা।

সেই জন্যেই তাঁর এই বিষন্নতা, এই অস্থিরতা—এই ঘোরতর অশান্তি।

রাত্রে যখন রাজা উন্মত্তের মতো তাঁরই মায়া-রচিত প্রতিমূর্তিকে আপাদ-মস্তক চুম্বন করেন—বলতে গেলে লেহন করেন সমস্ত দেহটাকে—প্রতি রেণু প্রতি অণু-পরমাণু সম্ভোগ করতে চান বলে মনে হয়—কখনও মনে হয় পূজা করছেন ঐ অকিঞ্চিৎকর নারীদেহটাকে; কোন রাত্রেই, একবারের জন্যও সে প্রচণ্ড কামনায় শ্রান্তি আনতে বা ছেদ পড়তে দেখলেন না রাণী রণরম্ভা—তখন কে জানে কেন, সেই পূজা, সেই সকাম চুম্বন, সেই কঠোর আলিঙ্গন নিজের দেহ দিয়েই উপভোগ করতে ইচ্ছা করে রণরম্ভার। ইচ্ছা করে সর্বচিন্তাবিবেচনাবিস্মৃত একটি পুরুষদেহের সর্বশক্তি-সংহত ঐ বাহুবন্ধনে পিষ্ট হ'তে, তার দৈহিক নিষ্ঠুরতায় দলিত মথিত হ'তে—দেহের প্রতি লোমকূপ দিয়ে এই ঐকান্তিক প্রমত্ততাকে উপলব্ধি করতে।

আর কিছু নয়—এ কৌতূহল, এ ইচ্ছা নিতান্তই বালোচিত তাও তিনি জানেন, তবু দেখতে চান যে কেমন লাগে এ লীলা। নরনারী যে যুগ যুগ ধরে, সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাপি, এই লীলাতেই, এই আসঙ্গলিপ্সাতেই বিচার-বিবেচনা ভালমন্দ সব কিছু ভাসিয়ে দিয়েছে—ইহকালের স্বার্থ পরকালের পরিণতি কোন কিছু চিন্তা করে নি—কোন বিপদ কোন পরিণামকেই ভয় করে নি—কত মুনি ঋষি তপস্বী সাধক দুনিয়ার এই আসক্তির আকর্ষণে দেহলীলার স্রোতে ভেসে গেছেন—এমন কি স্বয়ং নারায়ণ, দেবাদিদেব মহেশ্বরও যে লীলার ফাঁদ এড়াতে পারেন নি—সে না জানি কেমন—এই কথাই মনে হয় বার বার।...

ক্রমশ নেশার মতো পেয়ে বসে তাঁকে—রাত্রে দু চক্ষু ভরে এই ইতর কদর্য দেহধর্মপালন প্রত্যক্ষ করা—এবং দিনে তারই স্মৃতি-রোমন্থন। দিবারাত্র আচ্ছন্ন করা বিবমিষাকর এই চিন্তা ক্রমে তাঁর দৈহিক অস্বস্তির কারণ হয়, যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে—তবু তাকে ত্যাগ করতেও পারেন না। বরং মানুষ যেমন কখনও কখনও বহু সুখাদ্য ছেড়ে কটু-তিক্ত রসে পরিতৃপ্তি লাভ করে—তিনিও এই চিন্তায় সেই বিচিত্র স্বভাব-বিরোধী মনোভাব বোধ করেন—তিক্তস্বাদের আকর্ষণেই ঐ ভাবনায় নিমগ্ন থাকতে হয়।

শেষে আর এ কষ্ট এ পীড়ন সহ্য করতে পারলেন না দেবী রণরম্ভা।

দেহের কাছে হার মানলেন যোগিনী।

দেবীর মহিমা? দেব-দেহের সম্ভ্রম?

থাক। সে এ জন্মের জন্য নয়। দেহ যখন ধারণ করেছেন তখন তার স্বধর্ম মানতে হবে বৈকি।

এমন কি লোক-প্রচলিত অর্থেও ধর্ম পালন করা হবে। তিনি সত্যবদ্ধ, বর দিয়েছিলেন নিজেকেই দেবেন বলে। লোকটি তাঁকেই কামনা করেছিল, প্রার্থনা করেছিল তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কে জানে, হয়ত বা সেই সত্যের আকর্ষণই অন্য রূপ ধারণ ক'রে অহরহ তাঁকে টানছে। এই লোকটার বহু-পূর্বজন্মের প্রার্থিত ও প্রাপ্ত বর ন্যায় ও ধর্মের কাছে দাবী করছে তাঁকে। তাঁর মিথ্যাচরণেরই ফল এই আকর্ষণ—নিদারুণ নিপাতের।...

হয়ত বা এটাও মিথ্যাচরণ—নিজের দুর্বলতার একটা বিবেকসম্মত কারণ খাড়া করা। আসলে লোভই তাঁর, দুর্নিবার লোভ। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এই মানবজাতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো। এতকাল এদের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়েও দেখেন নি কোন দিন। আজ এদের জীবনযাত্রা দেখে মনে হচ্ছে—একবার, অন্তত একটা দিনও নিজের দেবত্ব বিসর্জন দিয়ে এদের জীবন আস্বাদ করলে মন্দ হয় না!...

নরদেহ-ধারণে-আচ্ছন্ন-বুদ্ধি রণরম্ভা বুঝতে পারেন না—এটাও এই দেহেরই ধর্ম—এই ভুল করা, নিজেকে ভুল বোঝানো, ভুল আশ্বাস বা স্তোক দেওয়া। জীবের কাছে জৈবিক আকর্ষণ অমোঘ, দুর্বার। এতে বুদ্ধি বিবেক এমনিভাবেই আবরিত হয়ে যায়, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা—ধর্ম অধর্ম

ঘুলিয়ে যায় বিবেচনার মধ্যে। দূর দেবত্বের আসন থেকে স্পষ্ট দেখা বা বোঝা যায়—এখানে এদের মধ্যে থেকে সম্ভব নয়।

আসলে যে ভুল তিনি করেছিলেন সেই বিন্ধ্যগিরির করুণাঘন দিনটিতে—তারই পূর্ণ মূল্য দিতে হচ্ছে তাঁকে—পূর্ণ মাশুল শেষ না হ'লে অব্যাহতি নেই।

সেদিন আর রণরম্ভা তাঁর নায়িকাকে আহ্বান করেন না।

নিজেই দ্বিরদ-রদনির্মিত সুবর্ণমণ্ডিত পর্যঙ্কে পক্ষকেশর শয্যায় বসে প্রতীক্ষা করেন তাঁর মানবদয়িতের।

একবার রাজা রণাদিত্যর কল্যাণ-অকল্যাণের কথাও মনে হয়েছিল বৈকি। এর পর রাজা আর বেশীদিন এ পৃথিবীতে থাকতে পারবেন না। দেবতার সঙ্গে মিলনের পর আর জীবদেহে অবস্থান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর লৌকিক নিয়মে তাঁর মৃত্যু অবধারিত! অনর্থক লোকটার মৃত্যুর কারণ হবেন?

কিন্তু সে বিবেচনা বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো ক্ষণেকের জন্য মনে উদিত হয়ে ক্ষণেকেই মিলিয়ে যায়।

এই জন্যেই তো তার এ পৃথিবীতে আসা, বর্তমান জন্মগ্রহণ। কার্য সফল হলে আর এখানে থাকারই বা প্রয়োজন কি? কর্ম ক্ষয় ক'রে অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তিই তো বাঞ্ছনীয়।

তিনি প্রস্তুত হন, সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন প্রিয়-মিলন-ক্ষণটির জন্য!

এ তাঁরই সৃষ্ট মায়া, তাঁরই নির্ধারিত নিয়তি—এ থেকে তাঁরও অব্যাহতি নেই।...

রাজা রণাদিত্য শয়নকক্ষে এলে রাণী রণরম্ভা তাঁর নায়িকার মতোই মদির কটাক্ষে, মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন, সাগ্রহে এগিয়ে যান অভ্যর্থনা জানাতে—বরাভয়প্রদায়ী দেবদুর্লভ দুই হস্ত প্রসারিত ক'রে।...

দুজনেই দ্রুত এগিয়ে যান নিজেদের অনিবার্য নিয়তির দিকে।

রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ- ও মণিমাণিক্য-খচিত গজদন্ত নির্মিত পর্যঙ্ক থেকে শুরু ক'রে বনবাসের পর্ণ-অজিন শয্যা, রণক্ষেত্রে স্কন্ধাবারের চর্মখট্টা পর্যন্ত—সমস্ত রকম শয্যাতেই শুয়েছেন পাণ্ডবমহিষী। কিন্তু আজ এই কঠিন, বন্ধুর তীক্ষ্ণাগ্রবহুল প্রস্তরের ওপর শুয়ে যে আরাম বোধ করলেন, সে আরাম বোধ হয় এর আগে কোন শয্যাতেই অনুভব করেন নি। চীনাংশুক আচ্ছাদিত শাল্মলীশস্য কিম্বা মেষশাবক-লোম দ্বারা প্রস্তুত শয্যাতে শুয়েও না। এই মাত্র কিছু পূর্বেই শ্রান্তিতে পা ভেঙ্গে আসছিল, ক্লান্তদেহ স্খলিতচরণ হয়েই তিনি বসে পড়তে বাধ্য হয়েছেন—বসেও থাকতে পারেন নি কয়েক নিমেষের বেশি—শুয়েই পড়েছেন—তবু এখন আর সে সব কোন অনুভূতিই রইল না। একটা ভারী সুখদায়ক শান্তি অনুভব করলেন এই মুহূর্তে। যে শান্তি যে সুখ বিবাহিত জীবনে একদিনও অনুভব করতে পারেন নি।

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কেন—তার পূর্বে স্বয়ম্বর সভায় বিজিতা হওয়ার পর থেকেই অবিরাম সমস্যা ও দুশ্চিন্তা, দুঃসহ লাঞ্ছনা ও দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে, করতে হয়েছে সপ্তপ্রহরব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, চতুর্দিকে—আত্মীয় পরিজন, দাসদাসী অগণিত কর্মচারীর ওপর সদাসতর্ক দৃষ্টি মেলে থাকতে হয়েছে—অসংখ্য লোকের মন যোগাতে হয়েছে অবিরত। সাধারণ মেয়েদের একটি স্বামীকে সুখী ও হৃষ্ট রাখতেই প্রাণান্ত হয়—তাঁকে পাঁচটি স্বামীকে তৃপ্ত করতে হয়েছে।···

এই প্রথম তাঁর একটু অবসর মিলল নিজের দিকে তাকিয়ে দেখারও।

অবশ্য সে অবসর যে খুব বেশীক্ষণের নয়—তাও তিনি জানেন। মৃত্যু যে হিম-অবশ দুই পা বেয়ে ধীরে ধীরে বুকের দিকে এগিয়ে আসছে, সকল-ইন্দ্রিয়-অবশ-করা শৈত্যের রূপে—তা বেশ অনুভব করতে পারছেন। আর হয়ত বা দু-চার দণ্ড—কিম্বা অতও হবে না—দু'চার ক্ষণ সময় আছে তাঁর নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার—তাঁর পক্ষে দুর্লভ এই বিলাসের।

সুমেরু পর্বতের এ অপরাহ্ণ সহজে শেষ হবে না এটা ঠিক, অতি ধীরে

ধীরে তা ম্লান হ'তে থাকবে। সে ম্লানিমা নামতে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যেই —তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ, নিষ্পাদপ তৃণশূন্য এই শৈল-শিখরসমূহের কোণে কোণে অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে—যেমন তাঁর চৈতন্য তাঁর চিন্তাশক্তি তাঁর বুদ্ধিরও চারিদিক ঘিরে ঘনিয়ে আসছে অন্তিম জড়তা। এখনই হয়ত একেবারে লেপে-মুছে একাকার হয়ে যাবে মাথার মধ্যে মনের মধ্যে; সব স্মৃতি, সব অনুভূতি, সমস্ত চিন্তা ঐ এক অন্ধকারের অতল গহ্বরে মিলিয়ে যাবে। তবু, ভারী ভাল লাগছে তাঁর, যেন মনে হচ্ছে তাঁর জীবন থেকে তাঁর পরমায়ু থেকে এই কটি ক্ষণ চুরি ক'রে নিতে পেরেছেন তিনি নিভৃতে সম্ভোগ করার জন্য—এই সময়টুকু তাঁর, একান্তভাবেই নিজস্ব, কাউকে ভাগ দিতে হবে না, কারও কাছে জমা রাখতে হবে না, নিয়োজিত করতে হবে না কারও সেবায়—উৎকণ্ঠিতভাবে কারও অভিরুচি বা আদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না।···

এই ক'টি ক্ষণ * মহাকালের কাছ থেকে চুরি ক'রে নেওয়া এই স্বল্পকালের অবসর যখন শেষ হবে, যখন মৃত্যু এসে এখনও-সুখে-দুঃখে-স্পন্দমান এই হৃদ্‌পিণ্ডে তাঁর হিমশীতল হাতখানি রাখবেন—চারিদিকের এই সব শিখরচূড়ার উপরকার তুষারের চেয়েও শীতল সেই হাত, অব্যর্থ অমোঘ—তখন এখান থেকে সোজা কোথায় যেতে হবে তাও তিনি জানেন। নরকেই যেতে হবে তাঁকে। হোমাগ্নিসম্ভবা, সাক্ষাৎ ধর্মরাজের সহধর্মিণী তিনি—চিরজীবন কায়মনোবাক্যে পতিসেবা, গুরুজন সেবা, ব্রাহ্মণ তপস্বী অতিথি অভ্যাগতদের পরিচর্যা ক'রে এসেছেন, প্রাত্যহিক পূজার্চনা ছাড়াও রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞের পুণ্যফল জমা আছে তাঁর—তবু, তৎসত্ত্বেও স্বর্গলাভ তাঁর ঘটবে না, ঘটা সম্ভব নয়।···

কেউ জানে না, বোধকরি কেউ জানবেও না কোন দিন—কারণ, একমাত্র যিনি জানতে পারতেন—যাঁর কাছে মানবমনের কোন দুর্বলতাই অজ্ঞাত নয়, সেই সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার মহারাজ-চক্রবর্তী যুধিষ্ঠির—সম্ভবত তাঁর প্রতি অনুকম্পাবশতঃই প্রকাশ করেন নি কথাটা।···এই প্রথম পুরুষের এবং বীরের পরিচয় দিলেন তিনি—এই প্রথম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার কারণ ঘটল পাঞ্চালী কৃষ্ণার। যুধিষ্ঠির মহান, যুধিষ্ঠির উদার—কিন্তু তিনি মানুষ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল এতদিন, সে সন্দেহের নিরসন ঘটল আজ।

* ক্ষণ—বর্তমান হিসাবের চার মিনিট সময়।

মহত্ত্ব ও ঔদার্যের বহু উর্দ্ধে তাঁর এই ক্ষমা, এই সহানুভূতি। মিথ্যা বলেন নি, দ্রৌপদীর পতনের যে কারণ বিবৃত করেছেন সেটাও সত্য—ওঁর পঞ্চ পতির মধ্যে গাণ্ডীবীই বেশী প্রিয় ছিল ওঁর কাছে, বেশী শ্রদ্ধেয়—কিন্তু এ ছাড়াও কারণ ছিল একটা। ধর্মরাজ তাও বলতে পারতেন অনায়াসে, তবু বলেন নি, শৌর্যের পরিচয় দিয়ে নারীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন। কিন্তু তাতেই কি অব্যাহতি পাবেন উনি? আর কেউ না জানলেও উনি নিজে যে জানেন। মনের অগোচর পাপ নেই। ওঁর অন্তরের গোপনতম এই লিপ্সা এই কলুষ সম্বন্ধে তিনি নিজে যে অনবহিত নন আদৌ।

আরও একজন অবশ্যই জানেন। ধর্ম। তিনি সবই জানেন। তাঁর কাছে কারও মনের কোন কলুষ অজ্ঞাত নয়। ধর্ম-তনয় ক্ষমা করেছেন কারণ তিনি শরীরী। দেহ ধারণ করলে দেহের ধর্ম কিছুটা পালন করতে হয়ই। তাঁকে মিথ্যাও বলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত সেই জন্যেই। আত্মরক্ষার কারণে মিথ্যাচরণও—জেনেশুনে বেশ হিসাব ক'রে জতুগৃহে সেই নিষাদী ও তাঁর পঞ্চপুত্রকে অপর্যাপ্ত সুরাপান করিয়ে অচৈতন্য ক'রে ফেলে রেখে আগুন লাগিয়ে পালাতে হয়েছে—যাতে শত্রুরা স-কুন্তী পাণ্ডবগণ দগ্ধ হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়, এঁরা আত্মগোপন ক'রে নিরাপদ থাকতে পারেন।...সেই দেহধর্মের কারণেই এই মাত্র তিনি তাঁর প্রিয়তমা ভার্যার—পট্ট-মহাদেবীর পতনের একটি মাত্র কারণ বলে ক্ষান্তি দিয়েছেন—একাধিক কারণ আর বিবৃত ক'রেন নি। কিন্তু ধর্ম তো অশরীরী, তিনি এত সহজে অব্যাহতি দেবেন কি? তাঁর কাছে দয়া নেই, মায়া নেই, ক্ষমা নেই—তেমনি প্রতিহিংসাও নেই, ক্রোধও নেই—আছে শুধু নির্ভুল হিসাব আর অভ্রান্ত জ্ঞান। অমোঘ অব্যর্থ নিষ্করুণ ন্যায়-নীতি, তুলাদণ্ডে মাপা।

শরীর-ধর্ম যেমন দুর্বলতা, তেমনি শরীরের ধর্ম ক্ষমাও।

সেই ধর্মই পালন করেছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

দেবতা নয়—মানুষই সেই জন্যে মানুষের বেশী প্রিয়, বেশী শ্রদ্ধেয়।

দেবতাকে ভয় করা যায়, হয়ত বা ভক্তিও করা যায়, ভালবাসা যায় না। মানুষের ভালবাসা তাই মানুষের কাছেই যায়।

সেই ঘনায়মান অন্ধকারে দূর-দিগন্ত-প্রসারিত, বিসর্পিত কুটিল পার্বত্য পথের দিকে একবার কৃতজ্ঞ নয়নে চেয়ে দেখলেন দ্রৌপদী, পাণ্ডবরা তো

নয়ই—তাঁদের শ্বেত উত্তরীয়ের প্রান্তটুকুও দেখা যাচ্ছে না আর। তাঁদের অনুগামী তুচ্ছ সেই সারমেয়টিকেও না।

থাক। তাঁরা এগিয়েই যান—দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনীর বোঝা আর তাঁদের যাত্রাপথ বিড়ম্বিত করবে না, তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে যান। তাঁদের পথ অবারিত হোক কুসুমাস্তীর্ণ হোক—দ্রৌপদীর তাতে কিছু আর যায় আসে না। উনি তাঁদের অনুবর্তন করতেও চান না। সারা জীবনই তো ক'রে এলেন—সুদীর্ঘ কাল—আর কেন? এবার একটু নিজেকে নিয়ে থাকতে চান। নিজের দিকে, তাকাতেও। এই যে সামান্য একটু অবসর পাওয়া গেছে—এই সময়টা নিজের দিকেই তাকিয়ে দেখবেন। সর্বথা, সর্বদা স্বামীর অনুগমন করা নাকি স্ত্রীর ধর্ম—সে ধর্ম যতদিন যতক্ষণ সম্ভব পালন করেছেন তিনি। এখন সে দায়িত্ব ও কর্তব্যের অবসান ঘটেছে, বিধাতা এবার ছুটি দিয়েছেন তাঁকে। এবার তাই নিশ্চিন্তও সেদিক দিয়ে।

না, অভিরুচিও নেই আর। প্রিয় অপ্রিয় অল্পপ্রিয় কোন স্বামীর সাহচর্যেই আর লোভ নেই। যুধিষ্ঠির জানতেন—জানবার কথাই—তবু এতটা যে জানতেন তা ঠিক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নি কোনদিন। এমনভাবে দ্রৌপদীও ভেবে দেখেন নি। আজ পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেটা তাঁর মুখে উচ্চারিত হ'তে, সে মুহূর্তে তাই একটু লজ্জাই অনুভব করেছিলেন কৃষ্ণা। অন্যায় বা অপরাধ করেছেন বলে এখনও মনে করেন না—তবু, ঐ দেহের ধর্ম বলেই হয়ত—একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করেছিলেন।

মিথ্যা বলেন নি ধর্মরাজ, ভুলও করেন নি। স্ত্রীর নিভৃততম মনের দুর্বলতাটুকু অনুমান করতে একটুও ভুল হয় নি তাঁর। সত্যই পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে তৃতীয়তেই বেশী আসক্ত ছিলেন তিনি। সেটা কি অপরাধ? এ ধরনের পক্ষপাত যে অস্বাভাবিক এমন কেউ বলতে পারবে না, স্বয়ং ধর্মরাজও না। আর যদি সেটা মানব-দেহধারীর পক্ষে স্বাভাবিকই হয়—তবে সেটা অপরাধ কিসের?

সত্যবাদী, সংযতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ধর্মভীরু—যুধিষ্ঠির এ সবই। কিন্তু মানুষ কি? অন্তত, যে মানুষ নারীমাত্রেরই কাম্য—স্বামী হিসেবে ভাবতে গেলে যে মানুষ যে পুরুষ তারা কামনা করে কল্পনা করে—যুধিষ্ঠির সে পুরুষ বা সে মানুষ নন। এক এক সময় বরং ক্লীব বলেই মনে হ'ত ওঁকে। যদি সকল

দুর্বলতার ঊর্ধ্বে হতেন তা হলেও তবু কথা ছিল, তা তো নন। আত্মরক্ষার জন্য যিনি ভেবেচিন্তে কৌশল অবলম্বন ক'রে নিঃসন্দিগ্ধ নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান, যিনি সম্পূর্ণরূপে ক্রোধ দমন করতে পারেন নি; রমণী-সঙ্গে যাঁর আসক্তি অনস্বীকার্য—দ্রৌপদীর চার বছর ভিন্ন-পতি-সহবাসের সময় প্রয়োজন হবে বলে যাঁকে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে হয়েছে—রমণীর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই এমন কথা কে বলবে; দ্যুত-ক্রীড়ায় যথেষ্ট পটু নন জেনেও যিনি তা স্বীকার না ক'রে খেলতে বসে নিজের ও বশম্বদ ভ্রাতাদের যথাসর্বস্ব নষ্ট করেন; যিনি জুয়াখেলার উত্তেজনায় ন্যায়-অন্যায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্ত্রীকে পণ রাখা উচিত কিনা তাও ভেবে দেখেন না;—তিনি সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি ও মানববৃত্তির অতীত, এমন কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন কৃষ্ণা।··· কৌরব দ্যুত-সভায় স্ত্রীর যে অকারণ ও অন্যায় লাঞ্ছনা তিনি নীরবে সহ্য করলেন—এতটুকু পৌরুষ কি মনুষ্যত্ব থাকলে তা সইতে পারতেন না। ভীম ও অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রাজার প্রতি আনুগত্যের কর্তব্যেই তা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন—যুধিষ্ঠিরের সেটুকু কারণও ছিল না? ধর্ম? যিনি দেবতা ব্রাহ্মণ অগ্নি সাক্ষী ক'রে বিবাহিতা স্ত্রীর সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—সে স্ত্রীকে লজ্জা ও অপমান থেকে রক্ষা করাই তাঁর ধর্ম ছিল সেদিন।

ভীমকেও দ্রৌপদী ঠিক মনেপ্রাণে প্রিয়তম স্বামী বলে মনে করতে পারেন নি; এমন কি—ঈশ্বর ক্ষমা করুন—নিজের উপযুক্ত বলেও ভাবতে পারেন নি। বিশাল দেহ, অপরিমেয় দেহবল, অশোভন খাদ্যলোলুপতা, প্রমত্ত ক্রোধ—সব মিলিয়ে মধ্যে মধ্যে তাঁকে বরং একটা দানব বলেই মনে হয়েছে। কখনও বা শিশু। ঠিক স্বামী প্রিয় দয়িত—এভাবে কল্পনা করতে অসুবিধা হয়েছে। আর নকুল? নকুল রূপবান, খুবই রূপবান—কিন্তু পুরুষের রূপ তো শুধু তার কোমল ত্বকে, সুকুমার ত্রুটিহীন মুখাবয়বে, আয়ত চক্ষু, সুগঠিত উন্নত নাসা কি সুডৌল চিবুকে নয়—দেহের এই অনিন্দ্যগঠনের সঙ্গে শৌর্য বীর্য বা সাহস মিলিত না হ'লে তার রূপ সম্পূর্ণ হয় না—তাকে রূপবান হিসেবে গণ্য করে না কেউ। সে রূপের মূল্য অন্তত তাঁদের কাছে—ক্ষত্রনারী রাজকুমারীদের কাছে নেই।···সহদেবও—সহদেবকে তো কোনদিন পুরোপুরি স্বামী হিসেবে ধারণাই করতে পারলেন না এতাবৎ কাল। বরং দেবরোচিত প্রীতিপাত্র

বলেই মনে হয়েছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে যে স্নেহ যে মমতা যে উদ্বেগ থাকে —সহদেব সম্বন্ধেও সেই মনোভাব ছিল বরাবর।

কে জানে, এসব কোন অসুবিধাই হ'ত না হয়ত—যদি না ধনঞ্জয় এদের পাশে থাকতেন। প্রদীপের মূল্য কম নয়, মধুস্থবর্তিকার দীপ্তি আরও উজ্জ্বল—খধূপ এমন কি খদ্যোতেরও কিছু আলো আছে—তবে চন্দ্রোদয় ঘটলে তা সবই এক নিমেষে নিষ্প্রভ হয়ে যায় চোখের সামনে—আবার সেই চন্দ্রও আর চোখে পড়ে না—সূর্যালোক প্রকট হ'লে। স্বামী হিসেবে এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর ঈপ্সিত সাধারণ নারীর কাছে, এমন কি সহদেবের স্ত্রীও হয়ত ঈর্ষার পাত্রী—শুধু অর্জুন সামনে থাকার জন্যই এঁরা হীনপ্রভ হয়ে গেছেন, এঁদের পূর্ণ মূল্য বোঝা যায় নি। নকুলের হিসেবে গাণ্ডীবী আদৌ রূপবান নন, শ্যাম বর্ণ, অবিরত যুদ্ধ করার ফলে জ্যা-সজ্ঘর্ষে বাহু কীনাঙ্কিত, হাত-পা কঠিন ও কর্কশ, দেহে অগণিত অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন—তবু শৌর্যে বীর্যে দুঃসাহসে, পৌরুষে, প্রেমে, আবেগে, রসবোধে, রসিকতায়, সম্ভোগশক্তিতে—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি অতুলনীয়। অর্জুন অনেক বিবাহ করেছেন—তবু মনে হয় আরও অনেক করলেও বেমানান হ'ত না। এক শরীরে বহু পুরুষের বীর্য ধরেন তিনি, বহু পুরুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর মধ্যে—তাই বহু প্রণয়িনী সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে কখনও সাপত্ন্য-বিদ্বেষের কথা মনে পড়ে না। তাঁর কাছে থাকলে, তাঁর কথা মনে করলে তাঁকেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাধিক কামনার পাত্র মনে হয়। হ্যাঁ, ধনঞ্জয়ই স্বামীদের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম ছিলেন—তা তিনি অকপটেই স্বীকার করছেন। আর তার জন্য তিনি লজ্জিত কি অনুতপ্ত নন কিছুমাত্র।

অপরাধ ঘটেছে ওঁর অন্যত্র। অপরিসীম লজ্জা ও কুণ্ঠার কারণ সেটা।

অর্জুন ছাড়াও আর একটি পুরুষের কথা উনি মনে রেখেছেন। কাম্য হিসেবে চিন্তা করেছেন। ঠিক কামনা না করলেও তাঁর সম্বন্ধে দুর্বলতা বোধ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে একটা অবচেতন উদ্বেগ সকল সময়ের ভাবনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে ওঁর।

আজ এই প্রদোষবেলায়—দিবসেরও, জীবনেরও—অকপটে স্বীকার করছেন—আরও যে পুরুষের চিন্তা তাঁর মনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সে নিতান্তই পরপুরুষ—অধিরথ-সূতপুত্র, রাধেয় বলে পরিচিত—কৌন্তেয় কর্ণ।

তাঁর কথা না ভেবে পারেন নি, পারেন নি তাঁর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না হয়ে।

দোষে-গুণে মানুষ—তবু রক্ত-মাংসের মানুষ। উদারতায় মহত্ত্বে ত্যাগে, দানে, কৃতজ্ঞতায়, বীর্যে—ক্রূরতায় নীচতায় বর্বরতায় পরিপূর্ণ মানুষ। যে মানুষকে আমরা বুঝতে পারি। দোষে-গুণে—তবে গুণই বেশী, দোষের সঙ্গে ওজনে গুণের পাল্লা ভারী—সে দিকেই অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে—তাই আরও আকর্ষণ তাঁর প্রতি। মাটির মানুষ, তবু সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে। তাই ভক্তি না ক'রেও তাঁর দিকে আকৃষ্ট হওয়া যায়, মুগ্ধ হওয়া যায়।······

কী কুক্ষণে যে সেই স্বয়ম্বর সভায় নির্মম কঠিন বাক্যটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে ছিল ওঁর!

কর্ণ ধনুর্বাণের দিকে অগ্রসর হ'তেই বলে উঠেছিলেন 'পণে বিজিতা হ'লেও আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না। সে ক্ষেত্রে বরং আত্মহত্যা করব!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভুল বুঝতে পেরেছিলেন উনি।

যে মধুর ক্ষমাসুন্দর অথচ ক্লিষ্ট হাসি হেসে তিনি শরাসন ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন, সে হাসি কোন সাধারণ সারথিপুত্র হাসতে পারে না। সে হাসি যে হাসতে পারে সে কোনমতেই প্রাকৃত, হীনবংশের সন্তান নয়।··· আর যদিই বা হয়—তাতেও কিছু যায়-আসে না। সূক্ষ্মমাত্র বংশ পরিচয়ে এর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়, সাধারণ মানুষের মাপে একে মাপা যায় না, সাধারণ নিয়মের বাইরের মানুষ এ।

কিন্তু তখন আর সে কথা ফিরিয়ে নেওয়ার সময় ছিল না। হাতের পাশা আর মুখের কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

তাছাড়া, তখন অত ভাববারই বা অবসর কৈ? নূতন নূতন ঘটনায় প্রতি মুহূর্তে নব নব নাটক রচিত হচ্ছে যেখানে—মনোযোগ আর চিন্তা সেখানে এককেন্দ্রিক হতে পারে না।

ভুলেও গিয়েছিলেন ক্রমশ।

পাণ্ডবদের পেয়ে সুখী হয়েছিলেন দ্রৌপদী। বহু বল্লভ আস্বাদনের যে গোপন তৃষ্ণা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক, তা অপ্রত্যাশিতভাবেই মিটে গিয়েছিল। এমন দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ কার অদৃষ্টেই বা ঘটে। দ্বিচারিণী স্বৈরিণী এ-সব আখ্যায় অভিহিত না হয়েই পাঁচ পাঁচটি পুরুষ-রত্নের সাহচর্য, তাদের প্রেম তিনি উপভোগ করেছেন। সপত্নী ছিল ঠিকই, তবু তিনিই যে

পাণ্ডবদের প্রিয়তমা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মনে মনে যে সূক্ষ্ম বিচার ক'রে অর্জুনকে আপন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আসনটি দিয়েছিলেন—সে বিচার নেহাৎই রসনাতৃপ্তিকর গুরুভোজনে তৃপ্ত মানুষের খাদ্য-বিচারের মতো। নইলে অন্য সাধারণ মেয়ে কেন—দ্রৌপদীই এদের যে-কোন একজনকে পেলে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব—এঁরা কেউই সামান্য পুরুষ নন।

কর্ণের কথা মনে ছিল না দীর্ঘকাল।

মনে পড়ল একেবারে রাজসূয় যজ্ঞসভায়।

পট্টবস্ত্রপরিহিতা পট্টমহাদেবী পাঞ্চালী যখন যুধিষ্ঠিরের বামপাশে বসে যজ্ঞের করণীয় কার্যে সাহায্য ও অংশগ্রহণ করছিলেন, সেই সময়ই, একবার মুখ তোলার অবসরে নজরে পড়েছিল—প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো তেজঃপুঞ্জকায়, সহজাত কবচকুণ্ডলধারী দীর্ঘদেহ সেই বীরপুরুষ—আর সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিলেন, সে পুরুষ কী একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ওঁর দিকে। কামার্ত? ক্ষুধার্ত?—না, বরং' বলা যায় প্রেমার্ত সে দৃষ্টি। সে দৃষ্টি চিনতে কোন নারীরই কখনও ভুল হয় না। এ দৃষ্টি মেলে যে-কোন পুরুষেই চেয়ে থাক, প্রায় সব নারীই পুলকিত বোধ করে, কৃত-কৃতার্থ হয়ে যায় বেশির ভাগই।

সেই থেকেই কর্ণের কথাটা মনের অবচেতনে থেকে গিয়েছিল।

ভুলতে পারেন নি।

ভোলার চেষ্টাও করেন নি। তার কারণ বহুদিন পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি যে, এ চিন্তা তাঁর মনে আছে—আর এটা অন্যায়, এও একরকম পর-পুরুষ চিন্তা। সবটাই তাঁর অজ্ঞাতসারে ঘটেছিল অনেকদিন পর্যন্ত। কথা-প্রসঙ্গে পাঁচজনের কাছে কর্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে শুনতে চাইতেন তাঁর নাম, তাঁর কীর্তিকথা, তাঁর প্রশংসা। তবু, সে প্রশংসা শ্রবণে যে ওঁর কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন তৃপ্তি লাভ ঘটে—সেইটে বুঝতে পারতেন না।

সেই সময়ই একদিন আর্যা কুন্তী গল্প করেছিলেন, কৌরবদের অস্ত্র-শিক্ষা-পরীক্ষা আসরে কর্ণের অনাহূত প্রবেশ; পৌরুষের, নিজের অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শনের সুযোগ লাভের জন্য কাতর প্রার্থনা; অর্জুনের—তথা নিজেদের গৌরব নাশের আশঙ্কায় গুরু কৃপাচার্যের রূঢ় বাক্যাঘাত—এবং দুর্যোধনের আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান এবং কর্ণের মানরক্ষার চমকপ্রদ নাটকীয় কাহিনী।

তিনি মূর্ছিতা হয়ে না পড়লে' সেদিনই যে ভয়ঙ্কর আত্মীয়-বিরোধ বাধত—তাও বলেছিলেন মহাদেবী কুন্তী। শুধু সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনিই বা কেন মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন—সেইটে বলেন নি। এখন বোঝেন বলতে পারেন নি। পাঞ্চালীরও অত কৌতূহল হয়নি। নিতান্তই আত্মকলহের—বিশেষ নিজ সন্তাননাশের আশঙ্কা মনে করেছিলেন।

আরও শুনেছিলেন। কর্ণের অলোকসামান্য দানের কাহিনী। কোন প্রার্থীকেই নিরাশ করেন না তিনি—তা সে প্রার্থী যা-ই কেন না যাচ্ঞা করুক। অর্থ বা ভোজ্য তো তুচ্ছ—স্ত্রী, পুত্র, নিজের প্রাণ—কিছুই অদেয় নেই তাঁর। সে অসামান্য দানের বহু অলৌকিক কাহিনী তখনই কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। স্নান ক'রে প্রতিদিন নদীতীরে বা অন্য জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে যখন সূর্যপূজা করেন—তখন যে প্রার্থী যা চাইবে তাকে তা-ই দেবেন—এমনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। তাঁর সেই উদারতার সুযোগেই পুত্রস্নেহান্ধ দেবেন্দ্র তাঁর প্রাণরক্ষার পিতৃদত্ত বর্ম সহজাত কবচকুণ্ডল অপহরণ করেছিলেন। নিজের সর্বনাশ ধ্রুব ও আসন্ন জেনেও এক নিমেষ ইতস্তত করেন নি কর্ণ—নির্দ্বিধায় সেই অঙ্গজ সর্বাধিক প্রিয়বস্তুটি অনায়াসে তুলে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ বেশধারী ইন্দ্রের হাতে—নিজের মৃত্যুবাণই—চিরাভ্যস্ত ক্ষমাসুন্দর ঈষৎ ব্যঙ্গ-করুণ হাসির সঙ্গে।

এ ব্যঙ্গ তাঁর অদৃষ্টকে—যিনি জন্মলগ্ন থেকে শুধুই প্রবঞ্চনা ক'রে চলেছেন তাঁর সঙ্গে।

বিচিত্র অদৃষ্ট তাঁর। এমন ভাগ্য কোথাও কারও শোনে নি কেউ।

জন্মমুহূর্তে সদ্যোজাত শিশুকে মা দিলেন জলে ভাসিয়ে, পিতা আত্মরক্ষার সহজাত বর্ম দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করলেন। এক মহাপ্রাণ দরিদ্র সারথি করুণার্দ্র হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করলেন, কিন্তু সেটাই—সেই বেঁচে যাওয়াটাই হল তাঁর জীবনের সর্বাধিক অভিশাপ। সর্বত্র সূতপুত্র বলে ঘৃণিত ও অবজ্ঞেয় হয়ে রইলেন। পাছে গুরুর বিশ্রামের এতটুকু ব্যাঘাত ঘটে—এই ভয়ে প্রাণপণে বজ্রকীট-দংশন-জ্বালা সহ্য করলেন—তার পুরস্কার মিলল নিদারুণ অভিশাপ, 'কার্যকালে এসব অস্ত্র তোমার কাজে লাগবে না।'

সমস্ত জীবনটাই তো তাঁর অভিশাপ। দুর্যোধন অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে তাঁকে নৃপতি করলেন। তাঁর শৌর্যে রণদক্ষতায় সমস্ত বিশ্ব ত্রাসগ্রস্ত,

তবু সূতপুত্র এ আখ্যা তাঁর কিছুতেই ঘুচল না। অথচ কত জারজপুত্র সগৌরবে সমাজের উচ্চ স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কামজপুত্র অস্বাভাবিক-জন্ম দ্রোণ কৃপ আচার্য বলে গুরু বলে ব্রাহ্মণ ব'লে সকলের পূজা লাভ করছেন। বিভিন্ন বৃত্তি ও জাতির লোকে পরিপূর্ণ সভায় ধৃষ্টদ্যুম্ন দেব-মানব-গন্ধর্ব সকলকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করল, 'এই লক্ষ্যভেদ যে করবে, সে-ই দ্রৌপদীকে লাভ করবে' অথচ পরমুহূর্তেই দ্রৌপদী বলে বসলেন, 'সূতপুত্রকে বরণ করব না কোন-মতেই।' তার পর ভিক্ষুকসদৃশ চীরবাস পরিহিত ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন যখন এলেন—তখন কুল-শীল-বর্ণ—কোন প্রশ্নই তুললেন না দ্রৌপদী।

বহু দুঃখে, আজন্ম অদৃষ্টের প্রবঞ্চনা, অকারণ বিরূপতা সহ্য করার ফলেই ঐ হাসিটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে কর্ণের—ঐ ব্যঙ্গ-করুণ হাসিটি।

দ্রৌপদীও একবার ভুল বুঝেছিলেন। অবিচার করেছিলেন কর্ণের প্রতি।

কপট দ্যূতসভায় যখন পাণ্ডবদের সব থেকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করে-ছিলেন কর্ণ…তখন তা খুবই অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়েছিল। কিন্তু সেইখানে সেই দিনই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন দ্রৌপদী। বুঝতে পেরেছিলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের আনুকূল্যে স্বামীদের সঙ্গে দাসত্ব মুক্ত হয়ে সভা থেকে বেরিয়ে আসছেন, কর্ণ বলে উঠেছিলেন, 'দ্রৌপদী আজ এক নতুন কীর্তি স্থাপিত করলেন! স্ত্রীকে নৌকা ক'রে তাঁর বীরস্বামীরা এই বিপদ-সমুদ্র পার হলেন।'

কথাগুলো ব্যঙ্গের—কিন্তু কণ্ঠস্বরটা খেদের। কানে বেজেছিল কৃষ্ণার। তাই, লোকটার প্রতি অপরিসীম উষ্মা ও ঘৃণাবোধ সত্ত্বেও বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, সে দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, মুষ্টিবদ্ধ হাতে অসহায় দর্শকের উপায়হীনতার জ্বালা—লক্ষ্য করেছিলেন ওষ্ঠ দুটি আবেগে কম্পমান। সে কম্পন বিদ্রূপের নয়, ব্যঙ্গের নয়—সে ক্ষোভ শিকার হস্ত-চ্যুত হওয়ার নয়। সে মহত্ত্বের ক্ষোভ, প্রেমার্তের আবেগ। যে ভালবাসে সে-ই এতটা বিচলিত হয় প্রেমপাত্রীর অপমানে।

সেই দিন, সেই মুহূর্তে বুঝেছিলেন দ্রৌপদী যে, আজও কর্ণ তাঁকে ভুলতে পারেন নি। প্রকাশ্যত যা অপমানের প্রতিশোধ—আসলে তা সীমাহীন প্রেমেরই অভিব্যক্তি। আজও তিনি পাঞ্চালনন্দিনীর হৃদয়দ্বারে ভিখারী।

সেই যে স্বয়ম্বর সভায় অর্ধবিকশিত নীলপদ্মের মতো কিশোরী মেয়েটিকে দেখেছিলেন—সেই 'নীলকুটিলকুন্তলা শারদ পদ্মপলাশ-লোচনা, শারদোৎপল-গন্ধা' মেয়েটিকে আজও তাঁর ভোলা সম্ভব হয় নি।

ভুলতে পারেন নি বলেই তাঁর অপমান কর্ণের বুকে অত বেজেছিল। উনি চেয়েছিলেন আঘাতে অপমানে বিদ্রূপে জর্জরিত ক'রে পঞ্চপাণ্ডবের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুলতে, চেয়েছিলেন যে সিংহরা তাদের নিজের সত্তায় জেগে উঠুক—এই সব শ্মশান-শৃগাল ও শবলোলুপ গৃধ্রদের দলিত-মথিত খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে নিজেদের প্রাপ্য পুনরুদ্ধার করুক। উনি জানতেন না যে, পাণ্ডবদের শক্তি যত—ধৈর্যও তত। পাণ্ডবদের প্রধান উপদেষ্টা-সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে তার যোগ্য শাস্তি দেবার আগে তার একশতটি অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন—কোন অপমান বা ক্ষতিতেই বিচলিত হন নি তার আগে। সেই শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত শিষ্যস্থানীয় এরা। এদের রোষ এরা দমন করতে জানে, সামান্য ইতরপ্রাণীর মতো সদ্য-প্রতিহিংসা লালসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না। তেমনি এরা যেদিন আবার শোধ নেয়—সেদিন বড় দুঃখদিন এদের অনিষ্টকারীদের। সেদিন এই শৃগাল সারমেয়ের দল, শবলুব্ধ গৃধ্রদের দল—শৃগাল-কুকুর গৃধ্রদের মতোই বিনষ্ট হবে, কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু অঙ্গাধিপতি অত জানতেন না। তিনি বীর, সাধারণ বীর্যবান ব্যক্তির মতোই আবেগ-প্রবণ। তিনি নিজের মাপেই সব মানুষের বিচার করেন। তবে সেখানেও হিসেবে মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে অপমানে যাদের রক্ত উত্তপ্ত হয়—তারা কখনও বিবাহিতা ধর্মপত্নীর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর অপমান নীরবে অধোবদনে সহ্য করে না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্যের কাছে নিজবাক্যে বদ্ধ, তাঁর অনুজেরা বদ্ধ জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্যে—রাজার প্রতি বশ্যতায়। তাই কোন বাক্যবাণই তাঁদের বিচলিত করতে পারে নি। অথচ কর্ণ যত ব্যর্থ হয়েছেন—তত অধীর তত তিক্ত হয়ে উঠেছেন। ফল হয়েছে বরং বিপরীত। তাঁর শ্লেষ বক্রোক্তি তাঁর নীচ বর্বরোচিত বাক্য কৌরবদের আরও নীচ কার্যে উৎসাহিত করেছে, আরও সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারাও বুঝতে পারে নি কর্ণের এই জ্বালার অর্থ। তারা স্বাভাবিক ঈর্ষা বলেই ধরে নিয়েছিল। আর কর্ণও ক্রমশ নিজের জ্বালাতে দগ্ধ ও উত্তপ্ত

হতে হতে ক্রমশ উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন—সমস্ত শালীনতা, সমস্ত সুশিক্ষা ও ভব্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তাঁর আচরণ।

কিন্তু দ্রৌপদী আর ভুল বোঝেন নি। কর্ণের মর্মবেদনা বুঝেই আশ্চর্য-রকম শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এর পরে। কৌরবদের সম্বন্ধে যত দাহ তাঁর, যত বিষ-জ্বালা—কর্ণ সম্বন্ধে তত উষ্মা আর প্রকাশ পায় নি। কর্ণ-প্রসঙ্গ বরং এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, সেটা যত না কর্ণ সম্বন্ধে দুর্বলতা—তত নিজের সম্বন্ধে আশঙ্কা। কেবলই প্রশ্ন করেছেন নিজেকে, সেও হয়ত অবচেতনে—তিনি কর্ণ সম্বন্ধে দুর্বল হয়ে পড়ছেন না তো ? কর্ণের অন্তর-প্রদেশের গোপন সিংহাসনে যে দেবতার নিত্য আরতি চলছে—ভক্তের পূজায় ক্রমশ তার দিকে নেমে আসছেন না তো সে দেবতা ?···

তারপর যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসন্ন. তখনই ঐ অত্যাশ্চর্য সংবাদ শুনলেন। কর্ণ রাধেয় নন, কর্ণ কৌন্তেয়। শুনলেন আর্যা কুন্তী নিজে গিয়েছিলেন কর্ণের কাছে--নির্লজ্জার মতো নিজের পরবর্তী পুত্রদের বিপদাশঙ্কায় বিচলিত হয়ে পরিত্যক্ত অবিচারিত জ্যেষ্ঠের কাছে তাদের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে।

আরও শুনলেন গোপন গুপ্তচর মুখে—মহাবীর মহাদাতা কর্ণ তাঁর উপযুক্ত আশ্বাসই দিয়েছেন, তাঁর স্বভাবজ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। জননীকে তিনি ক্ষমা করেছেন কিন্তু সংকটকালে মহোপকারী বন্ধুকে ত্যাগ করতে সম্মত হন নি। তবে মাতাকে আশ্বাস দিয়েছেন—অর্জুন ছাড়া অন্য কোন পাণ্ডবের তিনি প্রাণনাশের কারণ হবেন না। অর্জুনের সঙ্গে তিনি প্রাণপণ যুদ্ধ করবেন—এ তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অবশ্য কুন্তীর ভয় নেই তাতে—সে যুদ্ধে কর্ণই যান আর অর্জুনই যান, কুন্তী পঞ্চ সন্তানেরই জননী থাকবেন।

বিশেষ ক'রে অর্জুন সম্বন্ধে তাঁর এই বিদ্বেষ কেন, এ প্রশ্ন অনেকেই করেছে। এ প্রশ্ন চিরন্তন হয়ে থাকবে ইতিহাস। সে কি শুধু রথী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ? সে কি শুধু যশোলোভ ? কীর্তিলোভ ?

না, দ্রৌপদী জানেন তা নয়। পাঞ্চাল-স্বয়ম্বর-সভায় বীর্যশুল্কে ধানুকী গৌরবে পাঞ্চালীকে জয় করার ক্ষোভটাই ভুলতে পারেন নি কর্ণ। সেদিনের সে অন্যায় অবিচার—সে অবিচার দ্রোপদীরই—তাঁব বুকে আজও জ্বালাময়, সুগভীব ক্ষত জাগিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণার প্রতি—দ্রৌপদী শুনেছেন ওঁর কৃষ্ণা নামটাই বেশী প্রিয় কর্ণের--কোনকারণেই নির্দিষ্ট হওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে

বলে সমস্ত বীতরাগ, সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত প্রতিশোধ-পিপাসা পুঞ্জীভূত হয়েছে সেই স্বয়ম্বরবিজেতা অর্জুনের ওপর।

তাই পাণ্ডবকৌরবদের এই মরণপণ সংগ্রামের আরম্ভ থেকেই দ্রৌপদী অস্বস্তিবোধ করেছেন। আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে থেকেছেন। উনি জানতেন মহামতি ভীষ্ম যে কর্ণকে অর্ধরথী বলে বিদ্রূপ করেছেন তা অনেক হিসেব ক'রেই, পাণ্ডবদের যথার্থ হিতকামনায়। বিরক্ত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ সরে যাবেন—পাণ্ডবদের একই সঙ্গে ভীষ্ম ও কর্ণের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করতে হবে না, নিশ্চয়ই এই আশাতেই তিনি বারবার ব্যঙ্গোক্তিতে উক্ত্যক্ত ক'রে তুলেছেন কর্ণকে। অর্জুনও কর্ণের বিক্রম বা শৌর্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মুখে যা-ই বলুন একমাত্র কর্ণকেই নিজের যথার্থ প্রতিরথী মনে করতেন তিনি। তাই আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে প্রতিমুহূর্ত কাটিয়েছেন দ্রৌপদী। পট্টমহাদেবীর নিজস্ব গুপ্তচর বিভাগ থাকে—ওঁরও ছিল, দণ্ডে দণ্ডে তারা যুদ্ধের ফলাফল শুনিয়েছে ওঁকে। উনি উৎকণ্ঠিত পাংশু মুখে স্কন্ধাবারের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন তাদের।···

অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর দিনটি আসন্ন হয়ে এসেছে, কর্ণ ও অর্জুনের সম্ভাব্য দ্বৈরথ সমরের দিনটি। গুপ্তচরের মুখে খবর পেয়েছেন—শোকতপ্ত আসন্ন পরাজয়ের আশঙ্কায় বিহ্বল দুর্যোধনের কাছে কর্ণের ভীষণ প্রতিজ্ঞা—পরদিনের যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করবেন যদি না তার মধ্যে নিজে অর্জুনের হাতে নিহত হন। আর নিজের কানেই শুনেছেন অর্জুনের শপথবাক্য—পরের দিন হয় কর্ণ নয় অর্জুন একজনের অবশ্য মৃত্যু ঘটবে। 'কালি রণে কর্ণবধ প্রতিজ্ঞা আমার।'

এরপর আর স্থির থাকতে পারেন নি দ্রৌপদী। নিজকণ্ঠের মুক্তাহার পাঠিয়ে বিশ্বস্ত গুপ্তচর প্রিয়কামীকে দিয়ে কৌরব পক্ষের সংবাদ-সংগ্রাহক বিচিত্রকর্মাকে বশীভূত ক'রে ডাকিয়ে এনেছেন। তাকে অনুরোধ করেছেন শুধু একটি সংবাদ কর্ণের কানে পৌঁছে দিতে যে, শুধু নিজের নয় কর্ণমহিষীর আসন্ন বৈধব্য-আশঙ্কাতেও পট্টমহাদেবী কৃষ্ণা কাতর হয়ে পড়েছেন। অশ্রু-বিসর্জন করছেন।

বিচিত্রকর্মা সে মুক্তাহারের মূল্য শোধ করেছিল। বিচিত্র কৌশলেই কথাটা কানে তুলে দিয়েছিল কৌরবদের মহাসেনা-নায়কের কানে।

হায় রে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী যাঁরা বলেছেন তাঁরা কিছুমাত্র

ভুল বলেন নি। নির্বোধ কৃষ্ণা ভেবেছিলেন সেদিন—তিনি খুব একটা কৌশল অবলম্বন করলেন, দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণার চোখে জল এ সংবাদ সহ্য করতে পারবেন না কর্ণ, তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে দুর্যোধনকে নিরস্ত করবেন, এই ভয়ঙ্কর আত্মীয়-বিরোধ মিটিয়ে দেবেন। যুদ্ধের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।···তখন কি জানতেন যে তিনি সেদিন এই সংবাদের দ্বারা কর্ণের মৃত্যুবানই প্রেরণ করলেন। সবচেয়ে বড় কথা, কর্ণ মৃত্যুর পূর্বে আরও একটি বেদনা নিয়ে ইহধাম ত্যাগ করলেন—অর্জুনের প্রিয় কামনাতেই অধীর হয়েছেন দ্রৌপদী, কর্ণের পরাজয় তথা মৃত্যুকামনা করছেন—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল তাঁর জীবনের সেই শেষ প্রত্যূষবেলায়।

বিচিত্রকর্মার মুখেই সংবাদ পেয়েছিলেন দ্রৌপদী, তাঁর অনুমানের প্রথমার্ধ মিথ্যা হয় নি। কৃষ্ণার চোখে জল, সে উদ্বিগ্ন—এই সংবাদে অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন অঙ্গাধিপতি—কিন্তু তাই বলে চরম দুর্দিনে তিনি উপকারী বন্ধুকে ত্যাগ করেন নি, বিপক্ষতা করেন নি—অথবা তাকে অপমানকর সন্ধি ভিক্ষাতেও বাধ্য করেন নি। তাঁর মতো মহাত্যাগী মহান মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই করেছিলেন। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে ইষ্টের কাছে জয় নয়—পরাজয়ই প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যেন কৃষ্ণা সুখী হয়, শান্ত হয়, নিশ্চিন্ত হয়—নিরাপদ বোধ করে, সেই ভিক্ষাই জানিয়েছিলেন জন্মদাতা সূর্যদেবের কাছে।

নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে আসছে অন্ধকার—চারিদিকের শৈলশিখর-চূড়া অবলুপ্ত হয়ে আসছে ক্রমশ সেই ঘনিয়ে আসা তমিস্রায়। অন্ধকার নামছে কৃষ্ণার দৃষ্টিতেও। আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তাঁর চৈতন্য। মৃত্যুর হিম করস্পর্শ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তবু, তার মধ্যেও যেন অস্থির হয়ে উঠলেন দ্রৌপদী। প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছে তাঁর। কিন্তু সে মৃত্যু যন্ত্রণায় নয়, লজ্জায় অনুতাপে। সেদিন কর্ণের মৃত্যুতে যখন পাণ্ডব শিবিরে আনন্দের উৎসব শুরু হয়েছিল তখনও এমনি আকুলিবিকুলি ক'রে উঠেছিলেন তিনি—এমনি অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠেছিলেন। মাটিতে মাথা ঠুকে কাঁদতে ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর—ইচ্ছা হয়েছিল ছুটে গিয়ে মৃতদেহটার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আসেন। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি, পারেন নি লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বিবেকের অনুশাসনে চলতে।

তাই যেদিন প্রকাশ্যে কর্ণের যথার্থ পরিচয় ঘোষণা করলেন আর্যা কুন্তী, সেদিন পাণ্ডবদের অনুশোচনা ও শোকাশ্রুতে নিজের হাহাকার ও চোখের জল মেশাতে পেরে, তাঁর জন্য প্রকাশ্যে শোক করতে পেরে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন দ্রৌপদী। মনের অপরাধবোধ লাঘব করতে পেরে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন।

পাপ? অপরাধ? অন্যায়?

হ্যাঁ, এ যদি পাপ হয়, এই পরপুরুষচিন্তা—পরপুরুষ-আসক্তি বলে স্বীকার করতে রাজী নন তিনি, শ্রদ্ধা সহানুভূতি বললেই বরং সত্যভাষণ হয়—এই অনুভূতি যদি অপরাধ বলে গণ্য হয় তো তিনি পাপী, তিনি অপরাধিনী। এর-জন্য যদি তাঁর পতন হয়ে থাকে—যদি স্বর্গ গমনে বাধা সৃষ্টি ক'রে থাকে তাঁর মনের এই গোপন চিন্তা তো—তার জন্যেও তিনি অনুতপ্ত নন। এর জন্য নরকবাস করতে হ'লে অবশ্যই করবেন, কিন্তু সেটাকে তিনি ধর্মরাজের সুবিচার বলে স্বীকার করবেন না। ন্যায়নীতির অনুশাসন বাইরে থেকে চাপানো জিনিস। বাইরের দেহ পর্যন্ত তার অধিকার—মন সে শাসন মানতে বাধ্য নয়। সেটা—এই দেহ যিনি দিয়েছিলেন, দেহ আর তার মধ্যেকার মন প্রবৃত্তি আবেগ, তাঁর জানা উচিত। দ্রৌপদী তবু তো সে প্রবৃত্তি বা আবেগকে যদৃচ্ছ চলতে দেন নি, যথাসাধ্য সংযত ক'রে রেখেছেন। দেহ তো তাঁর অশুদ্ধ নয়ই—মনেও কখনও তিনি কাউকে প্রেমিকরূপে কান্তরূপে দয়িতরূপে কামনা করেন নি। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তাঁর মর্মবেদনায় দুঃখিত হয়েছেন এইমাত্র। এটুকুর জন্যও যদি কোন শাস্তি নির্ধারিত হয় পরলোকে তো তিনি নিরুপায়।···

আর দেরি নেই। শেষ শ্বাসটুকু ওষ্ঠপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। চিন্তা করার আর সাধ্যও নেই, ইচ্ছাও নেই। শীঘ্রই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো এই বহুজন-ঈপ্সিত বহুজন আকাঙ্ক্ষিত দেহটা ত্যাগ ক'রে যাত্রা করতে হবে সেই অজানা ভবিষ্যতের দিকে। শুধু এই শেষ মুহূর্তে দেহ মন দুইই নিথর নিশ্চল হওয়ার আগে তাঁর সখা আত্মীয় ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষী রেখে এই চরম প্রার্থনাটুকু জানিয়ে যেতে চান—এ জীবনের দায়-দায়িত্বের যেন এইখানেই অবসান ঘটে। যদি জন্মান্তর হয়—আবার যদি এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় তো পঞ্চ নয় একটি মাত্র পতিই তিনি প্রার্থনা করবেন, চাইবেন তিনি প্রথম

কৌন্তেয়কে। ধার্মিক বিবেচক বিচক্ষণ সুধীর স্বামী আর নয়, উনি চান মানুষকে, যে আবেগে দোলে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়, প্রতিহিংসায় দুর্দম হয়ে ওঠে। পাপপুণ্যে সতে-অসতে ত্যাগে-লোভে মেলানো পুরোপুরি মানুষকেই চান তিনি। আর তা পেলে এ জন্মে যত দুঃখ যত আঘাত যত বঞ্চনা অভাগিনী কৃষ্ণার জন্য সহ্য করেছেন কর্ণ—সারা জীবন ধরে স্নেহে প্রেমে সেবায় আত্ম-ত্যাগে তা ভুলিয়ে দেবেন কৃষ্ণা। এ জন্মের ক্ষত নিরাময় ক'রে তুলবেন আগামী জীবনে অন্তরের অমৃতবারি নিষেকে।

আর যদি স্বর্গবাস ভাগ্যে জোটে—শুনেছেন স্বর্গে দ্বেষ নেই, অসূয়া নেই; সকল সংস্কার, সকল বন্ধন, সকল বিধিনিষেধের উর্ধ্বে সেখানকার জীবন—সেখানে প্রকাশ্যেই তিনি পঞ্চপতির সঙ্গে অঙ্গপতিরও সেবা করবেন, তাঁকে ভজনা করবেন—নিত্য অশ্রুজলে ইহলোকের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করবেন।

হে ঈশ্বর, হে জন্মমৃত্যুর শাশ্বত নিয়ন্তা, এবার তুমি মুক্তি দাও দ্রৌপদীকে এ জন্মের বন্ধন থেকে। যজ্ঞাগ্নির দহনে যার জন্ম, সেই হোমানলের জ্বালা যার সাথী, সারা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে—সেই যাজ্ঞসেনীকে ক্ষমা করো এবার। এই দাহ থেকে তাকে রক্ষা করো, শান্তি দাও।

গুরুর প্রাপ্য

আচরণটা অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য লেগেছিল। এমন কি হয়ত এ ঘটনার যিনি কেন্দ্রপুরুষ—সেই প্রাজ্ঞ, স্থবির, মহামাননীয়, সকল যোদ্ধার শস্ত্রগুরু এবং শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধর—স্বয়ং দ্রোণাচার্যের কাছেও।

কুরুপিতামহ মহামানব ভীষ্মের পতনের পর শুধু কৌরব শিবিরেই শোকের মেঘচ্ছায়া নামে নি, শুধু দুর্যোধন পক্ষীয় বয়স্ক পুরুষ এবং যোদ্ধারাই শোকে অধীর হয়ে রোদন করেন নি—এ শোকে পাণ্ডব শিবিরকেও সমান ম্লান ও বিষণ্ণ করেছিল, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও তেমনি আকুল হয়ে ক্রন্দন করছিলেন। উভয় পক্ষই সাময়িকভাবে পরস্পরের প্রতি তীব্র বৈর ভুলে সমান হাহাকার করতে করতে ছুটে এসেছিলেন—বিচিত্র অন্তিমশয্যায় শায়িত মহাবীর, মহাধনুর্ধর, মহাজিতেন্দ্রিয়, ভীষণকর্মা ভীষ্মের চারি পাশে।

অথচ যাঁর সঙ্গে এই পিতামহ ভীষ্মের সর্বাধিক সৌহার্দ্য, যিনি ভীষ্মেরই আনুকূল্যে—অনুগ্রহ বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা ও সুখ লাভ করেছেন সেই দ্রোণ কি করলেন? দরিদ্র ভাগ্যবঞ্চিত দ্রোণ যখন শ্যালকগৃহে মলিন চীরবাসধারী ভিক্ষুকের জীবন যাপন করছিলেন—তখন ভীষ্মই সন্ধান পেয়ে তাঁকে সমাদরে ডেকে এনে এই অস্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপর রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দেন, ধনধান্যপূর্ণ উত্তমগৃহ, উৎকৃষ্ট বসনভূষণ ও নিরাপদ নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। সে-ই ওঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাতও। শুধু কৌরবরাই নয়, স্বয়ং ভার্গব—সেই ভয়ঙ্কর পরশুরামের সকল অস্ত্রের উত্তরাধিকারী দ্রোণাচার্য যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন শুনে অন্য বহু দেশের রাজকুমাররা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হলে সেইসব শস্ত্রশিষ্য রাজকুমারদের সাহায্যেই তিনি দ্রুপদকে পরাজিত ও বিনত ক'রে বহুদিন পূর্বের অবহেলা ও অপমানের শোধ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন—অথচ যাঁর অনুগ্রহে এই সমস্ত সম্ভব হয়েছে যাঁর কাছে ঋণের অবধি নেই, যিনি নিঃস্ব ভিক্ষুককে ধরে এনে রাজসিংহাসনেরও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন—সেই ভীষ্মের পতনের সংবাদ শুনেও দ্রোণ কিন্তু সেখানে ছুটে আসেন নি।

সেদিনের সে সার্বিক হাহাকার, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দুঃশাসন যখন ব্যাকুল হয়ে এসে সংবাদটা দিল, তখন—সেই নিদারুণ বার্তা শোনামাত্র—আচার্য দ্রোণ মানসিক আবেগে কিছুক্ষণের জন্য সম্বিৎ হারালেন। তার পর, প্রায় অর্ধদণ্ডকাল পরে ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে এলেও সক্রিয় হয়ে উঠতে বহু বিলম্ব ঘটল। কেমন যেন জড় প্রস্তরবৎ হয়ে রইলেন তিনি, বিহ্বলভাবে। তাঁর মুখ দেখে মনে হতে লাগল যেন এ ঘটনার গুরুত্ব, সংবাদের পূর্ণ তাৎপর্য তাঁর মাথায় ঢুকছে না। তাঁর চারিদিকে কী ঘটছে সে সম্বন্ধেও তিনি কিছুমাত্র সচেতন নন। বস্তুত তাঁর দেহটা মাত্র এখানে থাকলেও মন ও আত্মা যেন বহুদূরে চলে গেছে। তাই কুরুপিতামহের এই অত্যাশ্চর্য মহাপতনে তাঁরই যে সর্বাগ্রে ছুটে যাওয়া প্রয়োজন, সে কথাটা মনে পড়ছে না।

সত্যই মনে পড়ে নি সেটা—এই সর্বপ্রধান কর্তব্যটা।

মন তাঁর বহুদূরে চলে গিয়েছিল, আজ থেকে বহুদিন পশ্চাতে।

ভদ্র শিক্ষিত লোকের জ্ঞানকৃত অপরাধের স্মৃতি ও অন্যায়-বোধ চিরস্থায়ী

দুষ্টব্রণের মতো লেগে থাকে তার মনে। এই ধরণের গোপন ক্ষত মানুষ সাবধানে সন্তর্পণে ঢেকে রাখে বস্ত্রাবৃত ক'রে—কিন্তু তার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায় না। বরং তা আরও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে—কাউকে জানিয়ে দেখিয়ে একটু সান্ত্বনা কি সহানুভূতি লাভ করতে পারে না বলে।

স্থবির মহাগুরু দ্রোণাচার্যেরও সেই অবস্থা হয়েছে। একটা গোপন প্রবল অপরাধ-বোধ এই দীর্ঘকাল ধরে কর্কট রোগের ক্ষতের মতোই নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে তাঁকে। না পারছেন কোন প্রায়শ্চিত্ত করে তা থেকে অব্যাহতি পেতে, আর না পারছেন কাউকে সেই লজ্জাকর অপরাধের কথা—সেই সঙ্গে নিজের নিরুপায়তার কথা—জানিয়ে কিছু সান্ত্বনা বা পরামর্শ লাভ করতে।

কাউকে জানাতে পারছেন না—কারণ জানাবার মতো নয়।

কেউ কেউ জানে ঠিকই, কিন্তু কালক্রমে অসংখ্য ঘটনার ধূলিঝঞ্ঝায় সে স্মৃতি চাপা পড়ে গেছে—আজ আবার নতুন ক'রে মনে করিয়ে দিলে চারিদিকে থেকেই হয়ত একটা প্রবল ধিক্কার ও নিন্দার তরঙ্গ উঠবে। সে সময় ওঠে নি—দীর্ঘকাল পূর্বের মানুষের বিবেক অন্যভাবে প্রভাবিত হত বলেই নয়—সে সময় অনেকেই বালক ছিল, ঘটনাটার পূর্ণ অর্থ তাদের মাথায় ঢোকে নি, অথবা আচরণটাকে এত দোষণীয় বা নিন্দনীয় বলে বুঝতে পারে নি। কিন্তু আজ এই পরিণত বিচারবুদ্ধির বয়সে সে কথা স্মৃতিপথে উদিত হলে সকলেই তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে, সঘৃণ দৃষ্টিতে তাকাবে তাঁর দিকে। এমন কি যার জন্য এ কাজ তিনি করেছিলেন—হয়ত সে পর্যন্তও।

অবশ্য, তার জন্যেই কি ঠিক তিনি করেছিলেন?

যতবার কথাটা তিনি মনকে বোঝাতে গেছেন—ততবারই তাঁর বিবেক তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, ব্যঙ্গ-শাণিত হয়ে উঠেছে তার রসনা।

হয়ত আজ কাউকে অকপটে খুলে বলতে পারলে, মানুষের নিন্দা মাথা পেতে নিলে কিছুটা শান্তি পেতেন, প্রায়শ্চিত্ত হল বলে মনে করতেন। হায় রে, এই বয়সেও মানসিক দুর্বলতা, মিথ্যা প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি, সেই মোহই তাঁর মুক্তির পথ রুদ্ধ করেছে। ধীরে ধীরে, দীর্ঘকাল-ক্রমে এই যে অগণিত মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধার একটি আসন গড়ে উঠেছে—শুধু কৌরবরা বা পাণ্ডুপুত্ররা নয়, দেশ-বিদেশের নৃপতি ও ক্ষত্রবীররা তাঁকে যে সম্ভ্রমবিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন—সেই আসন, সে শ্রদ্ধা হারাতে

সাহস হয় নি তাঁর, তাই পারেন নি নিজের সম্বন্ধে নির্মম হয়ে নিজের বিচার করতে, সযত্নে রচিত মিথ্যা খ্যাতির সিংহাসন থেকে নেমে এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে।

অপরাধ অনেক।

অবিচার বললেও ভুল বলা হবে, অন্যায়ই করেছেন তিনি।

সশ্রেণীর কোন লোককে—সম্রান্ত উচ্চকুলোদ্ভব কারও সঙ্গে এ আচরণ করলেও এতটা দোষাবহ হত না হয়ত। অশিক্ষিত পদানত নীচকুলোদ্ভবের সঙ্গে এই প্রবঞ্চনা করা আরও অন্যায় হয়েছে—বিশেষত যে তাঁকে দেবতা-স্থানে পূজা করে সেই শিষ্যোপম তরুণ কিশোরকে এমনভাবে প্রতারিত ক'রে তাঁর সর্বনাশ সাধন করা। যা তার জীবনের সব চেয়ে বড় কাম্য, একান্ত আকাঙ্ক্ষিত, তার সাধনার সবচেয়ে বড় সিদ্ধি, তা থেকে তাকে চিরকালের মতো বঞ্চিত করা, জীবনের সকল সফল সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করা।

অথচ সে বেচারী কোন অপরাধই তো করে নি। না তাঁর কাছে, না অপর কারও কাছে। একমাত্র অপরাধ তার, নীচ কুলে জন্মেও যোদ্ধা হবার উচ্চাশা করেছিল।

তবু, সেও রাজপুত্র। নীচ বংশে জন্ম হলেও একলব্যর পিতা হিরণ্যধনু রাজাই ছিলেন—নিষাদ বা ব্যাধদের রাজা।

কিন্তু শুধু নীচ-কুলোদ্ভব বলেই কি তাকে এমন নির্দয় শাস্তি দিয়েছিলেন সেদিন, তার উচ্চাভিলাষকে এমন ভাবে নির্মূল, সিদ্ধির-অনুমাত্র-সম্ভাবনা-শূন্য করেছিলেন।

তাহলেও তো তবু একটা সান্ত্বনা দিতে পারতেন নিজেকে—নিজের বিবেককে। তিনি উচ্চবর্ণের লোক, ব্রাহ্মণ—তিনি তাঁর ধারণা এবং সংস্কার-মতোই কাজ করেছেন—এইটুকু সমর্থন করতে পারতেন নিজের কুকর্মের।

না, তিনি এ কাজ করেছিলেন সেদিন—জ্ঞানতই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, দুরন্ত অভিমান—গোপন প্রতিহিংসাস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য।

একলব্য যেদিন স্নানান্তে বল্কল পরিহিত হয়ে পুষ্প দূর্বা মধু দুগ্ধ ও মৃগ-মাংস প্রভৃতি অর্ঘ্য নিয়ে করজোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর শিষ্যত্ব প্রার্থনা করে-ছিল, সেদিন তাকে তিনি নীচকুলোদ্ভব, নীচ বৃত্তি বা জীবিকার মানুষ—এই যুক্তি দেখিয়েই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—যদিচ ন্যায়ত সে অধিকারও তাঁর

ছিল না। তিনি বর্ণগুরু, তিনি শিক্ষক—তাঁর কাছে সকলেই সমান, বিশেষ কিশোর একলব্য ব্রহ্মচারী নিষ্পাপ—তা তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলেন।

তবু তাতে অত দোষ হয় নি। লোকাচারের অছিলা একটা ছিল। কিন্তু তারপর যেটা করলেন সেটাই অমার্জনীয় অপরাধ। চিরদিন, যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী—এই অপযশ ঘোষিত হবে, ঐ লোকটার, ঐ চণ্ডালটার সুকৃতি আর তাঁর কুকীর্তি। যতদিন একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে মনুষ্য সমাজের চিহ্ন হিসেবে, ততদিনই এই অপকীর্তি এই জঘন্য স্বার্থবুদ্ধির কাহিনী প্রচারিত হবে। অথচ একলব্যর মতো ভক্ত তাঁর কেউ ছিল না সেদিন। সেদিন কেন—আজই বা কে আছে? এই দীর্ঘকালের মধ্যে এমন কোন শিষ্য কি তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেছে? একজনও না। এই তো—যে পাণ্ডব-দের জন্য, যে অর্জুনের জন্য তিনি এই কদর্যতম অন্যায়াচরণ করলেন, শুদ্ধমাত্র তাকে খুশী করার জন্য—সেই পাণ্ডবরা, সেই অর্জ্জুনই তো তাঁকে বধ করার জন্য তাঁকে পরাজিত করার জন্য আজ বদ্ধপরিকর।

সেদিনের কথাটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। চিরদিনই থাকবে। মনের পটে আগুনের অক্ষরে লেখা আছে সে ছবি।

কুমারদের নিয়ে গভীর অরণ্যে শিকারে গিয়েছিলেন—শিকার-পারদর্শিতা রাজকুমারদের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। স্বভাবতই শিকারী কুকুর ছিল সঙ্গে। কর্দমলিপ্ত চীরবাস-পরিহিত, তপঃকৃশ-তনু, জটাধরী কৃষ্ণকায় একল্যবকে দেখে একটি কুকুর তার স্বধর্মানুযায়ী উত্তেজিত হয়ে উচ্চরব করতে করতে তার দিকে ধেয়ে গিয়েছিল, তপস্যায় বাধাপ্রাপ্ত বিরক্ত একলব্য আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে তার ধ্বনি-ব্যাদিত মুখ-গহ্বরে পর পর সাত আটটি তীর বিঁধে তাকে নীরব ক'রে দিয়েছিল।

ভীত সারমেয়টি অস্ফুট একটা আর্তনাদ করতে করতে সেইভাবে কুমারদের কাছে ফিরে এলে এই আশ্চর্য শরনিক্ষেপ-দক্ষতা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হল। বিস্ময়ের সীমা রইল না কারও—বিস্ময়, আর তার সঙ্গে একটা মুগ্ধ সম্ভ্রমবোধ। তার মধ্যেই অভিমানে স্ফুরিতাধর হয়ে কিশোর অর্জুন বললেন, 'আচার্যদেব, আপনি আমাকে আশ্বাস—শুধু আশ্বাস কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সমগ্র সসাগরা ধরণীতেই আমাপেক্ষা দক্ষ আর কোন ধনুর্ধর থাকবে না, আমিই হব

শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ ; সরল বিশ্বাসে আপনার উপর নির্ভর ক'রে আত্মতৃপ্ত ছিলাম। কিন্তু আজ সকলের সামনে, বিশেষ এইসব বিদেশী কুমারদের কাছে—সে তৃপ্তি বিনষ্ট, সে গর্ব চূর্ণ হ'ল—অপরিসীম লজ্জা পেলাম।'

বিস্মিত দ্রোণও বড় কম হন নি। এ কৃতিত্ব বোধ করি তাঁরও কল্পনাতীত। তাই তিনি এদের বলার অপেক্ষা রাখেন নি। তৎক্ষণাৎ আহত সারমেয়টির পিছু পিছু সেই গভীরতর অরণ্যদেশে গিয়েছিলেন। যে দৃশ্য সেখানে গিয়ে তাঁর চোখে পড়েছিল তাতে আনন্দে গর্বে বুক ভরে ওঠারই কথা। প্রত্যাখ্যাত নিষাদ-রাজতনয় একলব্য সেই জনমানবহীন অরণ্যে গুরুরূপে তাঁরই মৃন্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে একাগ্রমনে, তপস্যার মতো ক'রে শস্ত্রাভ্যাস করছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সাধারণ নিয়মে যে তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করার কথা—তিনি তা করতে পারেন নি, করার উপায়ও ছিল না বুঝি। কারণ তাঁর মনে তাঁর প্রতিশোধ-সঙ্কল্পই সর্বাগ্রগণ্য। তিনি তৎক্ষণাৎ হিসাব করতে বসেছিলেন যে, একলব্য যত বড় সুকৌশলী যোদ্ধাই হোক, একক তার দ্বারা তাঁর কার্যসিদ্ধি হবে না। অন্যদিকে অর্জুন তথা কৌরবরা সহায় থাকলে অনায়াসে তা হতে পারবে। এতগুলি রাজকুমার আর কৌরবদের বিপুল সৈন্যবাহিনী—এদের সামনে দ্রুপদ দাঁড়াতেও পারবেন না, যুদ্ধ তো দূরের কথা।

এই হিসাব ক'রেই নিতান্ত নীচ স্বার্থপরের মতো, চণ্ডালাধিক চণ্ডালের মতো ঐ বীর উদার মহান চণ্ডালপুত্রের কাছে গুরুদক্ষিণা দাবী করেছিলেন—তার দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি—এবং সেও অম্লানবদনে তা দিয়েছিল।

স্বার্থে অন্ধ হয়ে হিসাবটা করেছিলেন বলেই সেদিন কতকগুলো কঠিন রূঢ় সত্য তাঁর মনে পড়ে নি। একলব্যর কাছে গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করা মানেই তার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে নেওয়া। তাহলে ইতিপূর্বে তার জন্ম, বংশ ও বৃত্তির দোহাই দিয়ে তাকে যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেটা আজ মিথ্যাচরণ বলে প্রমাণিত হয়। আরও একটা কথা মনে পড়া উচিত ছিল সেদিন—একলব্য যা-ই বলুক আর যা-ই করুক, তিনি যখন জানতেন যে কোন দিন কোনও কালে এক নিমেষের জন্যও, অনুমাত্র শিক্ষাও তাকে দেন নি, তখন তার কাছে গুরুদক্ষিণা চাওয়া মানেই অন্যায় প্রতিগ্রহ করা, প্রত্যবায়ভাগী হওয়া। এও এক রকমের প্রতারণা, পরস্বাপহরণ।

কিন্তু সেদিন নিজের স্বার্থবুদ্ধিতে অন্ধ ও বধির হয়েছিলেন। বিবেকের অনুশাসন শোনার মতো, জাজ্বল্যমান সত্য দেখার মতো অবস্থা ছিল না।

চিরঅবনত চিরপদদলিত নিষাদরা কিন্তু এই অবিচার বা অত্যাচার এত সহজে মেনে নিতে পারে নি। একলব্য তাদের আশা-ভরসা, একলব্য তাদের জাতির প্রত্যক্ষ মুক্তিদূত। ওকে কেন্দ্র ক'রে তাদের অনেক কল্পনা, অনেক উচ্চাশার স্বপ্ন। এইভাবে সে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত, প্রতারিত হয়ে তারা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠল, প্রবল আলোড়ন উঠল নিষাদসমাজে। কেউ বললে, 'আর আমরা ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে আজ থেকে আমাদের সম্পূর্ণ অসহযোগ।' কেউ বা বললে, 'এবার থেকে যেন ওদের পাদুকার চর্ম আর ভোজ্যের মাংস নিজেরাই সংগ্রহ ক'রে নেয়—সেই সঙ্গে অসিযুদ্ধের চর্মও। ওদের সঙ্গে ব্যবসায়ে আমাদের প্রয়োজন নেই। বনের ফল আর বন্যপশুর মাংস খেয়ে আমরা সুখেই থাকব—ওরা আমাদের সাহায্য না নিয়ে কেমন ক'রে বাঁচে তাই দেখব।'

সেদিন একলব্যই তাদের শান্ত ও নিরস্ত করেছিল। জনে জনে মিনতি ক'রে বলেছিল, তিনি যে আমার শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সে-ই আমার সৌভাগ্য। কৃতার্থ হয়েছি আমি। আমাদের—চণ্ডালদের এর চেয়ে জয়লাভ আর কি হ'তে পারে? কুরুবংশের শস্ত্রশিক্ষক ব্রাহ্মণ, গুরু ভার্গবের উত্তরাধিকারী—তিনি আমার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করেছেন, এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর তো আমি কিছু ভাবতেই পারি না। আমি তৃপ্ত ও প্রসন্নমনেই দক্ষিণা দিয়েছি, কোন ক্ষোভ কি অতৃপ্তি নেই সেজন্য। এই উপলক্ষ ক'রে যদি কোন বিরোধ বাধে, তাহলেই আমি বরং দুঃখ পাবো।... তাছাড়া ছাখো, তারা প্রবল, সব দিক দিয়েই আমাদের চেয়ে বড়, তারা যদি আমাদের আচরণকে স্পর্ধা মনে ক'রে তার প্রত্যুত্তর দিতে আসে—একনিমেষেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। ক্ষতি তো হবেই—অপমানেরও সীমা থাকবে না। তোমরা এই দুর্বুদ্ধি ছাড়ো, গুরুর যদি কৃপা থাকে—আমি বাঁ হাতেই শর নিক্ষেপ ক'রে যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারব।' *

---

* মহাভারতে আছে আঙুল কাটার পরই বাঁ হাতে শরযোজনা ক'রে দেখেছিলেন একলব্য—কিন্তু ঠি[illegible] আগের মতো নৈপুণ্য বা ক্ষিপ্রতা আর তাঁর ছিল না। কিন্তু [illegible] খাঁযায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (ঘটোৎকচ বধের পর), সে অঙ্গুলিত্র ধারণ ক'রে অস্ত্র

একলব্যের যুক্তিপূর্ণ বিনয়বচনে আর সকলে শান্ত ও নিবৃত্ত হলেও পর্ণাদ বলে একটি তরুণ নিষাদ নিরস্ত হ'ল না। সে কাউকে কিছু না বলে আরও দুর্গমে, গহন অরণ্যে গিয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ ক'রে কঠোর তপস্যা করতে শুরু করল। দ্রোণের উপযুক্ত শাস্তিই তার তপস্যার লক্ষ্য। দ্রোণের মৃত্যুতেই তার সিদ্ধি।

ক্রমশ সে কঠোর তপস্যায় দেবতারা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। শেষে স্বয়ং বিধাতা একদিন এলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধরে। বললেন, 'বৎস, তুমি নীচ জাতির ছেলে হয়েও তো বেশ কঠোর তপস্যা করছ। সত্যিই তোমার প্রশংসা করতে হয়। তোমার উদ্দেশ্যটা কি বাপু? ধনসম্পদ? শক্তি? রাজ্যখণ্ড?—না আর কিছু। শিগগিরই আমার সঙ্গে বিধাতার দেখা হবে হয়ত—জানা থাকলে তাঁকে বলতে পারি।'

এতদিনের কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা ও একাগ্র তপস্যার ফলে পর্ণাদ সর্বপ্রকার ক্লেদ বিরহিত হয়ে যথার্থ তপস্বীর দৃষ্টিলাভ করেছিল। সে বললে, 'আমি জানি তুমিই বিধাতা। আমার সঙ্গে ছলনা ক'রে লাভ নেই। আমার বিবাদ তোমার সঙ্গেই।'

বিধাতা প্রসন্ন হয়ে অভয়মুদ্রা ক'রে আশীর্বাদের ভঙ্গী করলেন। বললেন, 'তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখে বুঝছি জন্মগত যে অনধিকারই থাক, নিজের শক্তিতে তুমি তা লঙ্ঘন ক'রে তপর্লোকের অধিকারী হয়েছ। এখন তোমার কি প্রার্থনা, কী উদ্দেশ্যে এই কঠোর তপস্যা তাই জানতে ইচ্ছা করি।'

সক্ষোভে ও অভিমানে পর্ণাদ বলে উঠল, 'কেন—কেন একলব্যর এত বড় সর্বনাশটা হ'ল—বিনাকারণে—তাই আমাকে আগে বল বিধাতা, কেন এই ভাগ্যলিপি লিখেছিলে তার ললাটে? কী অপরাধ করেছিল সে যে এত বড় শাস্তিটা তাকে দিলে। ব্রতচারী শুদ্ধ ব্রাহ্মণের মতোই সে কঠোর সঙ্কল্প ক'রে, একাগ্রমনে প্রাণপণ ক'রে নির্জনে বসে শস্ত্রতপস্যা করছিল। কেন তাকে ঐ ব্রাহ্মণটা এমনভাবে প্রবঞ্চনা করবে আর তার পরেও স্বচ্ছন্দে সমাজের

নিক্ষেপ অভ্যাস করে এবং দ্বিতীয় পরশুরামের মতো যোদ্ধা হয়ে ওঠে। ক্রমে এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হয় যে, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব এমন কি দেবতাদেরও অজেয় বলে গণ্য হয়। সেইজন্যই, পাছে সে অর্জুনের প্রতি প্রতিশোধ কামনায় দুর্যোধনপক্ষে যোগ দেয়—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাকে নিহত করেন।

মাথার ওপর বিচরণ করবে! কেন? কেন?…শুনেছি সব ঘটনাই তোমার পূর্ব-নির্দিষ্ট, তোমারই সংঘটন। এ তোমার কি অবিচার বিধাতা! আমরা নীচজাতি বলে তুমি সুদ্ধ এমন পক্ষপাতিত্ব করবে, আমরা কোন সুবিচারই পাব না?'

বিধাতা বললেন, 'লক্ষ লক্ষ মানুষ, কোটি কোটি ইতরপ্রাণী—তাদের জীবনে কোন্ দিন কি ঘটবে—আমার এত অবসর নেই বৎস যে তার প্রত্যেকটি আমি আগে থেকে নির্দিষ্ট ক'রে রাখব। কার কি অদৃষ্টে আছে, জীবনে কি ঘটবে তা নির্ভর করে জন্মলগ্নে তার কী গ্রহ-সন্নিবেশ ছিল তার ওপর, সেই মতোই তার সুখদুঃখপ্রাপ্তি ঘটে। অবশ্য কিছুটা ভবিষ্যৎ মানুষ নিজের কর্মের দ্বারাও তৈরী ক'রে নেয়—তবে সে কর্মের জন্যও তার সেই জন্মমুহূর্তই দায়ী।'

'তবে এর কি কোন প্রতিকার নেই?' ক্ষুব্ধ রুষ্ট পর্ণাদ বলে ওঠে, 'এত বড় অবিচার অন্যায়ের দায় তুমি একলব্যের জন্মলগ্নের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে? তাহলে কি ঈশ্বরের বিচার বলতে আমরা যা বুঝি তা নিতান্তই কথার কথা? ঈশ্বর শুধুই বোবা কালা দর্শক মাত্র? তবে আমরা কেন বার বার ভগবানকে ডাকি? সে কি একেবারেই নিরর্থক?'

বিধাতা হেসে বললেন, 'বৎস, ঈশ্বরের বিচার অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু তা অমোঘ, অব্যর্থ। হয়ত কখনও কখনও সে বিচার বিলম্বিত হয়, কিন্তু একদিন তা আসবেই। অবশ্যম্ভাবী, অনির্বার। বিলম্বিত হয় তার কারণ ভগবান প্রথমটা কিছুদিন সময় দেন মানুষ বা যক্ষরক্ষ অপর সজ্ঞান জীবদের—যদি তাদের সুমতি হয় বা তারা অনুতপ্ত হয়। তারপরও কিছুদিন তাদের বাড়তে দেন, সে কত দূর যায় তা লক্ষ্য করেন। সেই জন্যই অনেক সময় মনে হয় অধর্মেরই জয়-জয়কার হচ্ছে, মনে হয় ঈশ্বরের ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই।… কিন্তু একদিন সে ন্যায়বিচার ঠিকই নামে, নিক্তির তৌলে—বিধাতার রুদ্ররোষ রূপে। যখন সে বিচার আসে তখন সে অধর্মকারীর মূলসুদ্ধ বিনষ্ট করে। …বৎস, এটা অবশ্যই মানবে সব পাপের শাস্তি সমান নয়, তা হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। যে অন্যায়ের যে সাজা—বিধাতা ঠিক তা হিসাব ক'রেই বিধান করেন। এখন দ্রোণের মৃত্যু হলে তার কতটুকু শাস্তি হ'ত? ধরো যদি সেই দণ্ডে তার মাথায় বজ্রাঘাতই হ'ত—সেটাকে কি তুমি ন্যায়বিচার বলবে? দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—এই হ'ল যথার্থ দণ্ড, সুবিচারের ফল।

যে প্রতিষ্ঠা ও সুখের লোভে দ্রোণ এমন করল—সেই প্রতিষ্ঠাই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। তাতে ওর মায়া আসুক, প্রতিপত্তির নেশা ধরুক মনে—তার পর তা যখন কেড়ে নেব তখন কি ঢের বেশী কষ্ট হবে না তার? যা পাই নি তা না পেলে কতটুকু দুঃখ হয়?···জেনে রাখো বৎস—যে পাণ্ডবদের জন্য সে এমন হীন কাজ করল, একদিন সেই পাণ্ডবদের হাতেই সে নিপীড়িত ও নিহত হবে। আরও আশ্চর্য হবে হয়ত শুনলে, তাকে যে বধ করবে সেও জন্মগ্রহণ করেছে। যে দ্রুপদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সে এত নিচে নামল সেই দ্রুপদের ঘরেই তার নিধনকারীর জন্ম হয়েছে। মিথ্যাচরণ ক'রে সে একলব্যর সারাজীবনের তপস্যা, তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, সেও সেই মিথ্যাতেই বিনষ্ট হবে। যে ছেলের জন্য তার ঐশ্বর্যের এত লোভ, সেই ছেলে তার ক্রূরকর্মা অমানুষ হবে। অমানুষ কিন্তু দীর্ঘজীবী, দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে অকথ্য দুঃখভোগ করবে।*···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বৎস, ঈশ্বর সব ঘটনা না প্রত্যক্ষ করুন, তাঁর একটা নিয়ম বাঁধা আছে, সে নিয়ম সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মতো কাজ ক'রে যায়—তাতে এক চুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।··· যার যা পাওনা সে তা পাবেই।

বিধাতা পুনশ্চ পর্ণাদকে আশ্বাস দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে অন্তর্ধান হলেন। পর্ণাদও তপস্যা ত্যাগ ক'রে আবার লোকালয়ে ফিরে এল।···

পর্ণাদ-বিধাতা সংবাদের এই অত্যাশ্চর্য বিবরণ যে একেবারে গোপন রইল না তা বলাই বাহুল্য। ক্রমশঃ লোক-পরম্পরায় তা সত্য-মিথ্যায় কিছুটা পরিবর্তিত বিকৃত হয়ে দ্রোণের কানেও এসে পৌঁছল। কিন্তু তখন এসব সংবাদে উদ্বিগ্ন কি বিচলিত হবার কথা নয়,—এই সব জনশ্রুতিতে—সাফল্যের নেশায় তিনি তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন প্রায়। বহু শিষ্যের আনত শির তাঁর পায়ে প্রণাম জানাচ্ছে, মহারাজ-চক্রবর্তীরা তাঁর প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শনে ব্যস্ত। কুরু-রাজসভায় তাঁর স্থান ভীষ্মের পরেই—তিনি মনে করেন সমান।

---

* অশ্বত্থামার চরিত্র ও পরিণামের আভাস পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের কথা থেকেই। এক জায়গায় তাঁর প্রসঙ্গে বাসুদেব বলছেন, 'তিনি ক্রোধী, দুরাত্মা, চপল ও ক্রূর।' তারপর যখন অশ্বত্থামা সাংঘাতিক ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তা সম্বরণ করতে পারলেন না, ফলে উত্তরার গর্ভ বিনষ্ট হ'ল, তখন বললেন, 'তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে অসহায় অনারোগ্য-ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয-শোণিত-গন্ধী হয়ে বিচরণ করবে'

তাছাড়া এসব তো সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এখন এ চিন্তার প্রয়োজন নেই, মৃত্যুকালের বহু বিলম্ব এখনও। পাণ্ডবদের হাতে নিহত হ'তে হলে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধের প্রয়োজন—বর্তমানে সে সম্ভাবনা কোথায় ?

দ্রোণ নিশ্চিন্ত নিরাপদে বহু দুঃখভোগের পর পাওয়া এই আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে লাগলেন। সে সুখের দক্ষিণাবাতাসে একলব্য সম্পর্কীয় যা কিছু সামান্য আত্মগ্লানি কুটোর মতোই কোথায় উড়ে চলে গেল।

সহসা এক রূঢ় আঘাতে যেন তাঁর সুখনিদ্রা ভেঙে গেল।

কপট-দ্যূতসভাতেই প্রথম সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি।

বহুদর্শী, জীবনে বহু পোড় খাওয়া দ্রোণাচার্য সেই একদিকে ক্রুদ্ধ, অপরদিকে ব্যঙ্গ-চপল কোলাহলের মধ্যেই শুনতে পেলেন মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পদধ্বনি—স্পষ্ট দেখতে পেলেন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের অবিমৃষ্যকারিতার, নির্বুদ্ধিতার ফল।

ওরা মরবেই, সেই সঙ্গে ওঁকেও মরতে হবে। পাণ্ডবদের সেই প্রথম জীবনের অজ্ঞাতবাসকালেই ওঁরা ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করেছেন—জানিয়েছেন আনুগত্য। তার পর, পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে বিবাহ ক'রে ফিরে এলে রাজ্যভাগ হয়েছে, পাণ্ডুপুত্রদের জন্য নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ সেই পুরাতন হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রদেরই বেতনভুক্ থেকে গেছেন। সুতরাং যুদ্ধ বাধলে এই পাপপক্ষেই যুদ্ধ করতে হবে তাঁকে, অর্থাৎ পাণ্ডবদের বিপক্ষে। আর সেক্ষেত্রে—

সেক্ষেত্রে কি হবে তা দ্রোণ জানেন। মৃত্যু অনিবার্য। এই মূঢ় দাম্ভিক দুর্যোধনের সাধ্য নেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবদের পরাজিত করে!

চঞ্চল হয়ে উঠলেন দ্রোণ। শুধু অনুতাপ আত্মগ্লানিতেই নয়, আতঙ্কেও অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে আর স্থির থাকতে না পেরে খুঁজে খুঁজে একদা নিষাদরাজ একলব্যের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বিস্মিত একলব্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। আদর-আপ্যায়নের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করল না—গুরুকে ইষ্টদেবতার পূজার মতো ক'রেই আবাহন জানাল। নূতন অজিনাসনে বসিয়ে নদীর জলে পাদ-প্রক্ষালন ক'রে পুষ্পচন্দন দূর্বা সুগন্ধি তৈল মধু প্রভৃতি অর্ঘ্য দান করল,

ধূপ-দীপে আরতি ক'রে ফল, দুধ ও মধু নিবেদন করল ভোজ্য হিসাবে। ব্রাহ্মণ ও আর্য—এর বেশি কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না এখানে তা একলব্য জানে। তারপর নতজানু হয়ে বসে দুই হাত জোড় করল, 'আদেশ করুন, আপনার কি প্রিয়সাধন করতে পারি!'

আজ আর বৃথা কোন বাগাড়ম্বর করলেন না দ্রোণাচার্য। তাঁর যা অনুমান আর আশঙ্কা খুলে বললেন সব। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দের পরিণাম তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, সেই সঙ্গে নিজেরও।

একলব্য সব শুনে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থেকে একটু ম্লান হেসে বলল, 'প্রভু, যদি সত্য বলে মনে আঘাত দিই, সে আঘাত আমাকেও সমান ভাবে আহত করবে—এই ভেবে ক্ষমা করবেন। আমার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ যদি আপনি দয়া ক'রে গ্রহণ না করতেন, কি আমাকে শিষ্যত্ব গ্রহণে বিমুখ না করতেন—তাহলে আমিই আজ আপনার পক্ষে যুদ্ধ করতে পারতুম, আর আপনার কৃপায় স্বয়ং দেবেন্দ্ররও সাধ্য হ'ত না আপনার কোন অনিষ্ট করে। কিন্তু আজ পাণ্ডবদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে এমন একজনকেও তো দেখছি না।'

শুনেই অবনত মস্তকে বললেন দ্রোণ, 'তবু শুনেছি তুমি অঙ্গুলিত্রের সাহায্যে অজেয় ধনুর্ধর হয়ে উঠেছ।'

'একটু ভুল শুনেছেন বোধ হয়। অপরের কাছে অজেয় হলেও গাণ্ডীবী অর্জুনের কাছে নয়। অঙ্গুলিত্রে আর অঙ্গুলিতে এটুকু প্রভেদ থাকবে বৈকি। আপনি শস্ত্রশাস্ত্রপারঙ্গম—এ বিষয়ে আপনার হিসাবে কিছু ভুল হয় নি। অর্জুনই আজ সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর।

মাথা আরও হেঁট হয়ে এল দ্রোণাচার্যর। অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন তিনি। তারপর ঈষৎ লজ্জাস্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে একলব্য?'

একলব্য দু হাতে নিজের কান ঢাকলেন। বললেন, 'আমার কাছে আপনার কোন অপরাধই থাকতে পারে না দেবতা। সুতরাং যখন অপরাধই হয় নি—তখন ক্ষমার প্রশ্নই বা উঠবে কেন?'

আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে—এতক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা কণ্ঠের কাছে বহিরাগমনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল অথচ প্রকাশ করতে পারছিলেন না—

সেই পর্ণাদের প্রসঙ্গটা তুললেন দ্রোণাচার্য। যথার্থ ইতিহাসটা জানতে চাইলেন। যা শুনেছেন সব কি সত্য ?

একলব্য বলল, 'আপনি কি কি শুনেছেন তা জানি না, তবে পর্ণাদ সত্যিই আপনার মৃত্যুকামনায় কঠোর তপস্যায় রত হয়েছিল এবং শুনেছি সে বিধাতারও দেখা পেয়েছে। সে সাক্ষাতের বিবরণ সে আমাকে দিয়েও গেছে।...এতে যে আমি কত দুঃখিত কত লজ্জিত তা কাউকে বোঝাতে পারব না, সর্বজ্ঞ আপনি—আপনিই বুঝবেন শুধু। মর্মাহত হয়ে আছি সেজন্যে।'

দ্রোণ প্রশ্ন ক'রে পর্ণাদ যা বলেছে সব জেনে নিলেন।

সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত শেষ হতে দ্রোণ উত্তেজিত হয়ে উঠে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'মিথ্যাচরণ ? আমি মিথ্যাচরণ করেছি ! সে কি ! সেইটেই তো মিথ্যা কথা।'

একলব্য একটু হাসলেন। তারপর সবিনয়েই বললেন, 'ক্ষমা করবেন দেব, আপনি যদি একটু ভেবে দেখেন কথাটা—তাহলে অত বিস্ময় বোধ করবেন না। আপনি যেদিন অর্জুন প্রমুখ রাজকুমারদের নিয়ে আমার সন্ধানে আসেন, সেদিন আমার কাছে কী চাইবেন তা পূর্বেই স্থির ক'রে নিয়েছিলেন, জানতেন যে তাতে আমার সর্বনাশ হবে, আমার যা একান্ত কাম্য তা থেকে চিরদিনের জন্য আমাকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছেন, আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছেন—কিন্তু সে কথার আভাসমাত্র না দিয়ে শুধুই গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন। অতি সাধারণ ভাবে—যাতে আমি কোন সন্দেহ না করি, প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা না করি। এইটেই কি মিথ্যাচরণ হ'ল না ?'

দ্রোণের কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন আর কোনমতেই চোখ তুলে একলব্যের দিকে চাইতে পারছিলেন না। তবু, ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে আড়ষ্ট রসনাকে কোনমতে সক্রিয় ক'রে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি—তুমি জানতে আমি কি চাইব ?'

'সঙ্গে অভিমান-ম্লান-মুখ অর্জুনকে দেখে অনুমান করতে পেরেছিলুম বৈকি।'

'তবু—তবু দ্বিধা করো নি, সতর্ক হও নি—আগে জানতে চাও নি আমি কি চাইব ?'

'আপনাকে যেদিন থেকে গুরুত্বে বরণ করেছি, সেদিন থেকেই তো আপনার আদেশ সম্বন্ধে দ্বিধা কি সংশয়ের কোন অধিকার রাখি নি। সে পথ কোথাও খোলা ছিল না। আমার জীবন, কীর্তি, ভবিষ্যৎ—এই গুরুদক্ষিণা আপনি চাইবেন তা বুঝেও আমার আর কি উপায় ছিল সেদিন ঐ প্রতিশ্রুতি না দিয়ে—বলুন!'

আর সহ্য করতে পারলেন না কুরুবংশ-শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। স্থির হয়ে বসে থাকতেও না। একলব্যর নিরুত্তেজিত শান্ত শ্রদ্ধাবিনম্র কথাগুলির প্রতিটি শব্দই তাঁর কর্ণে অগ্নি-শলাকার মতো প্রবেশ করছিল, মনে শুধু নয়, সমগ্র দেহেও বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা অনুভব করছিলেন। এবার লগুড়াহত জন্তুর মতোই অস্থির হয়ে উঠে সে স্থান ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে বিদায়-সম্ভাষণ কি আশীর্বাদ করার কথাও মনে রইল না তাঁর।

*　　*　　*

বহুদিনের কথা। সার্ধ ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বের ঘটনা।

তবু আজও এই কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে, চতুর্দিকের অগণিত শত্রুসৈন্যের মধ্যে বসেও উভয় পক্ষের হাহাকার, শোকোচ্ছ্বাস ও হর্ষধ্বনির মিশ্রিত কোলাহল সত্ত্বেও যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন সে কথাগুলো—আজও অনুভব করছেন সেই তীব্র বিষদাহ।

আরও শুনছেন। নতুন এক কণ্ঠস্বর আজ কানে আসছে, অদ্যাবধি যা কোনদিন শোনেন নি। তাঁর বিস্মৃত বিবেক যেন মনের রুদ্ধদ্বার ঠেলে সেই প্রত্যন্তদেশে এসে বলছে, 'মিথ্যাচরণ? সে কি শুধু ঐ একবার? অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষার দিন মহাবীর কর্ণ যখন এসে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, সেদিন তুমিই কি সম্বন্ধী কৃপাচার্যকে দিয়ে জন্মর প্রশ্নটা তোলাও নি—কর্ণ নিদারুণ আঘাত পাবে, লজ্জিত হবে জেনেও? তারপর কুন্তীর অসুস্থতার অজুহাত পেয়ে পরীক্ষা বন্ধ ক'রে দিতে পেরে কি আশ্বস্ত বোধ করো নি? ভাল ক'রে ভেবে ছাখো। কর্ণের কান্তি, সহজাত দিব্য কবচকুণ্ডল দেখে কি তুমি বুঝতে পারো নি—এ কিশোর ক্ষত্রিয় তো বটেই, নিশ্চয়ই কোন দেবপুরুষের অংশে জন্মগ্রহণ করেছে? তখন কেন তুমি তাকে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে দাও নি?"

দ্রোণ কান পেতে শোনেন মনের গোপন অন্তঃপুরে বিবেকের এই কঠোর সত্য কথাগুলি, আর মনের মধ্যেই মিলিয়ে নেন তার যথার্থতা।

হ্যাঁ, মিথ্যাচরণ ছিল বৈকি। তা আজ আর অস্বীকার করবেন না। তার আগেই আধার উপযুক্ত জেনে তিনি অর্জুনের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছেন, তাকে যদি অপরাজেয় শস্ত্রধর ক'রে দিতে পারেন—সে তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করবে যেমন ক'রে হোক। একচক্ষু হরিণের মতো শুধু এই দিকটাই দেখেছেন—সার্থক শিষ্য একলব্য বা কর্ণও যে তাঁর এইটুকু প্রিয়সাধন করতে পারত অনায়াসে, তাঁর আদেশ মাত্রে, অতটা ভেবেও দেখেন নি।

মনের অগোচরে পাপ নেই। বিবেক আজ অনেক কথাই বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার ক'রে এনে তাঁর চিত্তবুদ্ধির সামনে মেলে ধরছে।

দ্রুপদের অবহেলা বা নিজের দারিদ্র্য, তিনি ব্রাহ্মণ, ঋষির পুত্র—অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতেন, মানুষের স্বভাব বুঝে দ্রুপদকে ক্ষমা করতে পারতেন, করাই উচিত ছিল। করলে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের উপযুক্ত কাজ হ'ত—কিন্তু তিনি সাধারণ কামানুদাস মানবের মতোই কামিনীর মনোরঞ্জন করার জন্য, স্ত্রীর বৃথা অভিমান দূর করার জন্যই চিরজীবন উচ্চাশার তরুমূলে অব্রাহ্মণজনোচিত উপায়ের বারিসিঞ্চন করেছেন, ন্যায়-অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়ে, নিজের সংহত সকল শক্তি সার দিয়েছেন। দ্রুপদের অবহেলা, পুত্র-বন্ধুদের বিদ্রূপ দ্রোণকে তত বাজে নি যত বেজেছে তাঁর স্ত্রী কৃপীকে। তারই তাড়নায় দ্রোণ সামান্য ধনসম্পদের কাঙাল হয়ে ছুটে গেছেন ভগবানের অংশ-স্বরূপ মহামানব মহর্ষি পরশুরামের কাছে, তিনি প্রচুর ধনরত্ন সকলকে বিতরণ ক'রে নিঃস্ব হবেন এই সংবাদ পেয়ে। তারপর পার্থিব ঐশ্বর্যে ধনী হয়ে দ্রুপদকে স্পর্ধা জানাবেন—এই ইতর রিপু ইতর মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার আশায়।

এই সম্পদ নিজের শক্তিতে আহরণ করবেন এ মনোবল ছিল না—তাই ভিক্ষুক-বৃত্তি নিয়েই ছুটে গিয়েছিলেন ভার্গবের কাছে। তারপর সেখানে গিয়ে যখন শুনেছেন যে, যা কিছু ধনরত্ন ছিল ইতিমধ্যেই তা বিতরিত হয়ে গেছে, শুধু অস্ত্রগুলি পড়ে আছে, তখন সেইগুলিই যাচ্ঞা ক'রে নিয়ে এসেছেন তা প্রয়োগ প্রত্যাহারের পদ্ধতি সুদ্ধ।

কিন্তু সে বিত্তের মূল্য দ্রুপদ বোঝেন নি। তিনি বাল্যের দরিদ্র ক্রীড়া-সঙ্গীর সঙ্গে পুনঃসৌহার্দ্য স্থাপন করতে রাজী হন নি—রূঢ় ব্যবহারে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন ক্রুদ্ধ দ্রোণ সাধারণ নীচকুলোদ্ভব মানুষের মতোই প্রতিজ্ঞা

করেছেন এই অস্ত্র সম্বল ক'রেই, নিজের এই শস্ত্রবিদ্যার সহায়তাতেই দ্রুপদকে বাধ্য ও অবনত করবেন তাঁর কাছে। সেই প্রতিজ্ঞা রাখতেই প্রথম যাকে সুপাত্র ও যোগ্য বলে মনে হয়েছে তার সঙ্গেই চুক্তি করেছেন—অর্জুনের সঙ্গে। সেই চুক্তি অনুযায়ী —অর্জুনকে অপরাজেয় রাখতেই একটির পর একটি অন্যায় ক'রে গেছেন, জেনেশুনে সজ্ঞানে।

না, আর বিলম্ব নেই। মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তের কাল প্রত্যাসন্ন। সেজন্য কোন ক্ষোভও নেই তাঁর। কোন অভিযোগ নেই ভাগ্যের কাছে।

এবার একলব্যকে দেখার পর থেকে, তার লোকোত্তর মহৎ চরিত্রের পরিচয় পেয়ে—তার সেই অবিশ্বাস্য আক্রোধ অংহিস, সর্ব প্রকার প্রতিশোধের স্পৃহাহীন আচরণ ও সভক্তি বিনম্র কথাবার্তায় নিজের কলুষিত মনের ছবিটা যেন কদর্যতর চেহারা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনে, নিজের পাপের বোঝাটা আরও দুঃসহ গুরুভার বলে মনে হচ্ছে।

বিধাতার অভিসম্পাত কিছুটা যে ফলেছে তা তো সুপ্রত্যক্ষ। অশ্বত্থামা, যার দুঃখ দূর করার জন্যই পাণ্ডবদের এত তোষামোদ করা, এই মিথ্যা ও অসদাচার—সে সত্যিই অমানুষ হয়েছে। ক্রুর, ক্রোধী, স্বার্থপর, চপলমতি। ব্রাহ্মণের শিক্ষা সংস্কার বিবেচনা স্থিরবুদ্ধি কিছুই সে পায় নি। নিহত না হোক—পাণ্ডবদের হাতে যে মৃত্যুর অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করবে তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও সে অভিসম্পাত ফলবে বৈকি।

কিছুই বাকী থাকবে না—কড়ায়-গণ্ডায় নিজের দুষ্কৃতির মূল্য শোধ দিতে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, রাত্রিও গভীর হতে চলল, উদ্বিগ্ন সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত কৌরবরা তাঁকে পরবর্তী প্রধানপদে বরণ করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু সে সম্বন্ধে যেন একেবারেই কোন সচেতনতা নেই দ্রোণাচার্যের। তিনি সেই-খানেই, সেই ভাবেই, অসংখ্য মৃত ও আহত ব্যক্তির মধ্যে স্থির হয়ে বসে রইলেন, দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত।

সেই কারণেই পরম উপকারী কুরুপিতামহ ভীষ্মের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে আর যাওয়া ঘটে উঠল না তাঁর।

*　　*　　*

এই যুদ্ধে পরাজয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও—অথবা জেনেই

দ্রোণাচার্য যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মতো, ক্ষত্রিয়-ধ্বংসকারী ভার্গব পরশুরামের মতো প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগলেন। সে মৃত্যুন্মত্ততা দেখে মনে হ'তে লাগল—নিয়তিকে একেবারে সামনে দেখে, যমরাজ প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝেই তিনি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেছেন—মরীয়া হয়েই এই মরণমহোৎসবে মেতেছেন।

তাঁর মনে হতে লাগল, ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষি ও দেবর্ষির দল তাঁর কানে কানে তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছেন, এইভাবে নিতান্তই সাধারণ মানুষের ওপর সহস্র লক্ষ নরবিধ্বংসী ভয়ঙ্কর অস্ত্রপ্রয়োগের জন্য নিন্দা ক'রে বলছেন অস্ত্র ত্যাগ ক'রে এবার ঈশ্বরচিন্তায় মন দিতে, মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হ'তে। মনে হ'ল তাঁর সহজাত বিবেক তাঁর অন্তর থেকে সাশ্রুনয়নে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তিনি কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধের পঞ্চম দিনে সন্ধ্যার পরও বিরতি ঘোষণা করলেন না যুদ্ধের, মধ্যরাত্রে কয়েক দণ্ড মাত্র বাদে সমস্ত রাত্রিই যুদ্ধ চলল। পাণ্ডবপক্ষ গত চৌদ্দ দিনে যত না হীনবল হয়েছিলেন, মনোবল হারিয়েছিলেন—এই এক দিন-রাত্রির যুদ্ধে তার কয়েকগুণ হারালেন, রথী-মহারথী পদাতিক কত যে নিহত হ'ল তার ইয়ত্তাই নেই। সবাই বলতে লাগলেন আর এক প্রহরও যদি এইভাবে দ্রোণ যুদ্ধ করেন, তাহলে পাণ্ডবদের পরাজয়ের আর কিছুই বাকী থাকবে না।

তখন অগত্যাই শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবদের মিথ্যার সাহায্য নিতে হ'ল। পুত্র সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ দুর্বলতা জানা ছিল, ভীম তাই সেই স্থানটিতেই মর্মান্তিক আঘাত দিলেন, কাছে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'অশ্বত্থামা তো নিহত হয়েছে। আর কেন যুদ্ধ করছেন, কার জন্যে?'

আজকের এই হত্যাতাণ্ডব, নররক্তের এই ঘূর্ণির মধ্যে তাঁর এতকালের অপরাধবোধ আত্মগ্লানি এমন কি কুকর্মের স্মৃতিও যেন ভুলে বসে ছিলেন দ্রোণ, সেই সঙ্গে একলব্য পর্ণাদ ও বিধাতার নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণীও। অথবা তার এই বাস্তব চেহারাটা কল্পনা করতে পারেন নি। তাই অশ্বত্থামার মৃত্যু সম্ভব নয় জেনেও ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বিশ্বাস হ'ল না ঠিক, তবু একটা আশঙ্কাতে অবশ হয়ে গেল মন—সেই সঙ্গে দেহও। একবার এমনও মনে হ'ল—যে বিরক্ত ব্রহ্মর্ষিরা তাঁকে এতক্ষণ অস্ত্রত্যাগের পরামর্শ দিচ্ছিলেন —তাঁরাই হয়ত ওঁর অবাধ্যতায় রুষ্ট হয়ে এই অঘটন ঘটালেন।

সেই কারণেই—যখন ধর্মভীরু অথচ বিজয়োৎসুক যুধিষ্ঠিরের মুখেও এই দুঃসংবাদ সমর্থিত হ'ল তখন আর তাঁর সন্দেহমাত্র রইল না। পৃথিবীতে যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম তথা সত্যের প্রতীক—সেই যুধিষ্ঠিরকে যে তাঁর বিধিনির্দিষ্ট নিয়তিই মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত করাল, করানো যে যায়—তা কল্পনামাত্র করতে পারলেন না।

কথাটা মনে পড়ল একেবারে শেষ মুহূর্তে।

যখন অস্ত্র ত্যাগ ক'রে স্থির হয়ে ইহলৌকিক সকল ইষ্টানিষ্ট কার্যকারণ থেকে অপসৃত করিয়ে নিয়ে ব্রহ্মচিন্তায় মনকে সংহত করার চেষ্টা করছেন—সেই সময় অকস্মাৎ একটি দৃশ্য তাঁর মানসচক্ষুর সামনে ভেসে উঠল।

দেখলেন একলব্য—মহর্ষি একলব্যকে শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভি নিনাদ ক'রে তাবৎ ব্রহ্মর্ষি ও সুরলোকবাসী দেবতারা প্রত্যুৎগমন ক'রে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন—আর একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি, দ্রোণাচার্যের মতোই যার অবয়ব ও আকৃতি—কাতরভাবে ভৈরবতাড়িত হয়ে তার পিছু পিছু যাচ্ছে। আরও দেখলেন, একলব্য করজোড়ে বার বার সেই লোকটিকেই প্রণাম জানাচ্ছেন এবং কাতর কণ্ঠে বলছেন—ওঁকেও আসতে দিন, ওঁকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যাবো না।

এক লহমা হবে বোধ হয়—মনের মধ্যে তার থেকেও অল্প সময়ে বহু ঘটনার ছবি দেখা যায়।

কিন্তু সেইটুকুর মধ্যে—বিদ্যুৎচমকেই মনে পড়ল কথাটা। কিন্তু তখন আর ফেলে-দেওয়া-অস্ত্র তুলে নিয়ে নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি হ'ল না।

অবসরও পেলেন না অবশ্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন তার মধ্যেই তাঁর রথে উঠে খড়গ উদ্যত করেছে।

দ্রোণ তেমনি চোখ বুজে থেকেই শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'একলব্য, একলব্য—তোমার ঋণ কি শোধ হ'ল? প্রায়শ্চিত্ত কি সম্পূর্ণ হ'ল আমার? এতদিনের আত্মদহন যজ্ঞে কি জীবনের পূর্ণাহুতি পড়ল?'

কিন্তু প্রতিশোধের হোমাগ্নিতেই যার জন্ম—পিতৃবধের প্রতিহিংসায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সে কথা শুনতে পেলেন না। পেলেও অর্থ বুঝতে পারতেন না।

দিল্লী সফদরজঙ্গের কাছে রেলের ওপর দিয়ে বিপুল এক ওভারব্রীজ তৈরি হচ্ছে বলে আজকাল গাড়ি, বাসগুলোকে খানিকটা ঘুরে যেতে হয়। ইদানীং যাঁরা এই ঘোরা পথে যাতায়াত করছেন তাঁরা হয়ত কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন —এই পথে কুতুবের দিকে যেতে ডানহাতি যে মাঠটা তৈরি হচ্ছে—বহু প্রাচীন ঘরবাড়ি, বস্তি বিলুপ্ত ক'রে, সেখানে এখনও একটা ওরই মধ্যে একটু বিশিষ্ট গোছের সমাধি-ভবনের একতলা বা পোতা অংশটা টিকে আছে। আর তার চারপাশে যে পাঁচিল ছিল—তার দু-একটা টুকরো, এখানে ওখানে। সেটার পলেস্তারা-খসা কঙ্কালটা দেখে বোঝা যায়—ইমারতটা বহুদিনের, সাবেক কালের ছোট ইঁটের গাঁথুনি।

এমন দিল্লীর চারপাশেই দেখতে পাবেন অবশ্য। দিল্লীর নাকি খুব ডেভেলপমেণ্ট বা 'বিকাশ' হচ্ছে, আর সে বিকাশ মানেই প্রাচীন ভাল ভাল ইমারৎ কতকগুলো—তার মধ্যে সমাধিই বেশির ভাগ—ভেঙে সমভূমি ক'রে আগে মাঠ তৈরী হচ্ছে, তারপর সেখানে উঠছে হালফ্যাশানের কাচ ও কংক্রীটের বাড়ি, অথবা বিকাশ-প্রাধিকরণেরই একঘেয়ে, এক ছাঁচের সার সার কোঠা—মনুষ্য-নামধেয় পারাবতের খোপ কতকগুলো।

প্রতিবারই আসি আর দেখি দুটো চারটে ক'রে দিল্লীর 'শাহী' আমলের সৌধ বা প্রাসাদ এইভাবে মানুষের প্রয়োজনের কাছে প্রাণ মান দিচ্ছে। হাউজখাস আছে, কিন্তু সে হাউজখাস বা সরকারী জলাশয় যে প্রাসাদের অঙ্গ ছিল, সে 'সিরি' বা খিলজীদের বসতির চিহ্নও নেই। আগে একটা পাথরে নির্দেশ ছিল 'টু সিরি' বলে, সে পাথরটা এখন 'পঞ্চশীলা' পার্কের নাম-গৌরব বহন ক'রে ধন্য হচ্ছে। সিরির প্রাসাদের একদিকের খানিকটা দেওয়াল এখনও আধুনিক সৌধগুলির আড়ালে টিকে আছে—কিন্তু সেটা চেনাবার, দেখাবার কোন ব্যবস্থা নেই। আর সে ব্যবস্থা থেকেই বা লাভ কি—ওটুকুও তো থাকবে না। 'বসন্ত 'বিহার' যাওয়ার পথে সেদিনও যে

একটি সুন্দর চুনের কাজ-করা ছোট্ট 'ইদ্‌গা' দেখেছি—সম্ভবতঃ খিলজী আমলেরই —মানুষের স্থূল লোভের ওপর প্রাথমিক ঈষৎ চক্ষুলজ্জা বা সৌন্দর্যবোধের বিজয়-চিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকতে—এবার, এই সেদিন, দেখলাম সেটিও ভাঙা হচ্ছে। কিছুই থাকবে না এই উগ্র বিকাশেচ্ছার অত্যাচারে। কেন যে সরকার সোজাসুজি বড় বড় গগনচুম্বী বিশতলা বাড়ি তুলে ফ্ল্যাট-জীবনকেই অনিবার্য বলে মেনে নিচ্ছেন না তা জানি না। এই বিকাশ বা বিস্তারের নামে শুধু প্রাচীন ঐতিহাসিক ইমারৎগুলিই ধ্বংস হচ্ছে না, অনেক চাষের জমি, ফলের বাগানও নষ্ট হচ্ছে। এত যেখানে জনসংখ্যা সেখানে সীমিত জমির চিন্তা ছেড়ে সোজাসুজি আকাশ দখলের চেষ্টা দেখাই উচিত।

সে যাক গে, এই বিশেষ সমাধিভবনটির ধ্বংসাবশেষের কথা হচ্ছিল।

কী ছিল আর কতখানি ছিল তা ঠিক বোঝার উপায় না থাকলেও এমন সুবৃহৎ কোন সমাধিভবন যে ছিল না, এটুকু বোঝা যায় ঐ একতলা অংশটা দেখেই। ওরই মধ্যে আশপাশের অসংখ্য 'গোর'-এর থেকে সামান্য একটু বড় ছিল হয়ত। তবু, কে জানে কেন—যেতে আসতে দু বেলাই দেখি আর ভাবি, কার সমাধি ছিল এটা কে জানে! কতদিনের লোক, কোন্ আমলের; সুলতান বা বাদশাদের কেউ ছিল কিনা—শালা, শ্বশুর অথবা জামাইয়ের ভাই—সে যখন বেঁচে ছিল না-জানি তাকে কত লোক ভয় করেছে, সমীহ করেছে; সে সময়কার জীবনযাত্রা কেমন ছিল; যে লোকটির অস্থি হয়ত এখনও এখানের মাটির নিচে আছে, সে-ই বা কেমন ছিল; তার মৃত্যুর পর তার জন্যে কেউ হাহাকার করেছে না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে; চাঁদিনী রাতে কোন প্রিয়া এসে চোখের জলে সমাধি-বেদী সিক্ত করেছে অথবা কোন কন্যা, ভগিনী এসে জুমাবারে ফুল দিয়ে গেছে—কিংবা একটা 'দীয়া'ও জ্বালায় নি কেউ কোনকালে—ক্রমাগতই এই সব প্রশ্ন জাগে মনে। সে আত্মা কি আজও এখানে অপেক্ষা করছে রোজ-কিয়ামতের—অথবা ভগবান মানুষের এই বর্বরতা ও অত্যুগ্র লোভের চেহারা দেখে কৃপা ক'রে ডেকে নিয়েছেন তাঁর আশ্রয়ে?

ক্রমশঃ এই সমাধি-ভবনের ভাঙা টুকরোটা যেন একটা নেশার মতো পেয়ে বসল আমাকে। কেবলই নানা কল্পনা জাগে মনে, সেই বহুদিন মৃত

লোকটিকে উপলক্ষ্য ক'রে। মনে মনে এক এক সময় এক এক রকম রূপ দিই তাকে; কখনও কুচক্রী, অত্যাচারী; কখনও স্নেহময় উদার; কখনও বা দুধর্ষ বীর; কখনও কাপুরুষ। আবার ভাবি স্ত্রীলোকও তো হতে পারে। কোন শোকার্ত স্বামীর হয়ত শাজাহান বাদশার মতো অর্থসামর্থ্য ছিল না—তবু নিজের সাধ্যকে অতিক্রম ক'রে যথাসর্বস্ব ব্যয়ে এই স্মৃতিসৌধ গড়ে রেখে গেছে, কালের কপোলতলে—শুভ্র-সমুজ্জ্বল তাজমহল না হোক—একটি অতি সূক্ষ্ম তিল-চিহ্ন রেখে যাওয়ার দুরাশায়।

শেষে গত রবিবার এমন হ'ল, রাত চারটেয় ঘুম ভেঙে গিয়ে এই বাজে চিন্তাটা এমনভাবে পেয়ে বসল যে, আর ঘুম এল না কিছুতেই। শেষে খানিকটা এপাশ ওপাশ ক'রে, 'দুত্তোর' বলে উঠে সেই অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়লুম প্রাতর্ভ্রমণে। অসুবিধে বা কোন আশঙ্কার কারণ নেই, আরও অনেক বৃদ্ধই এখানে ঐ সময় বেড়াতে বেরোন।

হাঁটতে হাঁটতে যখন মাঠটার সামনে গিয়ে পৌঁছলুম তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটে নি, উষার কপোল সবে লজ্জারুণ হ'তে শুরু করেছে মাত্র। আজ আর পথ থেকে কি দূর থেকে দেখার কোন কারণ নেই, সোজা মাঠ ভেঙে আসল সমাধি-বাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলুম। পোতাটা মাত্র আছে, তবে সেটাই আমার মাথা-সমান উঁচু—ওপরের মেঝেটা সার সার খিলানের ওপর তৈরী—খিলানের নিচে খুপরি খুপরি ঘর। এমন সেকালে অধিকাংশ সমাধি-ভবনেই থাকত, অথবা তার চারপাশের প্রাচীরে—কোন্ ফকীর বা কোন রাহী এসে কোনদিন আশ্রয় নিতে পারে যাতে—এই ভেবেই এগুলো তৈরি করা হ'ত।

সেদিকে তাকিয়ে আছি—কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই—অকস্মাৎ চমকে উঠে দেখি, ঐ খুপরি ঘরগুলোর মধ্যে একটার অন্ধ গহ্বরে কী যেন নড়ছে। তারপর মনে হ'ল কী একটা বেরিয়ে আসছে। মেনেই নিচ্ছি, প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম খুব। না, জন্তুর ভয় নয়—নাগরিক সভ্যতার বুকের উপর লক্ষ লক্ষ মোটরযানের কোলাহলের মধ্যে বাঘ আসবে না—অন্য রকম ভয়ই। ভূতে বিশ্বাস না থাক, ভয় তো থাকবেই। কিন্তু দু'তিন মুহূর্ত পরেই আশ্বস্ত হয়ে দেখি যে বিদেহী কোন আত্মা নয়, এ দেহধারী জীবই, দীর্ঘদেহ এক মানুষ। আর একটু কাছে আসতে ঝাপসা আলোতেই দেখতে পেলুম জটাজূটধারী কৌপীনবস্ত্র এক সন্ন্যাসী।

তিনিও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে—আমিও।

শেষে ভয়ের ধাক্কাটা সামলে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'বাবা, আপ হিঁয়া রহ্‌তা ?'

প্রশান্ত, গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তর এল, 'নেহি বেটা। বিশ সাল বাদ বাদ হিঁয়া আতা। আজ হি আখেরি হ্যায়। ইয়ে গোরস্তান ভি নেহি রহে গা, আউর আজসে বিশ সাল বাদ হাম ভি জিন্দা নেহি রহেঙ্গে।...কিঁউ কি ইস শরীর অব ফেক্‌নেকো টাইম আ গিয়া। উমর একশো চালিশ সালসে জ্যাদা হো গিয়া।'

একশো চল্লিশ সাল!

পাগল নাকি। এ তো এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। বড় জোর সত্তর পঁচাত্তর হবে।

মানুষ কিছুদিন পর্যন্ত বয়স কমাতে চায়, তারপর—একটা বয়সে পৌঁছে, যখন আর কমাবার কোন উপায় থাকে না, তখন ক্রমাগত বাড়াতে থাকে। সাধুদের চেষ্টা দেখেছি এই বাড়ানোর দিকেই, তাতেই বোধ হয় পসার বাড়ে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কথাগুলো খেলে গেল আমার মনে, তবু তারই মধ্যে বোধ করি আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন 'মহাৎমা'। হেসে বললেন—ঝকঝক করছে দাঁত, সেই তখনও-প্রায়ান্ধকার-প্রভাত-আলোতে যেন ঝলসে উঠল তার দীপ্তি—'গদরের সময় উনিশ বিশ সাল বয়স হয়েছিল, সাদী ভি হয়ে গেছে তখন। আমার সাথী ছিল স্বামী রামানন্দ—এক গাঁয়ে বাড়ি, একসঙ্গে বেরিয়ে ছিলুম, সেও বেঁচে আছে। উত্তর কাশীতে থাকে, এখনও তপস্যা করে—বহু লোক দর্শন করতে যায়, খুব বড় সাধু—তাকে জিগ্যেস করতে পারো।'

রহস্য এবং কাহিনীর গন্ধ পেয়ে আরও কাছে এগিয়ে গেলুম। নমস্কারও করলুম হাত তুলে। তারপর বিনা অধিক ভূমিকায়—সোজাসুজি চেপে ধরলুম তাঁকে। এতদিনের প্রবীণ সন্ন্যাসী, যোগ-তপস্যা ছেড়ে বিশ সাল বাদ বাদ এই বিধর্মীর সমাধিভবনে কেন আসেন—এই উৎকট আধুনিক শহরের মধ্যে ?

প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করলেও, বললেন সব খুলেই।

বোধহয় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল, সেই মাঠেই বসে পড়ে ইঙ্গিতে আমাকেও সামনে বসতে বললেন। তারপর একে একে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। সে কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি ক'রে আমার সময় নষ্ট এবং আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। সেটা অর্থাৎ আমার প্রশ্ন ও তার উত্তরের ভাষা-ভঙ্গী পাঠকেরা অনুমান করতে পারবেন —আমি শুধু গল্পটাই বলছি এখানে।

সাধুর জবানীতেই বলি :—

'সেই গদর, যাকে তোমরা আংরেজীতে মিউটিনী বল—সেই সময়কারই কথা এটা। তার আগেই দুই বন্ধু বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে সিপাহীর নৌক্‌রি নিয়েছি। নতুন চাকরি—আরামের চাকরিও। তখন লড়াই দাঙ্গা কিছু নেই, কাজেই কোন ঝামেলায় যাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। গদরের কথা উঠলেই আমরা আপত্তি জানিয়েছি। তবে আমাদের কথায় কি এসে যায়, দু-চারজনের আপত্তি নিয়ে তো কাজ হবে না, বেশির ভাগের যা ইচ্ছা তাই মেনে নিতে হ'ল।

তারপর—লড়াই তো যা হ'ল তোমরা পুঁথিকেতাবে পড়েছ। কোথাও কোথাও সত্যিই জান দিয়ে লড়েছিল সিপাইরা। তবে কি জান, যেখানে লুঠতরাজের দিকে, আওরতের দিকে বেশী ঝোঁক, নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাই আসল লক্ষ্য, সেখানে কোন বড় কাজ হয় না। এ আমাদের জাতেরই দোষ বেটা। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জাফর শার দল হারল, নিকলসন সাহেব শাহ্‌জাহানাবাদ দখল করলেন। বাহাদুর শা জাফর লালকিল্লা ছেড়ে পালালেন, ধরাও পড়লেন। ছেলেগুলোকে তাঁর সামনে কাটল, তাঁকে জানোয়ারের মতো খাঁচায় পুরে জংলীদের দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল, তবু আংরেজদের গুস্‌সা পড়ল না। তারা নওজওয়ান লেড়কা দেখে আর ধরে নিয়ে গাছে লট্‌কে দেয়। গুলি ক'রে মারলে যে খরচা, তারও উপযুক্ত বিবেচনা করে না এদেশের লোকদের। হিন্দু মুসলমান কোন বাছবিচার ছিল না বেটা, ইনসানের লোহু খেয়ে খেয়ে যেন মাতোয়ালা হয়ে উঠেছিল।

আমরাও তো তখন নওজওয়ান, শুধু তাই নয়, সিপাহী-খাতায় নাম লেখানো ছিল—ধরা পড়লে রক্ষা নেই। আমাদের বেলায় অবিচার কি অত্যাচার—এ শব্দ দুটোও বলা চলত না। ফলে চুহা যেমন গর্তে গর্তে

ঘুরে বেড়ায় বিল্লীর ভয়ে—তেমনিই পালিয়ে বেড়াচ্ছি, খেতেও পাই না অর্ধেকের বেশী দিন। সে দুর্গতির কথা ভাবতেও পারবে না। সবচেয়ে বেশী কষ্ট ভয়েই। এখন ভাবি দিনরাত অমন মৃত্যুভয় সহ্য করার থেকে মরাও তো ভাল ছিল ঢের।

খাশ শাহ্‌জাহানাবাদে থাকার সাহস নেই, দেহাতের দিকেও যেতে ভরসা হয় না, সেখানে অল্প লোকের মধ্যে কিছু জানাজানি হতে বাকী থাকে না। এইসব শহরতলীতেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকার চেষ্টা করি। এদিক তখন জঙ্গলে ভরে গেছে—খিলজীদের দিল্লীর চিহ্নও নেই, তবু বড় বড় ইমারৎ আর এমনি গোর থাকায় গা-ঢাকা দেবার খুব সুবিধে।

একদিন এমনিভাবেই এখানে এসে পড়েছি—সন্ধ্যার মুখ দেখে বেরিয়ে পড়েছি একটু কোটর ছেড়ে—দেখি একদল আংরেজ এদিকে আসছে। ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেছি ওদের দেখেই, মাথায় যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—কিছু ভাবতেও পারছি না কি করা উচিত—দেখি বুরখা পরা একটি মেয়ে এই মকবারার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

সে সিঁড়িটা ভেঙে ফেলেছে। ছোট্ট একফালি সিঁড়ি—এই সামনেই ছিল।···মেয়েটার সঙ্গে বোধ হয় তার ভাইও ছিল, সে ভয়ের চোটে পাশের বাবলার জঙ্গল দিয়ে গিয়ে কোথায় লুকোল। আসলে আগে তাকে অমন-ভাবে পালাতে দেখেই আমি কারণ খুঁজতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আংরেজরা তখন বাগিচায় ঢুকছে।

কোন হুঁশই নেই আমার তখন, মনে হচ্ছে যেন মরেই গেছি। পালাবার কোন উপায়ও ছিল না আর। হঠাৎ সেই মেয়েটা এসে এই খুপরির সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, "পিছন থেকে আমার বুরখার মধ্যে ঢুকে পড়ো, জলদি। মাথাটা নিচু ক'রে থাকো—আমার গলার চেয়ে না উঁচু হয়ে ওঠে, ঐ গাঁজে মাথা থাকে যেন। জলদি জলদি, কী করছ বেকুফি। ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার আছে, আমার বুরখাও বড়, পা অবধি ঢাকা—অত কেউ বুঝতে পারবে না।"

আমি তো অবাক্। ওর কথাটা বুঝতেই দেরি হচ্ছে। মেয়েটা কিন্তু তখন আমার থেকে আমার বিপদের গুরুত্ব বেশী বুঝতে পেরেছে, সে এক ঝটকায় আমার হাত ধরে টেনে এই খুপরির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, বলল, "আর এক লহমা

সময় নেই, জলদি করো। তুমি কি বাওরা, এখন এসব লজ্জা-সরমের কথা ভাবতে আছে! মরবে যে এখনই!"

চুপি চুপি, যেন হিস হিস ক'রে বলে উঠল মেয়েটা।

অগত্যা। আমি বেঁকেচুরে কোনমতে সেই বুরখায় আত্মগোপন করলাম। বেঁকেচুরে ঐ অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে হয়েছে, বলেই হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরতে হচ্ছে, ওর পিঠের খাঁজে মুখটা গুঁজে দিয়ে —নইলে ঐটুকুর মধ্যে সম্পূর্ণ ওর দেহের সঙ্গে মিশে থাকা যায় না।

ততক্ষণে শয়তানগুলোও এসে পড়েছে। পুরুষ ভেবে হাত ধরে টানতে যাচ্ছিল। মেয়েটার যেমন দুর্জয় সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! বুরখার সামনে পথ দেখার জন্য যে পর্দার মতো ছোট্ট ঢাকাটা থাকে, সেটা খুলে ফেলল, শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, "কী হয়েছে, এখানে হল্লা করছ কেন?"

থতমত খেয়ে গেল বেটারা।

কিন্তু সে কয়েক লহমাই। তারপর সে কী জেরা বাবুজী! কে তুমি, এখানে কেন এসেছ, সঙ্গে কেউ ছিল কি না, একলা এভাবে এসময় কেন এসেছিলে, কী করছিলে—এমনি হাজারো কৈফিয়ৎ! আসলে তখন ঠিক বেইজ্জৎ করতেও ভরসা হচ্ছে না, আবার সোবেও কিছু কিছু হচ্ছে, একেবারে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। আমার কি অবস্থা বাবুজী বুঝুন একবার। এই চৈত্রমাস, পুরু নিশ্ছিদ্র বুরখার মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছি—গরমে, ভয়ে—দুকারণেই। মেয়েটাও ঘামছে দরদর ক'রে। তার জামা ভিজে গেছে, গলা থেকে বেণীর নীচে থেকে গরম ঘাম গড়িয়ে এসে আমার মুখে লাগছে, দুই ঘামে মিশে গড়িয়ে যাচ্ছে তার পিঠ বেয়ে। ওর বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করছে দুঃসাহসে, আতঙ্কে—মৃত্যুর সঙ্গে তখন জুয়োখেলা চলছে ওর। বুকের নীচেই আমার হাত, সেটা টের পেতে কোন অসুবিধা নেই। পিঠে মাথাটা গুঁজে রয়েছি—তাতেও শুনছি সেই হাতুড়ি-পেটার মতো আওয়াজ। মতিয়ার খুসবু তার জামায়, আতর মেখেছে হয়ত—তার সঙ্গে ঘামের গন্ধ মিশে কী বলব বাবুজী, যেন দিওয়ানা ক'রে দিচ্ছে। অল্প বয়স তখন আমার, মৌতের মুখে পড়েও যৌবন তার কাজ ক'রে যাবে, রঙ ধরাবে মনে, নেশায় মাতাল করবে—সেই তো স্বাভাবিক।

মেয়েটার বুকে যতই ঢেঁকির পাড় পড়ুক—শান্ত মর্যাদার সঙ্গেই জবাবদিহি

ক'রে যাচ্ছে। সে আমীর রহমৎউল্লার পোতী, সৈয়দ আহম্মদ খাঁর ভাগ্না। আমীর সাহেব যে আংরেজদের হয়ে লড়াই ক'রে জান দিয়েছেন—এই ভাবে হায়রান ক'রেই কি তার ইনাম দিতে চায় নাকি ওরা? এটা তার নানীর, নানার মুকবারা, এখানেই তার মাকেও গোর দেওয়া হয়েছিল।—এইখানে বাতি দিতে এসে সাপের মুখে পড়ে যায় তার মা, ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পাথরের ওপর পড়ে পেটে চোট লাগে—ওর জন্ম আর তাঁর মৃত্যু একই সঙ্গে হয়। সেই থেকে এই দিনটাতে সে প্রতি বছর বাতি দিতে আসে। ওদের বিশ্বাস না হয় মুকবারায় উঠে গিয়ে দেখে আসতে পারে—সে দীয়া এখনও জ্বলছে।

দেখল সাহেবরা, দেখে এল। বিশ্বাসও হ'ল এবার। এমন চোস্ত কাটা-কাটা কথা শুনে একটু সম্ভ্রমও বোধ করল বোধ হয়। আরও সম্ভ্রম ওর পরিচয় পেয়ে। রহমৎউল্লা আমীরের কাছে সত্যিই ওদের অনেক ঋণ। এবার সবাই টুপি খুলে সেলাম জানিয়ে সরে পড়ল।

এবার আমি বুরখার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে ঐ ঘরের কোণেই চলে গেলুম গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে। বুঢ্‌ঢা হয়ে গেছি, শরীরটা ফেলার সময় হ'ল—মিছে কথা বলব না, বুরখার মধ্যে ঐভাবে দাঁড়িয়ে খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তবু তখন যেন মুক্তি পেতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এমনি অনন্তকাল থাকলেও ক্ষতি নেই। বেরিয়েও তখন দাঁড়াতে পারছি না—কিছু যেন মাথাতেও ঢুকছে না। ঠিক মাতালের মতো অবস্থা তখন—পা টলছে, শিরে চক্কর লাগছে। সেই খুপরির কোণে গিয়ে ধুলো-জঞ্জালের মধ্যেই একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লুম। সাপ আছে কি বিছে আছে—সে খোঁজও করার অবস্থা রইল না।

মেয়েটা কিন্তু অসাধারণ, যেমন তার তেজ তেমনিই সহজ বুদ্ধি। সে ছাড়া পেয়ে বেশ সহজ ভাবেই বাগিচায় এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে "এব্রাহিম, এব্রাহিম" বলে ভাইকে ডাকতে লাগল। যদি সাহেবদের সন্দেহ তখনও না গিয়ে থাকে, কোথায় হয়ত ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে—এই সহজ আচরণেই সে সোবে কেটে চলে যাবে, সেই জন্যেই ঐ হাঁকডাক।

তারপর, অনেকক্ষণ পরে ওর ভাই এব্রাহিম আসাতে, আমি ঘর থেকে

বেরিয়ে এলুম। ঐ সেই ঘর বেটা, যেখানে সে দেবী আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। বেরিয়ে এসে হাত জোড় ক'রে বললুম, "তুমি আমার জীবন দিয়েছ, নিজের ইজ্জতের, জানের পরোয়া না ক'রে। এ ঋণ এখন শোধ দেবার অবস্থা নেই আমার। পুরোটা শোধ হবে যদি তোমার জন্যে কোন দিন নিজের জান দিতে পারি। সে না হলেও, যদি বেঁচে থাকি, কিছুটা অন্ততঃ শোধ দেবার চেষ্টা করব—কিন্তু তোমার দেখা আবার কোথায় কিভাবে পাব ?"

সে একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, "আজ আমার জন্মদিন, বিশ সাল পুরো হ'ল। যদি বেঁচে থাকি, সম্ভব হয় তো—যত দিন বাঁচব, বিশ সাল বাদ বাদ এখানে আসব, এই তারিখে মার কবরে দীয়া দিতে। যদি আসতে পার তো দেখা হবে, এই দিন মার কবরে দীয়া দিচ্ছি দেখলেই চিনবে।"

তারপর থেকে তীর্থযাত্রার মতোই এই তারিখে এখানে আসি বেটা—যেখানেই থাকি না কেন। সন্ন্যাস নেবার পরও। কারণ এ ঋণ ধর্মের ঋণ। তাছাড়া বিপদের দিনে যে জবান দিয়েছি—মুখে না দিলেও, মনে মনে—সে জবান নষ্ট করাও পাপ। কিন্তু আর তার দেখা পাই নি কোন দিনই।'

তারপর একটু চুপ ক'রে পথের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সাধুজী। ততক্ষণে একটা দুটো ক'রে গাড়ি, বাস চলতে শুরু করেছে, শহর—তার সঙ্গে যেন বর্তমান কালও—জাগছে একটু একটু ক'রে। যে কাহিনী বলছেন সাধু সে কাহিনী এবং সে কাল চলে গিয়েছে বহুকাল আগে। দিনের আলো আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠলে এ গল্প বিশ্বাসও হবে না।

তা বুঝেই বোধহয় সাধুরও সম্বিৎ ফিরল। একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কে জানে সে কোন তারিখের কথা বলেছিল, কি হিসেব ধরে—হিন্দু না আংরেজী না মুসলমানী বছর—সেইটেই জিজ্ঞাসা করা হয় নি সেদিন। আমি তো আমাদের সাল আর তারিখ ধরে আসি। সে হয়ত তার মুসলমানী সাল তারিখের হিসেবে এসে ফিরে চলে গেছে। কে জানে আমাকে বেইমান ভাবল কিনা। কিংবা হয়ত আমার কথা ভুলেই গেছে। বেঁচেও নেই এতদিন হয়ত। তবু আমার কাজ আমাকে করতেই হ'ত। এবার সব শেষ হ'ল। এ মুকবারারও শেষ, আমার এই শরীরটারও। বিশ সাল পরে আর কোনটারই কোন চিহ্ন থাকবে না এ মাটিতে। আচ্ছা যাই বেটা। পরমাত্মা তোমার মঙ্গল করুন।'

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর বয়স অনুপাতে অস্বাভাবিক রকম ক্ষিপ্রগতিতে উত্তর দিকের পথ ধরলেন—অবশ্য বয়স যা বললেন তা যদি সত্য হয়।…চেহারায় গলায় চলনে কোনটাতেই তো মনে হয় না। কে জানে আমাকে নিয়ে খানিকটা তামাশাই করে গেলেন কিনা। অথবা আমিই খোয়াব দেখলুম কিনা এতক্ষণ ধরে!

এ জন্মের ঋণ

ইতিহাসে আছে যে, ১৮৫৭ সালের মে মাসে—এদেশী সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে যখন স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করছে সেই সময় একটি আফগান (পাঠান বা কাবুলিওয়ালা যাকে বলি আমরা) মিসেস লীসন নামে এক ইংরেজ মহিলার জীবন রক্ষা করে। শুধু যে প্রাণে বেঁচেছিলেন তাই নয়, ভদ্রমহিলা তার সাহায্যে দিল্লীর বাইরে নিরাপদ স্থানে চলে যেতেও পেরেছিলেন।

ইতিহাসে এর বেশী কিছু নেই। সেই পাঠানটির কোন পরিচয় কোথাও লেখা নেই, এমন কি তার নামটাও জানা যায় না। যখন সকলে প্রায় পাগল হয়ে উঠে—ইংরেজ, ফিরিঙ্গী এমন কি শুধু ক্রীশ্চান জানলেই নির্বিচারে হত্যা করছে, তখন ঐ পাঠানটিই বা নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে কেন ঐ মহিলাটিকে রক্ষা করেছিল তাও আজ আর জানবার উপায় নেই। কম ঝুঁকি তো নেয় নি সে লোকটি,—সেদিন ইংরেজ শুধু নয়, ইংরেজকে যারা আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরও কারও রক্ষা থাকে নি।

কেমন ক'রে কী ভাবে রক্ষা করেছিল, সে কথাও অবশ্য ইতিহাসে নেই। একজনের চিঠিতে ঐ একটি লাইন মাত্র পাওয়া গেছে—'মিসেস লীসন নামে এক ভদ্রমহিলা এক আফগানের সাহায্যে প্রাণ-বাঁচাতে পেরেছেন।' এই মাত্র, আর কিছু নয়।

কিন্তু ইতিহাসে না লেখা থাকলেও আমরা বলতে পারি কী ঘটেছিল। আমাদের মানসচক্ষে যেন দেখতে পাই সমস্তটা। সেই কথাই বলতে বসেছি।

পাঠানটির নাম আগা মহম্মদ।

তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণ ছেলে, সুদূর আফগানিস্তান থেকে মাত্র কয়েক মাস আগেই এসেছে সে। তখনও এক বছর পুরো হয় নি বোধহয়—এতই অল্পদিন দিল্লীর সঙ্গে পরিচয় তার। কাবুলেরও উত্তর পশ্চিমে এক পার্বত্য অঞ্চলে ওদের দেশ। নিতান্তই চাষী গৃহস্থের ছেলে, পাহাড়ে যেটুকু চাষ হয়—ফল-ফুলুরী-মেওয়া—তাইতে আর দুম্বা ভেড়া পালন ক'রে সংসার চলে—খুব সুখে না হলেও স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

কিন্তু ওদের দেশে জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে ঝগড়া নিত্যনৈমিত্তিক। সে ঝগড়ার কারণটা হয়ত তুচ্ছ, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—কিন্তু ফলাফলটা তুচ্ছও নয়, অকিঞ্চিৎকরও নয়। সামান্য কারণে যে বিবাদের সূচনা হ'ল তা হয়ত বংশ-পরম্পরায় চলতে থাকবে, তার জন্য বহু প্রাণক্ষয় এবং রক্তক্ষয় হওয়াও আশ্চর্য নয়। দুটো সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ খেয়ালের ফলে হয়ত দুই গোষ্ঠীতে যুদ্ধ লড়াই বেধে গেল—এমন ঘটনা আকছারই ঘটে ও-দেশে।

এই রকমই সামান্য কারণে দুই পরিবারে বিবাদ বাধল আগাদের গাঁয়ে। আগা মহম্মদের যারা শত্রুপক্ষ তারা প্রবল—গাঁয়ের জমিদারের মতো। ফলে ওদের পরিবারে বহু লোকই মারা গেল, ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ ঘটল, শেষে বুড়ী মাকে নিয়ে একদিন গোপনে দেশ ছেড়েই পালাতে হ'ল আগাকে। কিন্তু ওদের দেশে বিবাদের আগুন থেকে দূরে সরে গেলেই অব্যাহতি পাওয়া যায় না। প্রতিহিংসা যায় সঙ্গে, বয় বংশ-পরম্পরায়—জাগুয়ারের মতো ওদের জেদ, তেমনি ধৈর্য। একটা তরুণ ছেলে আর একটা অশক্ত বৃদ্ধা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে—তাদেরও রেহাই দিল না আগাদের প্রতিপক্ষ। ওদলের চার-পাঁচজন লোক দল-বেঁধে পিছু নিল। কোনমতে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকাই দুঃসাধ্য, তার ওপর পথের কষ্ট তো আছেই। সেকালে ট্রেন ছিল না, লোকে দূরের পথ ঘোড়ায় যাতায়াত করত কিংবা নৌকোয়। ওদেশে নদী নেই, ভরসা ঘোড়া বা উট। গরিবদের হাঁটা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

খুবই কষ্ট হয়েছিল ওদের। পয়সা নেই যে ঘোড়ায় চাপবে, কিংবা ভাল ভাল সরাইখানায় খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম করবে। তাও সোজা পাকা সড়কে হেঁটে এলেও একটু সুবিধা হয়—সে উপায়ও ছিল না, শত্রুর ভয়ে যতটা সম্ভব বিপথ ধরেই আসতে হয়েছে। সে সব পথে লোকালয় নেই, বন্য জন্তুর

ভয় আছে, চোর-ডাকাতের ভয় আছে। লোকালয় থাকলেও না হয় আশ্রয় ভিক্ষা করা যায়, দু'খানা রুটি মেগে খাওয়া যায়। এ অর্ধেক দিনই ওদের অনাহারে কাটত, খিদের জ্বালায় অনেক সময় পাতা-লতাও খেতে হ'ত—তাতে পেট খারাপ হয়, শরীর ভেঙে পড়ে। ওর মা যদিও গান্ধারীর দেশের মেয়ে তবু এই বয়সে এত কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না—দিল্লীর কাছাকাছি এসে এক জায়গায় জ্বরাতিসার রোগে মারা গেলেন। আগা একেবারই একা পড়ল এ পৃথিবীতে।

দিল্লীর দিকে আসছিল ওরা, অনেক ভেবে-চিন্তে। বড় শহর, রাজধানী জায়গা—অনেক লোকজন, ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সহজ। তাছাড়া, ওখানে ওদের দেশী লোকও আছে কিছু কিছু—ওদের পক্ষে বা ওদের দলে—তাদের কাউকে খুঁজে বার করতে পারলে শুধু আশ্রয় নয়, হয়ত কাজ-কর্মেরও সুবিধা হতে পারে। এই সব পাঁচ রকম ভেবেই এত দূরের পথ ধরেছিল আগা। অবশ্য পথ যে ঠিক এতটা দীর্ঘ, এত কষ্টদায়ক, এত বিপদসঙ্কুল তা ও নিজেও বুঝতে পারে নি আগে।

এখন মা মারা যাওয়াতে ওর খুব অনুশোচনা হ'ল, মনে হ'ল যে এতদূর আসবার চেষ্টা না করলে—কাছাকাছি কোন শহরে—লাহোরে কি আম্বালায় গিয়ে আশ্রয় নিলে হয়ত মা এত তাড়াতাড়ি মরতেন না, আরও কিছুদিন তাঁকে বাঁচানো যেত।

কিন্তু তখন বসে বসে দুঃখ করবারও সময় নেই। একটু চোখের জলই ফেলবার সময় পেল না সে। পিছনেই শত্রু—নির্মম, নিষ্ঠুর, ক্লান্তিহীন। কোনমতে মাকে মাটি-চাপা দিয়েই আবার রওনা হতে হ'ল ওকে। তখন দিল্লী শহরই কাছে, তাই—যাঁকে নিয়ে দিল্লী আসার কথা, তাঁকে হারিয়ে দিল্লীতে আসার আর তেমন ইচ্ছা না থাকলেও—একসময় দিল্লীতে এসেই আশ্রয় নিতে হ'ল।

দিল্লী পৌঁছে প্রথম কটা দিন সত্যিই শান্তিতে ছিল আগা। এত বড় শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝখানে তার মতো একজন সামান্য প্রাণীকে খুঁজে বার করতে পারবে শত্রুরা, তা মনেও করে নি। এদিকওদিক ঘুরে শেষে পাহাড়গঞ্জে এসে এক দোকানে কাজ পেয়ে গিয়েছিল। জায়গাটা ওর নিরাপদও মনে হয়েছিল। ঘিঞ্জি বস্তী, বহু লোক—সেদিক দিয়ে আত্মগোপন

করা সুবিধা। তাছাড়া এ দিকটা পাঠান কম, মুসলমানই কম—হিন্দুদের বসতিই বেশী। এখান থেকে কেউ খবর দেবে তার দুশমনদের—তাও মনে হয় না, তারাই বা হিন্দু-প্রধান পাড়ায় খোঁজ করতে আসবে কেন?

কিন্তু তাও এল একদিন। ওদের সেই সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। তখন অপরাহ্ণ বেলা কিন্তু তা হলেও সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে—দিনের আলো কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। আগা দোকানের সামনের রাস্তায় জল ছিটিয়ে দেবে বলে কুয়া থেকে জল তুলছিল, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলতেই ওদের দেখতে পেল। তখনও ওরা দূরে আছে—তবু চিনতে কোন অসুবিধা হ'ল না আগার। সে দড়ি এবং ডোল ফেলেই ছুটল।

কিন্তু আগাও যেমন চিনেছে ওদের, ওর দুশমনরাও তেমনি চিনতে পেরেছে আগাকে। হয়ত ওকে ছুটতে দেখেই চিনেছে। যাই হোক, তারাও পিছু নিল। এমনি তাদের সঙ্গে দৌড়ে পারবার কথা নয়—কারণ আগা ছুটছে পায়ে ভর দিয়ে—ওরা ছুটছে ঘোড়ায় চেপে। কিন্তু তবু ঈশ্বরের দয়ায় সেই অসুবিধাটাই সুবিধা হয়ে উঠল আগার পক্ষে। সংকীর্ণ গলির মধ্যে পায়ে চলা যতটা সোজা, ঘোড়ায় চেপে চলাটা তত নয়। গলি হলেও দুদিকে দোকান—আর প্রায় সব দোকানেই রোদ বাঁচাবার জন্যে বাঁশের ডগায় চটের পর্দার ব্যবস্থা, সেগুলো কোণাকুণিভাবে দোকানের দরজা থেকে রাস্তার মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত, পায়ে হেঁটে গেলে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু ঘোড়ায় চেপে চলতে গেলে প্রতিহাতে সেগুলো বাধা সৃষ্টি করে, পর্দা সরিয়ে বাঁশের খুঁটি ঠেলে যাওয়া—সেগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়েই যেতে হয়, দোকানীদের তাতে ঘোর আপত্তি, তারা হইহই ক'রে ওঠে, মারতে যায়—নিতান্ত ওদের হাতে খোলা তলোয়ার এবং পিঠে বাঁধা বন্দুক দেখেই বেশী বাড়াবাড়ি করতে সাহস করে না।

তা হোক, তবু এদের অসুবিধা ঢের। আগা একটু হিসেব ক'রে চলতে পারলে ওদের চোখে ধুলো দিতে পারত অনায়াসেই—আর অনেক আগেই। কিন্তু আগা তখন ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটছে, খুব একটা হিসাব ক'রে চলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়—তা ছাড়া এ শহর তখনও ওর কাছে অপরিচিত, এসে পর্যন্ত—ইঁদুর যেমন ভাবে দিনের বেলায় গর্তের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে

তেমনি ভাবেই—পাড়ার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে ছিল ও, বাইরে বেরিয়ে বেশী ঘোরাঘুরি করতে সাহস হয় নি। সুতরাং পথঘাট কিছুই জানা নেই, কোথা দিয়ে কোন্ গলিতে ঢুকে কোথায় সরে পড়া যায় এসব সে কিছুই জানে না, হিসেব করবে কি? তাই কতকটা এলোপাতাড়িই দৌড়চ্ছিল, আরও সরু গলিতে ঢোকার বদলে মধ্যে মধ্যে বেশ চওড়া রাস্তাতেই এসে পড়ছিল—তাতে শত্রুপক্ষের সুবিধা। বিশেষ ক'রে আজমীঢ় দরওয়াজার কাছটাতে এসে তো ওদের হাতের মধ্যে পড়েই গিয়েছিল প্রায়!

তবে, নেহাত বোধহয় ওর ভাগ্যে মরা নেই—তাই, সে যাত্রা কোনমতে বেঁচে গেল। আজমীঢ় দরওয়াজা দিয়ে চোরাবাজারে পড়ে—সেখান থেকে মাধবদাসের বাগানবাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে যখন দরিয়াগঞ্জে এসে পড়ল তখন আর ওর বেশী দৌড়বার সামর্থ্যও নেই, দম শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘোড়-সওয়ারদের ক্লান্ত হবার তেমন কোন কারণই ঘটে নি তখনও পর্যন্ত, ঘোড়ার কাছে এটুকু কোন দূর পথ নয়, তারা তখনও বেশ তাজাই আছে। আগার অবসন্নতার সুযোগ নিয়ে এবার তারা ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, ওরাও বুঝল এবং আগা নিজেও বুঝল—এ যাত্রা আর আগার রক্ষা নেই। ওর দুশমনরা আনন্দে পৈশাচিক চিৎকার করতে লাগল মধ্যে মধ্যে, সাফল্যে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আগা মনে মনে তার মাকে বাবাকে স্মরণ করল। বাবার কথা তেমন মনে নেই। মাকেই ডাকল বেশী ক'রে। আল্লার কথা ভাববার চেষ্টা করল।

তবে নাকি আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'রাখে হরি মারে কে'—ঈশ্বর যাকে রক্ষা করবেন মনে করেন তাকে কেউ মারতে পারে না। আগার অদৃষ্টে তখন মৃত্যু নেই, তাই ভগবান এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার হাত দিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে ওকে রক্ষা করলেন।

প্রায় যখন শত্রুরা ওকে ধরে ফেলে—এই রকম অবস্থা, তখন হঠাৎ সামনের একটা বাড়ির দরজা খুলে একটি ইংরেজ ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি দোতলার জানলা থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন কিছুক্ষণ ধরেই। একটা অল্পবয়সী ছেলে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, অথচ সম্ভবত অনেকক্ষণ ধরে ছোটবার ফলেই যথেষ্ট দ্রুত দৌড়তে পারছে না, ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভেসে

যাচ্ছে, আতঙ্কে পাণ্ডাশপানা হয়ে উঠেছে তার মুখ—হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে, আর বুঝি চলতে পারছে না বেচারা—অথচ তারই পিছনে চারজন ঘোড়-সওয়ার ছুটে আসছে খোলা তলোয়ার নিয়ে। নির্লজ্জের মতো, পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠছে ; একটা নিরস্ত্র পদাতিক ভীত বালককে অতগুলো সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার ধরবে—তারই বাহাদুরির আনন্দে মুখচোখ উদ্ভাসিত।

ভদ্রমহিলা এ দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। পথে যারা ছিল, অন্য পথচারী, বা আশপাশের দোকানদার, তারা কিছু বুঝতে না পেরে বেকুবের মতো চেয়ে আছে, কেউ কেউ বা যেন শিকারখেলার মজা পেয়ে হাসছে হি-হি ক'রে, কিন্তু কেউই এই অসমান লড়াই বন্ধ করার কি হত্যা-কারীদের বাধা দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না। হয়ত বা ওদের ঐ হাতিয়ার-গুলোর ভয়েই আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। বাধা ওরা দেবে না শেষ পর্যন্তও, বা পারবে না—তা উনি বেশ বুঝতে পারলেন। স্ত্রীলোকের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল ঐ ছেলেটার অসহায় করুণ মুখের দিকে চেয়ে। তিনি স্বামীর বন্দুকটা হাতে নিয়ে দ্রুত নেমে এলেন নিচে।

তিনি যখন দোর খুলে বাইরের ফালি রকটাতে বেরিয়েছেন তখন আগা ঠিক সামনেটাতে এসে পড়েছে! ভদ্রমহিলা আর একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে ছুটে এসে ওর একটা হাত ধরে এক ঝটকায় ওপরে তুলে নিলেন এবং বিস্মিত হতচকিত আগা কিছু বলবার বা কোন প্রশ্ন করবার আগেই তাকে বাড়ির মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন, তারপর সেই বন্ধ কপাটে পিঠ দিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন এদের মুখোমুখি।

আগেই বলেছি যে তখন দুই পক্ষের ব্যবধান খুব কমে এসেছে। আগাকে ভেতরে ঢোকাতে না ঢোকাতে ওর দুশমনরা ওঁদের বাড়ির সামনে চলে এসেছে—অন্য কেউ হলে আগেই বাধা দিত কিন্তু নিতান্ত মেমসাহেব এবং বন্দুকধারিণী বলেই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল ওরা। আগা নিরাপদে বাড়ির মধ্যে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ ক'রে মেমসাহেব আবার তাদের দিকে ফিরে তাকালেন—এই সমস্ত সময়টা, তা সে যতটুকুই হোক, নিশ্চেষ্ট হয়ে বোকার মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

এবার মেমসাহেব নিজেই কথা বললেন। ভ্রূকুটি ক'রে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কে তোমরা, কী চাও?'

ওদলের যে প্রধান—সর্দারমতো একজন—সে-ই এগিয়ে এল। বললে, 'ঐ ছোকরা যাকে আপনি বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন, তাকেই আমরা চাই! ওকে বার ক'রে দিন, আমরা চলে যাচ্ছি।'

লাল হয়ে উঠল মেমসাহেবের মুখ। তিনি বললেন, 'লুকিয়ে রাখি নি। তোমাদের সামনেই ভিতরে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু ওকে তোমরা ধরতে চাইছ কেন, কী করেছে ও?'

'ওকে আমরা বধ করব। ওকে মারতে পারলেই ওদের বংশ শেষ হয়ে যাবে। তাহলেই আমাদের ছুটি।'

'ওকে বধ করবে? কেন? ও তোমাদের কী করেছে? কাউকে ঠকিয়েছে তোমাদের মধ্যে? কাউকে খুন করেছে? আর তা যদি ক'রেই থাকে তো সেজন্যে কোতোয়ালি আছে পুলিশ আছে, সেখানে খবর দাওগে। এ কোম্পানির রাজত্ব, এখানে নিজের খুশিমতো কাউকে সাজা দেওয়া যায় না।'

সে দলপতি একটু অসহিষ্ণুভাবেই যেন উত্তর দিল, 'ওসব কোতোয়ালি পুলিশ আমরা বুঝি না। আমরা পাঠান। আমাদের ঝগড়া আমরাই বুঝব। ওকে ছেড়ে দিন। মেয়েছেলের সঙ্গে তকরার করতে চাই না।'

মেমসাহেব খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন কিন্তু তবু শান্তভাবেই আবার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু ওকে তোমরা একেবারে খুন করতে চাইছ, এতগুলো তাগড়া জোয়ান ঘোড়সওয়ার মিলে একটা নিরস্ত্র ছেলেকে—ও এমন কী অনিষ্ট করল তোমাদের? ওর কী সাধ্য তোমাদের এমন কোন ক্ষতি করে!'

'ও কেন ক্ষতি করবে! আমাদের সঙ্গে ওর পরিচয়ই বা কতটুকু! আমাদের কোন লোকসানই করে নি ও।'

'তবে? শুধু শুধু ওকে মারতে চাইছ কেন? ও কি হরিণ না দুম্বা যে শিকার ক'রে খাবে?'

'শুধু শুধু মারতে চাইব কেন? ওর গুষ্টির সঙ্গে আমাদের গুষ্টির ঝগড়া। কেন কী কারণে সে ঝগড়া হয়েছিল, তাও আমরা জানি না, তা নিয়ে মাথাও ঘামাতে চাই না। আমাদের যিনি সবচেয়ে বড়, সর্দার—তাঁর হুকুম ওকে মারতে হবে—না মেরে ফিরলে তাঁরা আমাদের কোতল করবেন। সেই হুকুমই আমাদের কাছে যথেষ্ট। আজ ছ'মাস আমরা ওর পিছনে পিছনে ঘুরছি, আজ এতদিন পরে খোদার দোয়ায় ওকে কাছে পেয়েছিলাম, এতক্ষণে

সাবাড় ক'রেও ফেলতাম—যদি না আপনি বাধা দিতেন। এখন ওকে ছেড়ে দিন, আমরা আমাদের কাজ সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরি।'

এবার ভদ্রমহিলা নিজমূর্তি ধরলেন। বললেন, 'এত তুচ্ছ কারণে তোমরা একটা লোককে খুন করতে চাইছ—এই অপরাধেই তোমাদের পুলিশে দেওয়া উচিত। তোমরা খুনে এবং কাপুরুষ। তোমাদের লজ্জা করে না—এতগুলো ঘোড়সওয়ার লোক তলোয়ার বন্দুক নিয়ে বলতে গেলে একটা বাচ্ছাকে শিকার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ! এখনই চলে যাও এখান থেকে, নইলে আমিই কোতোয়ালিতে খবর দিয়ে তোমাদের ধরিয়ে দেব। এ তোমাদের পাঠান মুলুক নয়, এ কোম্পানির রাজত্ব, এখানকার আইনকানুন অন্যরকম।'

ওরাও রুখে উঠল এবার, 'ওসব কোম্পানি-ফোম্পানি আমরা বুঝি না। আইন-কানুনেরও ধার ধারি না। আমরা যা করতে এসেছি তা করবই। তুমি যদি আমাদের বাধা দাও তো তোমাকেও মারতে আমরা ইতস্তত: করব না, তোমাদের সমস্ত সাহেবী-কানুনের চেয়ে আমাদের সর্দারের হুকুম বড়।'

সত্যি সত্যিই ওদের যে দলপতি, সে বন্দুক তুলে বাগিয়ে ধরল ভদ্রমহিলার দিকে।

হয় ওকে মারতে হবে—নয় তো নিজেকে মরতে হবে। লোকটা বন্দুকের ঘোড়াতে হাত দিয়েছে, একটু আঙুলের চাপ দেওয়ার ওয়াস্তা। চোখের নিমেষে অবস্থাটা বুঝে নিলেন ভদ্রমহিলা এবং সেই চোখের নিমেষ ফেলবার আগেই নিজের বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন।

পর পর দু'বার আওয়াজ হ'ল—গুড়ুম গুড়ুম!

দোনলা বন্দুক, দুটো নলেই টোটা ভরা ছিল। ভদ্রমহিলার লক্ষ্যও অব্যর্থ। দুটি গুলিতে দুজন পাঠান খতম।

কিন্তু তবু হয়ত মহিলা একটু বিপন্ন হয়ে পড়তেন, কারণ আবার টোটা ভরতে সময় লাগত একটু, তাছাড়া টোটার থলিটাও নিয়ে আসেন নি নিচে নামবার সময়, এতটা যে বাড়াবাড়ি হবে তা তখন আন্দাজ করতে পারেন নি, আর ভাববারও সময় ছিল না বিশেষ। তবে সে যাই হোক, এই একবারের আওয়াজ পেয়ে পাশের বাড়ি থেকে আরও একটি সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। আগা যে সাহেব-পাড়াতে এসে পড়েছে তা সেও জানত না—ওরাও না। এখন যে দুজন অবশিষ্ট ছিল তারাও প্রমাদ গুনল। আশপাশের দোকানদার

রাহীর দলও—যারা এতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল, তারা তামাশার শেষ দেখবার জন্যে ভিড় ক'রে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চারদিকে, তারাও এবার ভরসা পেয়ে রুখে উঠল। 'সত্যিই তো, একটা বাচ্ছা ছেলেকে বিনা দোষে খুন করতে বেরিয়েছ তোমরা চার-চারটে জোয়ান মরদ, কুড়িখানেক হাতিয়ার নিয়ে ? এ কী অন্যায় কথা !'

বেগতিক দেখে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওরা পালাবার চেষ্টা দেখল। কিন্তু চারপাশের লোক এগিয়ে এসে ঘোড়ার মুখ ধরে ফেলল দুজনকারই।

'নেমে এসো, দেখি কত বড় মরদ তোমরা। নেমে এসো বলছি ঘোড়ার ওপর থেকে।'

এবার প্রাণের ভয়ে ওরা তলোয়ার চালাল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হ'ল। যে লোকটা সামনে ঘোড়ার মুখ ধরে ছিল সে ঘায়েল হ'ল বটে, জনতা খেপে উঠল একেবারে। ওদিক থেকে আর একজন যে সাহেব বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি এবার গুলি চালালেন। একজন পড়ে গেল, বাকি যেটি অবশিষ্ট রইল তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে সকলে মিলে কীল চড় ঘুষি চালাতে লাগল যদিচ্ছা। একেবারে মেরেই ফেলত হয়ত—যদি না সাহেব এসে বাধা দিতেন। তিনিই ওদের থামিয়ে সেই আধমরা লোকটাকে পুলিশের হাতে সঁপে দিলেন।

মেমসাহেব ভেতরে এসে দেখলেন, শ্রান্তিতে ভয়ে উত্তেজনায় আগা বসে পড়েছে ভেতরের সিঁড়িটায়। ঠকঠক ক'রে কাঁপছে তখনও। তিনি ওকে আশ্বাস দিয়ে ওপরে নিয়ে গেলেন, গরম দুধের সঙ্গে একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে খেতে দিলেন, তোয়ালে ভিজিয়ে কপাল গলা ঘাড় মুছিয়ে দিলেন, তারপর খানিকটা সুস্থ হতে ওর মুখ থেকে সব বিবরণ শুনলেন। সম্পূর্ণ বিনা দোষে কী কষ্টটাই না পেয়েছে ও—শুনতে শুনতে মেমসাহেবের চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বিশেষ যখন পথের মাঝে মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কথা বলতে বলতে আগা কেঁদে ফেলল তখন তিনিও চোখের জল রুখতে পারলেন না। তাঁরও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বেশ কয়েক ফোঁটা জল। তিনি ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক সান্ত্বনা দিলেন।

ওখানেই রইল আগা কয়েকদিন। তারপর যখন সে নিজে থেকেই

বিদায় চাইল তখন মেমসাহেব ওকে কিছু টাকা দিলেন আর তাঁর বন্ধু লেফটেনাণ্ট উইলোবীর নামে একটা চিঠি লিখে দিলেন। বলে দিলেন এই চিঠি নিয়ে লালকিলায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। যদি সুবিধা হয় তো তিনি ওকে নিশ্চয় ফৌজে ঢুকিয়ে নেবেন। আগার মতো একটা তাগড়াই জোয়ান ছেলেকে যদি দোকানে বসে আটা ঘিউ মাপতে হয় তো সে বড়ই আপসোসের কথা। লড়াইয়ের কাজই তার উপযুক্ত, সেই কাজের ব্যবস্থাই তিনি ক'রে দিলেন।

এতখানি দয়ায় আবারও আগার চোখে জল এসে গেল। সে ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা করল কিন্তু উপযুক্ত কোন ভাষা মুখে যোগাল না তার। শুধু দুই হাত জোড় ক'রে সে তার প্রাণদাত্রীর নামটা জানতে চাইল।

মেমসাহেব একটু হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'নাম জেনে আর কী হবে, মনে রাখতে চাও তো মনে রেখো—মিসেস লীসন, লীসন সাহেবের মেম, তাতেই হবে।'

আগা নামটা মুখস্থ করতে করতে সেলাম ক'রে বেরিয়ে এল।

এই ঘটনার ঠিক এক বছর পরে—১৮৫৭ সালের ১১ই মে মীরাট থেকে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীতে এসে পৌঁছল। ওরা যখন রাজঘাটের দিক থেকে এসে কিলার দরওয়াজায় পৌঁচেছে তখন তাদের দরজা খুলে দিল আগারই বন্ধু-বান্ধব পরিচিত কয়েকজন মুসলমান সিপাহী। আগা নিজে সে দলে ছিল না—ইংরেজের ঋণ সে ভোলে নি, তাছাড়া তার এই ক'দিনের অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছে যে এরা বুদ্ধিতে সাহসে একতায়—তাদের চেয়ে বড়; সাহেবদের তাড়িয়ে রাজত্ব কেড়ে নেওয়া অত সহজ হবে না। আর—আবার ঐ বুড়ো বাদশার 'রাজ' কায়েম হলে যে দেশের লোকের খুব সুবিধা হবে তাও মনে হয় নি ওর। তবে সে বাধা দিতেও চেষ্টা করে নি। সাগরের বান যখন আসে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলে, তখন একটা মানুষের কী সাধ্য তাকে আটকায়?

প্রথমটা সব দিক দিয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল সে। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ যখন শহরে সাহেব-নিধন পর্ব শুরু হয়ে গেল, তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। ক'দিন আগে অবশ্য শুনে এবং দেখে এসেছে যে মিসেস লীসন স্বামীর

সঙ্গে এলাহাবাদে যাবার তোড়জোড় করছেন—কিন্তু ঠিক কবে যাবেন তা কিছু শোনে নি। যদি এখনও না গিয়ে থাকেন?

আগা আর স্থির থাকতে পারল না। সে কিল্লা থেকে বেরিয়ে পড়ে দরিয়াগঞ্জের দিকে রওনা হ'ল। শহরের তখন যা অবস্থা তাতে কোন পথে এগোনোই যায় না। চারিদিকে ইংরেজ ও য়্যাংলোইণ্ডিয়ান সাহেবদের শব ছড়ানো। বহু দোকানপাট লুঠ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বহু বাড়িতে আগুন জ্বলছে। শুনল যে সাহেব বলতে দিল্লী শহরে আর কেউ নেই। সবাই খতম হয়ে গেছেন। আগার কপালে ঘাম দেখা দিল, চোখে যেন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে—তার মনে তখন একটিই প্রশ্ন—মিসেস লীসন জীবিত আছেন তো, গিয়ে দেখতে পাবে তো?···

কিল্লা থেকে বেরিয়ে চাঁদনী চকের ধার দিয়ে যাবার সময় একটা দরজীর দোকানের ঝাঁপ একটু খোলা পেয়ে নগদ তিন তঙ্কা দিয়ে একটা বোরখা কিনে নিয়েছিল সে। রেশমের বোরখা, দাম একটু বেশীই চেয়েছিল কিন্তু আগা তাকে এক ধমকে ঠাণ্ডা ক'রে দিল। সে সিপাহী, আজ থেকে দিল্লীতে সিপাহীদেরই 'রাজ' কায়েম হ'ল তা কি দেখছে না ওস্তাগর মিয়া? সে যে দাম দিতে চাইছে এই তো ওস্তাগর সাহেবের ভাগ্যি! ওস্তাগর সাহেবও তা বুঝল, কোনমতে ওকে বিদায় দিতে পারলে তখন সে বাঁচে—যদি এ আবার দলবল জুটিয়ে এনে দোকানসুদ্ধ লুটে নেয়? তাছাড়া কোমরে গোঁজা ঐ সঙীনটা বুকে গুঁজে দিলেই বা ঠেকাচ্ছে কে, এ লোকটা একাই তো যথেষ্ট।

অনেক কাণ্ড ক'রে ভিড় ঠেলে অন্য অন্য সিপাহীদের সঙ্গ ও প্রশ্ন এড়িয়ে যখন শেষ পর্যন্ত দরিয়াগঞ্জ পাড়ায় পৌঁছল তখন সেটা একটা নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ বাড়িরই দোর-জানলা খোলা—সাহেব মেমসাহেব আর তাদের ছেলেমেয়েদের মৃতদেহ ছড়ানো—কয়েকটা বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে, চিতার আলোর মতো সেই লাল আলোতে গোটা পাড়াটাই যেন বীভৎস দেখাচ্ছে।

আর এগোনো বৃথা—মনে মনে কে যেন বার বার বলছে, তবুও আগা কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে গেল লীসনদের বাড়ির দিকে। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে, পা অবশ হয়ে আসছে—কী দেখবে, সেই ভয়ে অবসন্ন হয়ে আসছে [illegible] জোয়ানটার বুক তবু যেতেই হবে। কী দেখবে

তা তো বুঝতেই পারছে কিন্তু তবু—যদিই তা না হয়। একটু ক্ষীণ আশা যে থেকেই গেছে কোথায়!

লীসনদের বাড়ির সামনে পৌঁছে বুঝতে পারল যে তার আশঙ্কাই ঠিক। বাড়ির দরজা ভাঙা, সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মিস্টার লীসন। তাঁর তেলেঙ্গী ক্রীশ্চান চাকরটার মৃতদেহ সিঁড়িতে পড়ে—সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ থমথম করছে। শ্মশানের মতো মনে হচ্ছে সবটা।...

এবার ফিরে যাওয়াই উচিত, কারণ কী দেখবে তা তো জানা কথাই—তবু আগার কেমন যেন একটা জিদ চেপে গেল। নিজের চোখে তার প্রাণদাত্রীর দেহ না দেখে সে যাবে না। আর দেখতে পেলেও—সে নিজে হাতে মাটি দেবার চেষ্টা করবে। আস্তে আস্তে ভারী পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠল সে—বেশী সময়ও লাগল না—উঠে সামনেই যে ঘরটা সেইখানটাতেই দেখল মিসেস লীসনের মৃতদেহটা, আরও তিন-চারটি মৃতদেহের সঙ্গে একটা স্তূপের মতো হয়ে পড়ে আছে।

চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেল অশ্রুতে। কিছুক্ষণের মতো কোন জ্ঞানই রইল না যেন। একবার মনে হল কোমরে গোঁজা এই সঙীনটা বুকে বসিয়ে সেও নিজের জীবনটা শেষ ক'রে দেয়—কিন্তু তারপরই মনে হ'ল, বিরাট একটা কর্তব্য এখনও বাকী আছে। মার মতো এঁকেও যে মাটি দিতে হবে। সম্ভব হলে ক্রীশ্চানদের গোরস্তানে গিয়ে মাটি দেবে সে।

মৃতদেহটা বার করতে গিয়ে কিন্তু চমকে উঠল সে। অন্য দেহগুলোর মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি তো! এখনও যে গরম আছে। গরম শুধু নয়—হাত-পা নড়ানো যাচ্ছে যেমন খুশি, মড়ার মতো শক্ত লাগছে না একটুও!!......

আরও একটু লক্ষ্য ক'রে দেখল যে এখনও সত্যিই ওঁর নিশ্বাস পড়ছে। বেঁচে আছেন—আঃ—বেঁচে আছেন এখনও! এইবার যেন একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল আগা। আরও ভাল ক'রে লক্ষ্য করল—ওঁর দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, পোশাকে যে এক-আধটু রক্ত লেগেছে—সে অপরের ক্ষত থেকে। আর এখনও ঘাম হচ্ছে, গলায় কপালে বুকে ঘাম জমে আছে। সম্ভবতঃ উনি ভয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন এই বীভৎস মৃত্যুর তাণ্ডব দেখে, ওরা মড়া মনে ক'রে ফেলে গেছে, ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে নি।

কিন্তু তখন আর ভাববার সময় নেই। আনন্দ করবার তো নয়ই! দূরে আবারও একটা হল্লা উঠেছে কোথায়—হয়ত লুটেরার দল এগিয়ে আসছে এবার। কিন্তু সিপাহীর দলই হোক আর লুটেরার দলই হোক, সামনে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। আগা অজ্ঞান মিসেস লীসনের দেহটা টেনে নিয়ে ভেতরের বারান্দায় এল—একটা বালতিতে খানিকটা জল ছিল, মুখে মাথায় থাবড়ে দিতে লাগল।

একটু পরেই জ্ঞান হ'ল মিসেস লীসনের। খানিকটা বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকবার পর আগাকে চিনতেও পারলেন।

'এ কি, আগা তুমি? তুমিও আমাকে খুন করতে চাও?'

'না মেমসাহেব—আমি বাঁচাতেই ছুটে এসেছি আপনাকে। কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই। এখনই হয়ত ওরা আবার এসে পড়বে—দল বেঁধে দুশমনরা এলে আমি একা কী করতে পারি বলুন। আপনি চট্ ক'রে এই বোরখাটা গলিয়ে নিন—আর একটুও দেরি করবেন না।'

'কিন্তু—আমি একা যাব—আমার স্বামী?'

'অনর্থক দুঃখ পাবেন মেমসাহেব, আর কারও খোঁজ করবেন না। যদি বেঁচে থাকেন তো বেঁচেই আছেন—কিন্তু এখন সবাইকে জড়িয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। সকলকেই তাদের নসিবের ওপর ছেড়ে দিন—আপনি দয়া ক'রে এখন বেরিয়ে চলুন এই দোজখ্ থেকে।'

'কিন্তু আমি যে চলতে পারছি না আগা, আমার পায়ে একটুও জোর নেই।' যেন কান্নায় ভেঙে পড়েন মিসেস লীসন।

'এখন একটু আমার হাতে ভর দিয়ে চলুন, দু-চার পা গেলেই আবার পায়ে জোর পাবেন। আমি আপনাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারি, আল্লা সে তাকত আমাকে দিয়েছেন কিন্তু তাতে ক'রে যে দেখবে সে-ই সন্দেহ করবে যে আমি কোন মেমসাহেবকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি একটু চেস্টা করুন চলবার, খোদার দোহাই!'

প্রায় টেনে-হিঁচড়েই নামিয়ে আনল আগা তাঁকে। বোরখায় মুখ ঢাকা ছিল বলে স্বামীর মৃতদেহ দেখতে পেলেন না মিসেস লীসন, তা নইলে বোধহয় সেখানেই আছড়ে পড়তেন। তাছাড়া চোখের জলে তাঁর চোখও ঝাপসা হয়ে গেছে, কিছু দেখবার শ[illegible]

আগা ঠিকই বলেছিল। খানিকটা চলতে চলতেই পায়ে জোর পেলেন মিসেস লীসন। হাঁটতে লাগলেন—তবে ওর হাতে ভর দিয়ে—বরং বলা যায় এলিয়ে পড়ে। তখন এদিকটা অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, শ্মশানের নির্জনতা নেমেছে চারিদিকে—দুশমনের ভয় কম। আগা দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল নদীর দিকে। একমাত্র ভরসা যদি কোন আঘাটায় একটা নৌকো পেয়ে যায় তো রাতারাতি নদী পেরিয়ে ওপারের কোন গ্রামে কিম্বা তেমন চড়া পেলে এপারেই নিচের দিকে কোথাও কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে নামবে। নইলে শহরে যেখানেই থাকুক না কেন—কোন-না-কোন রকমে খবরটা ছড়িয়ে পড়বেই, আর তাহলে তাদের দুজনেরই জান এক লহমায় খতম হয়ে যাবে। এদের মেজাজ সে এই এক বেলাতেই বুঝে নিয়েছে।

পথে অবশ্য দু-চারজন রাহীর সঙ্গে যে দেখা হ'ল না তা নয়। কিন্তু তারা মুসলমান সিপাহীর সঙ্গে বোরখা পরা মেয়েছেলে দেখে কোন সন্দেহ করল না। একবার শুধু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ একটা গলির মোড়ে এক ঘোড়ার গাড়ির সামনে পড়েছিল—সে গাড়ির চালকের পাশে বসে দেশী পুলিস একজন, পিছনের সহিসের জায়গাতেও তাই। গাড়ির ভেতর যিনি ছিলেন তিনি হেঁকেও উঠেছিলেন খুব জোর, 'কে যায় ও! কাকে নিয়ে যাচ্ছ, কার বউ?'

কিন্তু সেই হুঙ্কারেই আশ্বস্ত হ'ল ওরা। সাহেব! কথা কইছেন সাহেব একজন।

মিসেস লীসন সব ভুলে চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'মেটকাফ—তুমি!'

মেটকাফ সাহেব লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন,—দু হাতে আগার দুই কাঁধ চেপে ধরে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শয়তান, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস এঁকে?'

আগা নির্বিকার। সে ম্লান হাসিও হাসল একটু। মিসেস লীসনই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'উহুঁ উহুঁ—তুমি খুব ভুল করছ চার্লস্—আগা আমাকে সেই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করেছে, আমাকে বাঁচিয়েছে। আমাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতেই চাইছে। অবশ্য তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আর ভাবনা নেই—'

মেটকাফ আগার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরলেন, 'বাই জোভ! এখনও এমন বন্ধু আছে সিপাহীদের মধ্যে!......কিন্তু তুমি এর

সঙ্গেই যাও মিসেস লীসন, আমার নিজেরই জীবন বিপন্ন, কাল সকালের মুখ আর দেখব কিনা জানি না, কোতোয়ালি গেছে—আমার আস্তানাও শুনছি ভস্মীভূত। আমিও পালাচ্ছি প্রাণের দায়ে, এর মধ্যে তোমাকে জড়াব না। গুড্‌বাই। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।'

মেটকাফের গাড়ি চলে গেল। ওরাও আবার ওদের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু নদীর কাছাকাছি গিয়েই ওরা পড়ে গেল একেবারে—যাকে বলে সাক্ষাৎ যমের মুখে। একদল সিপাহীর সামনাসামনি পড়ে গেল। হইহই ক'রে উঠল তারা ওদের দেখে।

'কে যায়? কাকে নিয়ে যাচ্ছ ভাই সিপাই?'

উত্তর তৈরীই ছিল আগার। সে বললে, 'খবরদার ভাই সব, মোগলের জেনানা। বাদশার হারেমের আওরত। মির্জা আবুবকরের হুকুমে ওঁকে ওঁর অসুস্থ ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

সকলে সসম্ভ্রমে পিছিয়ে গেল, দুপাশে সরে গিয়ে পথ ক'রে দিল। 'মোগল হারেমের জেনানা'—এ কথা বললে তখন হিন্দু মুসলমান সকলেই সম্ভ্রমে মাথা নোয়াত, জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করত কথাটা। এটুকু এই এক বছরেই জেনে গিয়েছিল আগা।

রেশমের বোরখা, সঙ্গে পাঠান সিপাহী, কথাটা অবিশ্বাস করার মতো নয়। কিন্তু তবু কে একজন পিছন থেকে প্রশ্ন করল, 'বাদশার হারেমের জেনানা—পয়দল যাচ্ছেন? গাড়ি পাও নি ভাই সাব?'

'গাড়ি কোথায় বলো, এই হ্যাঙ্গামে কি কেউ আসতে চায়?'

বলতে বলতেই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল আগা।

হয়ত ওর সেই ব্যস্ততাই কাল হ'ল। একের সন্দেহ অপরের মনে ছড়িয়ে পড়ল।

'এই রোকো রোকো—রুখ যাও।' পেছন থেকে হুকুম হ'ল, 'আমরা দেখব তোমার কথা সত্যি কি মিথ্যে। ওঁর পা-টা অত ফরসা দেখাচ্ছে কেন? এই অন্ধকারেও সাদা মালুম হচ্ছে। মেমসাহেবদের মতোই সাদা যেন—'

আর দেরি করলে চলবে না তা আগা বুঝল। সে আর ইতস্তত: করল না। টপ ক'রে মিসেস লীসনকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে ছুটল ঘাটের

দিকে। অন্ধকার ঘাট—তবু একটা নৌকার মতো কি দেখা যাচ্ছে না? হে ঈশ্বর, এই একটুর জন্যে কি বাঁচাবে না ওদের, জীবনের দেনাটা কি শোধ করতে দেবে না?

আগা একমনে ঈশ্বরের নাম জপ করতে লাগল।

ততক্ষণে সিপাইরা হইহই ক'রে ওদের পিছু নিয়েছে। আগার ঘাড়ে অতবড় বোঝা, আরও মুশকিল, বোধ হয় ভয় পেয়েই, মিসেস লীসন যেন একেবারে এলিয়ে পড়েছেন, দুহাতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছেন আগাকে। আরও ভারী হয়ে উঠেছে দেহটা। তবু সেই সময়টায় যেন মত্ত হস্তীর বল এসে গেল ওর দেহে। ওরা—ধরা তো দূরে থাক, যথেষ্ট কাছে আসার আগেই আগা নদীর ধারে পৌঁছে গেল। সত্যিই একটা ডিঙ্গি নৌকো বাঁধা ছিল একটা খুঁটিতে, নৌকোর মালিকও সৌভাগ্যক্রমে অনুপস্থিত। কাঁধের বোঝা একরকম নৌকোর ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগা দড়িবাঁধা খোঁটাটা প্রাণপণে ওপ্ড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। সেই অন্ধকারে দড়ির বাঁধন খোলবার চেষ্টা করার চাইতে খোঁটা ওপড়ানো ঢের সহজ, একটু গায়ের জোর লাগবে এই যা!

এধারে শিকার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সিপাইদের একজন বন্দুক হাতে বাগিয়ে নিল। কালো বোরখা ঠাওর হচ্ছে না—কিন্তু খাকী কুর্তা নজরে পড়ছে বইকি! যাবে কোথায়?……

গুড়ুম! গুড়ুম!

পর পর দুটো গুলি ছুটল। প্রথমটা এড়িয়ে গেলেও দ্বিতীয়টা এসে লাগল আগার পিঠে।

তা হোক, খুঁটিটা কিন্তু আল্‌গা হয়ে গেছে। আগা প্রাণপণে নৌকোটা ঠেলে নিয়ে চলল গভীর জলের দিকে—

'আগা, তোমার গায়ে গুলি লাগে নি তো?'

ব্যাকুলকণ্ঠে মিসেস লীসন প্রশ্ন করেন।

'ও কিছু না মেমসাহেব, আপনি মন শক্ত করুন।'

'কিন্তু তুমি নৌকোয় উঠছ না কেন, উঠে এসো, উঠে এসো।'

'উঁহুঁ, মাঝের স্রোতটায় না পৌঁছে দিতে পারলে নৌকো যাবে না মেমসাহেব। আপনি তো দাঁড় বাইতে পারবেন না, ঐ স্রোতই আপনার ভরসা। গরমের দিন, এদিকে জল কম, স্রোতই নেই।'

বলতে বলতেই ঠেলছে সে। বুক পর্যন্ত, গলা পর্যন্ত ডুবে এল তার। হয়েছে, এইবার কাম ফতেহ্—নৌকো তার গতি পেয়েছে, স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছে।

আগারও শক্তির সেই শেষ। আর একটু দেরি হলে সে পারত না।

'মা!' একবার মাকে স্মরণ ক'রে যেন আরামে ডুব দিল আগা। আর তাকে দেখা গেল না।

নৌকা অন্ধকারে তরতর ক'রে এগিয়ে চলে গেল মিসেস লীসনকে নিয়ে।

প্রতিশোধ

পৃথ্বীরাজ চৌহানের নাম এদেশে কে না শুনেছে! পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তার কাহিনী ভারতের ঘরে ঘরে প্রবাদ-বাক্যের মতোই প্রচলিত। সেই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের মাঠে, সংযুক্তার পিতা জয়চাঁদের আমন্ত্রিত মুহম্মদ ঘুরীর প্রচণ্ড লড়াই হ'ল। পৃথ্বীরাজ দুর্ধর্ষ বীর, কিন্তু মুহম্মদ ঘুরীও সুনিপুণ সেনাপতি—তাই ভারতীয় বাহিনীরই পরাজয় ঘটল এবং পৃথ্বীরাজ ও তাঁর ভাই দুজনেই নিহত হলেন।

এই হ'ল ইতিহাসের কথা।

কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, পৃথ্বীরাজ একেবারে নিহত হন নি—গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন মাত্র। আর সে খবর পাবার পর মুহম্মদ ঘুরী তাঁর বীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করতে দেন নি, বরং হাকিম ডেকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ ক'রে তুলেছিলেন। তাই বলে ছেড়েও দেন নি, চিরকাল বন্দী হিসেবে কাছে রেখে দিয়েছিলেন—সম্ভবত নিজের যোদ্ধা-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়গৌরবের স্মারক হিসেবেই। তবে তখনকার কালে যা রেওয়াজ ছিল, বিশেষত মুসলমান রাজাদের—সিংহাসনের সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্ধ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন তাঁরা, যাতে সুযোগ পেলেও কোনদিন আর কেউ তাদের সিংহাসনে বসাতে না পারে—সেটুকু করিয়ে নিতে ভুলে যান নি মুহম্মদ ঘুরী। কোন দেশেই কোন কালে অন্ধদের সিংহাসনে বসবার অধিকার নেই।

এরপর অন্ধ পৃথ্বীরাজ নাকি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, আর বরাবরই—

মুহম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত—সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। একথা বহু রাজপুত ঐতিহাসিক লিখে গেছেন—দু'একজন বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকও তা সমর্থন করেছেন।

আরও একটা কথা বলেছেন তাঁরা—এই অন্ধ রায়পিথৌরাই নাকি শেষ পর্যন্ত ঘুরীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। এই সুযোগটুকুর জন্যই অপেক্ষা ক'রে ছিলেন নাকি তিনি—নইলে এত নির্যাতন সহ্য করার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না।

আর সেই নির্যাতনেরই নাকি শোধ তুলেছিলেন পৃথ্বীরাজ স্বহস্তে মুহম্মদ ঘুরীকে বধ ক'রে। শত্রুকে ছোট ক'রে দেখতে নেই কখনও—শত্রুর শেষ রাখতে নেই—চাণক্যের এই নীতিই নতুন ক'রে তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন। কেমন ক'রে কী হ'ল এর বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে নেই। আমার গল্প ইতিহাসের সেই অলিখিত পাতা কটা নিয়েই।

পৃথ্বীরাজকে যখন অন্ধ করা হয়, তখনও তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। এত-বড় সর্বনাশের কথাটা তিনি জানতেও পারেন নি। যখন পারলেন তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চেঁচামেচি করলেন না, রাগারাগিও করলেন না। গালিগালাজ অভিসম্পাতের একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। এসব ক্ষেত্রে মানুষ যা করে, এতকাল যা করতে দেখে এসেছে—তার কোনটাই তাঁকে করতে না দেখে পৃথ্বীরাজের পাহারাদার রক্ষীরাও অবাক হয়ে গেল। এমন কি তারা যেটা মনে করেছিল—যে এবার হয়ত পৃথ্বীরাজ আত্মহত্যার চেষ্টা করবেন—সে আশঙ্কাও বৃথা প্রমাণিত হ'ল। পৃথ্বীরাজ শান্ত ভাবেই আহার্য গ্রহণ করলেন, হাকিমের দেওয়া ওষুধও খেলেন নির্বিবাদে। অবশ্য তাঁকে সেবা করবার জন্য, পথ্য রেঁধে দেওয়ার জন্য হিন্দু চাকর জনা-দুই রেখেছিলেন মুহম্মদ ঘুরী ; কিন্তু বিধর্মী পরিবেশে, তাদেরই আনা এবং ছোঁওয়া তো বটেই—তাদের তাঁবুতে রান্না করা খাবার খাওয়া সে যুগেও হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তার ওপর হাকিমের ওষুধ, কী দিয়ে তারা কি তৈরি করে তারও ঠিক নেই। ভাল ক'রে জ্ঞান হবার পরও, কোথায় কিভাবে আছেন সব জেনেও যখন তিনি ধীরভাবে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিলেন, তখন গজনীর সৈন্যবাহিনীর অনেকেই অবাক হয়ে গেল। তারা অল্পদিন ভারতে এলেও

এদেশের গোঁড়ামি এবং জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের এটুকু পরিচয় পেয়েছে বৈকি। এদের আর যা-ই দোষ থাক—প্রাণের মায়া নেই, ধর্ম বিসর্জন দেওয়ার থেকে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াটা এদের পক্ষে ঢের সহজ।

তবে কি—কেউ কেউ এমন কথাও ভাবতে শুরু করলেন—তবে কি পৃথ্বীরাজ চৌহান বড় যোদ্ধা হ'লেও আসলে কাপুরুষই ?...

অবাক হয়েছিলেন মুহম্মদ ঘুরীও। তিনি প্রত্যহই বন্দীর খবর নিতেন। তাঁরও ভয় ছিল যে জ্ঞান হবার পর বন্দী একটা ভয়ানক কাণ্ড কিছু ক'রে বসবে। যখন শুনলেন যে সেসব কিছুই করেন নি পৃথ্বীরাজ—তখন বেশ একটু চিন্তিত হলেন। তিনি নির্বোধ নন—পৃথ্বীরাজকে কাপুরুষ ভাববার মতো বোকামি তাঁর ছিল না।

পৃথ্বীরাজের জ্ঞান হবার পরও অনেক দিন অপেক্ষা করলেন মুহম্মদ ঘুরী। তারপর—তিনি সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, তাঁবুর মধ্যেই চলাফেরা করছেন খবর পেয়ে—একদিন পৃথ্বীরাজকে তাঁর সামনে আনতে হুকুম দিলেন। একটু যেন ভয়ে ভয়েই দিলেন। নির্দেশ দিলেন যে কোথাও কোন অস্ত্রশস্ত্র ওঁর পোশাকের মধ্যে লুকোনো আছে কিনা দেখে, বেশ কড়া পাহারায় ঘিরে যেন আনা হয়। অন্ধকেও বিশ্বাস নেই তাঁর।

পৃথ্বীরাজ এলেন কিন্তু শান্ত ভাবেই। পরাজিত নৃপতির প্রতি সৌজন্য-বশত মুহম্মদ ঘুরী তাঁর হাতের বাঁধন খুলে একটা আসন দিতে বললেন; কিন্তু রক্ষীদের ইঙ্গিত করলেন যথেষ্ট সতর্ক থাকতে। পৃথ্বীরাজ টের পেলেন না—তাঁর চারিদিকে অন্তত কুড়িটি তরবারি বর্শা বল্লম উদ্যত রইল।

পৃথ্বীরাজ অবশ্য করলেনও না কিছু। নির্দিষ্ট আসনে বিনত ভাবেই বসলেন। মুহম্মদ ঘুরীর কুশল প্রশ্নের জবাবও দিলেন বেশ ধীর ভাবে। এমনটা আদৌ আশা করেন নি মুহম্মদ ঘুরী; এ তাঁর হিসেবের সঙ্গে একদম মিলছে না...অথচ মানুষের হিসেবে তো তাঁর কখনও ভুল হয় না এমন—! অবশেষে আর কৌতূহল চাপতে পারলেন না ঘুরী; প্রশ্ন করলেন, 'আপনার আহারাদির জন্য ব্রাহ্মণ পাচক খোঁজ করেছিলাম, পাই নি। অবশ্য হিন্দু দুজনকে রাজী করতে পেরেছি। আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?'

পৃথ্বীরাজ একটু হাসলেন। বললেন, 'বন্দীদশা হ'ল আপৎকাল। এসময়ে

কোন নিয়মই খাটে না। আমি আপনার অধীন, আপনার অন্ন গ্রহণ করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আচার-নিয়মের কথা ভাবলে চলবে কেন ?'

তখন কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেন মুহম্মদ ঘুরী। বললেন, 'আপনার মতো সৎবুদ্ধি সকলের থাকে কৈ ? আমরা আর একজন হিন্দু সেনাপতিকেও বন্দী করেছিলাম। তিনি কিছুতেই—স্বজাতির রান্নাও খেতে রাজী হলেন না। উপবাস ক'রে প্রাণ দিলেন, তবু মুখে কিছু তুললেন না।'

বারেকের জন্য পৃথ্বীরাজের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়েছিল কি ?

হ'লেও মহম্মদ ঘুরী তা টের পেলেন না। পৃথ্বীরাজ মাথাটা ঈষৎ নিচু ক'রে শান্তভাবেই বললেন, 'তিনি ভুল করেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ ঠিক বুঝতে পারেন নি। আত্মহত্যা সকল অবস্থাতেই মহাপাপ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সুখ দুঃখ সবই ভোগ করার জন্য। সবটাই সহজভাবে ঈশ্বরের দান বলে মাথা পেতে নেওয়া উচিত। আত্মহত্যা করলে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতিই অবিচারের অভিযোগ করা হয়—ঈশ্বরকে অপমান করা হয়।'

'কেয়াবাত ! কেয়াবাত !' অজস্র সাধুবাদ দিয়ে উঠলেন মুহম্মদ ঘুরী। সামনে এসে পৃথ্বীরাজের হাত দুটো ধরে বললেন, 'আপনাকে বীর যোদ্ধা ও নিপুণ শাসক বলেই জানতাম। এখন দেখছি পাণ্ডিত্য এবং নির্মল বিচার-বুদ্ধিতেও কম যান না। আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আমার অনুচররা, তার জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। এখন এ অবস্থায় যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আপনাকে দেওয়া সম্ভব আমরা তা দেবার চেষ্টা করব। আপনিও দয়া ক'রে আপনার যখন যা প্রয়োজন জানাবেন।'

পৃথ্বীরাজ তেমনি শান্তভাবেই ঘাড় নেড়ে বললেন, 'যে আজ্ঞে, জানাব।'

এই হ'ল ওঁদের পরিচয়ের সূত্রপাত।

এরপর যত দিন যেতে লাগল পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন মুহম্মদ ঘুরী। এমন নির্মল সহজ বুদ্ধি, এমন সৌজন্য, এমন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া—তিনি আর দেখেন নি। এতকাল মধ্য এসিয়ার পার্বত্য যাযাবর লোকদের সঙ্গেই তাঁর কারবার—তারা শিক্ষা সংস্কৃতি কোন কিছুরই ধার ধারে না, তারা শুধু জানে মানুষ মারতে, লুঠ করতে, ঘর জ্বালাতে—শিক্ষিত সংস্কৃতিবান স্থিরবুদ্ধির লোক কেমন হয় তা তাঁর জানা ছিল না, তাই তিনি আরও অবাক হয়ে গেলেন পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মিশে। শেষে

এমন হ'ল যে প্রতিদিন কিছুক্ষণ ধ'রে পিথৌরার সঙ্গে গল্প না করলে চলে না তাঁর। শুধু আনন্দ নয়—পিথৌরার সাহচর্যে উপকারও হ'ত তাঁর, রাজ্য-শাসন ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু উপদেশ এবং জ্ঞানও লাভ করতেন।

দেশে ফেরবার আগে ওঁকে এখানে রেখে যাবেন, হয়ত আগে এই সংকল্পই ছিল ঘুরীর; কিন্তু যাবার সময় আর সে ইচ্ছা রইল না। তিনি পৃথ্বীরাজকে নিয়েই দেশের দিকে রওনা হলেন। পৃথ্বীরাজ এখন ঘোড়ায় চড়তে পারেন। তাছাড়া তিনি মালিককে না-বলে পালাবেন না কথা দিয়েছেন—সেজন্য খুব কড়া পাহারারও দরকার নেই। তবু মুলতান ছাড়বার আগে বোধ হয় একটু বিবেকে লেগেছিল—জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওঁকে মুহম্মদ ঘুরী, 'আপনি কি মুক্তি চান? বলুন, তা হ'লে আমি আপনাকে দিল্লীতে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করি।'

'লাভ কি তাতে?' ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিলেন রায়পিথৌরা, 'আজ আর সেখানে আমার কি আছে?······রাজত্ব নেই, থাকলেও আমার কোন কাজে আসত না; আমি অন্ধ। আত্মীয়রা কেউ বেঁচে আছে কিনা জানি না, যদিই বা কেউ থাকে তারা আর আমাকে গ্রহণ করবে না—আমি বিধর্মীর শিবিরে আছি, তাদের অন্ন খেয়েছি।'

'তাহলে আর আপনার স্বাধীনতায় কাজ নেই।' হেসে ওঁর হাত ধরে বলেছিলেন ঘুরী, 'আপনি আমার কাছেই থাকুন। গলগ্রহ হয়ে থাকবেন এমনও ভাববেন না,—আমি আপনাকে সাগ্রহে স্বেচ্ছায় সমাদর ক'রেই রাখছি!'

এরপর পৃথ্বীরাজ যেন মুহম্মদ ঘুরীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন, প্রিয়তম বন্ধু হয়ে উঠলেন ওঁর। অধিকাংশ লোকই জানতে পারে নি যে সুলতানের নিত্যসঙ্গী ঐ লোকটিই তাঁর জীবনের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজ চৌহান। সেই জন্যেই ইতিহাসেও এ কথাটার উল্লেখ এত বিরল।

এই ভাবেই চলতে চলতে এল আঁদখুইয়ের যুদ্ধ। আর সেই পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে চারিদিকে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। মুহম্মদ ঘুরী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ওদিককার গোলমাল মিটিয়ে গজনীতে নিজের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ভারতে এলেন তাঁর পুরনো দুশমন

খোকারদের দমন করতে। কিন্তু এইখানে এসেই তিনি ঠেকে গেলেন বিষম রকম। ওঁর অভিযানের খবর পেয়ে খোকাররা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে এমন একটা জায়গায় আশ্রয় নিলে যে তাদের পরাজিত করা তো দূরের কথা, তাদের কাছে পৌঁছনোই শক্ত হয়ে উঠল। মুহম্মদ ঘুরীর বাহিনী পার্বত্য যুদ্ধে খুবই নিপুণ—তারাও ঐরকম অঞ্চলেরই লোক—তবু তারাও সে পথে যেতে পারল না। একটি মাত্র সংকীর্ণ বন্ধুর পথ, তাতে পাশাপাশি দুজনের বেশি যেতে পারে না—আর সেইভাবে যাবার চেষ্টা করলেই শত্রুরা একে একে বধ করতে থাকে অতি সহজে। পাহাড়ের ওপর থেকে আগুন ফেলেও পুড়িয়ে মারে ওরা।

ঘুরী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

মন্ত্রণাসভা ডাকা হ'তে লাগল ঘন ঘন, কিন্তু কেউই কোন সুবুদ্ধি দিতে পারে না। অবশেষে একদিন প্রায় হতাশ হয়েই—কতকটা আপনা-আপনিই বলে উঠলেন মুহম্মদ ঘুরী, 'পিথৌরা, তুমি আমাকে একটা বুদ্ধি দাও। আর তো আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না!'

পিথৌরা আজকাল প্রায়ই এঁদের মন্ত্রণাসভাতে এসে বসেন, কিন্তু নিঃশব্দেই বসে থাকেন সাধারণত। ওঁর কাছে কেউ কোনদিন মন্ত্রণা চায়ও না—উনিও কখনো নিজে থেকে দেন না। হাজার হোক পরাজিত এবং রাজা—অন্তরে অন্তরে এদের হিত-কামনা করবে এটা আশা করা অন্যায়, ঘুরীর লোকেরাও কিছু তা করত না! শুধু এইটুকু জানত যে তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। তাই মন্ত্রণাসভায় এসে বসাতে কখনও কেউ আপত্তি করে নি।

আজও সত্যি-সত্যিই কিছু সুমন্ত্রণা আশা ক'রে কথাটা বলেন নি মুহম্মদ ঘুরী, হয়ত কোন উত্তরও আশা করেন নি—কিন্তু পিথৌরা অপ্রত্যাশিত ভাবেই উত্তর দিলেন। বললেন, 'পথ একটা কিন্তু আছে শাহানশাহ্—সে পথে শত্রু যাবে এমন আশঙ্কা ওদের নেই, তাই সম্ভবত পাহারাও তেমন রাখবে না। সেই পথে যদি হঠাৎ গিয়ে পড়তে পারেন—ওরা প্রস্তুত হবার আগেই—তো কাজ হ'তে পারে!'

'পথ আছে! তাই নাকি! কোথায়? কোথায়? কোন্ দিকে?' একসঙ্গে বহু কণ্ঠে প্রশ্ন ওঠে।

'বল নি কেন এতদিন পিথৌরা ?' মুহম্মদ ঘুরীর কণ্ঠে সাগ্রহ অনুযোগ। 'কোন্ দিকে সে পথ ? তুমি দেখাতে পারবে ?'

'বিনা প্রশ্নে বিনা আমন্ত্রণে রাজকার্যে মন্ত্রণা দিতে গেলে—বিশেষত আমার যা অবস্থা—আপনারা সন্দেহের চোখে দেখতেন, সেই জন্যই চুপ ক'রে ছিলুম। আর পথ দেখানো—? আমার সে অবস্থা তো রাখেন নি আপনারা!' একটু হাসলেন পৃথ্বীরাজ।

তা বটে! লজ্জিত মুহম্মদ মাথা নামালেন। অপর সকলেরও কতকটা আশাভঙ্গ হ'ল। একজন সেনানায়ক তো একটু রুষ্ট হয়েই বললেন, 'তাহ'ল আর সে কথা তুলেই বা লাভ কি!'

তবে সকলে তাঁর মতো নয়। প্রধান উজীর বললেন, 'না দেখাতে পারলেও উনি হয়ত সন্ধান দিতে পারেন—'

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দাও পিথৌরা। তাই দাও।' ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন মুহম্মদ ঘুরী।

'পথ এমন কিছু গুপ্ত পথও নয়। সে পথ আপনাদের চোখের সামনেই পড়ে আছে, মাথাতে ঢোকে নি। এই পাহাড়ের ওদিকে একটু উপত্যকা মতো আছে দেখেছেন বোধ হয়—'

'কিন্তু সেদিকটা তো একেবারে খাড়া!' অসহিষ্ণু সেনানায়ক আবার বলে ওঠেন।

'আঃ, তুমি থামো না গিয়াস বেগ।' ধমক দেন মুহম্মদ ঘুরী।

'হ্যাঁ, খাড়া ব'লেই সেদিকে ওদের অতটা নজর থাকবে না। কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি ছোট পাহাড়ী নদী নেমেছে দেখবেন। বর্ষায় তার স্রোত হয় দুর্বার, কিন্তু এখন একেবারেই শুকনো। সেই নদীপথের খাত বেয়ে ওঠা হয়ত একেবারে দুঃসাধ্য হবে না। একটি ছোট দল যদি রাতের আঁধারে এগিয়ে উঠতে পারে, ভোরবেলা যদি অতর্কিতে হানা দেয় ওখানে, তাহ'লে ওদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে তাতে এদিক দিয়ে বাকী সৈন্যের উঠে যাওয়াটা সহজ হয়ে উঠবে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

পৃথ্বীরাজের কথা শুনে সকলে লাফিয়ে উঠলেন। আশ্চর্য, খাড়া পাহাড় বলে কেউ ভাল ক'রে দেখেও নি ওদিকটা। এখন গোপনে চর পাঠিয়ে দেখা গেল পৃথ্বীরাজের কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে [illegible] পাহাড়ী

নদী, কিন্তু বহুদিনের খরস্রোত পাহাড় ক্ষইয়ে জল নামবার পথটাকে খানিকটা ঢালু ক'রে দিয়েছে। এবার সকলে পৃথ্বীরাজকে ঘিরে বসলেন। পৃথ্বীরাজ শুধু ঐটুকু তথ্য যুগিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। পাহাড়-পর্বত পথঘাট —এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে তাঁর এমন অসাধারণ জ্ঞান তা কে জানত! তিনি অন্ধ হ'লেও আন্দাজে আন্দাজে পাথরে এঁকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় কি আছে, কোন্ পথে এদের যেতে হবে, কোথায় কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা।

এরপর খোকারদের জব্দ করা মুহম্মদ ঘুরীর পক্ষে কিছু শক্ত হ'ল না। শত্রুদের নির্মমভাবে দমন ক'রে—সমস্ত পাঞ্জাবকে আবার পদানত ক'রে বিজয়গর্বে নিশ্চিন্ত হয়ে গজনীর পথ ধরলেন মুহম্মদ ঘুরী। এবারও কিন্তু পৃথ্বীরাজকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন চাইল না। তিনি মুখে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আর বেশীদিন তোমাকে ধরে রাখব না পিথৌরা, আমি ওদিককার একটা বন্দোবস্ত ক'রেই তোমাকে নিয়ে আবার এদেশে ফিরব; কাবুল কি কান্দাহারে তোমার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরী করিয়ে হিন্দু দাসদাসী আনিয়ে মনের মতো ক'রে সাজিয়ে দেব তোমার ঘর—তারপর আমিই তোমার ঘরে অতিথি হব এসে। কেমন?'

পৃথ্বীরাজ হাসলেন শুধু।

পথে দেরি করতে কখনই অভ্যস্ত নন মুহম্মদ, বিশেষত এবার তো যাওয়া-আসার পথে ঝড়ের মতোই সবাইকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন; কিন্তু হঠাৎ দামিয়াকে পৌঁছে কি হ'ল—হুকুম দিলেন, মাস-খানেক এখানেই থাকবেন তিনি। সেই ব্যবস্থাই হ'ল। কিছু কিছু লোকজন এগিয়ে গেল, বাহিনীর অর্ধেকটা রইল তাঁর সঙ্গে।

পৃথ্বীরাজ প্রশ্ন করলেন, 'হঠাৎ বিশ্রামের ইচ্ছা হ'ল কেন শাহানশা?'

'শরীরটা ভাল নেই পিথৌরা। কাউকে ব'লো না কথাটা, শরীর খারাপ হয়েছে শুনলেই মৃত্যু আসন্ন ধরে নিয়ে এখনই আমার সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি বেধে যাবে। আমাদের তাই মরবার আগে শরীর খারাপ হওয়া নিষেধ। জায়গাটা ভাল—এখানে দুদিন থেকে বিশ্রাম করব, ফুর্তি করব—এই কথাই বলেছি সকলকে।'

[illegible] বললেন, 'অবশ্য আমার আর বেশী দিন [illegible]

এখন মেহেরবান খোদার দয়াতে কোনমতে গজনী পর্যন্ত পৌঁছে এই গৃহ-বিবাদটা বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করতে পারলে আর কোন ক্ষোভ থাকে না।

পৃথ্বীরাজ চমকে উঠলেন যেন কথাটা শুনে। যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখ: 'কেন, কেন, একথা বলছেন কেন?' একটু যেন বেশী ব্যগ্র—বরং বলা চলে ব্যাকুল—ভাবেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

এই ব্যাকুলতা ও বিবর্ণতাকে বন্ধুর স্বাভাবিক উদ্বেগ ও আন্তরিকতা ব'লে চিনতে না পারবার কোন কারণ নেই। মুহম্মদও তা চিনতে পারলেন। তিনি খুশী হয়ে—একটু সস্নেহ কণ্ঠেই বললেন, 'কেন বলছি তা আমিও ঠিক জানি না বন্ধু। শুধু ভেতরে ভেতরে যেন এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হচ্ছে যে আর বেশী দিন আমার বাকী নেই এ দুনিয়াতে। এ ধারণার কোনও বাহ্য কারণ আমিই খুঁজে পাচ্ছি না—সামান্য একটু শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া। কে জানে, হয়ত বা সেই জন্যেই—

পৃথ্বীরাজ আর কোন কথা কইলেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন শুধু।

সেইদিনই অপরাহ্ণে হঠাৎ মুহম্মদ ঘুরী প্রস্তাব করলেন, 'চল বন্ধু, একটু বেড়িয়ে আসি।'

আবারও একটু যেন চমকে উঠলেন পৃথ্বীরাজ। আবারও একটু অকারণ ব্যগ্রতা দেখা গেল তাঁর কণ্ঠে। কিন্তু মুহম্মদ তা লক্ষ্য করলেন না। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ঐ যে দূরের পাহাড়টা আকাশের কোলে মিশেছে, ঐখানে পাহাড়ের তলায় ঐ যে দেখছ ছোট্ট সরু সবুজের রেখা—সেও* গাছ আর আঙুরলতায় জড়াজড়ি—ওখানে আছে চমৎকার ছোট্ট একটি পাহাড়ে ঝরনা। জায়গাটি ভারী ভাল লাগে আমার। আসলে ওর লোভেই এখানে তাঁবু ফেলেছি। একটু একটু ক'রে পাহাড়ের ওধারে যখন সূর্য অস্ত যায়—সন্ধ্যার আঁধার আসে ঘনিয়ে, তখন যেন মনে হয় খোদা ঐখানেই তাঁর বেহেস্তের একটি টুকরো দিয়েছেন খসিয়ে। ওখানে বসলে তখন রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য, জয়-পরাজয় সব কিছু কোন্ আঁধিয়ারে তলিয়ে যায়—শুধু এক অপার্থিব আনন্দে মন যায় ভরে।'

---

* আপেল। সেব্ বা সেও বলা হয় পাঞ্জাবে।

নিজের বলবার ঝোঁকে বলে যাচ্ছিলেন মুহম্মদ, এতক্ষণে নজরে পড়ল পৃথ্বীরাজের মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে উঠেছে—

মুহূর্তের মধ্যে অনুশোচনায় ভরে গেল তাঁর মন, পৃথ্বীরাজের হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'মাপ করো ভাই, তুমি যে এসব কিছুই দেখতে পাবে না—অতটা আমার খেয়ালই ছিল না। তুমি থাক, আমি একাই যাই—'

"না না!' পৃথ্বীরাজ গলায় অস্বাভাবিক একটা জোর দেন, 'তাতে আমার কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আপনি আসলে কবি সুলতান—যোদ্ধাও নন, দিগ্বিজয়ীও নন। আপনি যদি এইভাবে বর্ণনা দিয়ে যান তাহলেই আমার দেখার কাজ চলবে।'

'বেশ বেশ. তাহলে তাই চলো।' খুশী হয়ে বললেন মুহম্মদ, 'ঐখানে জলের ধারে একটা গাছতলায় বসে কিছু কাব্য-চর্চাই করা যাক চল। আমি তোমাকে শোনাই আমাদের দেশের কবিদের রুবাই আর গজল—তুমি শোনাও তোমার দেশের চারণদের রচিত কীর্তিগাথা আর ভজন।'

পৃথ্বীরাজ দীর্ঘকাল চোখে কিছু দেখেন না বলে তাঁর কান খুব সজাগ ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি যাত্রা করার একটু পরেই বললেন, 'সঙ্গে আর কাউকে নিলেন না সুলতান?'

'না না। দরকার নেই। আমরা যাচ্ছি কাব্য-চর্চা করতে—সেখানে কি অরসিকদের নিয়ে যেতে আছে? মাইনে করা দেহরক্ষীরা গেলে ওখানকার শান্তিভঙ্গ হবে, খোদা নারাজ হবেন। আর প্রয়োজনই বা কি? তোমারও খাপে তলোয়ার আছে, আমার তো আছেই। ঘুরের মুহম্মদ-বিন-সাম আর হিন্দুস্থানের রায় পিথৌরার হাতে তলোয়ার থাকতে দুনিয়ার কোন দুশমন কাছে ঘেঁষবে না।'

ওঁরা যখন ঝরনার ধারে আপেল-কুঞ্জে গিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, তখন সূর্য পাহাড়ের ওপারে ঢলে পড়লেও পিছনের উপত্যকায় আঁধার নামে নি—তা তখনও রৌদ্রোজ্জ্বল। সেদিকে চেয়ে মুগ্ধকণ্ঠে ঘুরী বললেন, 'এই সব জায়গায় এলে বাকি তামাম দুনিয়ার সব কিছু ঝুট্, সব কিছু অর্থহীন মনে হয়। এখানে এলে মনে হয় এমনি জায়গায় মরতে পারলেও সুখ আছে। এখানে যে মরবে সে যত পাপই করুক না কেন তার দোজখে যাবার ভয় নেই—খোদা তাকে ক্ষমা ক'রে নিজের পায়ের তলায় টেনে নেবেনই!'

ততক্ষণে ঘোড়া থেকে নেমে তাঁরা দুজনেই নিজেদের ঘোড়া দুটো গাছের ডালে বেঁধে ফেলেছেন। মুহম্মদ হাত বাড়িয়ে পৃথ্বীরাজের হাতটা ধরে বললেন, 'চল পিথৌরা, কোথাও গিয়ে বসি। আমার হাতটা ধর—অচেনা রাস্তা, ঠোক্কর খাবে।'

কিন্তু পৃথ্বীরাজ নড়লেন না। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'দাঁড়ান শাহানশা, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। বহুদিন ধরেই এমনি নিরিবিলি একটু অবসর খুঁজছিলুম, মা চণ্ডী দয়া ক'রে আজ তা মিলিয়ে দিয়েছেন!'

বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন মুহম্মদ, পৃথ্বীরাজের গলার আওয়াজটাও কেমন যেন গোলমেলে ঠেকল! তিনি একটু ঔৎসুক্যের সঙ্গেই বললেন, 'ব্যাপার কি রাজা, কী এমন তোমার জরুরী কথা যা বলবার জন্য এত ভণিতা, এত দিন-ক্ষণ দেখা?'

'শাহানশা, বহুদিন ধরে আপনি আমাকে বলেছেন—যদি কোন প্রার্থনা থাকে আপনার কাছে নিঃসঙ্কোচে জানাতে, আপনি তা নিশ্চয়ই মঞ্জুর করবেন। এমন কি আমার স্বাধীনতা, মায়—আজমীঢ়ের সিংহাসন পর্যন্ত—চাইলে দেবেন!'

'মনে আছে বৈকি পিথৌরা। মুহম্মদ ঘুরীর স্মৃতিশক্তি অত ক্ষীণ নয়। কথা দিয়েছি, যা প্রার্থনা করবে—যদি অসাধ্য না হয়—নিশ্চয় মঞ্জুর করব।'

'কথা এখনও ঠিক আছে?'

'কথা আমি একবারই দিই পিথৌরা—আর তা ঠিকই থাকে বরাবর। তুমি চাও তো কুতবউদ্দীন আইবককে সরিয়ে দিল্লীর মসনদই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি।'

'না শাহানশা—কোন রাজ্যখণ্ড চাইবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করতুম না। আমি তো আপনাকে বলেছি—ভবিষ্যৎ বলতে আমার আর কিছু নেই। আমার এখন আছে শুধু অতীত। আর সেই অতীতের সূত্র ধরেই একটি মাত্র বাসনা আছে জীবনে—সেটি হ'ল প্রতিশোধ নেওয়ার।'

ঠিক বুঝতে পারলেন না মুহম্মদ ঘুরী। একটু বিহ্বলভাবেই বললেন, 'প্রতিশোধ? অতীত? কী বলছ পিথৌরা ঠিক বুঝতে পারছি না! ঠিক কী চাও তুমি বল তো? তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও?'

'না শাহানশা, সে ইচ্ছা থাকলে বহুদিন আগেই করতে পারতুম। সে

সুযোগ অনেকবার এসেছে। আপনি স্নেহ ক'রে বিশ্বাস ক'রে আমাকে বহুদিন আগেই অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েছেন, নিজের শোবার ঘরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সে যে কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই—আপনি দয়া ক'রে রাজী হোন।'

'তুমি যুদ্ধ করতে চাও? আমার সঙ্গে? দ্বন্দ্বযুদ্ধ?' অকস্মাৎ হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন মুহম্মদ ঘুরী, সে হাসি নির্জন নিস্তব্ধ শৈলসানুতে আহত হয়ে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে বহুদূর পর্যন্ত সেই পার্বত্য উপত্যকায় ছড়িয়ে গেল—নিমেষের মধ্যে। সে শব্দে একঝাঁক পাখি ভয় পেয়ে পাহাড়ের আশ্রয় ছেড়ে উড়ে পালাল। 'কিন্তু তুমি কি জান না পিথৌরা—ওধারে ইরান তাতার থেকে এধারে হিন্দুস্তান পর্যন্ত তলোয়ারের যুদ্ধে আমাকে হারাতে পারে এমন কেউ নেই?'

'আমার সঙ্গে তো কখনও আপনার সামনা-সামনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় নি সুলতান, কাজেই হিন্দুস্তানের কথাটা তোলা আপনার ঠিক হ'ল না। আমাকে হারালে কথাটা আপনার ঠিক হবে।'

'কিন্তু তুমি তো অন্ধ। তুমি লড়বে কেমন ক'রে?'

'সেই জন্যই তো এতদিন অপেক্ষা করেছি মুহম্মদ-বিন-সাম। প্রতিদিন একটু নিভৃত অবসর পেলেই একাগ্র সাধনা করেছি, শব্দের উপর নির্ভর ক'রে নির্ভুল হিসাবে শত্রুর হাতের অবস্থান জানবার। অতি কঠিন কাজ—কিন্তু অপেক্ষাও করেছি আমি দীর্ঘকাল। আমি কোন অন্যায় সুযোগ নেব না, অপরকেও নিতে দেব না—এই হ'ল বীরের যুদ্ধ সুলতান। আমি আপনাকে হত্যা করতেও যেমন চাই না—তেমনি আত্মহত্যা করারও ইচ্ছা নেই আমার। অন্তত প্রতিশোধ নেবার আগে নয়।'

'তুমি নির্বোধ পিথৌরা। আমি তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি, তোমার অসহায় আহত অবস্থার সুযোগ নিয়েছি—তুমি যদি আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার শোধ তুলতে, কেউ তোমাকে দোষ দিত না।'

'আর কেউ না দিক আমি দিতাম। সে কাজ করা তো দূরে থাক, ভাবলেও আমি নিজের চোখে ছোট হয়ে যেতাম। আপনাদের গজনীর বীরধর্মের ধারণা আর হিন্দুস্তানের বীরধর্মের ধারণা হয়ত এক নয় শাহানশা।'

শেষের কথাতে মুহম্মদ ঘুরীর গৌরবর্ণ মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। তিনি

কোষ থেকে নিজের তলোয়ার বার ক'রে বললেন, 'বেশ, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর, বার করো তোমার তলোয়ার। কিন্তু এখনও ভেবে ছাখ—যুদ্ধটা একটু অসমান হচ্ছে না ?'

'না সুলতান। একটু পরেই বুঝবেন যে সমানে সমানে লড়বার যোগ্যতা অর্জন না ক'রে এ দুঃসাহসিক কাজে নামি নি আমি !'

আরম্ভ হ'ল লড়াই। একদিকে মধ্য এসিয়ার সবচেয়ে বড় যোদ্ধা আর একদিকে এক অন্ধ। কিন্তু কিছু পরেই মুহম্মদ বুঝলেন যে সত্যিই বৃথা অহঙ্কার করেন নি রায় পিথৌরা—তাঁর শিক্ষা ও অভ্যাস প্রায় নিখুঁত। বরং অসুবিধা হ'তে লাগল মুহম্মদ ঘুরীরই। কারণ ওধারে এখনও প্রচুর দিবালোক থাকলেও এখানটায় পাহাড়ের আড়াল ও আপেল বনের শাখাপ্রশাখায় আন্দোলিত আঙুরলতার ছায়া প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার সৃষ্টি করেছে! তবে কতকটা লজ্জাতেই সে কথাটা বলতে পারলেন না মুহম্মদ ঘুরী। অন্ধের কাছে অন্ধকারের দোহাই দিতে সঙ্কোচে বাধল।

প্রথমটায় কিছু অবহেলাতেই লড়তে শুরু করেছিলেন ঘুরী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পূর্ণ মনোযোগ দিতে হ'ল, বাধ্য হয়ে। শেষে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হ'ল তাঁকে। বুঝতে পারলেন যে সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর সামনে —তিনি যদি মারতে না পারেন তো মরতে হবে তাঁকে।

বহুক্ষণ লড়াই চলল। চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, তার জন্য নয়—কিন্তু কতক্ষণ চালাবেন মুহম্মদ ঘুরী এ লড়াই ? এ কেমন মানুষ যে ক্লান্ত হয় না কিছুতেই—হারও মানে না।

প্রতিদিন যে অভ্যাস করেছে—দীর্ঘকাল ধরে, তার সঙ্গে ধৈর্যের পরীক্ষায় জেতা কঠিন। দুজনেই সমান যোদ্ধা; কিন্তু মুহম্মদের এভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় নি অনেক কাল। তাঁর অভ্যাস গেছে মরচে ধরে। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটু একটু ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে সে ক্লান্তি যেন তাঁর হাত ও পা দুটোকেই দুর্বল ক'রে তুলল। অথচ পৃথ্বীরাজ নির্বিকার, তাঁর হাত-পা যেন যন্ত্র, মুখেও একটু ক্লান্তি নেই। পরিশ্রমের চিহ্ন আছে শুধু ঘাম, বাঁ হাতে মধ্যে মধ্যে তা মুছে নিচ্ছেন। শেষে বুঝলেন ঘুরী যে এবার সত্যিই তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে—মনে মনে নিজের ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন। মনে পড়ল গজনীর কথা, নিজের আত্মীয়-পরিজনের কথা,

বিপুল সাম্রাজ্যের কথা।

মুহূর্তকাল—কিন্তু সেইটুকু অন্যমনস্কতার সুযোগেই পৃথ্বীরাজের তরবারি আমূল বসে গেল মুহম্মদ ঘুরীর বুকে।

মুহম্মদ একটু স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, একটু টললেন, হাত থেকে তলোয়ারটা পড়ে গেল—তারপর তিনিও লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

'পিথৌরা—রায় পিথৌরা, তোমার প্রতিশোধ পূর্ণ হয়েছে!' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন মুহম্মদ ঘুরী।

পৃথ্বীরাজও ততক্ষণে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তিনি এবার হাতড়ে হাতড়ে পাশে এসে বসলেন।

'শাহানশা, যদি একটু একা থাকতে পারেন তো আমি শিবিরে গিয়ে হাকিম ডাকি!'

'না না—অতক্ষণ তর সইবে না আমার। আমার আর সময় বেশী নেই পিথৌরা! এ আল্লার মর্জি—আমি এইটেই কিছুদিন ধরে মনে মনে অনুভব করছিলাম।'

'আর কি কিছুই বলবার নেই আমাকে?'

'আছে। তুমি যদি পারো তো পালাও এইবেলা। আমার লোকজনরা জানতে পারবার আগেই। নইলে বড় নির্যাতন করবে। আর—আর পার তো আমাকে ক্ষমা ক'রো। জানি না খোদার ক্ষমা পাব কি না!'

বলতে বলতেই মুহম্মদ ঘুরীর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল চিরকালের মতো।

পিথৌরা অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম সুলতান। তুমিও আমাকে ক'রো!'

ততক্ষণে ওধারের উপত্যকাতেও অন্ধকার নেমেছে। কিন্তু পিথৌরা তা টের পেলেন না। তাঁর চোখে যে চির অন্ধকার।

অভয়-বর

বর্তমান লাহোরের উপকণ্ঠে পীর আলি হাজিরী সাহেবের দরগার কাছে যে জায়গাটাকে এখন দাতা গঞ্জবক্স বলে—আড়াই তিন শ' বছর আগে ওটার নাম ছিল তালবাঘা। ওখানকার অধিবাসীরা স্থানটার একটু গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য বলত কাটরা-তালবাঘা। যদিচ কাটরা বা বিপণি-শ্রেণী ওর ধারে-কাছে কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ।

নিতান্তই ঘিঞ্জী পল্লী তালবাঘা—খাপরার চালের বস্তী। কয়েক ঘর হত-দরিদ্র জোলা-তাঁতির বাস। মাথায়-মাথায় চাল-ঠেকে-থাকা কয়েকটি মেটে ঘরে দিন-রাত ঠকাঠক মাকু চালাবার আওয়াজ ওঠে। উদয়াস্ত খেটেও কোনমতে দিন গুজরান করাই ওদের বড় সমস্যা। সুখে থাকার কথা ভাবাও অন্যায় বলে মনে করত ওরা। অন্য রকম ভাবে বাঁচার কথা ওদের তেমন জানাও ছিল না। ঐ পল্লীর বাইরে যে এক বিপুল বিস্তৃত শ্যামা বসুন্ধরা পড়ে আছে, তার খবরও ওরা রাখত না। রাখা সম্ভব ছিল না। রাজা বাদশাদের খবর তো রাখতই না।

ওরাও যেমন রাখত না—শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিমও তেমনি রাখতেন না,—ওদের খবর। এমন জায়গা যে আছে, এত কদর্য ও দীন পল্লী—এমন একান্ত নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও যে মানুষ বাস করে, তা তিনি জানতেন না। জানবার সুযোগও হয় নি কোনদিন। সম্রাট আলমগীরের প্রপৌত্র, বাহাদুর শাহের পৌত্র—বিখ্যাত ধনী আজিম-উশ-শানের জ্যেষ্ঠ পুত্র—বাবরশাহী তখ্‌তের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী—তাঁর সে সুযোগ হবেই বা কেন?

দরিদ্র পল্লী তিনি চোখে দেখেছেন বৈকি! কিন্তু সে তো দূর থেকে! রাজধানী থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে যাবার পথে কিম্বা আগ্রা-লাহোর বা সুদূর বাংলা মুলুক যাবার রাস্তায়—এমন কি খাস রাজধানী দিল্লী শহরেই ঢের অপকৃষ্ট বস্তী দেখেছেন তিনি কিন্তু সে ঐ দূর দিয়ে যেতে যেতেই দেখেছেন। হাতীর পিঠে সোনার হাওদার ওপর কিংখাপে মোড়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধনিমীলিত ভবিষ্যতের-সুখ-স্বপ্নে বিভোর তন্দ্রাতুর চোখ দুটি

মেলে—অথবা তেজী তুরুক সওয়ারে চেপে ছুটে যেতে যেতে নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই চেয়ে দেখেছেন হয়ত। আজ বুঝছেন যে তাতে কিছুই জানা যায় নি এদের অবস্থা। মানুষ যে এমন ভাবে বেঁচে থাকে—এমন ভাবে থেকেও যে বাঁচতে চায় মানুষ—এটা কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করেন নি তিনি। আজ বুঝছেন—বাবার মুখে বহুবার শোনা সম্রাট আলমগীরের সেই গল্প। আগা দানেশমন্দ খাঁর মুখে শুনেছিলেন তাঁর বাবা আজিম-উশ-শান। আলমগীর বাদশা হবার পর তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক ছুটে এসেছিলেন সুদূর পশ্চিম সীমান্ত থেকে কিঞ্চিৎ ইনামের আশায়। তার বদলে পেয়েছিলেন তীব্র ভৎর্সনা। সম্রাট স্পষ্টই তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, রাজপুত্র বা ভাবী রাজার উপযুক্ত কোন শিক্ষাই তিনি দেন নি আলমগীরকে। যে ছেলে হয়ত একদা কোটি কোটি প্রজার শাসক হবে—তাকে শিক্ষা দেবার মতো কোন ধারণাও নেই তাঁর। দুনিয়া তো দূরের কথা—এই দেশটা সম্বন্ধেও ওঁকে ওয়াকিবহাল করতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে আগা দানেশমন্দ প্রশ্ন করেছিলেন আলমগীরকে যে, রাজপুত্রদের কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা পাওয়া তিনি উচিত মনে করেন? আলমগীর জবাব দিয়েছিলেন—যে রাজা বা সম্রাট হবে, পৃথিবীর অপরাপর দেশ বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। তবু সেও পরের কথা—কোটি কোটি প্রজার সুখ-দুঃখের ভার যার হাতে এসে পড়বে তার উচিত সর্বাগ্রে জানা সেই প্রজাদের আসল অবস্থাটা। তার উচিত রাজ্যের দরিদ্রতম পল্লীতে গিয়ে বাস করা। নিজের চোখে দেখা, জানা—তাদের অভাব অভিযোগের কথা।

সেদিন বোঝেন নি কথাটার সম্যক অর্থ। আজ বুঝছেন। আজ একবস্ত্রে এইখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে বুঝছেন। কিন্তু আজ বুঝি আর কোন কাজেই লাগবে না এ শিক্ষা। কারণ আশা আজ আর কোথাও কিছু নেই। যাঁর নিশ্চিত বিজয়ী হবার কথা সেই আজিম-উশ-শান আজ পরাজিত, হৃতসর্বস্ব, মৃত। চিরশত্রু অকর্মণ্য মুইজ্-উদ্দীন আজ সিংহাসনে, সে-ই আজ বাদশা। সিংহাসনে বসার আশা আজ শুধু দুরাশাই নয়—সিংহাসন বা রাজগী দুই-ই আজ একান্ত দুঃস্বপ্ন ওঁর কাছে। এখন যদি কোনমতে প্রাণটা বাঁচে—সে-ই ঢের। সেইটুকুর জন্যই খোদাতালার কাছে ঋণী থাকবেন তিনি।

সেটুকুর আশাও তিনি আর করেন না—সত্যি-সত্যিই। মৃত্যু তাঁর সামনে এসেই দাঁড়িয়েছে—তা তিনি জানেন। সেদিন, যুদ্ধের পূর্বদিনই প্রত্যক্ষ করেছেন সে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ। সন্ধ্যার নমাজ পড়তে যাবার সময় পশ্চিম দিগন্তের পানে চেয়ে দেখেছেন রক্তবৃষ্টি হচ্ছে আকাশে। ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতেই চোখে পড়েছে তাঁর চারিদিকে রাশি রাশি কবন্ধ। কবন্ধ আর মৃতদেহ, দ্বিখণ্ডিত শবের বিবর্ণ মরা মুখ। তার মধ্যে বাপজানের মুখও চোখে পড়েছে তাঁর। বাবার ভাইদের—আর তাঁরও। নিজের মৃতদেহ নিজে দেখতে পেয়েছেন তিনি। সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়ে শুনেছেন তিনি কান্না। আহতদের আর্তনাদ। ভয় পেয়ে পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন—পালাতে চেয়েছিলেন যেখানে হোক কোথাও, এই রাজ্য, সিংহাসন, এই সর্বনাশা ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব থেকে দূরে কোথাও—কিন্তু পথ খুঁজে পান নি। আজ—মাত্র এই কটা দিন বাদেই কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে কিন্তু সত্যিই তাই ঘটেছিল। কোথাও পথ খুঁজে পান নি। বার বার—সারারাত ধরে তাই নিজেরই তাঁবুর চার পাশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভোরবেলা ওঁর ঐ ভয়ার্ত উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখে ওঁর খাবাস বা খাস খানসামা ওঁকে এনে লুকিয়ে রেখে গেছে এইখানে। এই একান্ত অপরিচিত নিঃস্ব মানুষগুলির মধ্যে—এই কাটরা তালবাঘায়।

এখানে এসে আর একটি শিক্ষা হয়েছে রাজপুত্রের। জেনেছেন যে আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে হৃদয় বস্তুটির কোন সম্পর্ক নেই। যে হৃদয়বত্তার চেহারা তাঁর রাজপ্রাসাদের ধারে-কাছে কোথাও দেখেন নি—তাই দেখছেন এখানে। বাইরে যে যত নিঃস্ব হয়, অন্তরে তার বুঝি তত ঐশ্বর্য ঢেলে দেন খোদাতালা। তা নইলে এই অভাবের মধ্যেও এক কথায় তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী হবে কেন জাকির মিয়া! কোন পরিচয় কোথাও ছিল না, তাঁর খাবাসেরও পরিচিত নয় এরা। সে শুধু জানত যে এখানে একটা বসতি আছে—স্রেফ সেই ভরসায় নিয়ে এসেছিল শাহ্‌জাদাকে। বস্তীতে ঢুকে প্রথমেই দেখা পেয়েছিল জাকির মিয়ার—তাই তাকেই কথাটা বলেছিল। মিনতি ক'রে বলেছিল, 'সম্ভ্রান্ত রইস্ বংশের ছেলে, বড় বিপদে পড়েছে—বাদশাহী ফৌজের হাতে পড়লে প্রাণ যাবে, নিজে পালাবে সে ক্ষমতা নেই, শোকে-দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেছে—দেবে একটু আশ্রয় মিয়া?'

জাকির একেবারেই হাত ধরেছিল শাহ্‌জাদার। খাবাসকে বলেছিল, 'আশ্রয় দেবার কথা কেন বলছ মিয়া? সব আশ্রয়ই তো খোদাতালার। আমার সঙ্গেই থাকবেন—আমার এই ভাঙা কুটিরে আমার সরিক হয়ে। সে তো আমারই ভাগ্য।'

তখন আর দাঁড়াবার সময় ছিল না। বাক্-বিস্তারের তো নয়ই. আলাপ-পরিচয়—এমন কি ধন্যবাদেরও নয়। বেলা হয়ে গেছে, দূরে রণবাদ্য বাজছে, লড়াই শুরু হয়েছে নিশ্চয়। কোনমতে দু-একটি কথায় ধন্যবাদের পালা শেষ ক'রে খাবাস ওঁরই ঘোড়ায় চেপে ফিরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কোন কথার সময় হয় নি। কি হবে, কখন আবার কোথায় দেখা পাওয়া যাবে তার, সে কথাও বলে নেওয়া হয় নি। উৎসাহটা যে যুদ্ধে যোগদানের নয় তা শাহ্‌জাদার সেই ক্লান্ত ভীতিবিহ্বল মস্তিষ্কেও ঢুকেছিল। তাঁর তাঁবুতে অসংখ্য মূল্যবান জিনিস পড়ে আছে—বাইরের লুটেরা কেউ এসে লুট করবার আগে ও-ই চায় গিয়ে দখল নিতে। বেচারী! হয়ত প্রাণটাই যাবে তার আগে—আর সে সম্ভাবনা তো পুরোপুরিই রয়েছে,—তবু কী লোভ ওর!

যাক্ গে। সে লোভ তিনি ক্ষমা করেছেন, শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম। বস্তুত ওসব কোন কিছুতেই আর লোভ নেই তাঁর। সব নিক্। যে যা পারে নিক্। রাজ্য সিংহাসন সম্পদ,—সব কিছুই আজ মূল্যহীন যেন তাঁর কাছে। শুধু দূর নিরালায় কোথাও, শান্তিতে জীবনটা কাটাতে চান তিনি—এই যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, এই হানাহানি থেকে দূরে কোথাও। সমস্ত পরিচিত চক্ষুর অগোচরে। তার জন্য বাকী জীবন যদি কায়িক পরিশ্রম ক'রে খেতে হয়, তিনি তাতেও রাজী। এদের মতো মাকু চালিয়ে বা কুমোরের মতো মাটির বাসন গড়ে কিম্বা সব্‌জীর চাষ ক'রেও। সেই সুখ। আসল সুখ। সেখানে অভাব অস্বাচ্ছন্দ্য হয়তো আছে, ভয় নেই। আর তেমনিই একটা কিছু কাজ করবেন তিনি, যদি প্রাণে বাঁচেন এযাত্রা।

শুধু আপাতত যদি দুটো-একটা মোহরও তিনি চেয়ে রাখতেন খাবাসের কাছ থেকে—কিম্বা অন্তত দুটো রুপোর সিক্কা টাকা। ওখান থেকে পালিয়ে আসার সময় খাবাস তাঁর নিজের পোশাক ছাড়িয়ে খাবাসেরই একটি সাধারণ পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল। ভালই করেছিল, নইলে সে মূল্যবান মসলিন আর জরি ভেলভেটের পোশাকে কোথাও আশ্রয় পেতেন না তিনি, আত্মগোপন

করা সম্ভব হ'ত না একটি দণ্ডও। কিন্তু পোশাক বদ্‌লাবার সময় দুজনের একজনেরও মনে হয় নি তাঁর আঙ্‌রাখার জেব থেকে টাকার ছোট থলিটা বার ক'রে নেবার কথা। এটা খাবাসের ইচ্ছাকৃত বলে মনে করেন না তিনি—সে প্রকৃতির লোক নয় সে—এটা ভুলই।

মনে থাকলে আরও অনেক কিছু আনতে পারতেন—তবে জেব থেকে রুমাল আর থলিটা—এটা স্বাভাবিক নিয়মেই আসা উচিত ছিল। সেটাই যথেষ্ট—এখানে যথেষ্ট। সব গুলিয়ে যাচ্ছে কদিন থেকে মাথার মধ্যে, তবু কথাটা মনে আছে এখনও, আশ্চর্য—ছটি আশরফি ছিল রেশমের ঐ থলিটাতে। তার সঙ্গে বোধ হয় গোটা দুই সিক্কা টাকা আর কিছু তামার দামড়ি—দু-একটা, সামান্য। বাদশাজাদার পক্ষে এমন কিছু নয় অবশ্য, কিন্তু এখানকার হিসাবে কুবেরের ঐশ্বর্য! পুরো ছমাস চলে যেত তাঁর। তাঁর এবং এদেরও। জাকির মিয়া, তার বৌ, তার ছেলেমেয়ে, ভাতিজা—সবাইকে নিয়েই। কীই বা খরচ এদের! মানুষ যে এত সামান্য অর্থে জীবন ধারণ করতে পারে—তার প্রয়োজন যে এত অল্প—তা এখানে আসার আগে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম। একবেলা দুখানা পোড়া রুটি এবং কোমরে নোংরা ছেঁড়া এক টুক্‌রো কানি—পুরুষদের এইটুকুই যথেষ্ট। এর ওপর মেয়েদের শতছিন্ন তালি-দেওয়া একটা ক'রে কামিজ। যেটা ভিজে গেলে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে বসে থেকে শুকোতে হয়—যেটা কাচবার কথা ভাবতেও পারে না এরা।

কিন্তু তাও এখন দুর্লভ হয়েছে। সেই পোড়া দুখানা রুটিও জুটছে না ক'দিন। এই একান্ত খাদ্যাভাবের মধ্যে বসে বসে এদের খাদ্যে ভাগ বসানো—এই লজ্জাতেই যে মরে যাচ্ছেন শাহ্‌জাদা। দুদিন বাদে গতকাল একটুখানি ছাতু সংগ্রহ হয়েছিল—ওজনে বোধ হয় আধ-সেরের বেশি হবে না—তাই জলে মেখে ডেলা পাকিয়ে যখন ভাগ করা হ'ল, তখন অতগুলো ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে অপেক্ষাকৃত বড় ডেলাটা বসে খেতে বার বারই গলায় বেধে যাচ্ছিল তাঁর। অথচ উপায়ই বা কি! অতিথি হিসাবে নাকি বেশিটাই তাঁর প্রাপ্য। সে সম্বন্ধে তাঁর কোন কথাই শুনতে রাজী নয় জাকির মিয়া।

অবস্থা এদের খারাপই। বাদশা আলমগীর যেদিন উত্তর ভারত ছেড়ে

সুদূর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করেছেন সেদিন থেকেই এমনি হাল ওদের। জাঠ আছে, আফগান আছে, রোহিলা আছে—লুটেরার অভাব নেই। লড়াইয়ের সময় ভাড়াটে ফৌজের উৎপাত তো আছেই, পরনের কানি আর মাটির সানকি ছাড়া সবই নিয়ে যায় তারা—তাও, এক এক সময়, কিছু না পেলে রাগ ক'রে মাটির হাঁড়িকলসীও ভেঙে দিয়ে যায়, খালি পেটে জল ধরে খাবার মতোও একটা পাত্র থাকে না। বাদশাদেরও ভয় করে না এরা। বিশেষত জাঠেদের তো কথাই নেই। অমন দোর্দণ্ড-প্রতাপ আলমগীর বাদশা দিল্লীতে বসে থাকতেই তো আগ্রা লুঠ ক'রে গেল ওরা—সিকান্দ্রার কবরস্তান থেকে আকবর বাদশার পবিত্র দেহটাকেও টেনে বার করতে এতটুকু ভয় হ'ল না ওদের।

তবু—গতরে খাটে ওরা, এসব দুর্যোগকে ভয় করে না। মহাজনরা চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকবে। একবার ক'রে সর্বস্বান্ত হবার পর তারা যথানিয়মে এগিয়ে আসে, কাপড় বোনবার সুতো যোগায়, প্রাণধারণের মতো চাট্টি গমও দেয়। হ্যাঁ—সবই নিয়ে নেয় তারা ঠিকই, অভাব দৈন্যদশা কোনদিনই ঘোচে না, তবু প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখে মহাজনরা—নিজেদের গরজেই।

কিন্তু এই সময়গুলো বড় খারাপ। এই লড়াই দাঙ্গার সময়গুলো। ঘরে মাল মজুত, ওরাও খাটতে রাজী কিন্তু পয়সা পাবার কোন পথ কোথাও খোলা নেই। একদিকে লুটেরা আর অন্যদিকে শাহী ফৌজ—যুদ্ধবিগ্রহের সময় লুটেরারা ঠিক ফৌজের পিছন পিছন এসে হাজির হয়—এই দুইয়ের ভয়ে আশপাশের সব হাট-বাজার বন্ধ, বড় বড় গঞ্জ শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করছে। মাল বেচবে কাকে? খাদ্য-খাবারই বা কিনবে কোথা থেকে? দূরে গ্রামাঞ্চলে হয়তো পয়সা দিলে গৃহস্থবাড়ি থেকেই—গম না হোক—ছাতু ভাঙবার মতো মকাই কলাই পাওয়া যায়, কিন্তু তারা কেউ কাপড়-গামছার বদলে সে সব দিতে রাজী নয়। মাল বেচবার কোন উপায় নেই কোথাও, আর মাল না বিক্রী হ'লে টাকা আসবে কোথা থেকে! জমানো এক পয়সাও যে থাকে না কারও বাড়ি।

অতিথির কাছে অবশ্য কিছু আশা করে না জাকির মিয়া, কিন্তু অতিথির যে অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সম্প্রতি অসহ্য হবার আরও একটি কারণ ঘটেছে।

শাহ্‌জাদার এ-ও অভিনব অভিজ্ঞতা।

মানুষ যে এমন ভালবাসতে পারে কাউকে, ভালবাসবার জন্য যে এত কষ্ট এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তা জানতেন না শাহ্‌জাদা। শাহ্‌জাদাদের জানবার কথাও নয়। স্নেহ ভালবাসা অতি কোমল লতার ফুল—সে লতা প্রাসাদ-প্রাচীরের পাষাণ-তাপে শুকিয়ে ওঠে।

জাকির মিয়ার একটি মেয়ে আছে, পান্না তার নাম। পান্না নাম রাখা উচিত হয় নি তার, মহম্মদ করিম মনে করেন। হীরা রাখলেই ঠিক হ'ত। হীরার মতোই উজ্জ্বল, দ্যুতিময়ী সে মেয়ে। শুধু রূপে নয়—স্বভাব-গুণেও।

পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে—কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নি। কেন হয় নি তা এখানে এসে প্রথমদিনই শুনেছেন মহম্মদ করিম। জাকির মিয়াই বলেছে তাঁকে। জন্মের পর থেকেই পান্নার সাদী ঠিক করা ছিল একরকম। জাকিরেরই ভায়ের ছেলে—পান্নার চাচেরা ভাই মন্নুর সঙ্গে। দুটিতে ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাব, সবাই বলত জোড়ের পায়রা। মন্নু ওর চেয়ে মাত্র বছর দুইয়ের বড়—সুতরাং সমবয়সীই প্রায়, খেলাধুলো সব কিছু একসঙ্গে ছিল ওদের, মায় খাওয়া দাওয়াও। মন্নু বেশির ভাগ দিনই জাকিরের বাড়ি কাটাত, তাঁতের কাজও শিখেছিল ওর কাছে। ভাইপো এবং ভাবী জামাইকে যত্ন ক'রে কাজ শিখিয়েছিল জাকির। রেশম বোনার কাজ জাকিরের মতো কেউ জানে না এ তল্লাটে—সেই দুর্লভ বিদ্যাও সে শিখিয়ে দিয়েছিল মন্নুকে।

বিয়ে ঠিক হয়েই আছে—তাই কোন পক্ষেরই তেমন তাড়া ছিল না। উভয় পক্ষই অপেক্ষা করছিল একটু সুসময়ের জন্য। খরচ তো আছেই কিছু। নিজেদের মধ্যে বিয়ে—এতে খরচ নাকি আরও বেশী। আত্মীয়স্বজন সবাইকেই ডাকতে হয়। দাওয়াত-এ খানাপিনার খরচই কত! আর এ গ্রামে ওরা সবাই সবাইকার আত্মীয়।

কিন্তু সেই 'একটু সুসময়' আর এল না, তার বদলে চরম দুঃসময়ই ঘনিয়ে এল বরং।

বনের পাশেই গ্রাম। বনে কাঠ কাটতে যাওয়া কি ফল-মূল সংগ্রহ

করতে যাওয়া ওদের নতুন নয়। প্রায়ই যেত ওরা। যেত ছোটরাই বেশির ভাগ। যারা ভারী কাজ করতে পারবে না তাদেরই পাঠানো হ'ত এই সব বাজে কাজে। অবশ্য বয়স্থা কুমারী মেয়েদের যাওয়ার কথা নয়—জাকিরের বিবি বারণও ক'রে দিয়েছিল পান্নাকে ওর দশ বছর বয়স হ'তেই—কিন্তু পান্না নাকি বরাবরই যেত লুকিয়ে লুকিয়ে, মন্নুর সঙ্গে।

আর তাইতেই সেদিন অমন কাণ্ড হয়ে গেল।

দু'জনে বনে ফাঁদ পেতেছিল শজারু বা খরগোশের জন্যে। পেয়েও ছিল তিনটে খরগোশ। আসন্ন ভোজের কল্পনায় খুশী মনে ফিরছিল ওরা, পান্নার হাতে জাল সুদ্ধ খরগোশ এবং মন্নুর মাথায় শুকনো কাঠের বোঝা। গ্রামের অপর ছেলেরাও আসে, সেদিনও এসেছিল। কৌশলে তাদের এড়িয়ে গিয়েছিল মন্নুই। ওদের সংকেত এবং স্থান ঠিক করা থাকত আগে থাকতে—ওর আর পান্নার—সেই মতো এসে মিলত ওরা। তারপর সারাদিন দু'জনে ঘুরে বেড়াত নির্জন বনে। পান্নার হাতে থাকত একটা লাঠি এবং মন্নুর তীর ধনুক। তবে সে এমন কিছু নয়—তাতে খরগোশ হরিণ মারা যায় বড় জোর। বিপদের আশঙ্কা ওরা করে নি কোনদিন। যা কখনও ঘটে নি তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, তাই ভয়ও ছিল না বিশেষ। সেদিনও নির্ভয়ে ফিরছিল ওরা। কিন্তু হঠাৎ গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ে গেল একদল লুটেরার হাতে। তারা বোধহয় নির্জনে বসে লুটের মালেরই হিসাব-নিকাশ করছিল, এখন অতিরিক্ত—'ফাউ'স্বরূপ পান্নাকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে একটা হিংস্র চিৎকার ক'রে উঠল। টাকা পয়সা এদের নেই তা তারা দেখেই বুঝেছিল, তাই মন্নুর দিকে ভ্রূক্ষেপও করে নি, একেবারেই তিন চারজন লাফিয়ে উঠে এসে ঘিরেছিল পান্নাকে।

তারা সাত আটজন—মন্নু একা।

কিন্তু মন্নু দমল না। তার ভাবী বধূকে নসীবের ওপর ছেড়ে দিয়ে আত্ম-রক্ষারও চেষ্টা করল না। সে একাই ঝাঁপিয়ে পড়ল লুটেরাদের ওপর। প্রথমটা ওকে গ্রাহ্যও করে নি তারা। কিন্তু ওর তীরে পর পর দু'জন আহত হ'তে টনক নড়ল তাদের। তারা এবার পান্নাকে ছেড়ে ওকে নিয়ে পড়ল। তীর ধনুকে লড়াই করার সময় নেই—সুযোগও কম। ছুটে গিয়ে দূর থেকে ছুঁড়বে সে অবসরও নেই। সুতরাং তীর ধনুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পান্নার

হাতের লাঠিটা নিয়েই লড়তে লাগল সে। প্রাণপণে মরীয়া হয়ে লড়ছে বলেই আরও দু'তিনজনকে ঘায়েল করে দিতে পারল—নইলে ঐটুকু লাঠি নিয়ে জোয়ান জোয়ান লুটেরাদের সঙ্গে লড়াই করার কথা নয় তার।

ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে পান্না তীর ধনুকটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে উঠেছিল একটা অর্জুন গাছের ডালে, সেখান থেকে তীর ছুঁড়তে লাগল। তাতেও আহত হ'ল জন-দুই। বেগতিক দেখে অবশিষ্ট যে তিন চারজন সুস্থ ছিল তারা আহতদের নিয়ে সরে পড়ল, কিন্তু তার আগেই মন্নুর ডান হাতের চারটে আঙুল কাটা গিয়েছিল একজনের তলোয়ারে, আর একজনের লাঠিতে ভেঙেছিল ওর হাঁটু। পান্নার তীর আসতে শুরু না হ'লে হয়ত ওকে একেবারে শেষই ক'রে দিত তারা।

সেই থেকেই মন্নু পড়ে আছে।

সে হাঁটু আর ওর ভাল হয় নি। শহর বাজারে গিয়ে কোন হাকিমকে দেখালে কী হ'ত তা বলা যায় না, হয়ত ভালও হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সে কথা চিন্তা করাও এদের পক্ষে বাতুলতা। যে যা জানত পাড়াঘরে—টোট্‌কা টুট্‌কি, তাই প্রয়োগ করল কিন্তু হাঁটু আর ভাল হ'ল না, বরং দিন দিনই শুকিয়ে উঠতে লাগল—হাঁটুর নিচে থেকে গোটা পা-টাই।

পা গেল, ডান হাতও অকর্মণ্য হয়ে গেল চিরদিনের মতো—এর পর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারে না কেউ। জাকির মিয়াও যদি না পেরে থাকে তো দোষ দেওয়া যায় না খুব। মন্নু বা মন্নুর বাপ-মাও আশা করে না সেটা। তারা এখন ওর বিবাহের কথাই চিন্তা করে না কেউ। গরিবের সংসার—যেখানে দিনরাত খেটেও পেট পুরে খাওয়া জোটে না, সেখানে অকর্মণ্য পঙ্গু ছেলের বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। কিন্তু জাকির মিয়া অন্য পাত্রের কথা তুলতেই পান্না বেঁকে দাঁড়াল। তার ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যই বলতে গেলে মন্নু নিজের জিন্দিগীটা দিল। পুরুষ মানুষ, কাজ করার ক্ষমতা চলে গেলে তার জিন্দিগীর আর রইল কি? আর দোষটা তো পান্নারই ষোল আনা। সে যদি আম্মাজানের নিষেধ অমান্য ক'রে না যেত ওর সঙ্গে, তাহলে তো এ সব কিছুই ঘটত না। এখন সে গিয়ে অপর একজনকে সাদী ক'রে সুখে জীবন কাটাবে আর মন্নু তার জন্যেই পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে থাকবে—সে হবে না কিছুতেই।

বকাবকি রাগারাগি—ভাল কথায় বোঝানো—সবই করেছে জাকির, কিন্তু মেয়ের সেই এক গোঁ। সাদী তাকে করতে হয় তো সে মন্নুকেই করবে—যাকে জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত সে নিজের মরদ বলে জেনেছে। সে তো কসবী নয় যে কথায় কথায় মরদ বদল করবে। অমানুষও নয় যে সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে গিয়ে মন্নুকে ঐ অবস্থায় ফেলে নিজে সুখে জিন্দিগী গুজরান করতে যাবে। না, শাদীর কথা আর যেন তার তোলা না হয় কখনও।

জোর ? জোর করলেও কোন সুবিধে হবে না। ইঁদারায় পড়ে মরতে সে জানে। কিংবা বেঁধে রেখে সে পথ বন্ধ করলে সোহাগ-রাতে নিজের দাঁত দিয়ে দুল্‌হনের টুঁটি কেটে নিয়ে খুন করবে সে—তারপর নিজেও খুন হবে। এ তার পাকা কথা।

এই অবস্থাতেই কথাটা রয়েছে এখনও।

জিদ্দী মেয়েকে বেশ একটু ভয় করে জাকির মিয়া। তাছাড়া সে ওর দুলারী মেয়েও বটে—বড় পিয়ারের। তার জিন্দিগীর সওয়াল যেখানে—সেখানে জোরজবরদস্তি করতেও মন যায় না। তাই কথাটা এখন চাপা দিয়েই রেখেছে। যাক্ কিছুদিন—যখন বুঝবে যে কোন আশা নেই তখন হয়ত আপনিই মন বদলাবে। সব মানুষই নিজের সুখ চায়। ছেলেমানুষ বলেই এখন বুঝছে না—কিছুদিন পরেই বুঝবে যে কৃতজ্ঞতা, বাল্যপ্রণয় ওসবের কিছু দাম নেই জীবনে—তার জন্যে নিজের সমস্ত জীবনটা নষ্ট করা যায় না।

হেসে চোখ টিপে বলে জাকির মিয়া।

কিন্তু জাকির মিয়ার এ ভরসার ওপর ভরসা করতে পারেন না শাহ্‌জাদা।

তিনি পান্নার মুখে চোখে অন্য আভাসই পেয়েছেন।

স্থির, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাস। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের ছবি।

হিন্দুদের কোন্ দেবী নাকি শ্মশানচারী ভিখারীকে পাবার জন্যেই অ-পর্ণা হয়ে তপস্যা করেছিলেন—ওঁর বাবার এক বাঙ্গালী হিন্দু মুন্সীর মুখে শুনেছিলেন শাহ্‌জাদা। এ সেই ধরণের প্রেম। এ ভালবাসা নিজের সুখ আনন্দ ভবিষ্যৎ কোন কিছুই চিন্তা করে না—নিজেকে নিয়ে মাথাই ঘামায় না।

এ বিশ্বাসের কিছু প্রমাণও পেয়েছেন শাহ্‌জাদা।

তাইতেই আরও গভীরভাবে নাড়া পেয়েছে তাঁর মন।

খাবার নেই। দিনের পর দিন চলছে উপবাস। কোনদিন আধ সের ছাতু কোনদিন বা এক সের আটা সংগ্রহ হয়। গোলমালে বেশী দূর যাওয়া যায় না—আশপাশের গ্রাম ভরসা। তাদেরও অবস্থা এদের চেয়ে খুব ভাল নয়, তাদেরও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যার ঘরে যা আছে দু-এক সের গম কি চানা কি মকাই—তা সে কৃপণের ধনের মতো সযত্নে রক্ষা করছে—গোপনে রাখছে সকলের অগোচরে চুরি-ডাকাতির ভয়ে। সুতরাং সে বার ক'রে আনা শক্ত। সোনা তো দূরের কথা, এক কুঁচি রুপোও নেই কারুর ঘরে। জাকির মিয়ার বিবির নাকে একটা রূপোর চিড়িতন নাকছাবি ছিল—সেইটেই খুলে নিয়ে সেদিন আধ সের ছাতু সংগ্রহ করা হয়েছিল।

তবু এ গ্রামের মধ্যে জাকির মিয়ার অবস্থা ভাল। ওর ঘরের খাপ্‌রা ভেদ ক'রে জল পড়ে না। ওর বিবি মেয়ে কামিজ পরে লোকের সামনে বেরোতে পারে। মন্নুদের অবস্থা আরও খারাপ। ওদের নাকি বিরামহীন উপবাস চলেছে কদিন ধরে। এর মধ্যে একদিন—যেদিন প্রথম আসেন মহম্মদ করিম এদের বাড়ি, সেদিন ক'খানা রুটি পাওয়া গিয়েছিল—অল্প ক'খানা—মাথা পিছু একখানার বেশি জোটে নি। মোটা রুটি অবশ্য, তার একখানা খেলেও কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারত কিন্তু হতভাগা মেয়ে পান্না ঘরের মধ্যে বসে খাবার অছিলায় ঘরে ঢুকে সেই রুটিরও আধখানা লুকিয়ে রেখেছিল—পরে দিয়ে এসেছে মন্নুকে চুপিচুপি। মন্নুর এক ক্ষুধার্ত ভাই তাই দেখে তারই এক টুকরো ভাগ চায়—পান্না না দেওয়াতে ঘটনাটা এসে বলে গেছে ওদের। বলা বাহুল্য তা নিয়ে চেঁচামেচি এ বাড়িতে বড় কম হয় নি। আমিনা বিবি বেশ দু-এক ঘা চড়ও কষিয়ে দিয়েছেন মেয়ের গালে। কিন্তু মেয়ে মোটেই দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয় নি—সজোরে সদম্ভে উত্তর দিয়েছে, 'বেশ করেছি—পঙ্গু লোকটা না খেয়ে মরে যাবে আর আমি এখানে পেট পুরে খাব—না? সে হবে না।'

তাই সেদিন ছাতু মেখে যখন এক এক ডেলা দেওয়া হ'ল সবাইকে, তখন আমিনা বিবি পান্নাকে ঘরে যেতে দিলেন না, বললেন, 'এইখানে আমাদের সামনে বসে খেতে হবে। খবরদার কোথাও নিয়ে যেতে পাবি না!'

একটু দূরেই বসেছিলেন শাহ্‌জাদা। তবু সেখান থেকে দেখতে পেলেন নিরুপায় পান্নার আয়ত দুটি চোখের কূল ছাপিয়ে অবাধ্য জল গড়িয়ে পড়তে।

সুন্দরী কিশোরী মেয়ের চোখের জল তাঁর তাতারী রক্তকে অস্থির চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। ঐ প্রস্ফুট পদ্মের পাপড়ির মতো ওষ্ঠাধরে তার অভ্যস্ত মধুর হাসি ফোটাবার জন্যে তিনি সেই মুহূর্তে অনেক কিছুই করতে পারতেন— দিতে রাজী ছিলেন অনেক কিছুই—কিন্তু কিছুই যে তাঁর নেই, কোন উপায়ই নেই কিছু করবার। তাই নিষ্ফল ক্ষোভে নিজেরই দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটের চামড়া কেটেছিলেন শুধু বসে বসে—আর কিছু করতে পারেন নি। নিজের ছাতুর ডেলাটা দিতে পারতেন অনায়াসেই—কিন্তু সে এরা দিতে দেবে না। তাছাড়া উপবাসে তাঁরও কষ্ট হচ্ছিল খুব। বাবরশাহী বংশের শৌর্য না পান—স্বাস্থ্যটা পেয়েছিলেন পুরোমাত্রাতেই, শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম। একটুখানি উপবাসেও মাথা ঝিমঝিম করে তাঁর।

সুতরাং করতে পারেন নি কিছুই।

চেয়েই ছিলেন শুধু বিহ্বলভাবে অসামান্য প্রেমে ভাস্বর ঐ সামান্য মেয়েটির মুখের দিকে। আর সেইভাবে চেয়ে থাকতে থাকতেই লক্ষ্য করেছিলেন অকস্মাৎ সেই সজল করুণ চোখ দুটিকে নতুন এক দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে। স্থির প্রতিজ্ঞার আলো সেটা—বিজয়গর্বের আভাসে উদ্দীপ্ত।

বিস্মিত হলেন শাহ্‌জাদা—কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। তিনিও একেবারে নির্বোধ নন, একটু লক্ষ্য ক'রেই বির্জয়-গর্বের কারণটা বুঝতে পারলেন ওর।

ছাতুর ডেলাটার অর্ধেক মুখে পুরে খেয়েছিল একটু একটু ক'রে—চোখের জলের মধ্যে। কিন্তু শেষ অর্ধাংশটা মুখের মধ্যে পুরে কৈ মুখ নড়ছে না তো! ঢোঁকও তো গিলল না।

অর্থাৎ সেটা মুখেই আছে ওর। মুখেই লুকিয়ে রেখেছে—এদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে।

এরা ক্ষুধার্ত, ক্লিষ্ট—ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত। অত লক্ষ্য করার অবসর এদের নেই। প্রথমটা দেখেছিল যে মুখে পুরেছে, মুখ নাড়ছে— খাওয়ারই লক্ষণ। আর ওর দিকে নজর রাখে নি কেউ। রাখা প্রয়োজন মনে করে নি। আর ওদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে উঠে পড়েছে পান্না। একটু এদিক-ওদিক, যেন লক্ষ্যহীন ভাবে, ঘোরা-ফেরা ক'রে এক সময় বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে, তারপর পিছন দিয়ে ঘুরে এক সময় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে মন্নুদের বাড়ি—মন্নুর

কাছে। মুখ থেকে সেই ছাতুর ডেলাটি বার ক'রে খাইয়ে দিয়েছে তার পঙ্গু অসহায় পিয়ারাকে।

এ সবই লক্ষ্য করেছেন শাহ্জাদা।

দূর থেকে অনুসরণ করেছেন ওকে। পিছনে পিছনে এসে ওকে মন্নুর ঘরে ঢুকে নিজের মুখ থেকে বার ক'রে খাওয়াতে দেখেছেন তাকে। সস্নেহে, সযত্নে—পক্ষীমাতার মতো।

তারপর আর দেখতে পারেন নি। দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ঝাপ্সা ক'রে জল ভরে এসেছে তাঁর দুই চোখে। এ রকম দেখতে অভ্যস্ত নন তিনি। এ তাঁর সকল অভিজ্ঞতার বাইরে।

মানুষ মানুষকে যত্ন করে, পরিচর্যা করে স্বার্থের জন্যে। যার শক্তি আছে, অর্থ আছে, সে স্নেহ-প্রেম কিনে নেয় এই রকমেরই একটা আব্ছা ধারণা একটু একটু ক'রে মনে গড়ে উঠেছে তাঁর। এতখানি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—কোন রকম আশা বা স্বার্থ-গন্ধহীন—এ যে কোথাও আছে তাই তো জানা ছিল না এতদিন।

বাবরশাহী রক্ত তাঁর ধমনীতে মাথা কুটতে লাগল বার-বার। বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল আবেগের সমুদ্র।

একটা কিছু করা যায় না? ঐ মেয়েটির মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে, ওর পিয়ারের লোকের মুখে অন্ন যোগাবার জন্যে—কিছু একটা?

এত অসহায় তিনি, এত নিঃস্ব!

যার জন্যে—থাকলে তিনি তখৎ-এ-তাউসও ছেড়ে দিতে পারতেন অনায়াসে, কোহিনূর-শোভিত তাজ দান করতে পারতেন—তার জন্যে কিছুই কি করবার নেই তাঁর!

মুঘলদের শাহী-তখ্তের ন্যায্য উত্তরাধিকারী তিনি, তৈমুর লঙ ও জেঙ্গিজ খাঁর মিলিত রক্ত তাঁর ধমনীতে—তিনি এমনি অসহায়ভাবে বেশরম বেঅকুফ গিদ্ধড়ের মতো—গর্তে মুখ লুকিয়ে বসে থেকে এদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসাবেন শুধু—এতটুকু কোন প্রত্যুপকার করতে পারবেন না?…

বার-বার নিজেকে এইভাবে নিষ্ফল প্রশ্নে জর্জরিত করতে করতেই এক সময় তাঁর নজর পড়ল নিজের আঙুল-দুটোর ওপর।

এই তো, এই তো উপায় তাঁর হাতেই রয়েছে! আশ্চর্য তো! এতকাল

কি অন্ধ হয়ে ছিলেন তিনি? এই আংটি দুটো এতকাল দেখতে পান নি? একটা হীরের আর একটি চুনির। সাচ্চা চুনির আংটি।

ওঁরা যখন বাংলাদেশে ছিলেন তখন বহুলোক আসত ভাল ভাল দামী পাথর বেচতে। এ একটা নেশা ছিল আজিম্-উশ-শানের। পাথর চিনতেনও তিনি। কোন্ পাথরের কত কিম্মৎ তা হাতে ক'রেই বলে দিতে পারতেন। অনেক সময় অনেক আমীর জায়গীরদার আসত তাঁর কাছে জহরৎ বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে। যে পাথর রেখে কেউ পঁচিশ সিক্কা টাকা দিত না, সেই পাথর রেখেই অনেক সময় আজিম-উশ-শান পাঁচশ' মোহর পর্যন্ত ধার দিতেন। জানতেন তিনি যে ঐ পাথর কোথায় কার কাছে বেচলে হাজার মোহর পর্যন্ত তাঁর মুনাফা হবে।

সেই সময়কারই আংটি এ দুটো।

অনেক টাকা দাম। চুনির আংটিটার জন্যে চারশ' মোহর গুনে দিয়েছিলেন আজিম-উশ-শান। এক পিদ্রু সাহেব বেচতে এসেছিল। মগের দেশ থেকে আনা বেদাগ চুনি—এর নাকি হাজার আশরফি কিম্মৎ। লুটের মাল বলেই সস্তায় দিয়েছিল সাহেব।

হীরের আংটিটার আরও বেশী দাম। কিন্তু আর্থিক মূল্যটাই ওর সব নয়। ওর ইতিহাস বড় বিচিত্র। চাটগাঁয়ে তীর্থ করতে যাবার সময় পথে এক দরবেশের দেখা পেয়েছিলেন ওঁর বাপজান। প্রচণ্ড বর্ষায় পথে বসে প্রশান্ত মুখে ভিজছিলেন দরবেশ। আজিম-উশ-শান খবর পেয়ে নিজে বেরিয়ে গিয়ে সসম্মানে ডেকে এনেছিলেন নিজের তাঁবুতে। শীতের দিনের বর্ষা—হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগছে সবাইকার, কিন্তু দরবেশ নাকি প্রসন্ন নির্বিকার ছিলেন। শুধু তাই নয়—একটু আলাপ ক'রেই বুঝেছিলেন আজিম-উশ-শান যে দরবেশ রীতিমতো পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ। বহু ভাষাভাষীও বটে। তিনি যত্ন ক'রে নিজের তাঁবুতে আগুনের ধারে ওঁর জন্য শয্যা প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন। নিজের খাদ্যের অগ্রভাগ দিয়েছিলেন খেতে। মদও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দরবেশ তা খান নি।

ওঁর বাদশাহী তাঁবুর সুখশয্যা কিন্তু সন্ন্যাসীকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি—তিনি ভোরবেলা উঠেই রওনা দিয়েছিলেন, আজিম-উশ-শানের বহু অনুরোধেও রাজী হন নি আর একটি দিনও থাকতে। তাঁর যাওয়ার সময়

হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ঐ হীরের আংটিটা আঙ্গুল থেকে খুলে প্রণামী দিতে গিয়েছিলেন শাহ্‌জাদা আজিম-উশ-শান। তাতে একটু হেসেছিলেন সেই দরবেশ, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ আজিমের মুখের দিকে, তারপর আংটিটা হাত পেতে নিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে। সে সময় শুধু তাঁর ঠোঁট দুটি নড়েছিল নাকি অল্প অল্প একটু। হয়ত বা কোন মন্ত্র পাঠই করেছিলেন। তারপর চোখ খুলে আবারও একটু হেসে আংটিটা মালিকের হাতে ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, 'তোর শ্রদ্ধার দান আমি নিয়েছি—আমার নেওয়া হয়ে গেছে। এখন যা দিচ্ছি এ আমার জিনিস।...হীরের আংটি দরবেশ ফকিরের কি কাজে আসবে? এটা তুই-ই রেখে দে বেটা, আমার আশীর্বাদ রইল—এ আংটি যতদিন তোর হাতে থাকবে কখনও কোন অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে না। যুদ্ধে, কি গুপ্তঘাতকের হাতে, কি কোন দৈব-দুর্যোগে মরার ভয় থাকবে না! যার হাতেই থাক এ আংটি—সে খোদার আশ্রিত জানবি।'

তাঁর এই অভয়-বর কোনদিন যাচিয়ে দেখা হয় নি, পরীক্ষা করেন নি আজিম-উশ-শান কিন্তু তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন কথাটা। তাঁর ধারণা ঐ দরবেশ কোন সিদ্ধপুরুষ, পীর হবেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে এই মৃত্যুঞ্জয় কবচ দিয়ে গেছেন।

আর বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই আংটিটি দিয়েছিলেন এবার যুদ্ধের আগে—বলেছিলেন, 'যদিই আমি হেরে যাই, তুমি বাঁচতে পারবে আর বেঁচে থাকলে একদিন আমার সে পরাজয়ের শোধও তুলতে পারবে। আমি না পাই—তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, যদি কোনদিন হিন্দুস্তানের বাদশাহী পাও তো আমি কবরে শুয়েও শান্তি পাব।'...

পিতার ঐকান্তিক স্নেহের নিদর্শন এই আংটিটির দিকে চেয়ে আবারও আজ জলে দুচোখ ভরে এল মহম্মদ করিমের। বেচারী বাপজান! কত আশাই ছিল ছেলের ওপর তাঁর!

মহম্মদ করিম মন স্থির ক'রে ফেললেন। জাকির মিয়াকে ডেকে চুনির আংটিটি তার হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি একবার শহরে যাও মিয়া, এই আংটিটা বেচে যা পাও—একেবারে কিছু বেশী ক'রে আটা ডাল ঘি নুন কিনে

আন—যাতে কিছুদিন আর খাওয়ার দুঃখ না থাকে।'

জাকির মিয়া জিভ কেটে আংটিসুদ্ধ ওঁর হাতটা ঠেলে দিয়ে বললে, 'না মিয়া, মেহ্‌মানদারীর দাম নিতে পারব না। অতিথির পয়সায় বসে খাব এ শিক্ষা আমরা পাই নি বাপ-নানার কাছ থেকে।'

কিন্তু তাকে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন শাহ্‌জাদা, বললেন, 'ছেলেমানুষী ক'রো না জাকির মিয়া। এ সব স্বভাবিক দিনকাল নয়, এখন তোমার ও পুরনো নিয়ম খাটাতে এসো না। বিপদের দিনে কে কার মেহ্‌মান ? সবাই মিলে বেঅকুফের মতো উপবাস ক'রে মরে কোন লাভ নেই। তাছাড়া তোমরা পারলেও আমি পারব না এমন ক'রে থাকতে—বিশেষত হাতে যখন উপায় আছে। যা বলছি শোন, কোন ভাল জহুরীর কি পোদ্দারের দোকানে গিয়ে বেচে এস এটা।'

বাদশাহ-বংশে জন্ম মহম্মদ করিমের—বহু পুরুষের শাহী রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে। আদেশ করা, ধমক দেওয়া—এগুলোয় তাঁদের জন্মগত অধিকার। এ অভ্যাস তাঁদের মজ্জাগত। সে ধমক চিনতে ভুল হয় না কারও, যে দিচ্ছে তার কি অধিকার আছে এভাবে শাসন করবার, সে সম্বন্ধেও মনে কোন প্রশ্ন ওঠে না। জাকির মিয়াও সে কণ্ঠস্বর ও ভ্রূকুটির সামনে যেন এতটুকু হয়ে গেল একেবারে। তাড়াতাড়ি হাত পেতে আংটিটা নিয়ে আমতা আমতা ক'রে বললে, 'এটা—তা এটার কত দাম হবে বড়-মিয়াজান ?'

'পাঁচ—' পর্যন্ত উচ্চারণ ক'রেও থেমে গেলেন মহম্মদ করিম। সত্য মূল্য বলে কোন লাভ নেই। ভয় পেয়ে যাবে জাকির মিয়াও। নানা রকম সন্দেহও জাগবে ওর মনে। আত্মগোপন ক'রে থাকা হয়ত কঠিন হবে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'এর কিম্মৎ ঠিক কত তা জানি না। শুনেছি অনেক। কিন্তু এই দুর্দিনে তো আর ন্যায্য দাম পাবে না। হয়ত দশ ভাগের এক ভাগও মিলবে না। যাক গে, তুমি ওসব দামটাম নিয়ে মাথা ঘামিও না, যা পাও তাতেই ছেড়ে দিও। বোকামি ক'রে যেন ফিরে এসো না। যদি পাঁচটা মোহরও পাও—এক মাস তো আমরা সবাই খেয়ে বাঁচতে পারব।'

পাঁচ মোহর !

মাথা ঝিম-ঝিম ক'রে উঠল জাকির মিয়ার। এত দাম এইটুকু একটা লাল পাথরের !

ওর অনেকদিনই সন্দেহ হয়েছে যে ওদের এই অতিথিটি সামান্য কোন ব্যক্তি নয়। নিশ্চয় কোন খানদানী ঘরের ছেলে হবে। কোন বড় আমির নবাবের ছেলে হওয়াও বিচিত্র নয়, কোন কারণে বাদশার কোপে পড়ে পালিয়ে এসেছে। ওর কথাবার্তার ধরন বা চালচলন দেখলেই তো বোঝা যায় মানুষটা কেওকেটা কেউ নয়। আমিনা বিবির শখ কত, এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়! বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ। ছোঃ!

জাকির মিয়া স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় মনে মনে হাসতে লাগল।

এর পরের যা ঘটনা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন।

অত বড় চুনির আংটি দেখে চমকে উঠেছিল শহরের বড় জহুরী আগা আতাউল্লা সাহেব। আরে, এ পাথর এই ট্যানাপরা লোকটা কোথায় পেলে? কম-সে-কম পাঁচশ' মোহর যে দাম পাথরটার। চোরাই মাল নয় তো—চোরাই কিম্বা কুড়িয়ে পাওয়া?

ফ্যাসাদে পড়বার ভয়ে তত নয়—ধমক-ধামক করলে ভয় পেয়ে হয়ত অনেক কম দামেই বেচতে রাজী হবে, এই লোভেই আরও ধমক-ধামক দিয়ে জেরা করেছিলেন আতাউল্লা সাহেব। 'বল্ বেটা কোথায় পেলি এ আংটি। এ তো খোদ বাদশার মাল মনে হচ্ছে! চুরি ক'রে চোরাই মাল চালাতে এসেছ তুমি আতাউল্লার কাছে! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! জান যে তোমাকে সপুরী শূলে চড়াতে পারি আমি—চোরাই মাল বেচতে আসার দায়ে!'

জাকির মিয়া দরিদ্র কিন্তু চোর বা ভিক্ষুক নয়। এ অপমানে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেও চড়া চড়া কথা বলে জবাব দিয়েছিল এ অভিযোগের। তার বাড়িতে যে ভদ্রলোকের ছেলে মেহ্‌মান হয়ে এসে আছেন কদিন, এ তাঁরই আংটি, তিনি বেচতে দিয়েছেন। বিশ্বাস না হয় ওরা কেউ চলুক না—গিয়ে দেখে আসুক জাকির সত্যি বলছে কি মিথ্যা বলছে।

অত গরজ আতাউল্লার ছিল না। সে আসলে দামটা অস্বাভাবিক রকম কমাবার জন্যেই কথাটা তুলেছিল। কিন্তু গরজ ছিল অন্য লোকের। শাহী সরকারের সংবাদ সরবরাহ-কারক ওয়াকিয়া-নিগার-ই-কুল হিদায়ৎ কেশ বসেছিল আতাউল্লার দোকানে। মির্জা মহম্মদ করিম মরেন নি তা সে

জানত। কোথাও নিশ্চয় লুকিয়ে আছেন এই কাছাকাছিই। কোনমতে ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা ইনাম মিলবে নতুন বাদশার কাছে। মিলবে বড় চাকরি, জায়গীর, নগদ টাকাও। লোভে চোখ জ্বলে উঠেছিল তার। সে উঠে এসে ধরেছিল জাকিরকে। তারপর সিপাহী-সান্ত্রী যোগাড় ক'রে ওর সঙ্গে তালবাঘায় আসতে আর কতক্ষণ লাগে?

হিদায়ৎ কেশ ছিল হিন্দু—বাদশার দরবারে কিঞ্চিৎ সুবিধা লাভের আশাতেই ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে। ভোলানাথ হয়েছে হিদায়ৎ কেশ। সুতরাং নিহত আজিম-উশ-শানের হতভাগ্য পুত্রের জন্যে তার মনে করুণার উদ্রেক হবে এমন মনে করার কোন কারণ ছিল না। যে যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তার মন যোগানোই বড় কথা—সে যদি আত্মীয়ের রক্তে তুষ্ট হয় তো হিদায়ৎ কেশের কি?

সিপাহী পাহারা নিয়ে ওরা যখন এসে জাকির মিয়ার বাড়ি ঘেরাও করেছে তখন শাহ্‌জাদা মির্জা মহম্মদ করিম বসে পান্নার সঙ্গেই গল্প করছেন। পান্নার চাতুরী যে তাঁর চোখ এড়ায় নি, তাঁকে যে ছাতুর ডেলা মুখে পোরার ধাপ্পায় ভোলাতে পারে নি সে—সে কথা তিনি বলেছেন পান্নাকে। পান্নাও অকারণ মিছে কথা বলার চেষ্টা করে নি। স্বীকার করেছে সে, মুখের মধ্য থেকেই ছাতুর ডেলা বার ক'রে খাইয়েছে মন্নুকে। তার জন্যে সে এতটুকুও দুঃখিত নয়—লজ্জিত তো নয়ই: 'নইলে উপায় কি বল! আহা বেচারী কখনও ক্ষিদে সইতে পারে না। তুমি ওকে আগে ছাখো নি—এই তাগড়াই চেহারা ছিল ওর। এখন তো কাঠি হয়ে গিয়েছে। কি ক'রে যে ওকে বাঁচাব—এই ভাবনাই এখন আমার সবচেয়ে বড়।'

তারপর সে শাহ্‌জাদার হাত দুটো ধরে হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলে বলেছিল, 'তুমি তো ভাইয়া অনেক জান শোন, লেখাপড়া জানা লোক—তুমি বল না, বাঁচবে তো আমার মন্নু? ওকে বাঁচাতে পারব তো? ও যদি না বাঁচে তো আমি এক লহমাও এই জান রাখব না, ঐ ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ব কিম্বা হিন্দু মেয়েদের মতো পুড়ে মরব। বল না ভাইয়া—ওকে কি বাঁচাতে পারব? আবার কি ভয় হয় জানো, মনে হয় এরা আমাকে অপর জায়গায় শাদী দেবার জন্যে যদি ষড় ক'রে মেরে ফেলে ওকে? যদি জহর দেয় রুটির সঙ্গে? এক-একদিন সেই কথা ভেবে সারারাত ঘুমোতে পারি না।'

নিজের রুমাল দিয়ে ওর পদ্মপত্রের মতো দুই চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন মহম্মদ করিম, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না পান্না, আমি বলছি তোমার মন্নু বেঁচে থাকবে। আমি আজ টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি, তোমার বাবা অনেক খাবার নিয়ে আসছেন। আমি বলে খানিকটা আটা ডাল মন্নুদের দেওয়াব!'

এই কথা বলতে বলতেই তাঁর দৃষ্টি গিয়েছিল বাইরে। আর সেই মুহূর্তে আবার সেই দৃশ্য দেখেছিলেন তিনি—সে রাত্রের দেখা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সেই রক্তবৃষ্টি, সেই কবন্ধের নৃত্য! ভয় পেয়ে শিউরে উঠে দুহাতে চোখ মুছে ভাল ক'রে তাকাতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন—হিদায়ৎ কেশের দলবলকে, তাদের সঙ্গে পিছমোড়া ক'রে বাঁধা জাকির মিয়াকেও।

আর কিছু দেখার প্রয়োজন ছিল না। আর কোন চিন্তারও না। নিজের ললাটলিপি সেই মুহূর্তেই পড়তে পেরেছিলেন মহম্মদ করিম।

এক মুহূর্তও আর ইতস্তত করেন নি। চট ক'রে নিজের আঙ্গুল থেকে হীরের আংটিটা খুলে ওর পান্নার মধ্যে পুরে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা সাবধানে রেখো পান্না, কোনমতে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে মন্নুকে পরিয়ে দিও—আর তার মৃত্যুর ভয় থাকবে না। দরবেশের মন্ত্রপড়া এ আংটি—যার কাছে থাকবে, তার আর কোন ভয় নেই!'

তারপর বিস্মিত বিহ্বল পান্না ব্যাপারটা কি ঘটল তা বোঝবার, কি কোন প্রশ্ন করার আগেই বাইরে এসে ধরা দিয়েছিলেন দুশমনের কাছে। বলেছিলেন, 'আমি তৈরী হিদায়ৎ কেশ—কিন্তু এরা আমাকে চেনে না, জেনে আশ্রয় দেয় নি, এদের ছেড়ে দাও!'

* * *

পুরো দু মাস সময় লেগেছিল পান্নার—মহম্মদ করিমের পরিণাম কি হ'ল জানতে। বিস্তর খোঁজ করতে হয়েছে তাকে—বিস্তর লোকের হাতে-পায়ে ধরতে হয়েছে। তবে শেষ অবধি খবর পেয়েছিল ঠিকই। কোন্ সামান্য মাটি-চাপা-দেওয়া কবরে শাহ্জাদার দেহ আশ্রয় পেয়েছে—অনেকদিন ধরে অনাদৃত পড়ে থাকার পর—তাও খুঁজে বার করেছিল সে। তারপর চুপি চুপি ছোট ভাইকে সঙ্গে ক'রে গিয়েছিল সেখানে।

আর কিছুই ছিল না ওদের সে কবরে দেবার মতো। শুধু পথে আসতে

আসতে পুষ্পিত গুলমোরের শাখা ভেঙে এনেছিল ক'টা। সেই ফুল আর নিজের চোখের জল সে ঢেলে দিয়েছিল শাহ্‌জাদার কবরে। আশ্চর্য সুন্দর পদ্মপত্রের মতো তার সেই দুটি চোখের জল—যে জল মোছাবার জন্যে শাহ্‌জাদা একদিন কোহিনূর-শোভিত তাজ আর শাহী-তখ্‌ৎ অনায়াসে বিলিয়ে দিতে রাজী ছিলেন।

ঢেঁকির স্বর্গারোহণ

যমুনা সিংকে চিনতে না পারার কোন কারণ ছিল না। অনেকদিন ধরেই দেখেছি তাকে—তরুণ কিশোর থেকে পক্ককেশ প্রৌঢ় পর্যন্ত। অন্তত ত্রিশ বছর তো দেখেছিই—তবে এখানে, হিমালয়ের এই, দুর্গম না হোক দূরবর্তী—তীর্থে তাকে দেখতে পাব, এই চায়ের দোকান-কাম-হোটেলের গদিতে ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে—তা একদম আশা করি নি। আশা করি নি বলেই অন্য লোক ভেবেছি। আর তাছাড়া, গত বছর-সাত-আট দেখিও নি তাকে, ভেবেছিলুম মরেই গেছে। বেঁচে থাকলে কলকাতাতেই দেখা হ'ত।

সেই জন্যেই, থমকে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখেও, এই লোকটি যে সেই যমুনা সিং সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গিয়েছিল, ওর গালের সেই বীভৎস কাটা দাগটা সত্ত্বেও। তাই আবার এগোতে এগোতে অনুচ্চ কণ্ঠেই মেয়েকে বলেছিলুম, 'এ লোকটি অনেকটা আমাদের যমুনা সিংয়ের মতো দেখতে।'

সেই নিচু গলাই তার কানে গিয়ে থাকবে। পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে ছিল সে, টেবিলটায় হাত রেখে, হঠাৎ যেন অস্থির হয়ে নড়ে-চড়ে বসল। ব্যাকুল হয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখল—তারপর চুপি চুপি যে ছোকরা রান্না করছিল তাকে কি বলল। সে ছুটতে ছুটতে নিচে এসে বলল, 'বাবুসাহেব, আপনারা যমুনা সিংয়ের কথা বলছিলেন? এই তো যমুনা সিং। আসুন আসুন, উপরে উঠে আসুন—উনি আপনাদের সঙ্গে কথা কইবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।...এখানে চেনা লোক তো বড় একটা দেখা যায় না, উনি বলছেন নিশ্চয়ই কলকাতার কোন বাবু এসেছেন—কতকাল কারও সঙ্গে দেখা হয় নি, তুই ওদের ডেকে আন।...আপনারা দয়া ক'রে একটু উপরে চলুন—,

এই তা হলে যমুনা সিং!

তখন আর আলাপ জমাবার ঠিক ইচ্ছা ছিল না, মেয়ে-জামাইও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তারা হাল-আমলের মানুষ, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কও কম, কলকাতাতে যাদের নাড়ি-বাঁধা তাদের পরস্পরের প্রতি টান ওরা বুঝবে না। তবু কী আর করা যাবে, এমন অনুরোধ 'না' করা যায় না। অগত্যা ক'টা সিঁড়ি বেয়ে ওপরের হোটেল-ঘরে উঠতে হ'ল।

ততক্ষণে যমুনা সিংও তার গদি ছেড়ে কেমন যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে। বোধ হ'ল একটু হাতড়ে হাতড়েই চলছে, সেই রকম স-সন্তর্পণ পদক্ষেপ। কাছে এসে একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে তার ঘোলাটে চোখে খানিকটা চেয়ে থাকার পর চিনতে পারল, 'আরে, ছোটবাবু! আসুন, আসুন, বসুন, এই গদীতে বসুন, এরা কে? মেয়ে, জামাই, নাতনী? বসুন বসুন, আপনারাও বসুন আরাম ক'রে। ছোটবাবু আপনি আমাকে চিনতে পারছিলেন না? কী আশ্চর্য!'

'চিনতে না পারলে আর নামটা করলুম কেন! তবে এখানে তোমাকে দেখব, এভাবে—একেবারেই মনে করি নি। তাই দেখেও চোখকে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না।...তা তুমিও তো আমাকে চিনতে পারো নি!'

'না ছোটবাবু, আপনাকে চিনতে আমার ভুল হ'ত না, তা যেখানেই দেখি না কেন। আসলে দেখতেই পাই নি যে! এ চোখটায় একেবারেই দেখি না—পুরো ছানি পড়ে গেছে। এটাতেও পড়ে আসছে, খুব কাছে এলে তবে ঝাপ্‌সা দেখতে পাই। এই এখন ভাল ক'রে দেখতে পেলুম।'

'ছানি কাটাও না কেন?'

'কাটাব। শুনেছি আসছে মাসে বেনারসের ডাক্তার নাথ আসবেন দেরাদুনে—আমি বলে রেখেছি, সেই সময় নেমে গিয়ে কাটিয়ে আসব। একটা নাতিকে আসতে বলেছি, হয়তো আমার এক বৌমাও আসবেন। কেউ না থাকলে তো হয় না। আমার তো চোখ বাঁধা থাকবে—'

'তুমি এখানে একা থাকো নাকি? এই এত দূরে? দেখে কে?'

'দেখে এরাই', পাচক এবং ভৃত্য বা বয়কে দেখিয়ে দিল যমুনা, 'এদিক দিয়ে আমার কপাল খুব ভাল। এরা আমাকে নিজের বাপের মতোই দেখে।'

'তা এখানে এসে হোটেল খুলে বসার মানে ? ওখানের অত বড় কারবার ভুলে দিয়ে ?'

'বলছি। সব বলব। আপনারা স্থির হয়ে বসুন তো—'

'বসব কি, এখনই ফিরতে হবে যে। যাওয়া-আসার গাড়ি করা, তারা ব্যস্ত হচ্ছে।'

'আচ্ছা, সে একটা কিছু হয়েই যাবে। বসুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, তবে তো ছুটি। আপনাকে এতকাল পরে পেলুম, এমনি ছেড়ে দেব।··· ওহো, ঐ জীপটাতে এসেছেন না, আপনারা ? দেখছিলুম বটে, তেজপালের জীপ।···ঠিক আছে, আমি খবর ভেজে দিচ্ছি, ও কোন গোলমাল করবে না। তিন ঘণ্টা বললে তিন ঘণ্টাই বসে থাকবে। এই চা দে আগে, চা আর নম্‌কীন। বাবুরা ভাত খেয়ে যাবেন, ভাল ক'রে সব্‌জি বানা। আমার অনেক কালের অন্নদাতা এঁরা। এঁরা এসেছেন এই আমার ভাগ্য।'

শেষের অংশটা অবশ্য হিন্দীতে বলল, কিন্তু দেখলাম, যমুনা সিং বাংলা কথা কিছুই ভোলে নি। এখনও চমৎকার বাংলা বলে।

কোন কথাই শুনল না যমুনা সিং। একাই যা হয় বকে গেল। আমার অতবড় মেয়েকে জোর ক'রে হাত ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে। জামাইয়ের ভ্রূ কুঁচকে ছিল, তার কাছে গিয়ে হাতজোড় করল। নাতনীকে কোলে করল। চা খাওয়াল, ভাত খাওয়াল—তার ফাঁকে ফাঁকে দুনিয়ার খবর নিল। ওর বিগত জীবনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের প্রায় সবাইকার। মনে হ'ল আজ যেন আমার মধ্যেই গোটা কলকাতা শহরটাকে হাতে পেয়েছে সে, সেই সঙ্গে তার একদা-কর্মস্থুল বিগত জীবনটাকেও। নিঃশেষে পান ক'রে নিতে চায় সেই স্মৃতিটাকে, ফিরে পেতে চায় সেই কর্মসার্থক যৌবন-কালটাকেও।

একটু নমুনা দিই, তাহলেই বুঝবেন—

'মেজবাবু এখন কি করছেন ? সেখানেই আছেন ? সেই বাড়িতেই ? নেই ? কোথায় বাড়ি করেছেন—কর্নফীল্ড রোডে ? আচ্ছা, সেখানে যে রায়েদের জমিগুলো ছিল ?—সেই জমিই ? মণিময়দা' কোথা ? বিলেত থেকে আর ফিরবেন না ? মেজবাবুর কি ছেলেমেয়ে ? কী কী করে তারা সব ? বিয়ে-সাদী হয়ে গেছে সকলকার ? আপনার ? বড়বাবু কোথায় থাকেন ?

বড়বাবু আর বিয়ে করলেনই না? মা? ও, মারা গেছেন? কবে? আহা, বড্ড ভালবাসতেন আমাকে। বলতেন, মুখপোড়া পয়সা পয়সা ক'রে গেল একেবারে, দেহটার দিকে একবার তাকায় না। এমন ক'রে দেহপাত ক'রে পয়সা করছিস—এর পর পয়সা যখন হবে তখন আর ভোগ করার ক্ষমতা থাকবে না। সাচ বাত। বহুত সাচ। ঠিকই বলেছিলেন। আচ্ছা, শাস্ত্রীবাবু বেঁচে আছেন? প্রমথবাবুরা? আপনাদের ঢাকুরিয়ার বিনয়বাবু? নেই? কবে গেলেন?'···ইত্যাদি—

এমন অনর্গল একের পর এক প্রশ্ন করে যে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তবু কোনমতে, ওরই ফাঁকে ফাঁকে তার কথাও কিছু শুনে নিই। কিছু জানাই ছিল—কিছু এখন জানলুম।

জানলুম এখানে এসে এই অজ্ঞাতবাস করার রহস্যটাও।

যমুনা সিংকে আপনারাও দেখে থাকবেন কেউ কেউ। মনে ক'রে দেখুন, ঠিক মনে পড়বে। মনে পড়ছে একটু একটু? ও অবশ্য বলে যমুনা সিং। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কসবা ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জে বাস করেছেন বা যাতায়াত করেছেন নিয়মিত—তাঁদের সকলেরই মনে পড়ার কথা অন্তত। তাই বা বলছি কেন—১৯৪০ পর্যন্ত বলতে গেলে ও অঞ্চলের ও-ই ছিল একমাত্র সংবাদপত্র-সরবরাহক। হকার নয়—চেঁচিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বিক্রি করত না—বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত। তবে এক-আধ দিন—বেশি কাগজ বেঁচে গেলে—কারণ অন্য ছোট হকারদেরও ও কিছু কিছু সাপ্লাই করত, তাদের নেওয়ার কিছু ঠিক ছিল না—ওখানে নয়, শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকত, 'এক পয়সা এক পয়সা বাবু, দু পয়সার কাগজ এক পয়সায় পাচ্ছেন। 'নন্দবাজার বসুমতী ফরওয়ার্ড! এক পয়সা!'

যমুনা সিংকে মনে রাখার আরও কারণ আছে। ভারী সুন্দর চেহারা ছিল ওর। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত মুখশ্রী—দোহারা সুঠাম গঠন, দেখবার মতোই চেহারা। ঐ কাটা দাগটা, ফোড়ার—তখন ছিল না। ছায়াছবির হিরো হবার মতোই মুখ ছিল। শুধু তাই নয়, তার মধুর হাসি আর অমায়িক কথাবার্তায় সকলেই ভালবাসত। টাকার তাগাদার মতো অপ্রীতিকর

কাজও এমন সুকৌশলে করত, এমন মিষ্টি ক'রে—ভিক্ষে চাইবার মতো সবিনয়ে যে, লোকে তাগাদা বলে ভাবতেই পারত না। অথচ তার টাকা পড়েও থাকত না বিশেষ।

যমুনা সিং নাকি বেশ বড় বংশের ছেলে। উত্তর বিহারের এক গ্রামে ওর বাড়ি, বর্তমান উত্তর-প্রদেশ-ঘেঁষা জায়গাটা। ওদের বাড়ি থেকে নাকি আট-ন' মাইলের মধ্যেই সেকালের সংযুক্ত-প্রদেশ পড়ত। দেশে জমি-জায়গা ক্ষেতীউতি ছিল বিস্তর, গরু ভৈঁস—খুব ধনী না হলেও এখানে এসে খবরের কাগজ বিক্রি করার মতো অবস্থা নয়। তবু কেন যে এভাবে মাত্র সতেরো বছর বয়সে একা কলকাতায় চলে এসেছিল একবস্ত্রে—সে এক কাহিনী।

ব্যবসা এবং টাকা—এ দুটো বস্তু ওর মজ্জাগত। এর প্রতি আসক্তি নিয়েই ও জন্মেছে বোধহয়। ছোটবেলা থেকেই নাকি ওর বিষয়-বুদ্ধি প্রখর। একবার ওর দাদা এসেছিলেন গঙ্গাসাগর করতে, ওর বাড়িতেই উঠেছিলেন, সেই সময়েই ওর কীর্তির কথা শুনেছি।

ওর মা-র কী একটা ভারি অসুখ। দামী ওষুধ লাগবে—সদর থেকে ডাক্তার এসে বললেন, শহর থেকে আনতে হবে, এ ওষুধ চাইই। যমুনার ওপরই ভার পড়ল, ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে, কাঁচা রাস্তা দিয়ে একমাত্র সে-ই সাইকেল ক'রে যেতে পারে।

শহর মানে বড় গণ্ডগ্রাম একটা—যেখান থেকে ওষুধ আনতে হবে—ওদের গ্রাম থেকে আট-ন' মাইলের পথ। গিয়ে ওষুধ কিনে ফিরছে, ওদের গ্রামের যিনি চৌধুরী, তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনিও শহরে যাচ্ছেন 'পায়দলে' —তাঁরও স্ত্রী মুমূর্ষু, কী একটা ওষুধ আনতে তার জন্যে। যমুনাকে দেখে উৎসুক ভাবে চেয়ে বললেন, 'এই ওষুধটা এনে দেবে বেটা, তোমার তো শয়তান-চাকার গাড়ি আছে, যেতে আসতে কতই বা মেহনত পড়বে!'

কী যে মাথায় ভূত চাপল যমুনা সিংয়ের, ও বলে বসল, 'না, বেশ মেহনত পড়ে। এতটা পথ, কাঁচা রাস্তা—আলের ওপর দিয়ে যেতে হয়, এক এক জায়গায় নেমে গাড়ি ঘাড়ে ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে হয়, পাশ দিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তা নেই। দেখছেন তো, এই ঠাণ্ডার দিনেও ঘেমে নেয়ে উঠেছি।...তবু, এনে দিতে পারি, এক টাকা মজুরি পড়বে।'

১৯২০ সন-টনের কথা হবে, তখন একটা টাকার মূল্য অনেক, ১৯৩০-এর মত ডিপ্রেশান না হলেও প্রথম যুদ্ধের ফোলানো বেলুন চুপ্‌সে গেছে ঢের, তাছাড়া সে যুদ্ধে ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা হয় নি—তখনকার এক টাকা এখনকার অন্ততঃ সাত-আট টাকা—কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশী। কিন্তু গরজ বড় বালাই—অগত্যা তাতেই রাজী হলেন চৌধুরী।

আবার প্রায় বারো মাইল যাওয়া ও আসা—অনেকটা সময় লাগল। ওষুধ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল যমুনা তখন দুপুরও গড়িয়ে গেছে। রোগীর অবস্থা খারাপ—তাছাড়াও ওর জন্যেও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সকলে। প্রথমটা যমুনা কিছু বলে নি, চেপে ছিল, না কী একটা মিছে কথাও বলেছিল বুঝি—ওষুধের দোকান বন্ধ ছিল বা এই ধরনের কিছু। কিন্তু চৌধুরী সাহেবকে নগদ ষোল আনা গুণে দিতে হয়েছে, তাঁর সে জ্বালা সহজে যাবার নয়, তিনিই ফাঁশ ক'রে দিলেন কথাটা।

বাড়ি-সুদ্ধ সবাই চটে গেল, কিন্তু ওর বাবাই মর্মান্তিক। তিনি বললেন, 'এই বয়সে এত বেনিয়াপন্ শিখেছ তুমি! মায়ের অসুখ—ওষুধ আনতে দেরি হলে জীবন সংশয় হ'ত—আর কী কষ্ট পাচ্ছে তা তো চোখেই দেখে গেলে। এমনিই এত দেরি হয়ে গেছে, বাঁচবে কি না সন্দেহ। মায়ের জীবনের দাম তা'হলে তোমার কাছে এক টাকারও কম!…ঐ এক টাকাতেই বড়লোক হয়ে গেলে!…বেশ, ঐ মূলধন নিয়েই তুমি সরে পড়—ছাখ, এই দুনিয়ায় বেয়ে-চেয়ে—এক টাকায় ক'দিন চলে। এ বাড়ির অন্ন আর তোমার খেয়ে দরকার নেই। এত লায়েক হয়ে গেছ যখন—মায়ের প্রাণ বিক্রী ক'রে রোজগার করতে শিখেছ—তখন চরেই খাও গে!'

খুবই আঘাত লেগেছিল সেদিন যমুনা সিংয়ের। অনেক কথা বলার ছিল ওর দিকেও, সেখানেও একটা মুমূর্ষু প্রাণীর জীবন-মরণের প্রশ্ন ছিল, বিশেষ চৌধুরী সাহেবের অনুরোধ, ওর জায়গায় অন্য কেউ হলেও সে অনুরোধ এড়াতে পারত না। মাঝখান থেকে সুদখোর চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে একটা টাকা বের ক'রে নিয়েছে চাপ দিয়ে—এ তো তার কৃতিত্বই!

কিন্তু অভিমানে এসব কোন কথাই বলল না সে, সত্যিই ঐ এক টাকা নিয়ে ঘর ছাড়ল।…

তার পরের কাহিনী আরও বিচিত্র। হেঁটে রেল-স্টেশনে এসেছিল,

না খেয়ে। সেখানে ভুজাওয়ালার দোকান থেকে কিছু ভাজা মোমফালি বা চিনাবাদাম কিনে নিয়ে বিক্রী করতে শুরু করল ট্রেনে ট্রেনে। দুদিন সেখানেই কাটল। তারপর লক্ষ্য করল ফেরিওয়ালার কাছে কেউ টিকিট চায় না। তখন সেই মোমফালি বিক্রী করতে করতেই একদিন কলকাতা এসে পৌঁছল।

'কলকাতাই বা কেন—আগ্রা, দিল্লী, বেরেলি, বনারস, পাটনা থাকতে?' হয়তো প্রশ্ন করেছে কেউ কেউ। তার উত্তরে ও বলেছে, 'ছেলেবেলা থেকেই শোনা ছিল, যদি পয়সা কামাতে চাও তো কলকাতা শহরে যাও—সেখানকার বাতাসে পয়সা ওড়ে, ধরে নিতে পারলেই হ'ল।'

কলকাতায় ওর এক ফুফেরা ভাই থাকত, শিয়ালদায় কী মিস্ত্রীর কাজ করত যেন, তার একটা গুম্‌টি ঘরের মতো কোয়ার্টারও ছিল। সেখানে বৌ নিয়ে থাকে সে, আর কারও থাকা সম্ভব নয়। তবু সেখানে উঠেই স্নান-টান ক'রে নিল, কাপড়-জামায় সাবুন লাগাল—তারপর শুরু করল টো টো ক'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে। একদিন মাত্র ঐ ভাইয়ার বাসায় খেয়েছিল—ভৌজী অনেক ক'রে বলাতে—আর যায় নি। ঐ ভাইয়াই স্টেশনের পোর্টার বা কুলীদের বলে দিয়েছিল, তাদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকত। খাওয়া—বেশির ভাগই ছাতু ভরসা।

দিন দুই ঘুরেই মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নিল শহরের হালচাল। দেখল যে বিনা পয়সার কারবার করতে গেলে খবরের কাগজ বেচাই প্রশস্ত। পরের দিন থেকেই কাছে লেগে গেল। যারা ফিরি করছে তাদের গিয়ে বলল, 'ক'খানা দাও না ভাই, আমি বেচে দিচ্ছি, যা হয় দিও। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে বিক্রী করব—পালাব না।' ঠিক হ'ল আটখানা কাগজ বেচলে এক পয়সা পাবে যমুনা। ও তাতেই রাজী হয়ে গেল।

শিয়ালদার মোড়ই প্রথম ধরল। সুন্দর চেহারা—ছেলেমানুষ—দেখলেই চোখ টানে। তারপর ছিপছিপে হাল্কা শরীর, ট্রামের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারে। প্রথম দিনই বেশ কিছু কাগজ বেচে ফেলল, অনেকে ওর ঐ প্রয়াস দেখে সামনে অপর লোক থাকা সত্বেও ওকে ডেকে ওর কাছ থেকেই কিনল। প্রথম দিনই চার পয়সা কমিশন পেল—নগদ।

দিন দুই পরে সেই লোকটির একটু বিশ্বাস হ'ল, সে বেশী ক'রে কাগজ

দিয়ে বলল, ধর্মতলার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে। সেদিন সত্যিই অনেক বেশী বিক্রী হ'ল, ওর ভাগে চার আনা পয়সা পাওনা হ'ল, ওর খাওয়ার খরচ বাদেও কিছু বাঁচল।

ইতিমধ্যে শিয়ালদার অনেক পোর্টার বা কুলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজনের কাছে দৈনিক টাকা-পিছু এক পয়সা সুদ অঙ্গীকার ক'রে দুটি টাকা ধার করল। সেই টাকা দিয়ে ওর এ ক'দিনের মহাজনের সঙ্গে কাগজের আফিসে গিয়ে নিজেই কাগজ কিনল, পুরো কমিশনে। তার সবগুলো বিক্রী ক'রে ফেলল সকাল আটটার মধ্যে। রাত থাকতে উঠে গিয়ে কাগজ নিয়েছিল বলে ওর কাগজই আগে বিক্রী হয়ে গেল।

এই শুরু। নিজের চেষ্টাতেই একাধিক কাগজের আপিসে এজেন্সী পাকা ক'রে নিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা ছুটে ছুটে বিক্রী করার মধ্যে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। বাড়ি বাড়ি দিতে পারলে বিক্রীটা বাঁধা থাকে। বেছে বেছে এলাকাও বার করল একটা, বালিগঞ্জের কাঁকুলিয়া অঞ্চলে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় একটা চোর-কুঠ্‌রীর মতো ছোট্ট ঘর ভাড়া নিল, পাকাপোক্ত ভাবে ব্যবসায়ে চেপে বসল এবার। এখানে আসার তিন-চার মাসের মধ্যেই বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা ক'রে নিল।

এর মধ্যে বাড়িতে যায় নি, কোন খবরও দেয় নি। এতটা বোধহয় বাবাও ভাবেন নি, তিনিই খোঁজ-খবর ক'রে ভাগ্নের কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় ক'রে চিঠি দিয়েছিলেন—সে চিঠিরও কোন জবাব দেয় নি। তার পর, মাসকতক বাদে এক দাদা এসেছিল খুঁজে খুঁজে, তাকে ভাল ক'রে খাইয়েছে, সিনেমা দেখিয়েছে, 'কলকাত্তাওয়ালী কালীবাড়ি' নিয়ে গেছে। কাপড়-জামা কিনে দিয়েছে, মা-র জন্যে শাড়ি দিয়েছে—কিন্তু বাড়ি ফিরতে কি বাবাকে চিঠি দিতে রাজী হয় নি। বাবা নিজে কখনও আসেন নি অবশ্য, তবে কয়েকখানা চিঠি দিয়েছিলেন—যমুনা খুব বিনয়ের সঙ্গে সেগুলোর উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু দেশে যায় নি।

সন্ধি হ'ল অনেক দিন বাদে।

বছর-তিনেক পরে ওদের এলাকায় ঘোর অজন্মা হ'ল।

ওদের গরু বাছুর লাঙল বয়েল সব বিক্রী হয়ে গেল। বাবা কিছু জানান নি ওকে। যমুনা খবর পেল ফুফেরা ভাইয়ের কাছে। উপযাচক হয়ে মা-র

নামে শ' দুই টাকা পাঠিয়ে দিল। দু'শো টাকা তখন কুবেরের ঐশ্বর্য, ওদের দেশে অন্তত। এত টাকা ওর পক্ষেও বার করা কঠিন, মূলধনহীন কারবার থেকে—কিছুটা ধার ক'রেই পাঠাল। ওর পক্ষে তখন আরও অনেক বেশী ধার পাওয়াও কঠিন ছিল না। ওর সততা—পয়সা-কড়ির ব্যাপারে কথার-ঠিক রাখা—ওর পরিচিত মহলে গল্প-কথা দাঁড়িয়ে গেছে। তখন পাঁচশো হাজার ধার চাইলেও পেতে পারত।

বাবা এই টাকাটা পেয়ে খুবই উপকৃত হলেন। না পেলে জমি বেচতে হ'ত। ছেলেকে লম্বা এক চিঠি লিখলেন, আশীর্বাদ ক'রে ও একরকম ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে, তবে এও লিখলেন যে তিনি অমন ক'রে না বললে আজ এত অল্পদিনে এমন ভাবে দাঁড়াতে পারত না যমুনা। পরিশেষে পত্রপাঠ ওকে একবার দেশে যেতে লিখলেন।

ছেলেও যথোচিত বিনয়-বচনে উত্তর দিল, কিন্তু দেশে গেল না। লিখল, খবরের কাগজের কাজে একদিনও ছুটি নেই, যাওয়া মানেই লোকসান, স্থায়ী লোকসান। লোকে কাগজ পড়বেই, ওর কাছ থেকে না পেলে অন্য লোক ধরবে, পরে ফিরে এলে কি সে লোককে ছাড়বে সহজে? লাভের মধ্যে ওর প্রতিযোগীরা দাঁড়িয়ে যাবে। কাগজ বিলির জন্যে দু-একজন লোক রেখেছে, কিন্তু তাদের ওপর তত ভরসা নেই, বিশ্বাসও নেই। বিশ্বাসযোগ্য একজন ম্যানেজার রাখার মতো ক্ষমতা যতদিন না হচ্ছে ততদিন যাওয়া একদম চলবে না।

একটা খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছিল অবশ্য। যমুনা এখানে চলে আসার অনেক আগেই ওর বিয়ে হয়ে ছিল। ওদের বস্তী বা মহল্লায় নাকি বারো বছরের ওপর কোন ছেলে আইবুড়ো থাকত না। সতেরো বছর বয়সে যমুনা যখন চলে আসে এখানে, বৌ তখন সবে 'গওনা' হয়ে ওদের বাড়ি এসেছে, তার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপও হয় নি। সে বেচারা নাকি কেবলই কাঁদত তার প্রায়-অপরিচিত স্বামীর জন্যে। বাবা লিখলেন, 'তাহলে তোমার বৌকেই পাঠিয়ে দিই, ওখানে গেলে তোমাকে ভাত-জল দিতে পারবে, নিজে-হাতে পাকিয়ে খেতে হবে না।'

যমুনা জবাব দিল, 'চার হাত চওড়া ছ'হাত লম্বা একটা ঘরে থাকি। তার অর্ধেকেরও বেশী কাগজে জোড়া (তখন বিভিন্ন মাসিক-সাপ্তাহিকও

রাখতে শুরু করেছে)—সেই কাগজের ওপরই শুতে হয়। রাঁধি বাইরে, রাস্তায়, বর্ষা নামলে ছাতু খেয়ে কাটাতে হয়। এর মধ্যে বৌ কোথায় থাকবে?'

এর বছর খানেক পরে একদিন 'তার' এল, 'তোমার বৌ মৃত্যু-শয্যায়, শেষ দেখা দেখতে চায়।'

এবার যেতেই হ'ল। তখন যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজও হয়ে এসেছে। একটি বিশ্বাসী বন্ধু পেয়েছে। যে বাড়িতে ভাড়া থাকে সেই বাড়িরই ছেলে, এম. এ. পাস ক'রে বসে আছে, কী যেন রিসার্চ করছে—দুজনে বন্ধুর মতোই হয়ে গেছে। ওর ঘরে আড্ডা দিয়ে দিয়ে ওর কাজের 'তরিকা'ও কিছু কিছু শিখেছে। সে-ই বলল, 'তুমি যাও, আমি দেখব।' মাইনে-করা লোক আছে, তারাই বিলি করে, আনেও তারা—তাদের কাছ থেকে টাকাটা বুঝে নেওয়া—হিসেবটা, আর যথাসময়ে আপিসে আপিসে সেটা জমা দেওয়া, এইটেই প্রধান কাজ।

বৌয়ের সঙ্গে বলতে গেলে সে-ই প্রথম দেখা—আর সেই শেষও। থাইসিস হয়েছিল শুনল, বোনরা আর ভাবীরা বলল—যমুনাই নাকি তার কারণ। ওরও খুব দুঃখ হ'ল এখানে এসে তার হাল দেখে। যমুনা যখন যায় তখন ফুটন্ত ফুলের মতো কিশোরী মেয়ে সে, স্বাস্থ্যে টলমল করছে, এখন দেখল একটা কঙ্কাল। অনুতাপও হ'ল—বাবা যখন লিখেছিলেন, তখন কলকাতায় নিয়ে গেলে হয়তো বাঁচত। বাসা একটা ভাড়া করার ক্ষমতা একেবারে যে ছিল না তা নয়, একখানা ঘরের ভাড়া আর কত পড়ত।

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। বাসা করায় শুধু ঘর-ভাড়ার প্রশ্নই ওঠে না—বিবিধ খরচ। তখন থেকে জড়িয়ে পড়লে আজ হাতে যে পুঁজি জমেছে তার কিছুই থাকত না। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ত।...

বৌকে দাহ করতে গিয়েও একটা কারবার ফেঁদে এল। ওদের শ্মশান ওদের গ্রাম থেকে প্রায় চার মাইল। কেউ কেউ অতদূর গিয়ে পোড়াতে পারে না, কোন পুকুর-ঘাটে-টাটে জ্বালিয়ে দেয়। তবে বেশির ভাগ লোকই নদীর ধারে নিয়ে যায়—ঐখানে, আশপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামেরই ঐ জায়গা ভরসা। একটা ঘাটও আছে ঠিক করা, সেইখানেই দাহ করে সকলে, কিন্তু

সেখানে কাঠ বা অন্য কোন উপকরণের ব্যবস্থা নেই—যার যা দরকার, বয়েল গাড়ি বোঝাই ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

যমুনা সিংকেও গাছ কাটিয়ে তিল ঘি প্রভৃতি সঙ্গে নিতে হ'ল। গিয়ে দেখল আরও একদল এসেছে তাদের আগেও, তারাও বয়ে এনেছে সব জিনিস। ওরা ফেরার পথে আরও একটি শবযাত্রী যেতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা মতলব খেলে গেল মাথায়। একটা ছোট ভাই ঘরে বেকার বসে ছিল। নদীর ঐ ঘাটের কাছে একটুখানি জমি ইজারা নিয়ে ক'দিনের মধ্যেই একটা চালাঘর তুলল, গোটাকতক গাছ কিনে কাটিয়ে কাঠ নিয়ে গিয়ে বোঝাই করল। আর যা যা লাগে দাহ করতে গেলে—তার একটা ফর্দ করিয়ে নিয়ে পুরুতকে দিয়ে—তাও সংগ্রহ ক'রে রাখল। কলকাতার শ্মশান দেখে এসেছে, এরকম হাতের কাছে সব জিনিস যুগিয়ে রাখলে কত সুবিধে হয় তা বুঝেছে। সেই ভাবেই আয়োজন করল। এ সব-কাজেই ভাইটাকে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিল, কত টাকার গাছে কত কাটাই বোঝাই খরচা দিয়ে ক'মণ কাঠ হ'ল, কত ক'রে পড়তা পড়ল, কী দামে বিক্রী করলে 'ইস্টাবলিশমেণ্ট' খরচা দিয়েও লাভ থাকবে—সব বুঝিয়ে দিল। কী ভাবে এসব খরচা কষতে হয়, তাও। ঘর তৈরির যা খরচ তার সুদ, জমির খাজনা, একটা নৌকর রাখতে হবে তার বেতন—সব বুঝিয়ে দিয়ে দামে পড়তা কষতে বলল। তার পর একটা ঢ্যাঁটরাদার ধরে আশপাশের গ্রামে ঢ্যাঁড়া দিয়ে দিল, এখন থেকে আর কাউকে কাঠ-টাঠ বয়ে নিয়ে যেতে হবে না, অর্জুন সিং ঠিকেদারের কাছে ন্যায্য মূল্যেই সব মিলবে, মায় 'জলখাই'য়ের জন্যে ছাতু-গুড় পর্যন্ত।

বাবা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কেউ তোমার কাছ থেকে টাকা দিয়ে কাঠ কিনবে না। বাজে গাছ সকলের ঘরেই দু'চারটে আছে, টাকাই মুশকিল।'

মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'আমার কুড়ি বছরের বাচ্চা ছেলে, শ্মশানে একা পড়ে থাকবে কি, ভূতে ধরবে যে!'

যমুনা বাপকে জবাব দিল, 'যখন আপনার লোক কেউ মরে, তখন লোক ডেকে কিংবা নিজেরা কোদাল-কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে বলা কম দিকদারী নয়, নিজেকে দিয়েই তো দেখলুম। বিনা ঝঞ্ঝাটে হাতের কাছে পেলে লোকে

ঠিকই নেবে। আর বাজে গাছ আমরা থাকতে দেব কেন, তার আগেই আমরা কিনে নেব ঘুরে ঘুরে, সে কথা অর্জুনকে বলে গেলুম। সে কথা, আর কিছুতে কাউকে ধারে না মাল দেয় সে কথাও—'

মাকে বোঝাল, 'সঙ্গে একজন নৌকর থাকছে, দুজনেই ওখানে শোবে। একা থাকবে কেন? আর গলায় জিনেউ আছে, ওকে রোজ চান ক'রে মন্ত্র জপতে বল—ভূত পিরেত পিশাচ ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।'

ভাইকে বলল, 'মোট কত খরচ হ'ল তোর তো খাতায় লেখাই রইল। লোকসান হয় তো আমার যাবে। আর যদি লাভ হয়—তুই আসলটা কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করবি, সুদ চাই না। তবে যদি আমার বাপেরই বেটা হোস—আসল শোধ হয়ে গেলে যা লাভ হতে থাকবে তার সিকি আমাকে পাঠাবি ঠিকঠিক। তোর ধর্ম সাক্ষী থাকবেন, ফাঁকি দিস তো সে বুঝবে।'

ফাঁকি সে দেয় নি। সেখান থেকে নিয়মিতই নাকি টাকা পেয়েছে যমুনা। এই লড়াইয়ে সংসারের খরচা বেড়ে যেতে যমুনাই ভাইকে অঙ্গীকার থেকে মুক্তি দিয়েছিল, আর কিছু নিত না।

আরও একবার দেশে যেতে হয়েছিল তাকে মাস কতকের মধ্যেই। আর একটি বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে বাবা 'তার' পাঠিয়েছিলেন। এবার আর আপত্তি করে নি যমুনা। একটা বৌ বুঝি এবার ওরও দরকার হয়ে পড়েছিল।

এবার সেয়ানা ডাগর বৌ। তবু এখানে আনে নি যমুনা সিং। স্ত্রী আর সংসার পুরুষের পায়ের শিকল, উন্নতির বাধা। তবে এবার আর ভুল করে নি। বছরে একবার ক'রে দেশে যেত।

এধারে তার উন্নতিও হয়েছে বিস্তর। টাকা কিছু কিছু সুদে খাটাতে শুরু করেছে। গহনা কি সোনা রেখে নয়, ব্যবসাদারদের মাল রেখে। একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়েছিল, বালিগঞ্জে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতেই। স্বভাবগুণে তাদের বাড়ির ছেলের মতোই হয়ে গিছল সে। সেই বন্ধুটি ডক্টরেট পেয়ে অধ্যাপক হয়েছে, কিন্তু যমুনার সঙ্গে বন্ধুত্ব বেড়েছে বই কমে নি। অশিক্ষিত বলে অবজ্ঞার চোখে দেখত না, মানুষ বলে শ্রদ্ধা করত। ইতিমধ্যে যমুনাও ইংরেজী ও বাংলা শিখে নিয়েছিল কিছু কিছু—চলনসই গোছের, ঐ বন্ধুর কছেই।

মালের ওপর টাকা ধার দিত, কাপড়ওলার কাপড়ের গাঁট রেখে, জামা-ওয়ালার কিছু 'ইস্টক' রেখে। তারাই ওর ঘরে তুলে দিয়ে যেত, আবার সুদ-সুদ্ধ শোধ ক'রে নিয়ে যেত। একবার এক-লরী সিগারেট এনেই পুরল ঘরে। বলত, 'সোনার জিনিস রেখে টাকা ধার দেওয়ার অনেক ঝামেলা, গেরস্তরা চট ক'রে দেনা শোধ করতে পারে না, তাদের সোনা পাহারা দিতে প্রাণান্ত। ব্যবসাদারদের লেন-দেন তাড়াতাড়ি হয়, এ-ই সুবিধে।'...

এই ভাবে চলতে চলতে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

সবাই যখন বোমার হিড়িকে শহর ছেড়ে পালচ্ছে, যমুনা বৌকে আনিয়ে নিল এখানে। বাড়িওলারা মেয়েদের সব গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট, বৌ এসে রান্না ক'রে সকলকে খাওয়াতে লাগল। তাঁরা বিনা ভাড়ায় ভেতরে ভাল ঘর ছেড়ে দিলেন, বাজার-হাট সব ক'রে দিতে লাগলেন, ওদের খাওয়ার খরচও তাই থেকে উঠে যেতে লাগল।

সে সময় বাড়ি বিক্রীর খুব হিড়িক। যমুনা কাঁকুলিয়া অঞ্চলেই একখানা প্রায়-নতুন বাড়ি কিনে নিল পাঁচ হাজার টাকায়। লোকে বলল, 'তুমি কি বেকুফ!' যমুনা হাসল মুচকে।

তারপর এল পঞ্চাশের মন্বন্তর। যমুনা সত্যিই টাকার গন্ধ পেত। ও তার আগে থেকেই নতুন বাড়িতে, আর একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চাল মজুত করতে শুরু করেছে। দশ টাকা মণ থেকে চল্লিশ টাকায় পর্যন্ত কিনে গেছে—বেচেছে ত্রিশ থেকে ষাটে। তারপর যেখানে থামা উচিত সেখানেই থেমেছে। চাল ছেড়ে কাপড় ধরেছে। রাশি রাশি কাপড়, সেগুলো আড়তদারদেরই বেচেছে পরে—ডবল মুনাফায়।

সে-ই ওর জয়যাত্রার শুরু। কী না করেছে তার পর। শেষে লড়াই থামলে বৌবাজার অঞ্চলে একটা বড় রাস্তার ওপর বিরাট একখানা ঘর নিয়ে আটার কল তেলের কল এবং ডাল-কড়াই-তিসি-খোলের গোলদারী দোকান খুলল। কসবায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে গেঞ্জির কল বসাল, শেয়ার কিনল—চিনির কলের, কাপড়ের কলের, কাগজের কলের।...

এর ভেতর কিছুতে যে লোকসান খায় নি তা নয়—তবে মোট জমা-খরচে লাভের দিকেই ভারী হয়েছে বরাবর; বড়বাজারে সস্তায় একটা কাপড়ের দোকান কিনে নতুন মাল দিয়ে শালাকে বসিয়েছিল, সে শালা আধাকড়িতে

সব-সুদ্ধ বেচে একদিন হাওয়া হ'ল। তা হোক—এসব সংবাদে কিন্তু যমুনা সিংয়ের প্রশান্ত মুখে একটি শিরাও কম্পিত হতে দেখে নি কেউ, হাহুতাশ কি গালাগালি তো দূরের কথা।

বড়বাজারের লোকসান তুলল বালিগঞ্জে। একটা ছোট্ট পোশাকের দোকান কিনল দশ হাজার টাকায়—মাল তার ভেতর হাজার টাকারও ছিল কিনা সন্দেহ। ছিল যেটা—সেটা ভাড়ার লীজ। অনেকেই বলাবলি করলেন 'এইবার ব্যাটা ডুবল, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি!' যমুনা অভ্যস্ত হাসি হাসল। তারপর এক বিখ্যাত কোম্পানীর কাছে নগদ ত্রিশ হাজার টাকার সেলামী নিয়ে হস্তান্তর ক'রে বেরিয়ে চলে এল হাসতে হাসতে।...

এসবই বহুদিনের ঘটনা। গত বছর-কয়েক আগে, সেই যে সর্ষের তেল নিয়ে যখন নানান্ কেলেঙ্কারি হচ্ছে, তখন পুলিস নাকি যমুনা সিংয়ের তেল-কলেও হানা দিয়েছিল, কল বন্ধ ছিল দিনকতক। কি হয়েছিল ভাল জানি না। কিন্তু তার পর থেকে আর ওকে দেখি নি। মাস কতক বন্ধ ছিল অত বড় ঘরখানা, পরে যাতায়াতে দেখলুম নতুন ক'রে কে যেন হাল-ফ্যাশনের একটা রেস্তোরাঁ খুলেছে। উঁকি মেরেও যমুনা সিংকে দেখতে পাই নি। ওদের কী হ'ল—আর কোন খবরও পাই নি। ওরা ও রেস্তোরাঁ খোলে নি এটা ঠিক—কিন্তু ওদের সে বড় বড় কল আর রাশীকৃত মাল কি হ'ল, কাকে বেচল, এ-ঘর তারাই ভাড়া দিল কিনা—কেউ বলতে পারল না। তাতেই শেষ পর্যন্ত একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, যমুনা সিং মরে গিয়ে থাকবে। নইলে এখানে নতুন কারবার হ'ল—অথচ সে নেই, তা কেমন ক'রে হয়?

তারপর—একেবারে এই।

বললুম, 'ব্যাপার কি, খুলে বল দিকি।'

একটু চুপ ক'রে রইল হাসি-হাসি মুখে, তারপর বলল—দেখলুম বাংলা কথা সে এখনও ভোলে নি, আগের মতোই পরিষ্কার বলতে পারে—'ব্যবসা বড্ড বেড়ে গিয়েছিল, নিজের বয়স হয়েছে, শরীরও আর বইছিল না। আর ওরই বা অপরাধ কি, আপনার মায়ের কথাই ঠিক, অত্যেচার তো কম করি নি ওর ওপর, নিহাৎ বাপ-দাদার দয়ায় লোহার মতো শরীর পেয়েছিলুম বলেই এতকাল যুঝল, নইলে কবেই জবাব দিত।...তা যা বলছিলুম, একা আর পেরে

উঠছিলুম না। ছেলেদের ওপরই ভার দিতে হয়েছিল—বুঝলেন না ?'

আমি বললুম, 'সে তো ভালই, তাতে দোষটা কি ?'

একটু মৌন থেকে বলল, 'দেখুন, পয়সা আমি খুব চিনি, পয়সাও আমাকে চিনেছে চিরকাল। ব্যবসা ব্যবসা ক'রেই পাগল সেই ছোটবেলা থেকে। একটা বৌয়ের দিকে তো তাকানোই হ'ল না, মরে গেল বেচারী। কিন্তু আমি ছোটবাবু চলি সিধাসিধা। হ্যাঁ—চালে কাপড়ে মুনাফা করেছি মোটা—তাকে যদি ব্ল্যাক বলেন তো ব্ল্যাক। তবে চল্লিশ টাকায় কিনে ষাট টাকায় বেচেছি ঠিকই, কিন্তু তাতে পাথরও মিশোই নি, ওজনেও মারি নি—ধরম জানে। তাও, যেদিন থেকে প্রাইভেট চাল বেচা বারণ হ'ল, কণ্ট্রোল হ'ল, সেদিন থেকে আর ওকাজে যাই নি। ব্যবসা করেছি—কিন্তু ব্যবসার গলিপথে কখনও হাঁটি নি।...কিন্তু ছেলেরা বোঝে অন্যরকম, আমার মতো দুঃখ পেতে হয় নি তাদের, তবু তাদের কুমীরের হাঁ, পেট ভরে না কিছুতেই। একটা পুলিস-কেস হয়েছিল জানেন তো ? আমি তখন দেশে, শরীর খারাপ, বিশ্রাম নিচ্ছিলুম, বড়ছেলেকে বসিয়ে গিয়েছিলুম। সে-ই অতি-লোভে সর্ষের তেলে তিসির তেল মিশিয়ে ছিল। খবর পেয়ে এসে তো ওর জরিমানা জেল বাঁচালুম, কিন্তু সেই আমার ঘেন্না হয়ে গেল। বললুম কি—আর না।

'এর মধ্যে আমার দু'নম্বরের বৌটাও মরে গিয়েছিল। কাছেই ছিল, ছেলেপুলেও হয়েছে—কিন্তু টাকা টাকা আর ব্যবসা ব্যবসা ক'রে তার দিকেও ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখি নি কোনদিন। কিন্তু মানুষটা বড্ড ভাল ছিল, সতীলক্ষ্মী, মুখ বুজে খেটেই গেছে চিরকাল, সকলের হুকুম তামিল করেছে—মুখ ফুটে নিজে কিছু দাবী করে নি। একটা শখ ছিল, তীর্থ করতে যাবার—ছেলের সঙ্গে পাঠাতে চেয়েছিলুম, ঐখানে অভিমানে লেগেছিল, বলেছিল, না, যাই তো তোমার সঙ্গে যাব। যখন তোমার সময় হবে তখন নিয়ে যেও।... আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছিলুম, ততদিন যদি না বাঁচো, কি আমিই না বাঁচি ?... জবাব দিয়েছিল, আমি না বাঁচি তুমিই যেয়ো, তোমার মধ্যে দিয়েই আমার তীর্থ হবে, আর তুমি যদি না বাঁচো ? তাহলে আর আমার তীর্থে দরকারই বা কি ! সে পোড়ামুখ আর কোথাও বার করব না।

'কথাটা এবার মনে পড়ে গেল। ভেবে দেখলুম বিস্তর রোজগার করেছি —আর কেন ? কলকাতায় তিনখানা বাড়ি, পাটনায় একটা, বাবার শখ

ছিল পাটনায় এসে গঙ্গাতীরে মরবেন, সে শখ মিটিয়েছি। দেশে বিরাট দালানকোঠা দিয়েছি—ব্যাঙ্কে আর শেয়ারে সার্টিফিকেটে অন্তত তিন লাখ টাকা আছে, এছাড়া ছেলেদের জামাইকে সব আলাদা আলাদা কারবার ক'রে দিয়েছি, সকলেই বেশ রোজগার করছে—আর কেন? ঐ বড়ছেলেটাও দুজন মহাজনের সঙ্গে মিলে চিনির কল করেছে—পারে তাই থেকেই ক'রে খাবে, নয়তো যা আছে ভেঙ্গে খেলেও ওর জীবন বেশ চলে যাবে।···ব্যাস, যাঁহা ভাবা তাঁহা কাজ, সব গুটিয়ে ফেললুম। তাই কি কম ঝামেলা! যন্ত্রপাতি বেচে, গুদোমের মাল অন্য মহাজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে সরিয়ে—আর যা যা কারবার ছিল বিক্রী ক'রে ছুটি হতেই এক বছর সময় লাগল। ছেলেরা এতে ব্যাজার,—বুড়ো ঘোড়াকে ঘানিতে জুতে বেশ টাকা আসছিল, যা থাকবে ওদেরই থাকবে—ওরা তো বিরক্ত হবেই! আমি বললুম, না, ঢের করেছি, আর নয়।

'সব চুকিয়ে বেরিয়েছি তীর্থে। হ্যাঁ—ঐ যে কলকাতার সব বিক্রী করলুম, তার অর্দ্ধেক টাকা দিয়েছি আমার মেয়েকে, ওর কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়েছি—সে আর পরে কোন ভাগ চাইবে না। ছেলেদের মনের ভাব—এখনই সব ভাগ ক'রে দিয়ে দিই—মরার পরে অনেক ট্যাক্স-ডিউটি লাগবে। আমি বলি, ভাগ, কতদিন বাঁচব ঠিক আছে! তোদের সব দিয়ে আমি ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াই আর কি! হ্যাঁ, ঐ বাকী অর্দ্ধেক টাকা থেকে খানিকটা দিয়ে আমার বড় স্ত্রীর নামে দেশে একটা হাসপাতাল ক'রে দিয়েছি। মানে আমি এক লাখ টাকা দিয়েছি, বাকীটা সরকার—নাম আমার স্ত্রীরই থাকবে।···

'তারপর একবছর ধরে ঘুরেই বেড়িয়েছি বাবু, সেই যে ও বলেছিল তোমার মধ্যে দিয়েই আমার তীর্থ হবে—সেইটে মনে ক'রেই। চিরকাল তো রোজগারই ক'রে গেলুম, খরচ করি নি বিশেষ, টাকা এমনি বার করতে বেশ কষ্টই হ'ত—তবু করেছি। যেখানে যা করবার—শ্রাদ্ধ, গোদান, ব্রাহ্মণ-ভোজন, সাধুভোজন—কিচ্ছু বাদ দিই নি। আমার স্ত্রীর মনে মনে ছিল—এই সব করবে, কলকাতায় বসে যা হয় ব্রত উপবাস দান সে করেওছে, বড় লক্ষ্মী বৌ ছিল ছোটবাবু, অনেক ভাগ্যে মেলে, বেটাদের বৌ সব দেখছি তো—তা আমি ওর দান-পুণ্যে কখনও বাধা দিই নি, এটাও ঠিক। আরও—সে সঙ্গে থাকলে কী কী করত সেই ভেবেই সব করেছি—পাণ্ডারা যা যা

বলেছে, বেশী তকরার করি নি।...

'ঘুরতে ঘুরতে শেষে এইখানে এসে পড়লুম ছোটবাবু। ভারী ভাল লাগল জায়গাটা। যেতেই ইচ্ছে করে না যেন। তা ভাবলুম যাবই বা কেন ? কোথায় যাব ? তিন ছেলে তিন ঠাঁই, দেশে ভাতিজার দল—তারা কেউই আমাকে চাইবে না। নিজেদের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছে, আমি গেলে একটা উৎপাত। টাকা রোজগার করতুম যতদিন ততদিন তবু এক রকম ছিল, অন্তত লোক-দেখানো আত্মীয়তা করত—এখন তো আপদ। তাই মন ঠিক ক'রে ফেললুম—এখানেই থাকব। যা ভাবা তাই কাজ আমার চিরদিন, এ বাড়িটা বিক্রী ছিল না, বেশী দাম বলতেই ছেড়ে দিলে। ছিল একতলা, দোতলায় ঘর বানিয়ে নিলুম। আসবাব আনিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসলুম, নোকরও পেয়ে গেলুম মনের মতো, বিশ্বাসী। আর কি চাই ?...

'মাস ছয়েক এমনি বসে রইলুম। দিন আর কাটে না। বসে বসে বাজারের হাল-চাল দেখি; দেখি আমার পাশে ঐ লোটা-ওয়ালার হোটেল। খুব জোর চলে, এমন জায়গায় এত লোক খেতে আসে—না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। হঠাৎ মাথায় গেল, বসেই তো আছি, আমিও একটা হোটেল খুলি না—বড়-রাস্তার ওপর বাড়ি আমার, আমাকে ফেলেই ওর কাছে যেতে হবে—বসে না থেকে বেগার দেওয়া। না হয় কিছু লোকসানই হবে।

'সেই মতলবেই নিচের ঘরগুলো ভেঙে একটা বড় হল-ঘর ক'রে নিলুম। রান্নার লোকও ভাল জুটে গেল, রতন সিং। ওর বাড়ি এখানে—ঋষিকেশের এক হোটেলে রান্না করত, ছুটিতে দেশে এসেছিল, দু'টাকা বেশি কবুল করতেই রাজী হয়ে গেল, ওর তো সুবিধে, রাত্রে বাড়ি যেতে পায়। তার পর এই চলছে।'

এই বলে থামল সে। কিন্তু বক্তব্য যে তার শেষ হ'ল না, সেটা তার মুখ দেখেই বুঝলুম। আরও কিছু বলার জন্যে উশখুশ করছে। তাই আমিই খেই ধরিয়ে দিলুম, 'তা কেমন চলছে ?'

'ভালই চলছে। বছর দুই তো হয়ে এল প্রায়। আমার জীবনই এই, কারবার থেকে ভগবান রেহাই দেবেন না। প্রথম বছর তো, তবু—হিসেব ক'রে দেখেছি—নীট হাজার টাকা লাভ হয়েছে গত বছর, সব খরচ—মায়

একটা বাড়ি-ভাড়া ধরেও।'

'তারপর—' একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'অবিশ্যি সে লাভ আমি ঘরে তুলি নি, এখানকার ঐ বড় মঠটায় টাকা দিয়ে একটা ভাণ্ডারা দিইয়েছি। আশপাশের যত মঠ মন্দির কুটিয়া ঝোপড়া আছে—লোক পাঠিয়ে সব সাধুকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হাজার টাকাতে কুলোয় নি—বাড়ি-ভাড়া হিসেবে যেটা সরিয়ে রেখেছিলুল সেটাও ওর সঙ্গে ধরে দিয়েছি। ভাল ভাণ্ডারা হয়েছিল। বৌটা বেঁচে থাকলে খুশী হ'ত।'

প্রাণের টিয়া

জাফর ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায়। ময়নদ্দী চুপচাপ বসে আছে হাত-পা গুটিয়ে, গুম হয়ে। হ্যাঁ, হাত-পা গুটিয়েই ঠিক, দুই হাঁটু চিবুকের কাছে জড়ো ক'রে, দুই হাতে সে দুটো বেড়ে ধরেছে, আর সেই হাঁটুর ওপরই দাড়িটা রেখে বসে আছে। যাকে, মেয়েরা বলে তিন-মাথা-এক ক'রে বসা।

'ও-ই। মোহন মিয়া। এখনও বসে? কাজে লাগো নি যে? নাস্তা হয়েছে? না, তাও হয় নি?···আজ তো রসুই নেই, না ভাত পাকাতে হবে?'

ময়নদ্দী নাম, কিন্তু জাফর ডাকে মোহন মিয়া বলে। তার দেখাদেখি আরও অনেকে ডাকছে আজকাল। ময়নদ্দীরও মন্দ লাগে না। মোহন বলতেই সুন্দর কিছু মনে ভাসে—ঐ নামটায় সে সৌন্দর্যের আভাস ওদের মনে হয়তো জাগে, ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আর সত্যিই রঙটা না হয় কালো, ময়নদ্দীর মতো লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা এ কারখানায় কার আছে? ঐ তো জাফর, সুন্দর চেহারা বলে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—হ্যাঁ, রঙটা ময়নদ্দীর চেয়ে এক পোঁচ পরিষ্কার তা মানে সে—ফরসা নয় কোনমতেই—চোখ দুটোও খুব বড় আর টানা, দাঁত ঠোঁট নাক সবই ভাল—কিন্তু তেমনি ঐ ঠোঁটের ভঙ্গীতে রাজ্যের বজ্জাতি মাখানো—মেয়ে ভোলাবার জন্যে বোধ হয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে 'প্যাকৃটিছ' করেছে কতদিন—কিন্তু তা হোক, এক বেঁটে হয়েই সব নষ্ট হয়ে গেছে, এক-কড়া দুধে একফোঁটা

গো-চোনা। মেপে ত্থাখো—পুরো একটি হাত লম্বা ময়নদ্দী ওর চেয়ে। না, মানে এক হাত না হলেও এক হাতের কাছাকাছি। কাশেম ছোকরার ফরসা রঙ, কিন্তু এই বয়সেই নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়ে গেছে। ভুঁড়ি হলে আর চেহারার বাহার কি রইল?

'কী হ'ল মোহন মিয়া? তবিয়ৎ খারাপ নাকি? বোখার হয়েছে?'

এই এক রোগ জাফরের। কবে কোন পুরুষ আগে বিহারী ছিল ওরা—এখন তো এই নারকেলডাঙায় তিন পুরুষ আছে—তবু মধ্যে মধ্যে দু-একটা হিন্দী বাত না ছাড়লে চলে না।

এবার জবাব দিল ময়নদ্দী, 'না, কিছু হয় নাই।'

'তয়?' আবারও প্রশ্ন করে জাফর।

জাফরের দোষ নেই খুব। অবাক সে হতেই পারে। কেন না যত আগেই আসুক—ময়নদ্দীকে চুপচাপ বসে থাকতে সে কখনই দেখে নি। হয় রসুই করে—তবে সে কদাচিৎ, রবিবার রবিবার ক'রে সে এক সের (কী আজকাল কিলো-মিলো হয়েছে, মাথায় ঢোকে না ময়নদ্দীর) গরুর মাংস কিনে আনে, লঙ্কা পিঁয়াজবাটা আর তেলে ফুটিয়ে রসুই করে, একফোঁটাও জল দেয় না। জলে ফুটলে নাকি মাংস বেশীদিন থাকে না, খারাপ হয়ে যায়। এ আচারের প্রক্রিয়ায় তৈরী বলে খারাপ হয় না—পুরো সাতদিন ধরে খায় ময়নদ্দী। ভাতটা অবশ্য অতদিন থাকে না, একদিন অন্তর রেঁধে নেয়, যেদিন রাঁধে সেদিন সকালে গরম রাত্রে পান্তা, পরের দিনও পান্তা খায়। দ্বিতীয় দিন রাত্রে শিয়ালদার মোড়ের হোটেল থেকে রুটি কিনে আনে, তাই খায়। কোনদিন ভাত বেশী থাকলে পান্তাও চালায় তার সঙ্গে।

ময়নদ্দী কারখানাতেই থাকে। কারখানাদার সুলতান মিয়াই তাকে রেখে সেই পাকিস্তান লড়াইয়ের আগে দেশে চলে গিছল; শালার জামাই, চুরি-চামারি করবে না এই বিশ্বাসে, তখন সে ভাবে নি যে এইভাবে এতদিন সেখানে আটকে যাবে। সেই হক্কে ময়নদ্দী কারখানাতেই শোয়, ওখানেই রকের এক পাশে রসুই ক'রে খায়। তার বদলে অবশ্য সে কাজও করে ঢের। তিনটে ঘর ঝাড়ু দেয়—চ্যাটাই পাতা থাকলেও সারাদিনে নোংরা তো কম হয় না। ছাদ দিয়ে জল পড়ছে কিনা, উই (ওরা বলে উলু) নামছে কিনা—লাট নেড়ে নেড়ে দেখে। বাড়তি সময়, রসুই না থাকলে, এই কাজগুলোই

সারে ময়নদ্দী—অন্তত জাফর এসে যা দেখে। এর জন্যে ওপর-টাইম পায় না—নিতান্ত শখ ক'রেই করে। বসে থাকতে ভাল লাগে না বলেই।

অবশ্য কাশেম বলে তা নয়, দারোয়ান জঙ্ বাহাদুর থাপার মেয়ের সঙ্গে রস করে সে—এই এঘর ওঘরে পাহাড়ের মতো লাট দেওয়া ফর্মার আড়ালে। সেইজন্যেই এত নাকি কাজে 'আটা' ময়নদ্দীর, আর এ ব্যবস্থাটা সুবিধেরও—একই জায়গায়, কিংবা একই অবসর-সময়ে দেখা করার ব্যবস্থা থাকলে বাপ-মায়ের চোখে পড়তে পারে—পড়ার সম্ভাবনা থাকে—আজ এঘর কাল ওঘর—সময়েরও ঠিক নেই—অত সন্দেহ হবার কারণ থাকে না। অথচ কোন দিন কখন কোন ঘরে লাগে সে তো পদ্মার দেখতে কোন অসুবিধে নেই।

এই বাড়িরই ও পাশের একটা ঘরে থাকে জঙ্ বাহাদুর—সে আর তার বৌ, আর ছেলেমেয়ে। ছেলেটা সম্প্রতি নৈহাটি জুট মিলে কাজে লেগেছে, পদ্মার মা-ও কোন্ ইস্কুলে আয়াগিরি করে—অবিশ্যি ঠিক ইস্কুলের চাকরি নয়, বাড়ি থেকে মেয়ে ডেকে আনা আর পৌঁছে দেওয়া এই কাজ। মেয়ে-পিছু দু টাকা আড়াই টাকা পায়। সকালে তাকে ব্যস্তই থাকতে হয়। একবার আটটায় ফিরে ভাত ডাল ক'রে রেখে আবার ইস্কুলে ছোটে। জঙ্ বাহাদুর যদিচ এখানেরই দারোয়ান, সকালটা তারও অবসর থাকে না। প্রেস থেকে ফর্মা আনা—কভার আনা—এইতেই কেটে যায়। আজকাল আটটা বাজলে বেশির ভাগ রাস্তাতেই ঠেলাগাড়ি চলতে দেয় না—কাজেই ভোর থেকে নয় তো কারখানার টাইমের পর এই সব কাজগুলো সারতে হয়। সুতরাং সকালটায় মোহন মিয়া নিরঙ্কুশ একেবারে। যদিবা কোনদিন হঠাৎ জঙ্ বাহাদুর এসে পড়ে—দেখবে মোহন কোন লাট থেকে ফর্মা নাড়ানাড়ি করছে—পদ্মা দাঁড়িয়ে দেখছে। তাতে আর দোষের কি? ঠেলাগাড়ি নিয়ে এলে তো কথাই নেই, সেই আওয়াজেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে পদ্মা।

কাশেম চোখ টিপে বলে, 'মিয়া বিবি রাজী তো কী করবে তার কাজী। বোঝ্‌লা না জাফর মিয়া?'

হানিফ প্রথমটায় বিশ্বাস করত না। বলত, 'পদ্মার যে বলে দশ বছর কাশেম ভাই?'

'আরে—পাহাড়ী মেয়ে ওরা, পাঁচ বছরেই তৈরী হয়ে যায়। বুঝিস না? দশে তো রস থৈ থৈ করবে।'

সুতরাং সেই মোহন মিয়াকে এমন অসময়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেখলে অবাক লাগবে বৈকি। জাফর কেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এসে গেছে জয়নাল—ছোকরা সাগরেদ—সেও এসে গালে হাত দিয়ে ঐ একই প্রশ্ন করেছে, 'আজ কী হ'ল গো মাইঝ্‌লা মিয়ার? কাজ-কাম কিছু নাই নাকি?'

কী যে হয়েছে সেটা এদের বলার নয়। কাউকেই বলার নয়।

এক কথায় সর্বনাশ হয়ে গেছে মোহন মিয়ার।

এক ঢিলে দুই পাখী মারার কথা বলে লোকে—একই সঙ্গে দুটি সাংঘাতিক খবর পেয়েছে সে কাল।

সুলতান মিয়া এতদিন চেষ্টার পর আসবার ছাড় পেয়েছে, সে নাকি সামনের মঙ্গলবার এসে পৌঁছবে। কালই দেশ থেকে সুলতান মিয়ার ভাই এসেছে—তার মারফৎই এই আনন্দ-সংবাদটি পাঠিয়েছে সে। সুলতান মিয়া আসা মানেই হিসেব-নিকেশ, নানা গাফিলতি তো হয়েছেই—তার পঞ্চাশ রকম জবাবদিহি, কৈফিয়ৎ। জাফর মিয়া যদিচ জমাদার—তবু আত্মীয় এই হিসেবে ময়নদ্দীই লাইব্রেরীর বাবুদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করেছে। পাশের ঘরের আফতাবউদ্দীন দপ্তরীও সুলতানের আত্মীয়—সম্পর্কে শ্বশুর হন সেই অধিকারে তিনিও মাঝে-মধ্যে এসে দেখা-শুনো করেন—টাকাকড়ির ঠেকা হলে তিনিই যোগাড়যন্ত্র ক'রে ধারে মাল পাইয়ে মান রক্ষা করেন ওদের —কিন্তু ময়নদ্দীর কাছ থেকে হিসেব বার করতে পারেন না তিনিও। অবশ্য খুব একটা জোরও করেন না—সুলতান মিয়া যাওয়ার পর কাজকর্মও কমে গেছে, লাইব্রেরীদের অবস্থাও তেমন ভাল নয়। সুলতান মিয়া কাজের লোক, নিজে সব কাজ জানে, সে যেমন কারিগরদের কাছ থেকে, যাকে বলে নিংড়ে কাজ আদায় ক'রে নিতে পারে—জাফরের সে সাধ্য নেই, কাজেই আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশী চলছে বেশির ভাগ, কোনমতে বাড়ি-ভাড়া, মহাজনের টাকা আর কারিগরদের মাইনে দিতেই প্রাণান্ত। লাভের কোন কথাই ওঠে না। তবু—এর মধ্যেই ময়নদ্দী কি দু-চার টাকা এধার-ওধার করে নি? দু' টাকা পাঁচ টাকা করতে করতেই অনেক হয়ে গেছে—সুলতান মিয়ার শ্যেনদৃষ্টি থেকে তার এক কড়াও এড়ানো যাবে না। অর্থাৎ খুব একটা বিশ্রী পরিস্থিতির

মধ্যে পড়তে হবে, চাকরি যাওয়াও বিচিত্র নয়।

আর এক দুঃসংবাদ, সেও কালই পেয়েছে। জঙ্‌ বাহাদুরের ছেলে সামশের জগদ্দলে মায়ের জন্যে একটা কাজ যোগাড় করেছে, এক কামরার হলেও বেশ ভাল একটা কোয়ার্টারও পেয়েছে এর ভেতর—সে মা আর বোনকে সেইখানে নিয়ে যেতে চায়। জঙ্‌ বাহাদুর নিজের আর স্ত্রীর সমস্ত রোজগারই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়—এখানে থাকলে এক পয়সাও জমবে না কোন দিন—বোনের বিয়েও হবে না।

আরও শুনেছে, সামশের নাকি ওখানেই পদ্মার একটা বিয়েও ঠিক করেছে। ঐ মিলেরই আর এক নেপালী দারোয়ান, বেশ মাইনে পায়, অবস্থা ভাল—প্রথম বৌ মারা গেছে—আবার বিয়ে করবে, বিধবা খুঁজছে—সামশেরের ইচ্ছে তার সঙ্গেই পদ্মার বিয়ে দেবে। বছর চল্লিশ বয়স হবে হয়তো—কিন্তু সে যা জোয়ান—তাতে ও বয়সটা কিছুই না। অঢেল টাকা, টাকা সুদে খাটায়—মদ-ভাঙও তেমন খায় না। একটা বাচ্ছা ছেলে ছিল, তাকে দেশে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে—এখানে কোন ঝামেলা রাখে নি। এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবে জঙ্‌ বাহাদুর তার ঐ মেয়ের জন্যে?

এর চেয়েও বিপদ আর দুঃসংবাদ কি আসতে পারে মানুষের জীবনে? এমন একই সঙ্গে?

·

হঠাৎ কানে গেল হানিফ বলছে—'ও মাইঝলা মিয়া (সুলতান বড় মিয়া সেই হিসেবে মোহন মিয়া মেঝ বা মাইঝলা), তোমার প্রাণের টিয়া কেমন আছে গো? বলি তার কিছু অয় নাই তো? এমন মন ভারী করছ ক্যান?'

ওঃ, এই এক আপদ! কী কুক্ষণেই যে মোহন মিয়া ঐ হরনাথ লাই-ব্রেরীর মদনবাবুকে দিকে চিঠি লেখাতে গিছল! কেন যে এমন উদ্ভট শখ হয়েছিল তার! ময়নদ্দী যে একেবারে লেখাপড়া জানে না তা নয়—তবে সে নামমাত্রই—নিজের হাতের লেখা সে নিজেই বুঝতে পারে না এক এক সময়। তার বৌ যে সে লেখা বুঝতে পারবে না সে বিষয়ে সে অন্তত নিশ্চিত। তাই কখনও-সখনও চিঠি লেখার দরকার হলে সে অপরকে ধরেই লিখিয়ে নেয়—ওরই মধ্যে যার গোটা গোটা হাতের লেখা তাকে দিয়েই লেখায়। পাড়ার অন্য দপ্তরীখানার লোককে দিয়ে লেখায় না সাধারণত—এটাও ঠিক।

এই ভয়েই লেখায় না, জানাজানি হাসাহাসি হবে বলে। সেই কারণেই মদনকে দিয়ে লেখানো তার উচিত হয় নি, হাজার হোক চ্যাংড়া—একুশ-বাইশ বছরের ছেলে। নেহাৎ ওর মুক্তোর মতো হাতের লেখা দেখেই লোভ সামলাতে পারে নি—ধরে পড়েছিল, 'মদনবাবু আমার একখানা পত্তর লেইখ্যা দেন কিরপা কইর‍্যা।'

'কী বলে পাঠ লিখব?' মদন প্রশ্ন করতে অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বলে ফেলেছিল মোহন, 'লেখেন "আমার প্রাণের টিয়া"—'

এই সম্বোধন, ভাষাও এর সঙ্গে তাল রেখে কাব্যে ভরা। দপ্তরীখানায় বিস্তর বই আসে—আজকালকার সব ভারী ভারী বই পড়ে বুঝতে পারে না—কিন্তু বটতলার কোন কোন লাইব্রেরী থেকে যখন ফর্মা এসে পৌঁছে—তারা একসঙ্গে পাঁচ কি দশ হাজার বই বাঁধিয়ে নেয়, তাদের কাছ থেকে দু-একখানা চেয়ে-চিন্তে নিয়েছে মোহন, এমনিও পড়েছে। 'গোপাল ভাঁড়ের গল্প' কি 'গোলেবকৌলি বিবির কেচ্ছা' গোছের বই। 'প্রেমপত্র' বলে একটা বইও আছে তার, কী ক'রে প্রেমপত্র লিখতে হয় তার উদাহরণ। কিছুটা কবিত্বের ঝোঁক বোধ হয় সহজাতও। বেশ ভাল ভাল কথাই বলেছিল ময়নদ্দী, কিছু কিছু অসংলগ্নতা বা ভুল তো থাকবেই—সেগুলো সংশোধন ক'রে নিয়েই লিখেছিল মদন—সে এখনকার ছেলে, বিস্তর প্রেম করেছে, করছেও, মাইনে আর একটু বেশী হলে বিয়েই ক'রে ফেলত এতদিনে—জানে-শোনে বিস্তর, সুতরাং চিঠিখানা বেশ ভালই দাঁড়িয়েছিল। মোহনের পাশের কারখানার এক বন্ধু পড়ে বলেছিল, 'এ চিঠি দিস না ময়নদ্দী, তোর বৌ এ চিঠি পড়লে হয় জহর খাবে, নয়তো পাগলের মতো ছুটে আসবে তোর কাছে—পথে পথে পাকিস্তানী পুলিস ধরে বেইজ্জৎ করবে, কি কোথাও বিক্রী ক'রে দেবে—'

সে পরামর্শ অবশ্য শোনে নি, বরং চিঠিখানা ভাল হয়েছে বুঝে নিজে গিয়ে বড় ডাকঘরে ফেলে এসেছিল।

কিন্তু চিঠি যেমনই হোক সেই থেকে এই 'প্রাণের টিয়া' কথাটা চাউর হয়ে গেছে। এমন তামাশার কথাটা কি আর মদন পেটে চেপে রাখতে পারে!

এইবার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল মোহন মিয়া। হুঙ্কার ছেড়ে ধমক

দিল, 'নে নে, নিজের কাম কর ফাজিল ছ্যাম্‌রা কোথাকার! ও কি, ও জয়নাল, ও কী কামে বসলা—তোমারে না কইছি সকালে আগে 'তরঙ্গ' বইটার মিসিল তোলতে! তুমি লেই পিলাইতে বসছ ক্যান ?'

বইয়ের ফর্মা, একশো বা দুশো যেমন অর্ডার থাকে, প্রতি ফর্মা আগে আলাদা-আলাদা ক'রে ভাঁজা হয়, তারপর সেগুলো একের পর দুই তারপর তিন—নম্বর ধরে সাজিয়ে পুরো বইখানার মতো গোছ ক'রে রাখা হয়—তাকে বলে মিসিল তোলা।

কাজটা একটু হিসেবের, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে মিলোতে হয়। না হ'লেই ফর্মার গোলমাল হবে, বই ফেরত আসবে, লাইব্রেরী থেকে ধমক দেবে কারখানাদারকে। সে এদের হাতে-মাথা কাটবে। জয়নালের অত হিসেব আসে না, প্রায়ই গোলমাল ক'রে ফেলে। আসলে বড্ড গল্প করা স্বভাব, 'ফিলিমে'র গল্প। তাতেই ভুল হয় অত। তাই প্রথম সুযোগেই সে যেটা সহজ, 'স্কেল'-এ (জিল্‌দ্‌) লেই পিলোতে বসে যায়।

আজও মুখ গোঁজ ক'রে বলল, 'জমাদার ছায়েব কইছে, জিগাও না তারে—'

জমাদার তার স্বাধিকার রক্ষায় খুব সজাগ—তাকে কিছু বলতে না পেরে গজ-গজ করতে থাকে মোহন মিয়া। 'চ্যাংড়া জমাদার অইলে এই দুর্গতিই অয়। অহনে মিসিল তোলা অইব, সিলি অইব, পুট চড়ানো বাকী—অহনে স্কেল কইরা কী কামডা অইব তো বুঝি না!'

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, তবু জাফর দেয়। বলে, 'ওকে মিসিল তুলতে বলে ফায়দাটা কি ? একশো খানা বইয়ের পঁচাত্তর খানায় ফর্মা কম কি বেশী হবে। মিসিল তোলবে হানিফ আর কাশেম—কালই তো বলে দিয়েছি।'

ভাল লাগছে না। এসব কিছুই ভাল লাগছে না। কাজকর্ম বিষ মনে হচ্ছে কাল থেকে।

বৌ আদুরীবিবি সুন্দরী না হলেও স্বাস্থ্যবতী, মোহন যখন ছেড়ে এসেছে তখনও প্রথম বয়স তার। তাতে যে অরুচি হয়েছে তা নয়—কিন্তু দীর্ঘকাল তো মোহনও আটকা পড়ে আছে এখানে, দেখা-সাক্ষাৎ নেই, আবার যে কবে হবে তারও ঠিক নেই। এখন দেশে গেলে সে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ। মোহন যে পারবে না, এটা নিশ্চিত। মুখটাও ভাল ক'রে মনে

পড়ে না আর। আব্ছা আব্ছা আদলটা শুধু মনে আছে। এখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে, পূর্ববাংলা স্বাধীন, এখন পাসপোর্ট পাওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই—এর আগেও সে পাসপোর্ট ক'রে আসে নি, বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় যখন ধরপাকড় শুরু হ'ল, তখন ভারতীয় নাগরিক বলে লিখিয়েছে, বৌ ছেলে কেউ নেই বলে। ভ্যানিশিং কালি দিয়ে রেশন কার্ড সংশোধন ক'রে দিয়েছিল ছিদ্দিকী। এখন পাসপোর্ট পাওয়া মুশকিল হবে।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পদ্মা মেয়েটা কাছে এসেছিল। খুবই অল্পবয়সী—কিন্তু সে-ই এসেছে ওর কাছে, গায়ে পড়েই এসেছে। মোহন হাত বাড়ায় নি আগে। ওর আচরণে কথাবার্তায় বুঝেছে এই বারো-তেরো বছর বয়েসেই 'পাকতে' কিছু বাকী নেই মেয়েটার। তাতেই মনে কোন বিবেকের দংশন অনুভব করে নি।

একা এই মরুভূমির মতো কারখানায় পড়ে থাকা—সেখানে এমন একটি সরস সাহচর্য—ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই এসে পড়েছিল।

সময় কাটানো শুধু নয়, সত্যিই ভাল লেগেছিল মোহন মিয়ার। নবীনতা ও প্রবীণতার এমন সহজ সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখে নি। মেয়েটা জানে অনেক কিছু, অল্প বয়সের সারল্যও যায় নি একেবারে। কখনও মনে হয় শিশু, কখনও মনে হয় যুবতী। এই নিত্য-নব রূপান্তরেই এত আকর্ষণ মোহন মিয়ার।

বিপদ আসন্ন, খুবই বিপদ। সুলতান মিয়ার এই অপ্রত্যাশিত আগমন মোহন মিয়ার সর্বনাশই সূচনা করছে সম্ভবত। কিন্তু সে চিন্তার থেকেও ওর কাছে এই পদ্মার বিয়ে এবং স্থানান্তরী হওয়ার খবরটাই বেশী মারাত্মক।

পদ্মার উপর যে এত টান—এমন প্রবল টান হয়েছে মোহনের, কালকের আগে বোঝে নি। এখন মনে হচ্ছে পদ্মা ছাড়া সে বাঁচবে কি ক'রে ?

অনেক ভাবছে, কাল থেকেই ভাবছে।

চাকরির জন্যে চিন্তা নেই ওর। এ লাইনে এতকাল কাজ করছে, আশে-পাশে এত দপ্তরীখানা—চাকরি একটা জুটে যাবেই। বরং—সে ভাবছে চোর বদনাম হওয়ার আগে, সুলতান মিয়ার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ জবাবদিহির আগেই একটা ছুতোনাতায় ঝগড়া বাধিয়ে সরে পড়বে কিনা। তখন—চোর বললেও সাফ্ বলতে পারবে লোককে, ছেড়ে আসার জন্যে সুলতান আকচে

পড়ে বদনাম দিচ্ছে। আসলে এতদিন বুক দিয়ে কারখানাটা আগলে ছিল—এখন অপর কারখানায় গেলে ক্ষেপে তো যাবেই।

না, সে সব ঠিক আছে—কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখানে তার চাকরি মিলতে পারে, জগদ্দলে কে চাকরি দেবে? অথচ আসল সমস্যা তো সেইটেই। পদ্মাকে হারালে যে তার চলবে না।

পালিয়ে যাবে? পদ্মাকে নিয়ে?

কিন্তু কোথায় যাবে? এসব ব্যাপারে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার সম্ভাবনা যেখানে—পুলিসের টনক নড়বেই। আর পুলিস যদি সত্যিই সক্রিয় হয়, কারও সাধ্য নেই তাদের চোখকে ধুলো দেয়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ। নাবালিকা হরণ, হিন্দুর মেয়ে—এমনিতেই তো জেল হবার কথা—আবার যদি নাগরিকত্বের ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে, অনিবার্য ডবল জেল।

এক যদি জঙ্ বাহাদুর রাজী হয় ওর সঙ্গে নিকে করাতে। কিন্তু সে বিস্তর টাকার খেলা। টাকা পেলে জঙ্ বাহাদুর রাজী হবে—কিন্তু সে এক-আধশো টাকার কাজ নয়। এক হাজারের কম তার হাত মুখে উঠবে না। অত কেন, ওর সিকিও তো নেই মোহনের হাতে।

কাল সারারাত ভেবে কিছু কূলকিনারা পায় নি মোহন মিয়া। আজ সকালবেলা পদ্মাকে ধরেছিল। পদ্মা অম্লানবদনে জবাব দিয়েছে 'তা কী করব বল, আমার তো হাত নেই। দাদা যে বুড়ো বর ঠিক করেছে সে কি মোটা টাকা খাবে না ভাবছ? কত খেয়েছে এর ভেতরই সেই খবর নাওগে। আবার বাবা যখন শুনবে—তখন সেও মোচড় দিয়ে কিছু আদায় করবে। দাদা কি একাজ আজ নতুন করছে? এখানে থাকতেই দাদা একটা কাকে ধরে এনেছিল একদিন। আমি দেখেছি দশটা টাকা গুনে নিয়েছে। তুমি টাকা ছাড়—তোমাকে শাদী করতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাবার অমতে কিছু করা যাবে না, যা রাগী—তোমাকে আমাকে দুজকেই টুকরো টুকরো ক'রে কাটবে।'

কী একটা অপ্রীতিকর চেঁচামেচিতে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল মোহন মিয়া।

বাদল লাইব্রেরীর মালিক এসে চেঁচামেচি করছেন। তাঁর নতুন বই

মোটে একশোখানি দিয়ে চুপচাপ বসে আছে ওরা—কী ভেবেছে কি?

আকর তাঁকে বোঝাচ্ছে বই 'হটপেরেছে' আছে, জেলটা ধরানো হলেই চড়িয়ে দেবে। তারপর আর বই ভরে 'ফিনিচ' করতে কতক্ষণ? আসলে দোষটা নটবর হাফটোনেরই, কভার দিয়েছিল 'একারে ভিজা'—দেখেন নি, ঐ একশোখানা জেল ধরাতেই কতগুলো নষ্ট হয়েছে কালি উঠে? ড্রাই দেয় নি এক ফোঁটাও—ইত্যাদি।

দূর! এই কি জীবন?

আজ প্রথম মনে হ'ল মোহন মিয়ার সে যেন ইয়াহিয়া খাঁর জেলখানাতেই বন্দী হয়ে আছে। মানে তার চেয়ে এ জীবন এমন কিছু বেশী সুখের নয়।

মোহন কাজ নিয়ে বসেছিল, সব ছেড়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল আবার। ইস্! কারখানা বাড়িটা যেন দোজখ একেবারে। হিঁদুরা যাকে নরককুণ্ড বলে। নিচু পুরনো বাড়ির একতলা—রাস্তায় তো কুকুরে প্রাকৃতিক কাজ সারলেও জল জমে যায়। প্রতি মুহূর্তেই ভয়, সে জল এসে না কারখানা-ঘরে ঢোকে। লাট দেওয়া ফর্মা সব ঘরেই আছে—গুদোমঘরটায় তবু ইঁটের উপর করোগেট টিন দিয়ে উঁচু ক'রে রাখা আছে—এসব ঘরে মেঝের ওপর খেজুর পাতার চ্যাটাই শুধু, তার ওপরই ফর্মা। এদের হাতের ময়লায়, ঘামে, পান-চুনের দাগে কালো তেল-চিটচিটে হয়ে যায় গোছের ওপরের দু'তিনখানা শীট। সে অবশ্য যিস্কা যায়গা উস্কা যায়গা—এই মন্ত্রেই উদাসীন থাকে ওরা। কিন্তু জল ঘরে ঢুকলেই সর্বনাশ, সব সুদ্ধ যাবে, গোছকে-গোছ। তাও একটা গোছ ভিজলেই তার জল শুষে ওপরের দুতিন গোছ পর্যন্ত ভিজবে। গোছ মানে দুশোখানা ফর্মা।

অথচ তেমন বিপদ হলে—ওরা খাটল না হয় প্রাণপণেই—ফর্মা সরিয়ে রাখবে কোথায়? সব ঘরেই তো এই পর্বতপ্রমাণ টাল। একটু ছুঁচ ঢোকাবারও জায়গা নেই। আর সব ঘরই এমনি নিচুতে। বোধহয় দেড়শো বছরের বাড়ি, পাকাবাড়ি, কিন্তু এমন অবস্থা সব মেঝের, ওপর তলায় বাড়িওলা বনমালী সাঁপুইরা ঘরের মেঝেতে জল ফেললে সে জল নিচে পড়ে ফর্মা ভিজোয়।

এর প্রতিকারেরও কোন উপায় নেই, বলে বলে হদ্দ হয়ে গেছে ওরা! আসলে সাঁপুই মশাই চাইছে যে ওরা উঠে যাক। সম্পূর্ণ নিচের তলাটা

এরা ভোগ করছে সত্তর টাকায়—ওরা উঠে গেলে নাকি সে দেড়শো টাকা পেতে পারবে।

ঘরগুলো তো ঘুটঘুটে অন্ধকার (তাতেই অবশ্য মোহন মিয়ার এই নবপ্রণয়-পর্বে অনেক সুবিধে হয়েছে—তা মানতে সে বাধ্য)—এক কারখানা ঘরটা ছাড়া। তাও—সে ঘরেও যেটুকু আলো আসে, এই উঠোনের দিক থেকে। এমনি বিজলী আলোও একটা জ্বেলে রাখতে হয় একশো বাতির। 'নইলে কাম করন যায় না।' 'লোড ছেডিং' না কি হয়েছে আজকাল ছাতার মাথা—কারিগরদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। অন্ধকার তো হতেই পারে, উত্তর দিকে তিন ফুট গলি, তাও পাশের আফছারউদ্দীনের কাঠের দোতলাটা ঝুঁকে পড়ে আলোর দফা সেরে দিয়েছে। এই পশ্চিম দিকটা—যেদিকে সদর সেদিকের গলিটাই ছ'ফুটের মতো, তা সেদিকে তো জানলা নেই, সদর দরজা এদের, তার পাশে বাড়িওলাদের ওঠার সিঁড়ি।

তাও সে গলিও যা, গরমের দিনেও কাদা হয়ে থাকে। আশপাশের বাড়ির উদবৃত্ত নোংরা জল এসে পড়ে এই গলিতেই, কেউ বা ঘরের দেওয়ালে একটা ফুটো ক'রে রেখেছে গলির দিকেই—যার সঙ্গে সরকারী নর্দমার কোন যোগ নেই—ঘরে বসে রসুই করে, চায়ের কাপ ধোয়—সব জলই এই গলিতে পড়ছে। পাইখানার জল, অন্য প্রাকৃতিক কাজটা—সবই। একটা অবর্ণনীয় দুর্গন্ধ থাকে সর্বদা এই গলিটাতে। আর সর্বদাই কাদায় প্যাচ প্যাচ করে, বৃষ্টি হলে সেই যত রাজ্যের রকমারি নোংরা—জাফরের ভাষায় দোজখের ময়লা—সেই জলে মিশে উঠোনে এসে ঢোকে।

অবিশ্যি, উঠোনটাও তাদের এমনিতে সাফ থাকে না কোনদিন। সেদিকে চাইলে মাঝে মাঝে ওদেরও গা ঘিন ঘিন করে। ওদের সয়ে গেছে তাই, নতুন লোক এলে নাকে কাপড় দেয়। অথচ ওরাই বা এত আবর্জনা—এতগুলো লোকের থুতু গয়ারও তো কম নয়—ফেলে কোথায়? ওদিকে একটা পাইখানা আছে বটে চট টাঙানো—সেটা সর্বদাই প্রায় ময়লা থাকে বলে লঘুক্রিয়া বা ছোট প্রাকৃতিক কাজটা উঠোনেরই এক কোণে সারতে হয়। সেখানে একটা ঝাঁঝরি আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা সক্রিয় থাকে কদাচিৎ। সে বস্তুটিও জমে থাকে এই উঠোনেরই এক প্রান্তে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কে প্রত্যহ জমাদার ডেকে সাফ করাবে? জমাদার আসে সপ্তাহে একদিন,

সেইদিন বিকেল থেকেই আবার জঞ্জাল জমতে শুরু করে।

তাও উঠোনটাই কি তেমন বড়! বড় জোর চার হাত চওড়া পাঁচ হাত লম্বা। আর একটু বড় ছিল—এরই এক পাশে ফুটো চৌকি পেতে টিন দিয়ে ঘিরে মাথায় টিন দিয়ে জঙ্ বাহাদুর থাকার জায়গা ক'রে নিয়েছে। ওদিকে এই রকের যে ফালিটুকু গেছে—গুদোমের সামনে, সেইখানেই রান্না করে পন্মারা। উঠোনেই ইট পেতে রসুই করতে হয় মোহন মিয়াকে; সেই ইটেই শিরীষ গলে, লেই তৈরি হয় বেলায়।

তবু তো এইখানেই কাটল এই এতকাল—ঠিক হিসেব নেই, অন্তত বারো-চোদ্দ বছর তো হবেই, হয়তো বেশি। সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে এসেছিল—যা বলত ওর বাবা, কে আর সন-তারিখ লিখে রেখেছে—কিছুই জানত না, দপ্তরীখানা কাকে বলে, বই বাঁধা ব্যাপারটা কি; বই যে আবার বাঁধতে হয় এমনভাবে, ফর্মা কেটে ভাঁজাই সেলাই ক'রে—কোন জ্ঞানই ছিল না। সবই এখানে এসে শিখেছে। সাগরেদ হয়ে ঢুকেছিল ফুফার জোরে—নইলে তখনও সুলতান মিয়ার চাচেরা ভাই তোরাপ মিয়া বেঁচে, তারই কারখানা—শেষকালে দেশে গিয়ে মরবার শখ হতে সুলতানকে লিখে দিয়ে গেল মোটে ছ'হাজার টাকা নিয়ে—তা হোক, তোরাপ মিয়া মানুষ ছিল ভাল, হাতে ধরেই কাজ শিখিয়েছে ওকে যত্ন ক'রে।

সুলতান মিয়াকে খুবই স্নেহ করত তোরাপ মিয়া, নইলে এত বেশি বয়সের ছেলে কারিগর নিত না সে, আট-ন' বছরের ছেলে দেখে নিত, বলত বাঁশ পাকলে আর বাঁকানো যায় না, বুড়ো ধাড়ি ছেলে বিড়ি তাড়ি খেয়ে পেকে আছে সব—তাদের কি কাজে মন বসে, না কাজ শেখানো যায়?

অবশ্য একটা দোষও ছিল। তোরাপ মিয়া ছিল বিপত্নীক, বয়সও হয়েছিল ঢের—অনেক কম বয়সে বৌ মরেছিল একটা ছেলে রেখে—কিন্তু আর শাদী করে নি সে। ছেলে বড় হয়ে মিলিটারীতে চাকরি নিয়ে চলে যায়—বাপের খোঁজখবর রাখত না। তোরাপ খুব সুপুরুষ ছিল, সায়েবদের মতো রঙ, সাদা সুন্দর দাড়ি, পাকা বাবরি চুলে খুবই সম্ভ্রান্ত দেখাত। লেখাপড়াও কিছু জানত, শরিয়ৎ মুখস্থ ছিল প্রায়—কিন্তু একটু ঐ 'ইয়ে' দোষ ছিল। ফুটফুটে ছেলে ছাড়া সাগরেদ নিত না—মোহনকে নিয়েছিল

সুলতান মিয়ার জন্যে—রাত্রে এক একটি ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে শুতো। বলত, 'বুরা মানুষ, মানষের শরীল তো, কওন তো যায় না—খারাপই অইয়া পরল, তখন কেডা কাকে ডাকে। থাউক কাছে, আর কিছু না পারুক, মানষেরে ডাকতেও তো পারব।'

কিন্তু মোহন মিয়া জানে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিল যে কারণটা অন্য। সেবা করতে হ'ত। হাত-পা টেপা থেকে অনেক কিছুই। কালো এবং কিছু বেশী বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও—সেও অব্যাহতি পায় নি। এখন মনে হয় সুলতান মিয়ার প্রতি এত স্নেহের কারণও তাই, অল্প বয়সে ছিপছিপে ফর্সা সুদর্শন ছিল সুলতান মিয়া।

যাই হোক—দীর্ঘকালই কেটেছে এখানে। এই বাড়িতে নয় আগে অন্য বাড়ি একটা ছিল, ছিটে বাঁশের বেড়া টিনের চাল—এর তুলনায় সে ছিল বেহেশ্‌ত্‌। তার উঠান বলে বস্তু ছিল না। ব্যারাকবাড়ি মতো, অনেক ভাড়াটের সঙ্গে বাইরের কল ও সাধারণের পাইখানা সরতে হ'ত—তবু সে ঢের ভাল ছিল। অবশ্য আকাশ-টাকাশ দেখা যেত না সেখানেও, গরমে সেদ্দ হতে হ'ত। সেখানে বিজলীর আলোও ছিল না। সে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এ বাড়িতে এসেছে, সেও তো হ'ল দশ বছর। সাগরেদ থেকে কারিগর—অবশ্য এখন তার পদবীটা কি তা কেউই বলতে পারবে না, আধা-মালিক আধা-ম্যানেজার।

তা হোক, তবু এখন অন্য কারিগররা বাড়ি যায়,—তাকে তো এই নরককুণ্ড পাহারা দিতে হচ্ছে বারো মাস—এই ক'বছর তো বটেই, কারখানাদার দেশে আটকে পড়ার পর থেকেই। জঙ্‌ বাহাদুরও থাকে, তবে সে তো মদ খেয়েই বেহুঁশ থাকে আদ্ধেক সময়, তার আর কষ্ট কি? মোহন যে ও জিনিস একেবারে মুখে তোলে নি কোনদিন তা নয়—তবে বেহুঁশ হবার মতো কখনই নয়। আত্মীয় হিসাবে এখানে জায়গা দিয়েছে—এ কারখানা সেই কারণেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে তার। নড়বার বেড়াবার ফুর্তি করার উপায় নেই।

কিন্তু তবু এতকাল তো এমন হয় নি। এই চাপা অন্ধকার ভ্যাপসা ও গুমোট গরম, এই আবর্জনা দুর্গন্ধ—কৈ কোনদিন তো এমনভাবে তার গলা টিপে ধরে নি। আজ এত অসহ্য হচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে—একটু আকাশও যদি থাকত! কারখানার কোথাও থেকে এক ফালি আকাশ দেখা যায় না।

এক ঐ উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘাড় তুলে ওপর পানে চাইলে হয়তো একটু ধোঁয়াটে রঙের আকাশ দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেইটুকু আকাশ দেখার জন্যে এ উঠোনে নামা যায় না। একটা ক'রে ইঁট পাতা আছে, নিতান্ত প্রয়োজনে ওর ওপর দিয়ে 'ইত্যাদি' করার জন্যে যাওয়া যায়—শখ ক'রে কে নামবে!

আজ যে এত অসহ্য হচ্ছে তার কারণ কি ঐ পদ্মা? সে চলে যাবে, তার হয়তো বিয়ে হয়ে যাবে—অথবা তাকে দিয়ে ব্যবসা চালাবে তার ভাই—এই ভেবেই কি এত কষ্ট হচ্ছে, এত খারাপ লাগছে? নিজের দৈন্য, নিজের পরনির্ভরশীল অসহায় অবস্থা বুঝতে পারছে বলেই? পদ্মাকে আর দেখতে পাবে না, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না—এটা মনে হলেই যে বুকের মধ্যে টন টন ক'রে উঠছে, কাটা ছাগলের মতো ছটফট ক'রে উঠছে মনটা—একেই কি মোহব্বৎ বলে, ভালবাসা? আগে মনে হ'ত আদুরীকেও সে ভালবাসে—আজ বুঝছে তা নয়, তখন আর কেউ ছিল না, অন্য কোন মেয়েকে এভাবে পায় নি, আদুরীর বয়স ছিল অল্প—তাই তাকে ভাল লাগত। ভাল সে বেসেছে এই পদ্মাকেই। চঞ্চলা মেয়ে, আবদারে অভিমানে ওকে অস্থির ক'রে তোলে, পাকা কাটা কাটা কথা, ঝগড়ায় সিদ্ধহস্ত—তবু সে-ই আসল প্রাণের টিয়া, একে ছাড়া ওর চলবে না, বাঁচবেও না ও।

যদি কোনমতে এ খাঁচা—এ বন্ধন কেটে সে টিয়াকে বার করতে না পারে—নিজে হাতে ওকে খুন করবে, তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে ফাঁসীকাঠে উঠবে। তাতে কোন দুঃখ থাকবে না।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যের দিকে অনেকটা সুস্থ বোধ করল সে। মাথা ঠাণ্ডা হতে, ব্যাকুল উদ্বেগ কমতে, দিশাহারা বুদ্ধি একটু একটু ক'রে পথ খুঁজে পেল।

চলেই যাবে সে এখান থেকে, যাবে পদ্মাকে নিয়ে। এমন জায়গায় যাবে যেখানে কলকাতার পুলিসের হাত পৌঁছবে না। রাতারাতি বহুৎ দূর গিয়ে পড়বে—জানে-আলমের 'টেকছি' আছে, ওর জলপড়ায় তার ঘাড়ের ব্যথা সারা পর্যন্ত সে খুব অনুগত—তাছাড়া এসব ব্যাপারে তার উৎসাহও খুব—শুধু তেলের খরচা দিলেই সে বর্ডারে পৌঁছে দেবে। বর্ডার বলতে অবিশ্যি সরকারী বর্ডার নয়—চোরাই মাল পাচারের বর্ডার, সেখান থেকে

কোন লরীতে চেপে ভেতরে ঢুকে যাওয়া খুব শক্ত হবে না।

না, শুধু-হাতে যাওয়া যাবে না। তা যাবেও না সে। এমনিতেই সে কিছু টাকা গোলমাল ক'রে ফেলেছে, সে হিসেব কারখানাদারকে বোঝানো যাবে না। দুর্নাম যদি নিতেই হয় ভাল ক'রেই নেবে। 'বোর্ট'-(বোর্ড) ওলার দেখা পায় নি বলে তাকে টাকাটা দেওয়া যায় নি, সে প্রায় পাঁচশো টাকা। এ ছাড়াও কারখানার ক্যাশে শ'-দুই মতো মজুত আছে। সবটাই নিয়ে যাবে সে, যদি খোদা সদয় হন—কাল ব্রজবাবুর টাকা পেমেণ্ট করার দিন, শ' পাঁচেক কোন্ না দেবে—সেটাও হাতে আসবে। সেটা পেলে আর বাক্সর দুশো টাকা ভাঙবে না। এতেই জানে-আলমকে তেলের খরচা, এক বোতল পাকীর খরচা দিয়েও হাতে ঢের থাকবে। তবে জানে-আলম না আবার পদ্মার দিকে হাত বাড়ায়। তা বাড়াকগে—কী আর এসে যাবে তাতে ? এক দিনের ব্যাপার। তার সঙ্গে গুণ্ডামিতে পেরে উঠবে না, বরং মিষ্টি কথায় যদি মিটিয়ে নিতে পারে তো দেখবে।

বাংলাদেশে পৌঁছলে আর কোন অসুবিধে নেই। এখানের টাকার অনেক দাম ওখানে। ঢাকাতে বহুৎ লাইব্রেরী হয়েছে, বিস্তর বই ছাপা হয় —দপ্তরীখানাও হয়েছে নিশ্চয় অনেক। ওর মতো কাজ-জানা লোকের চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না। রাজশাহীতে সুলতান মিয়ার ভগ্নীপতি থাকে, দপ্তরীর কামই করে—তার কাছে গেলেও কাজ পাবে। না, সে আবার অনেক কথা, সুলতান যদি খৎ পাঠায় ? ঢাকাতেই যাবে।

পদ্মাকে পরের দিন ভোরবেলাই ধরল মোহন মিয়া। তার উঠতে একটু দেরিই হয়—কিন্তু খালি বাড়ি, মোহন মিয়ার ঘুম ভাঙাতেও কোন অসুবিধা নেই। অসুবিধা হ'ল না ওকে রাজী করাতেও। আধ ঘণ্টার যুক্তি-তর্কেই রাজী হয়ে গেল সে। মাতাল আধবুড়ো বরের প্রস্তাবটা তারও ভাল লাগছিল না। সেখানে গেলে কি পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তা মোটামুটি এই বয়সেই বুঝে নিয়েছে সে। আসলে ওর দাদারই সুবিধে হবে যা কিছু। তার চেয়ে এ লোকটা ভালবাসে, যত্ন করবে, মাথায় ক'রে রাখবে। নতুন দেশ দেখবে—স্বাধীনভাবে থাকবে, সেও একটা বড় লোভ।

রাজী হয়েছে সেটা মুখে না বলে শুধু প্রশ্ন করল, 'তা কবে যাবে ?'

'কবে কি, আজই। এখনই।'

'এখনই ?'

'তা নইলে তো বেরনোই যাবে না। তোর বাবা গেছে ফর্মা আনতে, মা ইস্কুলে—এই তো সুবিধে। আর একটু পরেই তো তোর মা এসে পড়বে, তার পরই আমার কারখানার পঙ্গপালরা। বাস, হয়ে গেল—আজকের মতো শেষ। ওরা যখন যাবে, তোর মা তখন ঘরে এসে যাবে। কাল বাদে পরশু কারখানাদার এসে পড়বে, আর সময় কোথা পাব ?'

আরও মিনিট কতক গাঁইগুঁই ক'রে পদ্মা রাজী হয়ে গেল। কাপড়জামা বেশী নিতে বারণ করল মোহন মিয়া। সে-ও বিশেষ কিছু নেবে না। যে যা পরে আছে, আর এক সেট—পদ্মা পোশাক নিক, সে নেবে লুঙ্গি আর কামিজ। যাতে প্রথম চোটেই না বুঝতে পারে এরা একসঙ্গে পালিয়েছে। খানিকটা তো আশপাশে খুঁজুক, অপেক্ষা করুক—ততক্ষণে অনেকদূর চলে যাবে ওরা।

অন্য সব ব্যবস্থাও ঠিক করাই ছিল আগের দিন রাত্রে। জানে-আলমকে বলা ছিল, সে 'টেকছি' নিয়ে রাজাবাজারের পথে অপেক্ষা করবে 'ফেলাগ' ডাউন ক'রে। এরা যাবে একটা 'রেকছা'য়—জানে-আলম পাড়ায় ঢুকতে রাজী নয়, জানাজানি হলে তাকে ধরে পুলিস টানাটানি করবে। তারপর পথে দুটো-তিনটে পাম্প থেকে কিছু কিছু ক'রে তেল ভরে নিতে যা দেরি—এক জায়গা থেকে ট্যাঙ্ক ভরে নিলে 'সোবে' করবে তারা—তারপর সোজা ছুট লাগাবে, লম্বা পাড়ি।

কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া এমন কিছু কঠিন নয়। আগে মোহন মিয়া বেরোল, বিড়ি ধরিয়ে বাজারের থলি নিয়ে, তার খানিক পরে এদিক-ওদিক চেয়ে পদ্মাও। কোনটাই অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়, অনেকেই দেখল চেয়ে কিন্তু মনে কোন সন্দেহ দেখা দেবার কথা নয়, দিলও না। য়্যাণ্টনিবাগানের গলি দিয়ে 'ছাকু'লার' রোডে পড়ে বাঁদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা থামের পাশে অপেক্ষা করবে মোহন, কথা ছিল। পদ্মা সেইখানে গিয়ে মিলবে।

এ পর্যন্ত সবটাই ঠিক ঠিক হয়ে গেল—মোহন মিয়ার ভাষায় 'পেলান' অনুযায়ী। তারপর একটা রিক্সা ডেকে চড়ে বসা তো এক মিনিটের ব্যাপার।

কিন্তু সবে ওরা বসার পর রিক্সাওলা গাড়ি তুলেছে, পিছন থেকে যুগ্মকণ্ঠের হুঙ্কার—'এই রেক্‌ছা, রোকো রোকো।'

একটি পুরুষ ও একটি নারীকণ্ঠ।

আর, বুঝি সে কণ্ঠ একেবারে অপরিচিতও নয়।

কিন্তু না, তা কেমন ক'রে হবে? আজই, এখনই—কি ক'রে আসবে? বিশেষ ক'রে নারীকণ্ঠের অধিকারিণীটি।

না, না, এ বুঝি খোয়াব দেখছে সে। ওর মনের ভয়েই এমন বোধ হচ্ছে। এ ডাক ওর নিজের মাথা থেকেই আসছে, বাইরের থেকে নয়।

কিন্তু এসব ঠিক-মতো ভাবার আগেই—কে বা কারা যেন এসে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এক ঝটকায় রিক্সা নিচু ক'রে নামিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেনে নামাল ওদেরও।

না, আর খোয়াব কি মিথ্যা কল্পনা মনে করার কোন কারণ নেই।

সুলতান মিয়া, আর সঙ্গে ঘোমটা-দেওয়া আদুরী বিবি।

'ওই! মোহন মিয়া। কৈ যাও। পলাইবার তালে ছিলা নাকি? তাইলে যা লেখছে সব তা ঠিকোই। ছেমরিটারে নিয়া পলাইতে আছিলে। ওঃ, আল্লা বাচাইছেন। আর তিনডা মিনিট অইলেই তো অইছিল আর কি। কাম ফতে করতা! বড় শখ পেরানডায়, না? পেরানে বান ডাকছে! রও। কী করি তোমার হাল ছাখো।'

বলা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না আদুরী বিবির। তার মধ্যেই, কথা-বলা চলতে-থাকা অবস্থাতেই, বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সে দুই আসামীর ওপর। কামড়ে খিমচে চুল ধরে টেনে ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ক'রে তুলল দু'জনের দেহ। মোহন মিয়ার ডান চোখটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল, নইলে আঙুল বাঁকিয়ে উপড়ে নেবার ভঙ্গীতেই খিমচে নিতে গিছল। প্রকাশ্য দিবালোক, প্রায় আপিস যাবার সময় লোকদের, বড়রাস্তার ওপর এই কাণ্ড—নিমেষে বহু মানুষের ভীড় জমে গিছল—কিন্তু কারও সাহস হ'ল না ঐ অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটিকে নিবৃত্ত করার। এরা তো কোন অবসরই পেল না—না পালাবার, না আত্মরক্ষা করার, না ভালমতো কোন জবাবদিহি করার কি প্রতিবাদ করার। অস্ফুট অব্যক্ত একটা আধা-গোঙানির মতো শব্দ করতে করতে মার খেয়েই চলল মোহন মিয়া।

অসত্যের সত্য

ইস্কুলে থাকতে রবি আমাদের ব্যাচে ভাল ছেলে বলেই গণ্য হ'ত। পাসও করেছিল সে ফার্স্ট ডিভিশনে, দুটো লেটার পেয়ে। কলেজে ঢুকেও প্রথমটা কোন অমনোযোগ দেখা যায় নি। আই. এ. পাস করার পর হঠাৎ কী হ'ল, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, যাকে বলে হল্ল হল্ল ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমরা অনুযোগ করলে হাসত শুধু, বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলত, 'আফটার অল, এসব লেখাপড়ার কী উদ্দেশ্য বলতে পারিস ? এতে না হয় জ্ঞানার্জন, না হয় সৎ ভদ্র নাগরিক হবার শিক্ষালাভ। চৈতন্যদেব যাকে অফলশাস্ত্র বলেছেন—এ তাই। না ভাই, এতে আর আমার রুচি নেই।'

'তাহলে কী করবি এখন ?' প্রশ্ন করলে আবারও তার অধরপ্রান্তে সেই রহস্যময় হাসি দেখা যেত। বলত, 'দেখি। করবই যা হয়। তবে কিছু তাড়া নেই। কিছু একটা ক'রে খাবার পক্ষে যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাই ঢের। আফটার অল—পয়সা রোজগার হয় কপালে আর বুদ্ধিতে, ওর জন্যে লেখাপড়া লাগে না। আর সবাইকেই যে নিয়ম ক'রে তারিখ ধরে কিছু একটা করতেই হবে—হয় ছাঁচে ঢালা লেখাপড়া নয় তো ছাঁচে ঢালা চাকরি—তারই বা মানে কি ? আফটার অল, লাইফটা এত কিছু ইম্পর্ট্যাণ্ট নয়।'

'আফটার অল'টা ওর মুদ্রাদোষ, কিন্তু অকস্মাৎ এত দার্শনিক হয়ে উঠল কেন আর কী ক'রে, সেইটেই ঠিক ভেবে পেলুম না আমরা।

অবশ্য তাড়া ওর সত্যিই ছিল না। এখনই কিছু না করলে খেতে পাবে না, সে রকম অবস্থা ওর নয়। বাবার একমাত্র ছেলে রবি। বাবার অবস্থাও মন্দ নয়; তিনি তাঁর পৈতৃক সূত্রে অনেকগুলি ওকালতির বাঁধা মক্কেল পেয়ে গিয়েছিলেন, ইহজীবনে জীবিকার জন্য চিন্তা করতে হয় নি। অবসর এত ছিল যে পরলোকতত্ত্ব নিয়ে রাশি রাশি বই পড়তেন। লিখতেনও কিছু কিছু, সেগুলো কখনও-সখনও ইংরেজী কাগজে ছাপাও হ'ত। ফলে, মক্কেল আর ভূত—এর মধ্যেই তাঁর দিন কেটে যেত, ছেলের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার অবসর পেতেন না। আর মা—তাঁর একমাত্র ছেলেকে পূজো করতেন বলতে গেলে—তাকে তিরস্কার করা কি কোন অনুযোগ জানা-

নোর কথা চিন্তাই করতে পারতেন না।

রবি অবশ্য কলেজ ছাড়লেও লেখাপড়া ছাড়ল না। যে ছকে-বাঁধা জীবনে ওর ঘোরতর আপত্তি—মোটামুটি ওর জীবনটা সেই এক রকম ছকেই বেঁধে ফেলল। বেলা আটটা অবধি ঘুমিয়ে উঠে—চা-জলখাবার-কাগজপড়া দাড়ি কামানো এবং স্নানাহার, এইতেই দিব্যি বেলা বারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিত, তারপর বেরিয়ে চলে যেত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, এখন যেটার ন্যাশনাল লাইব্রেরী আখ্যা হয়েছে। কী পড়ত তা ঈশ্বর জানেন, মোদ্দা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ত গোটাচারেকের মধ্যেই। তার পরের আচরণটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য, আপত্তিজনক বোধ হ'ত, অন্তত আমাদের কাছে। লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যেত গঙ্গার ধারে, তাতেও আপত্তি ছিল না, গঙ্গার ধারে বেড়াতে আমরাও যেতুম মধ্যে মধ্যে—কিন্তু রবির যাওয়া ছিল অন্য রকমের। সে সেখানে গিয়ে যত রাজ্যের মাঝি-মাল্লা আর জাহাজের সারেঙদের সঙ্গে মিশত, তাদের সঙ্গে বসে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে দিত—সন্ধ্যের পর পর্যন্ত, এক একদিন রাত সাড়ে নটা দশটা বেজে যেত তার বাড়ি ফিরতে। আড্ডা দিত কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলছি না ; দু-একদিন আমরা কৌতূহল-বশত খুঁজে খুঁজে ওকে বার করেছি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছি—কাউকে সে হয়তো পয়সা খরচ ক'রে চা খাওলাচ্ছে, কারুর সঙ্গে বসে নিজে চা খাচ্ছে, কাউকে বিড়ি খাওয়াচ্ছে, কাউকে সিগারেট—হয়তো বা তাদের কারও আধপোড়া সিগারেট থেকে নিজেরটা ধরিয়ে নিচ্ছে, তার সেই অধরসুধা-রসসিক্ত সিগারেটটা সযত্নে হাতে ধরে। এমনই ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে।

এর পর স্বভাবতই আমাদের সঙ্গে রবির সম্পর্কটা শিথিল হয়ে এল। বন্ধুত্ব ভাল, বন্ধুর জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করাও উচিত—এ বিষয়ে আমাদের কারও দ্বিধা কি দ্বিমত নেই—তাই বলে এতটা বরদাস্ত করা কঠিন। আমাদের মধ্যে নকুলই সবচেয়ে ভালবাসত রবিকে—ইস্কুলে থাকতে ওদের আমরা বলতুম 'মানিকজোড়'—সেই নকুলও বলতে বাধ্য হ'ল, 'বড্ডই ছোটলোক-ঘেঁষা হয়ে গেছে রবিটা। ওর সঙ্গে আর আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা শোভা পায় না। এ প্রবৃত্তি ওর হ'ল কেমন ক'রে ? কী বংশের ছেলে ও, সে কথাটাও একবার ভাবে না।...আশ্চর্য !'

অবশ্য রবি যে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্যে খুব একটা ব্যগ্র, অথবা

আমরা একটু 'ছাড়ো ছাড়ো' ভাব দেখানোতে খুব যে একটা দুঃখিত বোধ করছে—তাও মনে হ'ল না। সে তার জগৎ নিয়েই বেশ মেতে রইল। মাঝে মাঝে কদাচিৎ কখনও দেখা হ'ত সিনেমায়। বিদেশী নাচ-গানের ছবি বা ওয়েস্টার্ন যাকে বলে—আমেরিকার প্রথম যুগে পশ্চিম আমেরিকার বসতি শুরুর সময়কার মারামারি কাটাকাটির ছবি—এই সব ছবিই বেশির ভাগ দেখতে আসত সারেঙ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। ও গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ছবি দেখাত, চা-খাবার খাওয়াত, হয়তো বা ছবির শেষে কোন 'বার'-এ নিয়ে গিয়ে মদও খাওয়াত। ওরই যে সব খরচা, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকত না। ওদের সঙ্গে হয়তো নিজেও মদ ধরেছে—কে জানে।

এই ভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর, আমরা যখন কেউ এম. এ. পড়ছি, কেউ বা কলেজের পালা শেষ ক'রে চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়েছি বা উমেদারী করছি—হঠাৎ একদিন শুনলুম রবি বিলেত গেছে।

শুনলুম প্রথম নকুলের মুখেই।

'সে কি রে!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম ওকে, 'রবি। বিলেত গেছে? কী বলছিস তুই!'

'এই ছাখ না—চিঠি দিয়েছে সেখান থেকে।'

চিঠিখানা খুলে দেখাল নকুল। আমরা চার-পাঁচজন জড়ো হয়েছি কার্জন পার্কে, চীনাবাদামের বরাদ্দ হাতে নিয়ে। যে ক'জন বসেছি তার মধ্যে এক শৈলেশ ছাড়া সবাই বেকার এখনও—শৈলেশও সবে ঢুকেছে কী একটা সওদাগরী অফিসে—সুতরাং কথাটা শোনামাত্র কেমন যেন একটা ঈর্ষার কামড় অনুভব করলুম সবাই। সকলেই চিঠিখানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লুম বলতে গেলে।

বিলেতের খাম, বিলেতের পোস্টমার্ক—সবই ঠিক। সন্দেহের কোন কারণ নেই। বক্তব্যও পষ্ট। জাহাজে গেছে, পথে খুব কষ্ট হয়েছে 'সী-সিকনেস'এ, জাহাজে কত কী খেতে দেয়—কিছুই খেতে পায় নি ঐ অসুখের জন্যে—এইসব লিখে, যেদিন প্রথম লণ্ডনের চেরিং-ক্রশ স্টেশনে পা দেয়—কী ভীষণ থ্রিল হয়েছিল মনে—টেমস নদী পার হবার সময় পুলের ওপর থেকে পার্লিমেণ্ট হাউস দেখে সবার অলক্ষ্যে একটা নমস্কার ক'রে নিয়েছিল কেমন ক'রে—তারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। এখনও কোন বাসা ঠিক হয় নি, পাকা

ঠিকানা একটা ঠিক হলে জানাবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘ পত্র শেষ করেছে।...

অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বসে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম আমরা। যাকে খরচের খাতায় ধরে রেখেছিলুম, যার সম্বন্ধে অবজ্ঞার শেষ ছিল না মনে মনে—ইদানীং করুণার চোখে দেখতে শুরু করেছিলুম—হঠাৎ তার এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-পরিবর্তনে কেউই খুব সুখী হলুম না, বলা বাহুল্য।

হঠাৎ বিলেতই বা গেল কেন? কী শিখতে গেল? পড়াশুনো করতে গেল, না, কোন চাকরি-বাকরি? নাকি কোন কারখানায় ট্রেনিং নিতে? ক'দিন থাকবে সেখানে? খরচা দিল কে? কোন স্কলারশিপ যোগাড় করল নাকি? কীই বা স্কলারশিপ পাবে সে—কিসেই বা ওর যোগ্যতা আছে?—ইত্যাদি সহস্র প্রশ্নে আমরা পরস্পরকে জর্জরিত ক'রে তুলতে লাগলুম। উত্তর কেউই জানে না, কারণ দীর্ঘকালের মধ্যে কেউ আমরা ওর বাড়ি যাই নি, দেখাও হয় নি—কোন খবরই রাখি না বলতে গেলে। বেশ কিছুদিন হ'ল আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে সে, তার অস্তিত্ব ভুলেই বসে আছি আমরা।

এর দিনসাতেক পরে আমিও একটা চিঠি পেলুম। স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-য়্যাভন থেকে চিঠি লিখছে। এতে খবর আরও কম, উচ্ছ্বাসই বেশী। লিখেছে—'এখানে এসে তোর কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ল রে! তুই শেক্স-পীয়ার বলতে অজ্ঞান হোস, এখানে এলে কী খুশীই হতিস—সেই কথাই ভাবছি কেবল। আমি তো তোদের তুলনায় মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—তবু আমারই রোমাঞ্চ হচ্ছে। কোনদিন যে এ মাটিতে পা দিতে পারব তা ভাবি নি—এ তো তীর্থ বলতে গেলে। সময় কম—তবু এক ফাঁকে পালিয়ে এসেছি। একবার যখন বিলেতের মাটিতে পা দিয়েছি, কোনটা বাদ দেব না। ডিকেন্স্-এর বাড়ি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জায়গা—সব দেখে নেব।'

এর পরের চিঠি পেল মুকুল। প্যারীর এফেল টাওয়ার থেকে লেখা। লিখেছে, 'গোনা দুটো দিনের জন্যে এসেছি, কিন্তু প্যারী ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এখানে ভিক্ষে ক'রে খাব তাও ভাল। এই ঠিক আমার ধারণার স্বর্গ।'

নকুল রবির দ্বিতীয় চিঠি পেল ইংল্যাণ্ড থেকেই। স্কটল্যাণ্ড যাবার পথে

ট্রেন থেকে লিখেছে, 'ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ঘুরতে হচ্ছে—হুইর্ল-উইণ্ড ট্যুর যাকে বলে, কোন ঠিকানাই তাই দিতে পাচ্ছি নে, অথচ তোদের খবর পাবার জন্যে কী যে হচ্ছে! আমাকে তো তোরা একেবারে বাজে খরচ বলে ধরে নিয়েছিলি! ভালয় ভালয় ফিরতে পারি তো এর জবাব দেব।...তুই যদি এক কাজ করিস তো ভাল হয়। সামনের সপ্তাহে আবার লণ্ডনে ফিরব, আমার এই বন্ধুর কেয়ারে যদি একখানা চিঠি দিস তো আমি ঠিক পাব। এমনি—জাস্ট্ তোদের একটা খবর। মাকেও আমি এই ঠিকানায় চিঠি দিতে বলেছি।'

ঠিকানাও দিয়েছে একটা। ইংরেজী নাম, লণ্ডন শহরের ঠিকানা। ওয়েস্ট এণ্ড—মানে বড়লোকের জায়গা। বেছে বেছে বন্ধু ভালই করেছে ছোকরা।

শুধু ঈর্ষাই নয়, মনে মনে কিছুটা তারিফ করতেও বাধ্য হলুম। যে পাঁকে নেমে গিয়েছিল সেখান থেকে এই উঁচুতে ওঠা—বাহাদুরি আছে বৈকি! কে জানত ওর মধ্যে এতদূর শক্তি আছে! যে নকুল ওর ওপর সবচেয়ে বেশী খড়গহস্ত ছিল, সে-ও স্বীকার করল, 'তা যাই বল, শুধু তো আর ঐ ছোটলোকগুলোর সঙ্গে আড্ডাই দেয় নি, প্রত্যহ লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনোও করেছে নিয়মিত—সেটাও ভেবে দেখতে হবে বৈকি! ডাঃ জেকীল আর মিঃ হাইড শুধুই কবির কল্পনা নয়—এই দুটো মিলিয়েই তো মানুষ। ওর মধ্যে যে ডাঃ জেকীলেরই জয় হয়েছে—তার কারণ ওদের বংশের ঐতিহ্য।'

রবি দেখলুম শুধু বন্ধুদের নয়, ওর প্রাক্তন শিক্ষক বা অধ্যাপকদেরও মনে ক'রে চিঠি দিয়েছে। মধ্যে একদিন হেডমাস্টার উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি স্নেহোজ্জ্বল মুখে বললেন, 'কী রে ভাল আছিস তো? কী করছিস এখন?...হ্যাঁরে, রবিটা কী পড়তে গেল রে বিলেতে? এত কথা লিখেছে ইষ্টুপিডটা—সেই কথাটাই শুধু লেখে নি।'

'ও, আপনাকেও লিখেছে বুঝি?'

'হ্যাঁরে! একখানা কেম্ব্রিজ থেকে, একখানা গ্লাসগো থেকে। মধ্যে রোম থেকেও একখানা কার্ড ছেড়ে ছিল। সব মনে আছে ছোঁড়ার, লিখেছে, রোমানদের কত গল্প আপনার মুখে শুনেছি, আপনি কেবল বলতেন বড় হয়ে

গ বনের বইখানা পড়িস, ইতিহাস এমন উপাদেয় ক'রে কেউ লিখতে পারবে না। সে-কথা তখন শুনি নি—আজ সে জন্যে আপসোসের সীমা নেই। এখানে এসে পর্যন্ত কেবল আপনার কথা মনে পড়ছে।'

বলে সগর্বে চেয়ে রইলেন উপেনবাবু। তাঁর দাড়ির জঙ্গল ভেদ ক'রে স্নেহ ও ছাত্রগর্ব ঝরে পড়তে লাগল মুখের হাসি থেকে।

উপেনবাবু একা নন, দেখলুম কলেজে আমাদের ইতিহাস পড়াতেন ক্ষীরোদবাবু, তাঁকেও একখানা চিঠি দিয়েছে রোম থেকে। ক্ষীরোদবাবু এখন কোন মফঃস্বল কলেজে পড়ান, কী একটা কাজে কলকাতা এসেছিলেন, হঠাৎ সেদিন চৌরঙ্গীর মোড়ে দেখা হয়ে গেল, তিনিও আনন্দে গদগদ রবির চিঠি পেয়ে। বললেন, 'আরে, আমার এই নতুন ঠিকানারও খোঁজ রেখেছিল রবি, তা কে জানত। ঐখানেই চিঠি দিয়েছে। লিখেছে—এখানে এসে পর্যন্ত কেবলই আপনার কথা মনে পড়ছে, আর মনে মনে আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি বার বার।'

খুবই খুশী হয়েছেন দেখলুম ক্ষীরোদবাবু, পুরনো ছাত্রের এই মনোযোগ ও উক্তিতে। প্রাণ খুলে রবিকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

উচ্ছ্বাসের প্রথম তরঙ্গ মিলিয়ে যেতে স্বভাবতই চিঠিপত্র বিরল হয়ে এল, তবে একেবারে বন্ধ হ'ল না। ছ'মাসের মধ্যে আমি একটা, নকুল দুটো, সুধীর একটা—জানাশুনোর মধ্যে এই ক'টা চিঠির হিসেব জানি। সবই ইংল্যাণ্ড থেকে লেখা, আমার আর সুধীরেরটা তো খাস লণ্ডন থেকে। ঠিকানা সেই বন্ধুর। বুঝলুম, ইংল্যাণ্ডটাই ওর আসল কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্র—প্যারী রোম—ফাঁকে ফাঁকে ঘোরা।

সর্বশেষ চিঠি পাবার পাবার মাস দুই পরে একদিন শৈলেশই খবরটা দিল, রবি দেশে ফিরছে। শুধু ফিরছে তাই নয়, এক বিখ্যাত সওদাগরী ফার্মে চাকরিও পেয়েছে। ফার্মের নামটা শুনে আমাদের অনেকেরই মুখ ঈর্ষায় কালো হয় গেল। কাজটাও শুনলুম নতুন ধরনের—এক্সপ্যানশন অফিসার—এক কথায় ডেভেলপমেণ্টের কাজ, অর্থাৎ কাজ কম, মাইনে বেশী। শৈলেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে, চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁ থেকে লাঞ্চ খেয়ে বেরোচ্ছিল; শৈলেশ বলে, পাকা সাহেব একেবারে, মুখে চার্চিলের মতো

মোটা চুরুট, ঐরকমই নাকি গোলগাল হয়ে এসেছে বিলেত থেকে। শৈলেশই খবর দিল, বিলেতে নাকি শুধু বড় বড় ফার্মের আফিসগুলো ঘুরে ঘুরে স্টাডি ক'রে বেড়িয়েছে—কী ক'রে সেখানে কি কাজ-কর্ম চালায়। শৈলেশের আন্দাজ—মাইনে ওর হাজার টাকার কম নয়, এ ছাড়াও বোধহয় নানা রকমের য়্যালাউন্স আছে।

আমাদের মধ্যে একটা অকথিত অব্যক্ত বোঝাপড়া হয়ে গেল, বড় অফিসার হয়েছে—বিলেত ফেরত বলেই যে আমরা হ্যাংলার মতো গিয়ে ঘনিষ্ঠতা করব তা নয়—রবি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে না এলে আমরা এ শহরে তার পুনরাগমনের অস্তিত্বই স্বীকার করব না। কোন আলোচনা না ক'রেই আমরা বেশ একমত হয়ে গেলুম—সকলেই একবাক্যে এই মনোভাব প্রকাশ করলুম পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। একমাত্র ঈর্ষার সূত্রেই আমাদের দেশে এতগুলি মন একটি সিদ্ধান্তের মালায় গাঁথা সম্ভব।

কিন্তু এ চুক্তি রাখা সম্ভব হ'ল না।

আমাকেই যেতে হ'ল সর্বাগ্রে, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে।

আমার এক ভাগ্নে রেলে চাকরি করতে করতে অফিস থেকে ক্যানাডা যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু ক্যানাডা অবধি না গিয়ে সে ইংল্যাণ্ডেই নেমে পড়ে—বাড়িতে চিঠি দেয়, তার বহুদিনের ধ্যান সে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া করবে; আমরা যেন কোন চিন্তা না করি, সে ওখানেই চাকরি পেয়ে গেছে একটা, নিজের পড়ার খরচ সে নিজেই চালিয়ে নেবে। তারপর আর একখানা মাত্র চিঠি দিয়েছিল বাড়িতে, সে আজ বছর দুইয়ের ওপর হয়ে গেল, সেই থেকে আর কোন খবর নেই। খবর একেবারে না থাকলে বরং ভাল হ'ত, দু-একটা উড়ো খবর যা এসেছে—তা আদৌ ভাল নয়। সে নাকি ঘোরতর মাতাল হয়ে গেছে, পড়াশুনো কিছুই করে না, মাতাল হয়ে পথে পথে ঘোরে, বাঙালী কাউকে দেখলে তার কাছে গিয়ে ভিক্ষে চায়, আর কিছু হাতে পড়লেই গিয়ে মদ খেয়ে সেটা উড়িয়ে দিয়ে আসে তৎক্ষণাৎ।

ফলে এদিকে তার মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে বসেছেন, আমার ভগ্নিপতিও পাগল হবার দাখিল। এর মধ্যে কী সূত্রে যেন খবর পেয়ে দুজনেই এসে চেপে ধরলেন, রবি চৌধুরী আমার বিশেষ বন্ধু, সে বহুদিন বিলেতে ছিল,

গোটা ইংল্যাণ্ডটা চষে ফেলেছে—নিশ্চয়ই বহু পরিচিত লোক আছে সেখানে, তাকে ধরে ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

কাটিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলুম—কিন্তু দিদি কোন কথাই শুনলেন না, শেষে যখন পায়ের কাছে মাথা খুঁড়তে শুরু করলেন তখন আর 'না' বলতে পারলুম না। গুটি গুটি একদিন আফিসে গিয়ে হাজির হলুম।

রবি অবশ্য খুবই খাতির করল। বেয়ারা গিয়ে স্লিপ দিতে নিজে বেরিয়ে এসে দু-হাতে আমার করমর্দন ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, তারপর বেয়ারাকে কফির ফরমাশ ক'রে বলে দিল, এখন কেউ দেখা করতে এলে যেন বলে দেয়—সাহেব খুব ব্যস্ত, ঘণ্টাখানেকের আগে দেখা হবে না।

অতঃপর আমার দিকে চেয়ে স্মিত প্রসন্ন মুখে বলল, 'তার পর ?···কী খবর বল ? এতদিনে গরীব বন্ধুকে মনে পড়ল তাহলে ?'

একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলুম বৈকি। পা ডুবে যাওয়া কার্পেট, দেহ ডুবে যাওয়া নরম চেয়ার, ঝকঝকে ফার্নিচার—সামনে ঐ দামী নিখুঁত পোশাক পরা 'সাহেব'—তার মুখে ঐ চার্চিলিয় চুরুট। সামান্য সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী পরা আমি এখানে একেবারেই বেমানান।

তবু পাল্টা অভিযোগই করলুম, 'মনে কি তোমারই পড়েছিল ব্রাদার ? তুমিও তো খোঁজ নাও নি।'

'কী ভরসায় নেব বল ভাই ? তোমরা তো আমাকে আউটকাস্ট—যাকে বলে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছিলে। দেখা করতে গেলে যদি মুখ ফিরিয়ে নাও ?'

'চিঠিগুলো লিখেছিলে কী ভরসায় ?

'দ্যাট্‌স্ য়্যানাদার থিং। সে চিঠি না লিখে থাকতে পারি নি বলেই লেখা। তা ছাড়া চিঠির তো আর চক্ষুলজ্জা নেই। না পড়ে ফেলে দিলেও আমি টের পাব না, আমার অপমান-বোধও হবে না।'

'এ তোমার বাজে কথা রবি,' ওর হৃদ্য ব্যবহারে আর একটু সাহস বেড়েছে ততক্ষণে, 'তখন কী কারণে তোমাকে এড়িয়ে চলতুম তা তুমি বিলক্ষণ জানো। সে তুমি আর এ-তুমিতে আকাশ-পাতাল তফাত।'

'কী ক'রে জানলে ?' রবির দৃষ্টিতে কৌতুকের সঙ্গে যেন একটা প্রতি-হিংসার আনন্দ খেলে গেল, 'মানুষের স্বভাব কি অত সহজে বদলায় ? মোটা মাইনের চাকরি আর দামী কাটা পোশাকেই মানুষটা বদলে গেছে এটা ধরে

নিলে কী ক'রে ? সে যাকগে—আক্‌টার অল এত কাল পরে দেখা, এখন ওসব ঝগড়া থাক। তুমি কি করছ বল ? নক্‌লোটা তো শুনছি পোর্ট কমিশনারে ঢুকল। এম. এ. পাস ক'রে ঐ চাকরি—সকাল আটটায় হাজির দেওয়া !'

খবর দেখলুম সে সকলকারই রাখে, কে কী করছে, কে বেকার আছে—সব। অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধে এখনও তার কৌতূহল ও আগ্রহ যথেষ্ট। সুতরাং আরও একটু জোর পেলুম মনে মনে। আরও দুটো-চারটে কথার পরই আমার আসল বক্তব্য খুলে বললুম।

দেখলুম শুনতে শুনতেই গম্ভীর হয়ে উঠল সে, তারপর আমার বলা শেষ হতে বলল, 'তা আমাকে এক্‌জ্যাক্টলি কি করতে হবে ?'

'ঐ তো বললুম, ওখানে তোমার যে সব জানাশুনো বন্ধু-বান্ধব আছে—তাদের একটু চিঠি লিখে কোনমতে যদি এখানে চালান করাতে পার। খরচ যা লাগে সব আমরা দেব, মায় যিনি এসে ওকে জাহাজে তুলে দেবেন তারও সমস্ত ইনসিডেন্টাল খরচ সুদ্ধ। একবার এখানে এসে পৌঁছলে তার বাবা-মা বুঝবে, ধরে রাখতে পারলে রাখবে, না হয়—সে তাদের দায়িত্ব।'

'হুঁ।' অনেকক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে বসে বসে একটা প্যাডের ওপর পেন্সিল দিয়ে আঁচড় টানতে লাগল। ধূমায়িত চুরুটটা ছাইদানীর ওপর রাখা অবস্থায় জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল—সেটাও খেয়াল রইল না।···প্রায় মিনিট দশেক পরে মুখ তুলে তাকাল, স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'সত্যি কথাই বলছি, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, বিলেতে আমার তেমন কোন বন্ধু নেই।'

হতাশও যেমন হলুম, বিরক্তও হলুম এই নির্লজ্জ মিথ্যা কথায়। তবু শান্ত স্বরেই বললুম, 'বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি !'

আরও একটু চুপ ক'রে রইল সে। তারপর ঈষৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'তোমাকে একটা সত্যি কথা খুলে বলছি ভাই, উইথ দ্য রিকোয়েস্ট—এখন অন্তত কিছুদিন কাউকে বোল না। অবশ্য আমার যিনি বস্‌ তিনি জাতে ইংরেজ, ইংরেজ কাজ বোঝে। আমার দ্বারা প্রচুর উন্নতি হয়েছে এদের এই অল্প দিনেই—এখন টের পেলেও ছাড়বে না। তা ছাড়া ঠিক ধাপ্পাবাজী যাকে বলে কাগজে-কলমে তা আমি করি নি। কেউ আমার

কাছ থেকে কোন কাগজপত্র চায় নি, কিছু লিখে দিতেও বলে নি। স্পষ্ট কোন মিথ্যেও বলি নি। তবু, আফটার অল, একটু এমব্যারাস্‌ড্‌ হয়ে পড়তে হবে ঠিকই।…আসল কথা, আমি বিলেত-টিলেত কোথাও যাই নি।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ ভাই, সত্যিই বলছি বিশ্বাস করো। অন দ্য অনার অফ এ জেণ্টলম্যান! নতুন কিছু করব—নতুন কোন পথে জীবিকা উপার্জন করব—এই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। সেই জন্যেই সারেঙদের সঙ্গে মিশে বন্ধুত্ব করেছিলুম। লাই-ব্রেরীতে গিয়ে যত রাজ্যের ভূগোল আর ভ্রমণ-কাহিনীর বই পড়তুম—আর গঙ্গার ধারে গিয়ে যেচে ভাব ক'রে ওদের তোয়াজ করতুম। পয়সাও কিছু কিছু খরচ করেছি ওদের পেছনে। তারপর দু-একজনের সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে তাদের দিয়ে ঐসব দেশের খাম-পোস্টকার্ড আনিয়ে চিঠি লিখে আবার তাদের হাতে দিয়েছি—তারা সেই সব জায়গায় গিয়ে পোস্ট করেছে—নিজেরা হয়তো যেতে পারে নি, আত্মীয়-স্বজন দিয়ে পোস্ট করিয়েছে। ওরা বেশী লেখাপড়া শেখে নি তো, ওদের কাছে এখনও বন্ধুত্বের দাম আর কথা দেওয়ার দাম আছে। যে-কথা দিয়ে যাবে, প্রাণ দিয়েও তা রাখবে, রেখেওছে—ঠিক ঠিক যার পরে যা—যেখান থেকে যে তারিখে যা ফেলবার ফেলেছে।'

'তারপর? প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি, 'এ যে আরব্য উপন্যাসের গল্প প্রায়।'

'হ্যাঁ, কতকটা তাই। ঐ সময়টা আমি কিছু বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট আর ইকনমিক্স-এর বই সংগ্রহ ক'রে আলমোড়ার কাছে দূর এক পাহাড়ী গ্রামে চলে গিয়েছিলুম—সেও এক ঐ সারেঙ বন্ধুর আত্মীয়ের কটেজে। ছোট্ট, কোজী—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল, স্বেচ্ছা-নির্বাসন হ'লেও কোন কষ্ট হয় নি। বাবা-মাও জানতেন না, তাঁদের ধারণা কোন সারেঙ বন্ধু আমাকে স্মাগ্‌ল্‌ ক'রে বিলেতে নিয়ে গেছে।…এর মধ্যে, আমার ঐ অজস্র চিঠি লেখার ফলে, কলকাতায় বেশ চাউর হয়ে গিয়েছিল আমার বিলেত যাওয়ার কথাটা। মাস ন'য়েক পরে ফিরে প্রথমেই এই অফিসে এসেছিলুম দেখা করতে, এখানের পার্সোনেল অফিসার হলেন আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের জামাই, সেই জেনেই এসেছিলুম—তিনি আমাকে দেখামাত্র সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে

পরিচয় করিয়ে দিলেন—আমি বহুদিন বিলেতে ছিলুম, এক্সটেনসিভ্‌লি ইয়োরোপে ঘুরে বেড়িয়েছি, ওখানে ব্যবসা স্টাডি করতেই গিয়েছিলুম—ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে য়্যাপয়েন্টমেণ্ট। আমাকে একটা দরখাস্তও লিখতে হয় নি যে মিথ্যে কথা লিখব। ওঁরাই বরং লিখিত ভাবে অনুরোধ করেছিলেন আমাকে চাকরি নেবার জন্যে। তারপর অবিশ্যি আমার ওয়ার্থ প্রমাণ ক'রে দিয়েছি, এর মধ্যেই ইনক্রিমেণ্ট হয়ে গেছে একটা। আসল কথা, পড়াশুনোটা ভালই করেছি, ফাঁকি দিই নি—আর বোধহয় একটা স্বাভাবিক ন্যাকও ছিল। এই হল সত্যি—ট্রুথ অ্যাণ্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করো, না হয় ক'রো না।'

'কিন্তু লণ্ডনের ঐ ঠিকানাটা?'

'সেও আমার ঐ, তোমাদের মতে এক ডিসরেপুটেব্‌ল—বন্ধুর কাণ্ড। ওটা তার এক শালার ঠিকানা। সে শালাকে বলে রেখেছিল, চিঠিটা যাওয়া মাত্রই সে এখানে রিডাইরেক্ট ক'রে দিত।'

আবারও সে অপ্রতিভের মতো একটু হাসল একবার।

যাত্রাসঙ্গিনী

এটাকে ঠিক গল্পও বলা চলে না, আবার সত্য ঘটনা বললেও বোধ হয় সত্যের একটু অপলাপ করা হয়। কারণ ঘটনাটা আমার চাক্ষুষ নয়। আমার বন্ধু রাঘবন নায়ারের মুখ থেকে শোনা, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এটা। রাঘবন এগারো বছর কলকাতার থাকার ফলে প্রায় বাঙালীই হয়ে গিছলেন, তাই বলে দেশের টান যায় নি। ছেলেমেয়েদের গরমের ছুটির সঙ্গে নিজের পাওনা ছুটি নিয়ে প্রতি বছরই সেখানে চলে যেতেন। কেরালার একেবারে পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে এক গ্রামে তাঁর বাড়ি, পনেরো দিনের বেশী থাকা হ'ত না—কারণ যেতে আসতেই ছ দিন ছ রাত কেটে যেত—তবু গ্রীষ্মের দিনে এদেশে দীর্ঘ পথ-ভ্রমণের দুঃসহ কষ্ট হাসিমুখেই সহ্য করতেন। জমার ঘরে পড়ত আসবার সময় আনা নারকেলের গুঁড়ো, তেঁতুলের কাই, দক্ষিণী রান্নার মশলা। একবার এমনি এক যাত্রাতেই পৌণে দু মন ওজনের উদুখল বয়ে

এনেছিলেন ইড্‌লি ও দোসার চাল ডাল বাটার জন্যে।

এবার রাঘবন বিলাসের সঙ্গে কিছু বাণিজ্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন—অর্থাৎ ঐ ছুটির মধ্যেই একটা আপিসের কাজ ফেলে ছিলেন। কাজটা বোম্বেতে, তাই ফেরার পথে স্ত্রী-পুত্র সোজা কলকাতা পাঠিয়ে নিজে বোম্বে নেমেছিলেন—এবং আপিস থেকেই টিকিট কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল বলে ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া নিয়ে থার্ড ক্লাসে আসার সুবিধে হয় নি, প্রথম শ্রেণীতেই চড়তে হয়েছিল।

বোম্বে হাওড়া মেলের সেই প্রথম শ্রেণীর বগিতেই এই নাট্যের শুরু এবং শেষ।

রাঘবন গাড়ির বাইরে নামের তালিকা দেখেই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। একটি কুপেতে তাঁর সঙ্গে যার নাম পড়েছে সে নিশ্চিত কোন শ্বেতাঙ্গিনী। এ আবার কি বিভ্রাট। একে মেয়েছেলে তায় বিদেশিনী—নিভৃত নির্জন কামরা—কোন ফ্যাঁসাদে পড়বেন না তো? শুদ্ধ বাংলায় চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে—ইংরেজীতে যাকে বলে with foreboding—গাড়িতে এসে উঠলেন, এবং তাঁর বার্থ ওপরে না নিচে—খোঁজ না ক'রেই ওপর তলায় বিছানা বিছিয়ে, স্যুটকেসটি মাথার কাছে রেখে যেন সম্ভাব্য বিপদের জন্যেই প্রস্তুত হলেন। কেবল কলবসানো পানীয় জলের পাত্রটাই ওপরে রাখা গেল না, নিচের বার্থের পাশে ছোট জায়গাটায় রাখতে হ'ল।

খানিক পরে—গাড়ি ছাড়বার মিনিট পনেরো আগে সেই সহযাত্রিনীটি, যাকে বলে হুড়মুড় ক'রে, এসে পড়লেন। কিন্তু, আর যাই হোক—ঠিক এরকমটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না রাঘবন। মেমসাহেব তো বটেই—কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ-ধরণের মেয়ে নয়—হিপি বলে যারা আজকাল পরিচিত, তাদেরই স্ত্রীসংস্করণ, ফিমেল অফ দ্য স্পিশিস্। সংক্ষেপে হিপিনী। একটা কোলাপুরী বেড-কভারের পাজামা, সেটার ছিলের দিকটা পায়ের কাছে ঝালরের মতো ঝুলছে, উর্ধ্বাঙ্গে সংক্ষিপ্ততম একটা নামাবলীর জামা, গলায় নকল পদ্মবীজের মালা, সামনের এক হাতে কতকগুলো প্লাস্টিকের লাল চুড়ি, কাঁধে ঝোলা, একটা আস্ত হরিণের চামড়া গোল ক'রে মোড়া—সম্ভবত শয্যা হিসেবে—অথচ এই সবের সঙ্গে একান্ত বেমানান একটা রেক্সিনের স্যুটকেস—এবং সুদূর কল্পনাকেও যার সঙ্গে এই বেশভূষা মানানো যায় না—তিনটে হাফপ্যান্ট

পরা ছেলে। একটা বছর দশেক, আর একটা বোধ হয় আট, শেষেরটা তিন কি চার। এরাও শ্বেতাঙ্গ তাতে সন্দেহ নেই, অন্তত এককালে ছিল, বর্তমানে ধূলায় ধূসর—তার ওপর বিভিন্ন জায়গায় জলপড়ার দাগ কাদার মতো গড়িয়ে পড়েছে—অর্থাৎ বহুকাল স্নান হয় নি. জল খেতে বা মুখ ধুতে যা দু এক ফোঁটা গায়ে পড়েছে তারই দাগ ওগুলো। হাফ প্যাণ্ট ছাড়া উর্ধ্বাঙ্গে বা নিম্নাঙ্গে আর কিছুই নেই—না জুতো না কোন জামা। ছোটটার শুধু একটা হাতকাটা গেঞ্জি আছে গায়ে—কিন্তু সেটা এত নোংরা যে রাস্তার জঞ্জাল-ঘাঁটা পাগলের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

তবে এতেই বিস্ময়ের শেষ নয়। মহিলা এসেই এক কাণ্ড করলেন। টপাটপ ছেলে তিনটেকেই নিচের বার্থের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন। ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে শুয়ে পড়ল তারা—মহিলা ঠেলে ঠেলে তাদের সরিয়ে দিলেন দেওয়ালের দিকে, যতটা সম্ভব—তারপর নিজের সেই হরিণ-ছাল খুলে পেতে তার ওপর একটা কম্বল এমন-ভাবে ঝুলিয়ে দিলেন যাতে নিচে ছায়ার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু বিধি বাম। বগিটা মান্ধাতার আমলের, আর্শোলা যথেষ্ট। বোধ করি বড়টার গায়ে উঠে থাকবে, সে ধড়মড় ক'রে বেড়িয়ে এল। মহিলা তাকে তিরস্কার ক'রে আবার ভেতরে পাঠাতে চাইলেন কিন্তু সে একবগ্‌গা ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই আর ঐ আর্শোলাকুণ্ডে যেতে রাজী হ'ল না। অগত্যা তিনি উপদেশ দিলেন, 'বাথরুমে থাক্‌গে যা—গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত।'

ছেলেটা তা-ই যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় চার্ট হাতে চেকার বা কনডাক্‌টার কী বলে—সেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন। তরুণ, অতিশয় সুশ্রী চেহারার ছেলেটি, স্মার্ট—সম্ভত মারাঠীই হবে—ওকে দেখেই হিন্দীতে ধমকে উঠলেন, 'এই ছোকরা, এখানে কি করছ। যাও, পালাও শিগগির।'

ছোকরা তো সেই 'শিরতেড়া'—গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চেকার ভদ্রলোক গিয়ে গলা ধরলেন, 'যাও, নামো বলছি।'

এইবার মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'কী করছেন কী করছেন, ও যে আমার ছেলে।'

একবার আপাদমস্তক তাঁকে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলে ? ওর টিকিট কোথায় ?'

'ওর আবার টিকিট কি? ঐটুকু ছেলে।'

'তিন বছরের ওপর হলেই টিকিট লাগবে।'

রাঘবন এই সময় আর থাকতে পারলেন না—বলে উঠলেন, 'ঐ একমাত্র নয়, আরও দুটি আছে বার্থের নিচে।'

মহিলা অভিমান-স্ফুরিত অধরে অভিযোগের সুরে বললেন, 'এটা তোমার বলা উচিত হয় নি। তোমার কি ক্ষতি হচ্ছিল?'

রাঘবন উত্তপ্ত হয়েই ছিলেন। বললেন, 'এ আমাদের জাতীয় ক্ষতি, বলব না।'

এরপর চেকার ভদ্রলোক, নামটা ধরে নেওয়া যাক মাধব যোশী—তলা থেকে হিড় হিড় ক'রে টেনে বার করলেন ছেলে দুটোকে। বললেন, 'তিনখানা হাফ টিকিট লাগবে—ট্রেন ছাড়ার আগে না দিলে আরও পেনাল্টি চাপবে।'

অতঃপর চলল দীর্ঘ কেজিয়া। মহিলার যুক্তি—'ওরা তোমার বার্থ অকুপাই করছে না, ওদের ভাড়া কেন নেবে। এমন তো কত ভিখিরী, সন্ন্যাসী যায় বিনা ভাড়ায়। তা ছাড়াও তো কত যাচ্ছে।'

মাধবের প্রতিযুক্তি, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস, এখানে আমি য়্যালাও করতে পারি না। তাছাড়া আমি আমার ডিউটি ক'রে যাবো, আর কে করে নি—সেটা আমার কাছে কোন আদর্শ বা যুক্তি নয়।'

মহিলা বলেন, 'আমার কাছে টাকা নেই।'

মাধব বলেন, 'তাহলে ওদের নেমে যেতে হবে। প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে —আমি আর দেরি করতে পারি না।'

প্রথমে চোটপাট, পরে অভিমান, আরও পরে চোখের জল—সব অস্ত্রগুলি প্রয়োগ ক'রেও মাধবকে গলানো গেল না। সে দুটো ছেলের হাত ধরে নামিয়ে দিতে যায়; শেষে রফা হলো ছোটটার টিকিট নেবেন না মাধব—বড় দুটোর দুটো হাফ টিকিট লাগবে।

মুখটা অন্ধকার ক'রে মহিলা টাকা বের ক'রে দিলেন।

ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ছেলে তিনটেকে ভালভাবে বসিয়ে ডিনারের অর্ডার দিয়ে (দুটো নিরামিষ মীল) মহিলা এবার গোছ ক'রে বসলেন।

তারপর সিগারেট বার ক'রে গুটি গুটি করিডোরের শেষ প্রান্তে যেখানে মাধব দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে গিয়ে 'অফার' করলেন। মাধব ইতস্তত করছিলেন—মহিলা বললেন, 'মধ্যের অপ্রীতি যে ভুলে গেছ সিগারেট নিলে তবে বুঝব। এমন তো কত হয়—রাগ বিরক্তি রেখে লাভ কি বলো।'

অগত্যা সিগারেট নিলেন মাধব। একটু পরে মহিলার আহ্বানে এসে কামরাতেই বসলেন, বেঞ্চির এক কোণে, সন্তর্পণে।

এবার শুরু হ'ল মহিলার দুঃখের কাহিনী। এ তিনটি ছেলের একটাও নাকি তাঁর নয়—দুঃস্থ অনাথ ছেলে সব—তিনি পুষ্যি নিয়েছেন। তাতেই তাঁর অর্থ-সংকট আরও। তিনি অধ্যাপনা করেন কালিফোর্ণিয়ায়। একটা বই লিখবেন ভারত সম্বন্ধে, তারই তথ্য সংগ্রহে এসেছেন—এদের কোথায় ফেলে আসেন—তাই এনেছেন। কিন্তু এখানে এসে খরচা চালাতে পারছেন না, ইত্যাদি—

মাধব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এরা ছেলে নয় আপনার?'

'এত বড় বড় আমার ছেলে? তুমি ভাবতে পারলে কী ক'রে! আমার এই মোটে চব্বিশ বছর বয়স।'

[চব্বিশ বছর মাই ফুট! রাঘবন মনে মনে বললেন]

এই বলে মহিলা আর একটু কাছ ঘেঁষে বসলেন। প্রায় মাধবের গায়ে গা ঠেকিয়ে।

[দুর্গন্ধ লাগছে না লোকটার?—রাঘবনোবাচ]

অতঃপর ঝোলা থেকে বেরোল মদের শিশি, ছোট গ্লাস। সেই সঙ্গে জলের বোতল। গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে মধুর হাসি ও মদির কটাক্ষের সঙ্গে আগেই মাধবের সামনে ধরলেন। মাধব আর 'না' বলতে পারলেন না।

সংক্ষেপে এর ফলশ্রুতি এই দাঁড়াল, রসিদটা ফেরত নিয়ে মাধব সেটা ক্যানসেল করলেন। টাকাটা ফেরৎ দিয়ে উপদেশ দিলেন, 'খাওয়ার পালা চুকে গেলেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বেন, আর খাবার দেওয়া পর্যন্ত বা খাবার সময় দরজাটা বন্ধ রাখবেন—তাহলে বোধহয় কেউ আর ডিস্টার্ব করবে না। তারপর কাল সকালে যা আছে আপনার অদৃষ্টে হবে, যেভাবে পারেন ম্যানেজ করবেন।'

মাধব চলে যাচ্ছে মহিলার আর একটি—ইংরেজিতে যাকে বলে বিস্ময়

নিক্ষেপ করলেন—দুহাতে মাধবের গলা জড়িয়ে চুমো খেলেন দু গালে এবং ঠোঁটেও।

[রাঘবনের উক্তি, ঘেন্নাপিত্তি একেবারে নেই নাকি লোকটার ?]

মাধব চলে গেলে দরজা বন্ধ ক'রে মহিলা যখন স্যুটকেশ খুলে ছেলেদের জামা বার করতে লাগলেন, রাঘবন ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখলেন, সামনেই মোটা একটা একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল, সেই সঙ্গে এক গোছা ট্র্যাভেলার্স চেক। সব জড়িয়ে কয়েক হাজার টাকা!

রোগ ও তাহার প্রতিকার

ঘটনাটা যে ঠিক কি ঘটল তা কেউই ভাল জানে না। কারণ কেউই ঠিক বুঝতে পারে নি। বোঝবার অবকাশও পায় নি তেমন। অমন সুস্থ সবল কর্মঠ মানুষটা—ওঁর শ্যালক তেঁতুল পালের ভাষায় 'গ্যাট্টাগোট্টা' আর বিন্দের ভাষায় 'খাটাগুমশো',—মানে ? মানেটা বলতে পারব না—কারণ অভিধানে শব্দটা নেই।—হঠাৎ আঁ-আঁ শব্দ করতে করতে চেয়ার থেকে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেলেন একেবারে—কেউ কিছু বোঝবার কি কোন প্রতিকার করার আগেই—এক্ষেত্রে কে কি বুঝবে বলুন ?

কেউ কিছু বুঝল না বলেই কেউ কিছু বলবে না—শাস্ত্রের এমন কোন অনুশাসন নেই। রোগ নির্ণয় শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

প্রহ্লাদ ঘোষ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন যেন, 'থ্রম্বসিস। তোমরা হাঁ করে দেখছ কি! একজন ছুটে ডাক্তার নিয়ে এসো।'

সুমন্ত প্রামাণিক সংক্ষেপে বললেন, 'সেরিব্রাল। ইস—ব্রেনটাই গেল শেষ কালে।'

আশু মুখুজ্যে বললেন, 'উহু, করোনারী। সেরিব্রাল হলে নাক দিয়ে রক্ত গড়াত এতক্ষণে।'

সুমন্ত জবাব দিলেন, 'সে সময় যায় নি এখনও। এই তো সবে শুরু।

ভুবনদা বললেন, 'ও সব কিছু না—স্টোক হয়েছে একটা, সিম্পল স্টোক। ব্লাড প্রেসার ছিল নিশ্চয়ই, যা খাওয়া খেতেন—না থাকাই তো আশ্চর্য ?'

নির্মলদা বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—স্ট্রোক ঠিকই। তবে ওর মধ্যে সিম্পল কিছু নেই দাদা, সবই কমপ্লেক্স। আসলে ওর সবটাই থ্রম্বসিস।'

এঁরা বাদানুবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়লেও ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনবার লোকও ছিল সেখানে। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাড়িতেই ছিলেন, খবর পাওয়া মাত্র চলে এলেন। পাড়ার ডাক্তার কিন্তু তাঁর নাম-যশ আছে, একবার ডাকলে বড় একটা কোথাও যান না, দস্তুর মতো বার কতক হাঁটাহাঁটি ক'রে তবে আনতে হয়। কিন্তু এখানে আলাদা ব্যাপার। বংশীবাবুর অসুখ শুনলে আসবে না কে? বংশীবাবু এ পাড়ার মাথা, পাড়ার গৌরব। তিনি শুধু ধনীই নন—গণ্যমান্যও বটে। সম্প্রতি আবার এম-এল-এ হয়েছেন। তাও কোন দলে নাম লিখিয়ে নয়—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এম-এল-এ, একদিকে কংগ্রেসী অপর দিকে বামপন্থী-সমর্থিত—দুই প্রার্থীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সগৌরবে ঢুকেছেন তিনি। মন্দ লোকে বলে ভোট. কিনেছেন প্রত্যেকটি টাকা গুণে দিয়ে—কিন্তু মন্দ লোকের বলাকে কোনদিনই গ্রাহ্য করেন নি বংশীবদনবাবু আজই বা করবেন কেন?

ডাক্তার যাঁকে ডাকা হ'ল—সুশীল অর্ণব—বহুদিনের বিচক্ষণ ডাক্তার তাই ব'লে বুড়োহাবড়াও নন। বড় হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, পড়াশুনোও অনেক। বিলেতে না গেলেও বিলেত-ফেরতের ধাঁচ-ধরনটা আয়ত্ত করেছেন পুরোপুরি। সুতরাং সেই মতো একটা অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাব নিয়েই তিনি এসেছিলেন -কিন্তু রোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর আর সে শান্ত গম্ভীর্য রাখতে পারলেন না। তাঁর মুখেচোখে ইতর লোকের মতোই বিস্ময় ফুটে উঠল একটা, বরং তাকে বিহ্বলতা বলাই উচিত।

'এ তো থ্রম্বসিস নয়!'

'থ্রম্বসিস নয়?' উপস্থিত সকলের মুখ দিয়ে হিস-হিস শব্দ বেরোল একটা—'বলেন কি? তাহলে কি এটা?'

যেন থ্রম্বসিস মনে ক'রেই সকলে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—এইবার বিচলিত বোধ করছেন একটু—

'আজ্ঞে—কি তবে এটা দেখলেন?'

তেঁতুল পাল এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন।

কি দেখলেন তা ডাক্তারও জানেন না। তাঁর শাস্ত্রে যাকে স্ট্রোক বলে

তা নয়, বুকের অবস্থা খুবই ভাল, নাড়ি একটু উত্তেজিত হলেও ভয়াবহ রকমের নয়, ব্লাড্‌প্রেসার কম—তবে ?

কিন্তু কিছু বুঝতে পারছেন না—একথা বলা সম্ভব নয়। ডাঃ অর্ণবকে সবাই বিচক্ষণ ডাক্তার বলে জানেন—তাঁর মুখ থেকে বিচক্ষণ মতামত শুনতেই অভ্যস্ত সবাই। তিনি মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, 'এটা একটা ফীট-মতো হয়েছে। আপনারা সবাই চারদিকের হাওয়া ছাড়ুন, মুখে মাথায় জল দিন। বাড়িতে স্মেলিং সল্ট আছে ? না থাকে তো কেউ ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুন একটা।'

থম্বসিস নয় শুনে সকলে কিছুটা নিরুৎসাহ হলেও ডাক্তারের নির্দেশ পালন করার লোকের একেবারে অভাব হ'ল না। জল এল, পাখা খোলা হ'ল—কে একজন হাত-পাখাও আনলে একখানা,—স্মেলিং সল্ট মায় ব্লটিং পোড়ার গন্ধ পর্যন্ত শোঁকানো হল কিন্তু বংশীবদনবাবুর ফীট' ভাঙ্গল না। যেমন পড়ে ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন তিনি ; দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ এবং দুই চক্ষু নিমীলিত হয়েই রইল। দাঁতে-দাঁত লেগে গিয়েছিল সেটাও খুলল না—উল্টে কান পেতে শুনলে একটা মৃদু গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা যেতে লাগল এখন।

ডাক্তার প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলেন—এইবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রশান্ত ললাটে ঘাম দেখা দিল—চির-অবিচলিত ঠোঁটের ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী নষ্ট হয়ে মুখটা তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই হাঁ হয়ে রইল খানিকটা। এক কথায় তিনি এ রোগের আগা এবং গোড়া—মাথা আর মুণ্ড কিছুই ধরতে পারলেন না।

এই—যাকে বলে অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে নির্মলদা বলে উঠলেন, 'অত সহজে এর হদিস করতে পারবে না ডাক্তার, বংশীবদন অত সহজে উঠে বসবে না। চিরদিন সবাইকে ঘোল খাইয়েছে—আজ তোমাকেই কি এমনি ছাড়বে ? যাকে বলে বংশীবদন ভড়, মানুষটি অত সহজ নয় সেটা মনে রেখো।'

বংশীবদনবাবু সম্বন্ধে এই তিনটি শব্দই যথেষ্ট। এই-ই ওঁর যথার্থ পরিচয়।

মানুষটি সহজ নয়।

কখনও কোনদিনই সহজ ছিলেন না তিনি।

প্রথম বয়সে কিভাবে টাকা জমিয়েছিলেন তা কেউ জানে না—তবে কিম্বদন্তী এই, যে মামা ওঁকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছিলেন, তাঁকে শেষ অবধি আত্মহত্যা করতে হয়েছিল, মামাতো ভাই-বোনেরা চেয়ে-চিন্তে পরের দয়ায় মানুষ হয়েছে। মামা মরবার পর চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স থেকেই নাকি চাকরি করছেন তিনি—সাধারণ বাঙ্গালী ফার্মের কাজ, সামান্যই বেতন, কিন্তু তাঁরই কপাল গুণে কোনটা টেঁকে নি। পর পর যে তিনটি ফার্মে কাজ করেছেন, সে তিনটিরই মালিককে দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে। শেষেরটির নাকি মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে—বিশেষত বংশী শব্দ কানে গেলেই নেচে-কুঁদে লাফিয়ে-চেঁচিয়ে—পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা করতেন। অথচ সত্যিই কিছু বংশীবাবুর জন্যে তাঁদের কারবার যেতে পারে না—কারণ তাঁরা যখন দেউলে হয়েছেন তখন বংশীবাবুর আর কতই বা বয়স, বড়জোর একুশ হবে! ঐ বয়সে আর কিইবা করতে পারেন তিনি!

না, সে সব কিছু নয়। তবে ঐতেই বংশীবদনবাবুর ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল একটা চাকরির ওপর—মনিবদের বেইমানী দেখে দেখে আর ওদিকে যেতে ইচ্ছে করে নি। এর পর—সামান্য পুঁজি নিয়ে তিনি ব্যবসাতেই নেমেছিলেন।

কিন্তু ঐ যে বলে না (বংশীবদনবাবু নিজেই বলতেন কথাটা) 'তুমি যাবে বঙ্গে তোমার কপাল যাবে সঙ্গে'—তাই যেন হল ওঁর। সোজাসুজি কারবারে নামার মতো পুঁজি বা মূলধন ওঁর ছিল না, তাই প্রথম প্রথম ভাগেই করতে হয়েছে, অপরের সঙ্গে। কেউ ছোটখাটো কোন কারবার করেছে কিন্তু টাকার অভাবে জুৎ করতে পারছে না, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করছে হচ্ছে দেখলেই বংশীবদনবাবু তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। কিছু টাকা ঢেলে অংশীদার হতেন। যার মোটে তিন হাজার টাকা পুঁজি তার পক্ষে আরও দুই কি তিন হাজার টাকা পেলে সুবিধেই হবার কথা কিন্তু এমনই ভাগ্য বংশীবাবুর যে, প্রত্যেকবারই তাঁর প্রচেষ্টায় হিতে বিপরীত হয়েছে। যাদের যাদের সঙ্গে ভাগে কারবার করতে গেছেন—তাদেরই কারবার উঠে গেছে কিছুদিন পরে। নিজেদের চালের ভুলে, অভিজ্ঞতার অভাবে বা গোঁয়ারতুমির জন্য বিপুল দেনায় জড়িয়ে পড়েছে তারা। সেক্ষেত্রে নিজের আসলটা উদ্ধারের জন্যে যদি বংশীবাবু তাদের কারবার বেচে-কিনে ক্রোক ক'রে নিজের

হকের টাকা আদায় ক'রে নেন তো খুব দোষ দেওয়া যায় কি?

ক্রমশ এতেও অরুচি ধরে গেল তাঁর। স্থির করলেন পুঁটি মাছের ঝাঁকে আর যাবেন না, মরতে যদি হয় তো রুই মাছের ঝাঁকে গিয়ে মরাই ভাল। ছোটখাটো কারবারে আর না—এবার যদি ব্যবসায় জড়াতে হয় তো যা আছে গরিবের ক্ষুদ-কুঁড়ো সব দিয়ে একটা বড় ক'রে কোম্পানী ফাঁদবেন নিজেই। লিমিটেড কোম্পানী।

ফাঁদলেনও নিজেই উদ্যোগী হয়ে, একটা নয়—কয়েকটাই পর পর। কিন্তু ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং—সব কটা কোম্পানীই পর পর লিকুইডিশ্যানে গেল। অবশ্য তাতে বংশীবাবুর কোন ক্ষতি হয় নি—তখন নাকি তা হ'ত না। লিমিটেড কোম্পানী যতই ডুবুক—ম্যানিজং এজেণ্ট বা ডিরেক্টারদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগত না। পাঁকাল মাছের মতোই বেরিয়ে আসতে পারতেন তাঁরা—পিছলে।

যাই হোক—এইভাবে গোটা এগারো কোম্পানীর সুব্যবস্থা করতে করতেই যুদ্ধ এসে গেল, তার সঙ্গে মন্বন্তর। লিমিটেড কোম্পানীর কাজটা বড়ই তুচ্ছ মনে হ'ল তখন। নেমে পড়লেন কালো বাজারে—চাল থেকে সিগারেট, কামানোর ব্লেড থেকে চিনি—কোনটাই বাদ গেল না। তার সঙ্গে মিলিটারী কনট্র্যাক্ট তো আছেই, সেও নানাবিধ ও বিচিত্র। কখনও নিজে কাজ করতেন না, তাঁর কাজ ছিল শুধু ঠিকা বার করা, তারপর সে ঠিকা ভাগ ক'রে নেবার জন্য তো কত লোকই প্রস্তুত। তারা লাভ করুক বা লোকসান করুক—ওঁর লাভ বাঁধা, তাও আগাম এসে যেত। মন্দ লোকে বলে যে, সে সময় তিনি সরবরাহ করেন নি এমন বস্তু নেই বা এমন প্রাণী নেই। চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদ—যে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। এবং ঠিকা বার করার জন্যেও দেন নি এমন ঘুষ নেই, পদার্থ থেকে প্রাণী সবই যুগিয়েছেন—নির্বিচারে। তবে মন্দ লোকে কি না বলে! আর তাদের কথাতে কান দেবার মতো মানুষও বংশীবদন ভড় নন।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সে সময় ওঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দিতে চেয়েছিলেন—যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর সর্ববিধ সাহায্যের জন্য। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বংশীবাবু তা নেন নি। এদেশে তাদের রাজত্ব যে বেশীদিন নয় তা যেন তিনি তখনই দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা আসার পর বংশীবাবু দিন কতক কংগ্রেসী মহলে ঘেঁষেছিলেন—তারপর দিন কতক বিরোধী দলে—কিন্তু কোথাও ভাল লাগে নি তাঁর। ওরা সবাই টাকা চায়, তাঁর টাকার জন্যেই নাকি তাঁকে দলে নেবার আগ্রহ। এত বোকা বংশীবাবু নন যে তাঁর রক্ত-জলকরা টাকা ঢেলে ওদের দল বজায় রাখবেন।

এখন আর তিনি ওসব কোন দলেই নেই। শখ হয়েছিল কিছু টাকা খরচ ক'রে এম. এল. এ. হয়েছেন। টাকার শক্তি তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন—যত দিন ও বস্তুটি তাঁর পর্যাপ্ত আছে, ততদিন কোন দলই কিছু করতে পারবে না। যদি শখ হয় তো আসছে বারে দিল্লীর লোকসভাতে গিয়েও বসতে পারবেন।

টাকার শক্তি জানেন বলেই তার সাধনাও ছাড়েন নি। তবে এখন আর বেশী পরিশ্রম করতে পারেন না। দৌড়-ঝাঁপ পেরে ওঠেন না তত। এখন শুধু খুঁজে খুঁজে নাবালক আর বিধবার সম্পত্তি কিনে বেড়ান, মামলা-মকদ্দমা ক'রে নিজের অধিকার কায়েম ক'রে অনেক চড়া দামে বেচেন অথবা মামলা-মকদ্দমা শুরু হবার আগেই কিঞ্চিৎ লাভে বেচে দিয়ে সরে পড়েন। এ ছাড়াও কিছু করেন তিনি—সমব্যবসায়ীদের সাহায্য করেন পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে। না, তার মধ্যে কোন ভেজাল কি ভেল নেই। কারণ যা করেন তার জন্য ফী নেন—মোটা টাকাই নেন—নিঃস্বার্থ পরোপকারে তিনি বিশ্বাস করেন না কোন দিনই। আর যারা শুধু খাতাপত্রে কিছু হের-ফের ক'রে, দু-একটা শেয়ার এ-হাত থেকে ও-হাতে সরিয়ে সামান্য কয়েকটা কালির আঁচড় টেনে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করবে—তাঁরই বুদ্ধিতে ও নির্দেশে—তাদের কাছ থেকে হাজার-কয়েক টাকা তিনি নেবেন না-ইবা কেন? এটা তো ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তাঁর পাওয়া। তাঁর পরামর্শ না পেলে কি আর হরিদয়াল কুণ্ডু অতগুলো বড় বড় বিলিতী কোম্পানী কব্জা করতে পারত, না ওসিয়ানিয়া বীমা কোম্পানীর লাখ লাখ টাকা গিয়ে উঠত হরিহর চৌরাশিয়ার সিন্দুকে। তবু তো হরিহর তাঁর সঙ্গে বেইমানী করলে। এক পারসেণ্ট দেবে বলে দেবার সময় দিলে আধ পারসেণ্ট। এক ক্রোরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র। তা তার শোধও উঠেছে হাতে হাতে—বংশীবদনবাবু হাতে থাকলে কি আর ধরা পড়ত, না শ্রীঘর বাস করতে হত? শেষে এসে তো কেঁদে পড়েছিল।

'বাবুজী বাঁচাও। শলা দাও কী করব!' তা বংশীবাবুও একরোখা, এক কথার মানুষ। যে বেইমানী করবে তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না, লাখ টাকার লোভ দেখালেও না। শেষ হয়ে গেল সব সম্পর্ক, ঐ পর্যন্তই। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাই দেখলেন বংশীবদন ভড়, কেমন ক'রে লোকটা চারদিক থেকে ডুবল!

এহেন বংশীবদন মানুষটি যে সহজ হবেন তা সম্ভব নয়। সহজ মানুষ নন‌ও তিনি। তাই, ফীট হয়ে পড়ে থেকেও মানুষকে বেগ দিতে থাকলেন। সব চেয়ে বেগ দিলেন ডাক্তার অর্ণবকেই বেশী ক'রে। ডাক্তার ঘেমে নেয়ে উঠলেন, মাথার চুলগুলো টানাটানিতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠল, উদ্‌ভ্রান্তের মতো কেবল নিজের টাইটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। অর্থাৎ এতদিনের অভ্যস্ত আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটি মোড়ক-খোলা কর্পূরের মতোই উবে গেল—অতি সাধারণ গোলা লোকের মতোই বিচলিত ও বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

এই যখন অবস্থা তখন বংশীবদনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সেক্রেটারী—এবং অধুনা তাঁর জামাইও বটে—বাঘা দে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। বাঘা আগে এই বাড়িতেই থাকত। এককালে বলতে গেলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন বংশীবদন, বাড়িতে থাকা-খাওয়া ও মাসিক এক টাকা বেতনে চাকরি দিয়েছিলেন। তা বাঘাও বেইমানি করে নি। দীর্ঘদিন শুধু ঐ পেটভাতাতেই দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা ভূতের মতো খেটেছে সে। সেই বাপ-মরা মা-খেদানো ছেলেটিই ক্রমে তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং কোন কোন বিশেষ কারবারে অংশীদারও হয়ে উঠল। এক্ষেত্রে যতটা চুরি করা স্বাভাবিক বা সম্ভব, অন্য যে কোন লোক যা করত—বংশীবদনবাবু নিজেও এ অবস্থায় বিবেক বাঁচিয়ে যতটা চুরি করতেন—তার থেকে অনেক কম করত বাঘা। তার এই বিশ্বস্ততার চরম পুরস্কার দিয়েছেন বংশীবদনবাবু, তাকে জামাই ক'রে। তার জন্য বাহবাও দিয়েছেন নিজেকে। পুরস্কার দেওয়া তো হ'লই, সেই সঙ্গে অমন বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত লোকটিকে বেঁধে ফেলাও হ'ল চিরকালের মতো। জামাই হবার পর অবশ্য বাঘা আর এ বাড়িতে থাকে না, ভালও দেখায় না সেটা। এই পাড়াতেই কাছাকাছি একটা বাড়ি করিয়ে দিয়েছেন বংশীবাবু মেয়ে

জামাইকে (অবশ্য বাঘারই টাকায়)—ওরা এখন সেখানেই থাকে।

বাঘাকে দেখে সবাই আশ্বস্ত হ'ল। এমন কি ডাক্তারও। তাকে দেখে আশ্বস্ত না হয়ে থাকা যায় না—এমনই একটা দক্ষতার ছাপ আছে তার চেহারায়, তার চলনে বলনে। সে এসেই—'সরুন সরুন, সরে যান তো—দেখতে দিন আমাকে কী হয়েছে' বলে সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে অবলীলাক্রমে মুহূর্তের মধ্যে সামনে এসে পড়ল।

'এবার বলুন তো—ব্যাপারটা কি ?'

সবাই একসঙ্গে বলতে যাচ্ছিল, একটিমাত্র আঙুল তুলে সবাইকে নিরস্ত ক'রে বাঘা বলল, 'মামা তুমিই বল শুনি, কেমন ক'রে কী ঘটল !'

তেঁতুল পালও সাড়ম্বরে বেশ রঙ দিয়েই বলতে যাচ্ছিলেন, দুটো চারটে কথার পর তাঁকেও থামিয়ে দিলে বাঘা। বললে, 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ডাক্তারের কম্ম নয় এ রোগ সারানো। আচ্ছা, উনি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে কী কথা হচ্ছিল জানেন ? কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কে কী বলছিল ?'

নিমেষে একটা স্তব্ধতা নেমে এল সেই গুঞ্জনরত আসরে। অস্বাভাবিক নীরবতা একটা।

সত্যিই তো—এটা তো কেউ লক্ষ্য করে নি—কী কথা হ'তে হ'তে ফীট হ'ল ওঁর—কার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ?

কিছুক্ষণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাবার পর—সকলেই যেন এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই !'

—এবং আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে এক কোণে দাঁড়িয়ে-থাকা পাড়ার ইস্কুলের হেড মাস্টার—পঞ্চানন্দ মাইতিকে। বংশীবাবু সেক্রেটারী, সেইহেতু প্রতি রবিবারেই পঞ্চুবাবুকে একবার ক'রে আসতে হয়—সেদিনও এসেছিলেন। ঠিক তাঁর সঙ্গেই যে কথা কইতে কইতে ফীট্‌টা হয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করে নি। পঞ্চুবাবুকেই কেউ লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্য করবার মতো ননও তিনি।

এখন সকলের মিলিত অগ্নিদৃষ্টির সামনে এতটুকু মানুষ পঞ্চানন্দ মাইতি সঙ্কুচিত হয়ে আরও এতটুকু হয়ে গেলেন। এগিয়ে এসে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'আজ্ঞে, আমি তো তেমন কোন কথা—মানে আমি তো ভাল কথাই বলছিলুম। মানে—'

প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে উঠল বাবা, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে ভাল-মন্দ আমরা বুঝব। কী বলছিলেন, তাই বলুন দিকি—চট পট। ঠিক ঠিক বলবেন, একটা কথারও না হেরফের হয়।'

ঠিক ঠিকই বললেন পঞ্চানন্দ মাইতি, না বলবার কোন কারণও নেই কিছু। সত্যিই খারাপ কথা কিছু বলেন নি। ওঁর এক ভগ্নীপতি এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে হাজার খানেক টাকা ঠকেছিলেন, গরীব মানুষ খুবই কষ্ট হয়েছিল সেজন্য, লোভে পড়েই যথাসর্বস্ব বার করে দিয়েছিলেন তিনি। তা তখন কোন প্রতিকারই হয় নি। কিন্তু সেই লোকটা এতদিন পরে অন্য একটা ব্যাপারে দারুণ ফেঁসে গেছে—যথা সর্বস্ব তো গেছেই—পুরো তিনটি বছর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। আপীল করেছিল তাতেও কোন ফল হয় নি। আরও একটা মজার ব্যাপার—সম্প্রতি একটা কি চার-আনা টিকিটের লটারীতে ওঁর সেই ভগ্নীপতিটি প্রায় উনিশ শো টাকার মতো পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ যা গিয়েছিল তার সুদসুদ্ধ পুষিয়ে দিয়েছেন ভগবান।

এইকথাটা শুনতে শুনতেই বংশীবদনবাবুর প্রথম একটু ভাবান্তর হয়। তাঁর মুখখানা কেমন বিকৃত হয়ে উঠতে থাকে, দু একবার তাঁর চেয়ারে বসেই কী রকম এপাশ ওপাশ করেন, তাঁর যে অস্বস্তি হচ্ছে একটা তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তার ওপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নি পঞ্চুবাবু। গত রাত্রির গুরু ভোজনের ফলে বায়ুর আধিক্য হয়েছে, এই মনে করেছিলেন। বলার উৎসাহে বলেই যাচ্ছিলেন তিনি। এমনি আরও দুচারটি যা ঘটনা ঘটেছে তাঁর জানাশুনো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—তাঁর প্রত্যক্ষ চোখে দেখা—তারই ইতিহাস বিবৃত ক'রে উপসংহারে টেনেছিলেন তিনি, 'যে যথার্থ ধর্মভীরু হয়, যে সৎপথে থাকে—তার কথা স্বয়ং ভগবান চিন্তা করেন আর শেষ পর্যন্ত তার ভালই হয়। ধর্মই প্রধান, ধর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই দেখুন না—'

'এই পর্যন্ত বলেছিলেন পঞ্চুবাবু, হ্যাঁ, তাঁর বেশ মনে আছে। এই কথাগুলি ঠিক এইভাবে বলেছিলেন। তবে শেষ করতে পারেন নি, তার আগেই—বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে অতর্কিতে দুম্ ক'রে পড়ে গিয়েছিলেন বংশীবাবু। ওঁর ঘাড়েই কতকটা পড়েছিলেন তাই রক্ষা, নইলে আরও খুবই আঘাত লাগত। হাজার হোক ওঁদের আরামের শরীর তো।

'হুঁ, লাগাচ্ছি।' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল বাঘা। বাঘের মতোই যেন গর্জন ক'রে উঠল সে। অসুস্থ শ্বশুরকে উপলক্ষ ক'রেই যে তার এখানে আসা, সে কথাটা সে বেমালুম ভুলেই গেছে মনে হ'ল। সেদিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরেই আগে সে পড়ল পঞ্চানন্দবাবুকে নিয়ে।

'বলি কে, কে বলেছে আপনাকে কথাটা, য়্যাঁ ? কে বলেছে শুনি ? যে সৎ পথে থাকে তার ভাল হয় আর যে পাপী তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়—এমন গাঁজাখুরী গালগল্প কোথায় পেলেন আপনি ? এই সব মিথ্যে কথাগুলো শেখান নাকি ছেলেদের ইস্কুলে ? তা হ'লে তো খুব শিক্ষা দিচ্ছেন। হুঁ।'

একটু দম নেবার জন্যেই বোধহয় থামল বাঘা দে, আড়ে একবার শ্বশুর-কাম-মনিব-কাম-অংশীদারের চেহারাটাও দেখে নিল যেন, তারপর আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বলি কী জানেন আপনি, য়্যাঁ ? এতবড় দুনিয়াটার কোথায় কি হচ্ছে তার কি খোঁজ রাখেন ? ঐ যে সব সেন্ট্রাল এভিনিউ আর রাসবিহারী এভিনিউ আর সাদার্ণ এভিনিউর ওপর বড় বড় বাড়ি আর ঐ যে দেখেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুমুখো গাড়ি—যার একটার দামে আপনার মতো ইস্কুলবাড়ি তিন-চারখানা কেনা যায়—কিসের পয়সায় ওগুলো হয়েছে জানেন ? সবগুলোই বুঝি নিছক সৎপথের পয়সা ?…পাপের সাজা হয় বলছেন, বছরে কতগুলো ক'রে খুন জখম রাহাজানির কিনারা হয় না, ক্রিমিনালরা মোটে ধরাই পড়ে না, তার খবর রাখেন ? যারা ওকাজ করেছে তারা কত লোক দেখুনগে আপনার আশেপাশেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলি হেডমাস্টারী করেন—খবরের কাগজ একখানা তো পড়লে পারেন, এ সব হিসেব তো মধ্যে মধ্যে বেরোয় ; তা নিয়ে য়্যাসেম্ব্লীতে কোশ্চেনও ওঠে। খাস দারোগা পুলিশকেই খুন ক'রে গুম্ ক'রে দিচ্ছে তার কিনারা হচ্ছে না—তা সাধারণ মানুষ তো কোন ছার। বিশ্বাস না হয় লালবাজারে গিয়ে খতেনটা দেখে আসুন গে যান।'

পঞ্চানন্দবাবু স্তম্ভিত। স্তম্ভিত উপস্থিত সকলেই। আর সকলের সেই প্রস্তরীভূত নিস্তব্ধ অবস্থার মধ্যে নিদারুণ নিঃশব্দ চাঞ্চল্য জাগিয়ে একটি মাত্র ধ্বনি প্রকাশ করলেন—এতক্ষণ যিনি পাথরের মতো পড়ে ছিলেন—সেই বংশীবাবু। একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অতি ক্ষীণ একটা শব্দ উঠল, 'য়্যাঁ—।'

আনন্দিত হবার কথা, এমনকি আনন্দে লাফিয়ে ওঠাই হয়ত উচিত, অন্তত সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যাপারটা কতদূর কী হচ্ছে দেখা দরকার—যাই হোক এতক্ষণ পরে একটু হুঁশের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করল না বাঘা। বরং আগের চেয়েও বেশী ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'অকারণে যারা লাখে লাখে মানুষ মারে তারা বীর যোদ্ধা, যারা সেই মানুষ মারার হুকুম দেয় তারা বড় বড় রাজনীতিক নেতা, আর তাদের মারবার জন্যে সাংঘাতিক সাংঘাতিক হাতিয়ার সন্ধান দেয় তারা বড় বৈজ্ঞানিক—তা আপনি জানেন না? এদের কী হয়, আপনারাই মহাপুরুষ বলে পূজো করেন, বড় বড় পুরস্কার দেওয়া হয়। সৎপথে কারা থাকে?—গরীব-গুরবো বা চাষী মজুর—তাদের কখনও ভাল হয় আপনি দেখেছেন? যেখানে যত অধর্ম যত পাপ—সেখানে তত পয়সা, তত সম্মান, তত প্রতিপত্তি। এসব কি আপনাদের চোখে পড়ে না? কোথায় কোন্ জগতে থাকেন আপনি, য়্যাঁ?'

আরও হয়ত খানিকটা বক্তৃতা করার ইচ্ছা ছিল বাঘার, উৎসাহের বাষ্পটা অনেকখানি তৈরী ক'রে ছিল নিজের ভেতরে কিন্তু তাতে বাধা দিলেন স্বয়ং বংশীবদনবাবু। আর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'য়্যাঁ—? ও কে কথা কইছে? বাঘা? আমার কী হয়েছে? আমি শুয়ে কেন?'

ডাক্তার হেঁট হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, কনুয়ের এক গুঁতো দিয়ে তাঁকে নিরস্ত ক'রে বাঘাই এবার এগিয়ে এসে বলল, 'কিছু হয় নি বাবু, ঐ একটু তন্দ্রামতো এসেছিল আপনার। উঠুন, উঠে বসুন এবার আপনি—ঘুম তো ভেঙ্গেছে, আর কেন!'

ডাক্তারের দৃষ্টির আতঙ্ক এবং হাতের বাধা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বাঘা তাঁকে ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বংশীবদনবাবু তাঁর আসনে নিরাপদে ও আরামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর দুর্বল ও ক্লান্ত দৃষ্টিটা একবার উপস্থিত সকলের ওপর বুলিয়ে নিলেন, তারপর ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাববার চেষ্টাও করলেন। তারপর কতকটা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গীতে বললেন, 'তা তুই—তুই এ সময় এখানে কেন—কাজ-কর্ম ফেলে?'

'আজ্ঞে, আমি আপনাকে সেই খবরটা দিতে এসেছিলুম।'

'কী খবর?' ভ্রূকুঞ্চিত প্রশ্ন—সেই পূর্ববৎ।

'ঐ যে কাগজে সেদিন পড়েছিলেন আমেরিকার এক শহরে দুটো কেরাণী মিলে সাতচল্লিশ লাখ ডলার মেরে সরে পড়েছে, চারদিকে হৈ-হৈ তোলপাড় চলেছে—কাল আপনি খোঁজ করছিলেন না কেসটার কী হ'ল, কাগজে আর কিছু লিখছে না কেন? আজ এইমাত্র পত্রিকা অফিসে সেই খবর নিতে গিয়েছিলুম। তাই ভাবলুম জানিয়ে যাই একটু—হয়ত উদ্বিগ্ন থাকবেন'—সামান্য একটু চোখ টিপে শেষ করলে কথাটা বাঘা, 'যা দিনকাল, ব্যাঙ্কে যাদের টাকা আছে, সকলকারই বুক ঢুগ্‌বুগ্‌ করে সর্বদা।'

'হ্যাঁ—তা কী শুনলে?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করেন বংশীবাবু, ইতিমধ্যেই তাঁর কণ্ঠ ও দৃষ্টির ক্লান্তি পনেরো আনা কেটে গেছে।

'নাঃ, কোন হদিসই হয় নি। ছটা দেশের পুলিশে খুঁজছে তাদের, বহু এরোপ্লেন, গাড়ি, জাহাজ ছুটোছুটি করছে, আরও লাখ লাখ ডলার খরচ হয়ে গেল কিন্তু একজনকেও ধরতে পারা গেল না এখনও।'

'তাই নাকি হে! বল কি, আশ্চর্য ক্ষমতা তো লোক দুটোর। বাহাদুর বটে।...দিন কাল কী দাঁড়াল তাই ভাবি, ওদের দেশের পুলিশই যদি এমনি অকর্মণ্য হয়, আমাদের দেশের এদের ওপর আর ভরসা কী!'

কথাগুলো যা-ই বলুন—সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল ও শুনল, তাঁর চেহারার আর বলার ভঙ্গিতে কোথাও কোন অসুস্থতা নেই। দিব্যি সহজ মানুষ।

'কৈ রে, কেউ তামাক দিয়ে যা না রে! এ যে ছাই হয়ে গেছে একেবারে।'

তারপরই পঞ্চানন্দবাবুর দিকে নজর পড়াতে আর একবার ভ্রূ কুঁচকে যেন কী একটা মনে করবার চেষ্টা করলেন, 'তারপর, মাষ্টার যেন কী বলছিলে তখন?'

তাড়াতাড়ি বাঘা যেন সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আড়াল ক'রে দাঁড়াল পঞ্চু-বাবুকে, 'না না, আমার সঙ্গে ওঁর একটু দরকার ছিল। ওঁর ইস্কুলে মর্যাল ট্রেনিংয়ের ক্লাস করবেন, তাই ওঁর ইচ্ছা যে, আমি একটু সময় করে পড়াই।'

'ভাল ভাল, উপযুক্ত লোককেই ধরেছেন। তা তুই যেন না বলিস নি। শুধুই নিজের কাজ নিয়ে থাকলে চলে না—ছেলেগুলোর আখেরও একটু দেখা দরকার।'

তারপরই তাঁর নজর পড়ল ডাক্তারের ওপর, 'আরে—ডাক্তার কী মনে করে ?'

ডাক্তার জবাব দেবার আগেই এবারও উত্তরটা যুগিয়ে দিলে বাঘা, 'ও এসেছিল ওদের সুন্দরবন সেবা সমিতির জন্য চাঁদা চাইতে।'

'চাঁদা!···তা তুই কি বললি ?' ভীষণ শোনায় তাঁর গলাটা।

'আমি বলে দিয়েছি এখানে ওঁর চাঁদা না নেওয়াই ভাল। চাঁদা আমরা দিতে পারি, ভালই দেব—কিন্তু আমাদেরও তিনটে প্রতিষ্ঠান আছে, যা দেব আদায় ক'রে নেব তার তিন গুণ! তা ও পাড়ার ডাক্তার, ওকে আর প্যাঁচে ফেলতে চাই না।'

'বেশ করেছিস, ভালই করেছিস। ডাক্তার ছেলে ভাল।' মন্তব্য করেন ভড় মশাই।

ততক্ষণে ডাক্তারের হাত ধরে টানতে টানতে সদর দরজার কাছে নিয়ে গেছে বাঘা, 'নাও, এবার সরে পড়ো দিকি, চুপচাপ, এমন ফুটো বিদ্যে নিয়ে আর এখানে ডাক্তারী করতে এসো না বার-দিগর।'

ডাক্তার অর্ণব কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তা আমার ফীটা ? আমাকে দস্তুরমতো ডেকে আনা হয়েছে, অমনি সেধে আসি নি।'

'কিন্তু ডাক্তারীটা কী করলে এসে শুনি! সেটা তো করলুম আমি, ফী তো উল্‌টে তোমারই দিয়ে যাওয়া উচিত, গুরু দক্ষিণে! আবার ফী।' খিঁচিয়ে ভেংচি কেটে বিশ্রী একটা গলার স্বর বার করলে বাঘা, চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আর ফীয়ে কাজ নেই। মানে মানে সরে পড়ো ভাল চাও তো। মিছিমিছি আমাকে ঘাঁটিও না!···নইলে তোমার ঐ যন্তরপাতি আর ব্যাগ কেড়ে রেখে দেব—আর একবার আমার কাছে ডাক্তারীর এগ্‌জামিন দিয়ে তবে ছাড়িয়ে নিতে হবে। আমার নাম বাঘা দে, মনে রেখো।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের যে হাত ধরা ছিল তাইতে মোলায়েম অস্তুর্টিপুনী চলছিল বোধহয়, ডাক্তার সুশীল অর্ণব কোন মতে হাতটা ছাড়িয়ে এক লাফে রাস্তায় এসে পড়লেন।

পূজা কনসেশন চলিতেছে গত কয়েকদিনই। কিন্তু আজ হইতেই পূজার ছুটি আরম্ভ। সমস্ত সেভেন-আপ ট্রেনখানা লোকে লোকারণ্য। হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, কাবুলী, মাড়োয়ারী, সিন্ধী, ওড়িয়া, সাঁওতালী, বাঙালী, ভারতের প্রায় সব ভাষাভাষী এবং সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীই সেই প্রয়াগে আসিয়াছেন, কিন্তু মিলিত হইতে পারেন নাই। গালাগালি, হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি এবং কিছু বা রক্তারক্তিও চলিয়াছে, তবু শেষপর্যন্ত যাত্রীরা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া কোনো-মতে উঠিতেছেই, আর পরক্ষণেই পুরাতনদের দলে মিশিয়া বামপন্থীদের প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ফিরিওয়ালার চিৎকার, মুটেদের বচসা ও যাত্রীদের কটূক্তি সমস্ত মিলিয়া স্থানটিকে নরমেধ-যজ্ঞের আসর করিয়া তুলিয়াছে বলিলেও বোধকরি অত্যুক্তি হয় না।

ইহারই মধ্যে, ট্রেন ছাড়িবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটি বাঙালী যুবক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একটা মাঝারি কামরার হাতল ধরিয়া টপ করিয়া পাদানিতে উঠিয়া পড়িল। সঙ্গেসঙ্গে গাড়ির মধ্য হইতে বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় নানা প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, 'এখানে নয়, এখানে নয়, হিঁয়া জা'গা কাঁহা', 'আগে যাও, বহুত খালি হ্যায়' ইত্যাদি। কিন্তু ছেলেটি অবিচলিতভাবে হাতের ছোট স্যুটকেশ এবং আরও ছোট্ট বিছানাটা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল, তাহার পর ধমক দিয়া কহিল, 'দেখতা নেহি, গাড়ি ছোড় দিয়া?'

তাহার পর দরজা খোলা অসম্ভব দেখিয়া সে জানালা দিয়াই গলিয়া অনায়াসে ভিতরে চলিয়া আসিয়া অপর কাহারও একটা বিছানার বাণ্ডিলের উপর দাঁড়াইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল।

গাড়ির মধ্যের অসন্তোষ তখনও যায় নাই। একজন রুষ্টকণ্ঠে কহিলেন, 'ইঞ্জিনের দিকে দেদার জায়গা খালি পড়ে রয়েছে, তবু সকলে এইখানেই ভিড় করবে।'

ছেলেটি তখন চোখ বুজিয়া দম লইতেছিল, সে চোখ মেলিয়া বক্তার দিকে চাহিয়া হাসিয়াই জবাব দিল, 'আপনি আবার ই. আই. আর-এর গাড়ির

সামনের দিকে চড়তে বলছেন ?'

সঙ্গেসঙ্গে সকলেই একবার শিহরিয়া উঠিলেন। সম্প্রতি অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে কথাটা সকলেই একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সহসা মনে পড়িয়া গেল। তবু একজন ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 'খামকা ই. আই. আর-এরই বা দোষ দিচ্ছেন কেন, এই তো সেদিন ঢাকা মেলে কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল।'

ছেলেটি কেমন যেন অদ্ভুতভাবে একটু হাসিল, তাহার পর কহিল, 'তা বটে! কিন্তু সে-ও তো আমারই দোষে।'

—'আমারই দোষে!!'

নিমেষের মধ্যে গাড়িসুদ্ধ লোক যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারই দোষে এমন কাণ্ডটা ঘটিল—এ কথার কী অর্থ হইতে পারে ?

—'ব্যাপার কী মশাই ?'

একজন ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন। আর একজন কহিলেন, 'আপনি কি ওখানে চাকরি করেন ? মানে, ই. বি. আর-এ ?*

সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। ওধারের বেঞ্চে গুটিকয়েক বাঙালী ভদ্রলোক যতখানি সম্ভব বিছানা বিস্তৃত করিয়া বসিয়াছিলেন, উত্তরটা শুনিবার অসুবিধা তাঁহাদেরই বেশী। ফস করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন একটু সরিয়া বসিয়া কহিলেন, 'এইদিকে আসুন না দাদা, কতক্ষণ আর কষ্ট ক'রে যাবেন ? জায়গা একরকম ক'রে হয়েই যাবে এখন।'

বলা বাহুল্য আগন্তুক আর দ্বিধা করিল না। কোনোমতে স্তূপাকার মোট-ঘাট ঠেলিয়া মাড়াইয়া এপাশে আসিল এবং তাঁহাদেরই বিছানো জাজিমের উপর বেশ আরাম করিয়া বসিল।—'আঃ, বাঁচলুম! ছুটোছুটি ক'রে এসে দাঁড়ানো যা কষ্ট।'

অতঃপর সে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাইল।

এধারে শ্রোতারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুখপাত্রস্বরূপ প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার নামটি কী, জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?'

---

* আগে কলিকাতা হইতে পূর্ববঙ্গে যাওয়ার যে রেললাইন ছিল, সেটাকে ই. বি. আর. বলত। তার আগে যেটা ছিল ই. আই. আর সেটাই ভেঙে এন. আর. এবং ই. আর. হয়েছে।

ছেলেটি হাসিয়া জবাব দিল, 'বিলক্ষণ। তা পারবেন না কেন? আমার নাম, অসিত—অসিতরঞ্জন সেন।'

এইবার আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন, 'তা ঢাকা মেল দুর্ঘটনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক শুনতে পেলুম না তো?'

রহস্যজনকভাবে হাসিয়া অসিত জবাব দিল, 'মানে, আমি ঐ গাড়িতে ছিলুম আর কি।'

সকলেই বিস্মিত হইল। কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সকলেই প্রথমে পরস্পরের মুখের দিকে এবং পরে অসিতের মুখের দিকে চাহিল। অসিত কিন্তু তখন নির্বিকারভাবে সিগারেট টানিতেছে, আর সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে।

শেষে একজন প্রশ্ন করিলেন, 'তার মানে? আপনি ছিলেন তা কী হয়েছে?'

সিগারেটের খানিকটা ছাই ঝাড়িয়া অসিত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দেখুন, কথাটা আমার বলবার ইচ্ছা ছিল না মোটে, আপনাদের পেড়াপীড়িতেই বলতে হচ্ছে। এর মধ্যে যে কটা ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল তার সব ক'টাতেই আমি ছিলুম।'

কথাটা ঠিকমতো বুঝিতে না পারিলেও, অকস্মাৎ বোধকরি অকারণেই, একটা হিমশৈত্য সকলের মেরুদণ্ড দিয়া যেন দেহের নিচের দিকে নামিয়া গেল। অনেকেরই মুখ হইয়া উঠিল বিবর্ণ।

অসিত কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছে, 'এমনি আমার দুর্ভাগ্য, যে ট্রেনেই আমি চড়ব—একটা না একটা কিছু ঘটবেই। প্রায়ই আমি ই. আই. আর-এ যাই, শুধু পরখ করার জন্যেই সেবার ই. বি. আর-এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। যাবার সময় গিয়েছিলুম দার্জিলিং মেলে, বিশেষ কিছু হয় নি বটে, কিন্তু একটা কথা আপনারা হয়তো শোনেন নি—তিন-তিনটি লোক সেদিন দার্জিলিং মেলে কাটা পড়েছিল, আর একটা ফায়ারম্যানের দুটো আঙুল একেবারে উড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলুম, ফেরবার পথেও হয়তো অমনিই একটা কিছু ছোট-খাটোর ওপর দিয়ে কেটে যাবে, কিন্তু তা হল না। তাও যখন সারারাত কাটল তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম, ঘুমও একটু এল, কিন্তু কে জানত মশাই যে, শেষ-রাত্রে ঢাকা মেল অমন ক'রে এসে আমাদের ঘাড়ে চাপবে!'

'ইস!'

দৃশ্যটা মনে পড়িয়াই বোধহয় অসিতের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে একটুখানি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিল, 'সে যে কী মর্মন্তুদ দৃশ্য মশাই, কী বলব আপনাদের। সকাল হতে বেরিয়ে যখন দেখলুম ঐসব অবস্থা, কারুর দেহের খানিকটা তাল পাকিয়ে গেছে, কারুর পাঁজরা ভেঙে বুকে খানিকটা গর্ত, কারুর বা হাত-পা কোথায় উড়ে গেছে তার কোনো খবর নেই, তখন সত্যিসত্যিই মনে হল যে কাছাকাছি কোনো গাছ খুঁজে নিয়ে গলায় দড়ি দিই। কী অনুশোচনা যে হল তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। মনে হল কেনই বা শখ ক'রে পরীক্ষা করতে এসেছিলুম, আমি যদি না আসতুম তা হলে তো আর এমনটা ঘটত না!'

অসিত চুপ করিল।

গাড়িসুদ্ধ তখন নিস্তব্ধ, শুধু তাহার ঠিক পাশেই যিনি বসিয়াছিলেন, রাধিকাবাবু তাঁহার নাম, তিনি প্রাণপণে একটুখানি ওপাশে সরিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখে চোখে একটা ভয়ার্ত ব্যাকুলতা, কাহারও বা কথাটা শুনিতে শুনিতে মুখটা অনেকখানি হাঁ হইয়া গিয়াছিল—তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই—কেহ বা বহুক্ষণ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বসিয়া থাকিয়া ঘনঘন চোখের পাতা ফেলিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে ওপাশের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি কতকটা নিজেকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যেই বলিয়া উঠিলেন, 'ই সব আপনার বুঝা ভুল আছে বাবুজী।'

অসিত একটুখানি ম্লানভাবে হাসিল, কোনো জবাব দিল না।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি তখন তাতিয়া উঠিলেন, 'হাসলেন যে বাবু? আপনে ছিলেন ঐ বিহিটা ডিজিয়াস্টারের সময়?'

অসিত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ছিলুম বৈকি। আর না থেকে উপায়ও ছিল না লালাজী, আজকাল আমি খুব দরকার না থাকলে ট্রেনে চাপি না, চাপলেও চেষ্টা করি দিনের বেলা যেসব ট্রেনে যাওয়া যায় সেইসব ট্রেনে যেতে, কিন্তু সেদিন উপায় ছিল না ঐ ট্রেনে না এসে!'

তাহার পর রাধিকাবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, 'বললে বিশ্বাস করবেন না

হয়তো, তারপর প্রায় পনেরো দিন ঘুমোতে পারিনি। যখনই ঘুমোতে চেষ্টা করতুম চোখের সামনে ভেসে উঠত ঐসব চেহারা! কারুর মাথাটা থেঁৎলে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, কারুর হয়তো সমস্তটাই চটকে তাল পাকিয়ে গেছে, শুধু মধ্যে প্রাণটুকু ধুকধুক করছে। আর সে কী গোঙানি মশাই, এখনও মনে হলে যেন হাত-পা অবশ হয়ে আসে।'

রাধিকাবাবুর ওপাশে যিনি বসিয়াছিলেন, মনে হইল তিনি যেন চোখ বুজিয়া বেঞ্চিতে ঠেস দিয়া কান্নাই চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাধিকাবাবুও হেঁট হইয়া কুঁজা হইতে গড়াইয়া উপর্যুপরি তিন গ্লাস জল খাইয়া ফেলিলেন। আর পিছনের বেঞ্চে যে কয়জন মহিলা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখের চেহারা তো অবর্ণনীয়!

লালাজীর হাতে ছিল অর্ধভুক্ত একটা পেয়ারা, তিনি কম্পিত হস্তে সেটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, 'সব ঝুট। আপনে খালি আমাদের ডর লাগাচ্ছেন।'

আবার সেই ম্লান হাসি। অসিত হাত দুইটা জোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইল। কহিল, 'ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই তো অহরহ করি লালাজী যে, একবার অন্তত এ ভয়টাকে ঝুট ক'রে দাও—তিনি শোনেন কৈ?... সেদিন সকালে যখন পাঞ্জাব এক্সপ্রেসটা ফেল হয়ে গেল তখনও পরের দিন যাব বলেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা ছিল রাত্রের ট্রেনে আর যাব না। ছোটভাই বললে, দাদা একটা মিথ্যে কুসংস্কারের জন্যে কাজ ক্ষতি করবে? দেরাদুন এক্সপ্রেসে চলে যাও—। আমিও তাই বুঝে গেলুম, ভাবলুম সত্যিই বোধহয় কুসংস্কার আমার, এবারে তাই প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু, রাত্রে ঘুমোতে পারি নি, লালাজী, গোটা কামরার মধ্যে আমিই জেগে ছিলুম শুধু—'

দম লইবার জন্যই বোধহয় অসিত থামিল। নিজের অজ্ঞাতে রাধিকাবাবুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'তারপর?'

অসিত কহিল, 'তারপর আর কী! ব্যাপারটা যখন ঘটল তখন অবিশ্যি আর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু চৈতন্য যখন হল, তখন উঠে বসে আগে নিজেরই গালে মুখে চড়াতে লাগলুম! যদি রাত্রের ট্রেনে না চড়তুম তাহলে তো আর এইটি হত না। ...বিশেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন দেখতে হল চোখের

সামনে জ্বলন্ত গাড়ির মধ্যে থেকে লোকগুলো প্রাণের দায়ে চিৎকার করছে, অথচ তাদের বাঁচানো যাচ্ছে না, তখন যে প্রাণের মধ্যে কী হতে লাগল তা কাউকে বোঝানো যাবে না—'

অকস্মাৎ পিছনের বেঞ্চি হইতে একটি বৃদ্ধা মহিলা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ওরে বাবা রে, আমি যে রোগা মেয়েকে দেখতে যাচ্ছি রে, আমার কী হবে রে—'

চাহিয়া দেখিলাম আরও দুই-একজন মহিলা আঁচলে চোখ মুছিতেছেন, ওপাশের শিখ দম্পতিটি ব্যাপার ঠিক না বুঝিলেও গাড়িসুদ্ধ সকলের ভয় লক্ষ্য করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। আর সবচেয়ে কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলেন রাধিকাবাবু, পাশের ভদ্রলোকটির কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া কহিলেন, 'আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে, একটু হাওয়া করুন কেউ।'

অসিত মহিলাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'আপনারা এত ভয় পাবেন জানলে আমি এসব কথা বলতুম না, ইস—ভারি অন্যায় হয়ে গেল।'

কিন্তু মানুষের স্বভাব এমনিই যে, যতই ভয় পায় ততই তাহার সেই ভয়ের বস্তু সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ে। ওধারে দুটি যুবক বসিয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা অনেকদিন আগে সেই যে পাঞ্জাব মেলের ব্যাপার হয় তাতেও কি আপনি ছিলেন ?'

অসিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'নিশ্চয়! তাতেই তো আমার বাবা মারা যান। আমি বাবাকে নিষেধ করেছিলুম, তিনি শোনেন নি।'

যুবকটি কী একটা কথা বলিতে গিয়া যেন চাপিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে কহিল, 'আচ্ছা এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই কি রাত্রিবেলা ?'

অসিত জবাব দিল, 'সমস্ত। সেদিন হরিদ্বার যাচ্ছিলুম দিল্লী হয়ে, এখান থেকে সারা পথটা দিনের ট্রেনে ট্রেনে গেলুম। কিন্তু, দিল্লী গিয়ে ভাবলুম যে, এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সবই তো বিহারে, এত পশ্চিমে কি আর কিছু হবে ? তাইতেই তো ঐ কাণ্ডটি ঘটল। দেরাদুন-দিল্লী এক্সপ্রেসে চড়লুম, তা-ও গেল।…আহা, এক বিধবা তার একমাত্র ছেলে নিয়ে যাচ্ছিল হরিদ্বার, বিধবাটি গেল বেঁচে, কিন্তু তারই চোখের ওপর ছেলেটা মরে গেল—'

ওপাশের বৃদ্ধাটি কান্না থামাইয়া অসিতের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি

আবার ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আর রাধিকাবাবুর অবস্থা দেখিয়া মনে হইল তাঁহার শেষ মুহূর্তই বুঝিবা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তখন শ্বাসের মতো করিয়া নিঃশ্বাস লইতেছেন।

লালাজী কহিলেন, 'আ— আপনে কোথায় যাবেন বাবু?'

অসিত জবাব দিল, 'এলাহাবাদে।'

এলাহাবাদ! অর্থাৎ, কাল সকাল ছয়টা পর্যন্ত।

পিছনের যুবকটি কহিল, 'দিনে দিনে যাবার কি আর কোনো উপায় নেই আপনার?'

অসিত কহিল, 'তাহলে কি সোজা যাই?...কালই মোকদ্দমা আছে আমার।'

গাড়িসুদ্ধ সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু মহিলাটির ফোঁপানোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই তখন শোনা যাইতেছিল না। অসিতও বোধকরি তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই গাড়ি আসিয়া বর্ধমান পৌঁছিল। সেখানেও খুব ভিড়, দুই-একজন তাহার মধ্যে আমাদের কামরায় ঢুকিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু কোনোমতে কপাট খুলিতে না পারিয়া আবার অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে গেলেন। কিন্তু, কখন যে ইহার মধ্যে লালাজী মোটঘাট বাঁধিয়া লইয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন—তাহা আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই।

শিখ ভদ্রলোকটি সবিস্ময়ে কহিলেন, 'কেঁও শেঠজী, আপ হিঁয়া উতরতে হেঁ? দিল্লীতক নেহি যাইয়েগা?'

ততক্ষণে ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইয়াছে, তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া লালাজী প্ল্যাটফর্ম হইতে কী জবাব দিলেন তাহা ঠিক শোনা গেল না, তবে এইটুকু শুধু বোঝা গেল যে, তিনি আর এই গাড়িতে দিল্লী যাইতে প্রস্তুত নহেন। অন্য যে কোনো গাড়িতে, যত দেরিতেই হউক যাইবেন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কিন্তু, তবুও গাড়ির সকলেই চুপচাপ, কাহারও কোনো কথা কহিবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। সকলের মুখের চেহারা যেন এই দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে।

অসিত ততক্ষণে লালাজীর শূন্যস্থানে নিজের বিছানাটা বিছাইয়া আরাম

করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু সে-ও কোনো কথা আর তুলিল না। অনেকক্ষণ পরে সহসা রাধিকাবাবু অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনাকে একটি কথা বলব ?'

স্মিতমুখে অসিত কহিল, 'বলুন।'

রাধিকাবাবু একবার ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, 'আ—আমরা, আমি বলছিলুম কি, আপনি এ গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্রেনে গেলে হ'ত না ?'

অসিত কহিল, 'সে তো আগেই বলেছি আমি, উপায় নেই। কাল আমার মোকদ্দমার দিন আছে।'

রাধিকাবাবু কিছু উচ্চস্বরেই কহিলেন, 'তাই বলে এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন করবেন আপনি ?'

প্রশান্ত মুখে অসিত জবাব দিল, 'কী করব বলুন। উপায় কী ?'

রাধিকাবাবুর সঙ্গেরই অপর একজন রাগিয়া বলিলেন, 'উপায় কী তা আমরা কী জানি, আপনাকে নেমে যেতেই হবে।'

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে অসিত কহিল, 'বটে! যেতেই হবে? কেন, শুনতে পাই কি ?'

রাধিকাবাবু রাগে তোতলা হইয়া গেলেন, 'আ—আ—আমাদের খুশি! নামো বলছি, নইলে ঘাড় ধরে নামাব।'

অসিতের গলার স্বরও রুক্ষ হইয়া উঠিল, কহিল, 'দেখুন, সাবধান হয়ে কথা বলবেন। আমিও টিকিট কিনে এই গাড়িতে চড়েছি, আপনারাও তাই —কী অধিকারে আমাকে গলাধাক্কা দেবেন শুনি? বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমিই গার্ডকে ডেকে আপনাকে নামিয়ে দেব।'

কথাটার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া রাধিকাবাবুর দল যেমন অকস্মাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছিলেন, তেমনই অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। ওধারের মহিলারা শুধু ঘোলা, নিষ্প্রভ চোখে অসিতের দিকে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া কী বলাবলি করিতে লাগিলেন।

একটুপরে রাধিকাবাবুই আবার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; এবারে তাঁহার সুর আশ্চর্য রকম নরম। কহিলেন, 'আপনি কিছুতেই নামবেন না ?'

অসিত কহিল, 'না।'

—'আপনার টিকিটের টাকাটা যদি আমরা সবাই মিলে চাঁদা ক'রে দিয়ে দিই—?'

অসিত কহিল, 'তাতে আমার কী হবে? মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণটা করতে রাজি আছেন কি আপনারা? দিন তাহলে দেড় হাজার টাকা, আমি নেমে যাচ্ছি। আর, সত্যি কথা বলতে কি, আবার কতকগুলো লোকের অপঘাত মৃত্যু দেখতে আমারও ইচ্ছে নেই!'

দেড় হাজার টাকা!

সকলেই চুপ করিয়া গেলেন। ওপাশের একটি যুবক শুধু ফিসফিস করিয়া রাধিকাবাবুকে বলিল, 'গার্ডকে ডেকে একবার বুঝিয়ে বললে কী হয়?'

কিন্তু সে কথার কেহ জবাব দিল না।

ইতিমধ্যে গাড়ি আসানসোলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা চাহিয়া দেখি, ওপাশের মহিলারা অভিভাবকের ইঙ্গিতে মালপত্র গুছাইতে শুরু করিয়াছেন। রাধিকাবাবু যেন আঁধারে কূল পাইলেন, তিনি সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া কহিলেন, 'আপনারা নামছেন নাকি স্যার?'

সেই ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'অগত্যা। রুগ্ন বোনকে দেখতে যাচ্ছিলুম, আরও খানিকটা দেরি হয়ে গেল আর কি। কিন্তু নিজের প্রাণের মায়া আগে …বুঝলেন না!'

রাধিকাবাবুদের দল বোধকরি এই পথ দেখানোর অপেক্ষাতেই ছিলেন, তাঁহারাও ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধাছাঁদা আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি ওড়িয়া মেঝেতে বসিয়াছিল, তাহারা কতকটা বুঝিয়াছিল, কতকটা বোঝে নাই, কিন্তু তাহারাও দেখি মালপত্র ঘাড়ে তুলিতেছে।

আসানসোল স্টেশনে গাড়ি থামিবামাত্র নামিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। শিখ ভদ্রলোকটি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'কেঁও বাবুজী, আপলোক সব চলা যাতে হেঁ?'

রাধিকাবাবু হাত-মুখ নাড়িয়া কহিলেন, 'না গিয়ে কেয়া করেগা সর্দারজী? প্রাণের মায়া তো সবাইকারই হ্যায়!…দেখতা নেহি, ও সাক্ষাৎ শমন বৈঠা হ্যায়!'

গাড়ি যখন আসানসোল হইতে ছাড়িল তখন ওখানে শিখ দম্পতিটি

এবং এপাশে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেহ নাই। সমস্ত গাড়িটা ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

অসিত ভালো করিয়া বিছানাটা বিছাইয়া স্যুটকেশটা মাথায় দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'কৈ, আপনি নামলেন না তো!'

আমি জবাব দিলাম, 'আমি যে আপনার সঙ্গে এক গাড়িতে রয়েছি। আপনি যত গল্প করলেন সব ক'টাতেই তো দেখলুম আপনি নিজে বেঁচে গেছেন। আপনি যদি বাঁচেন তো আমিও বাঁচব।'

অসিত কহিল, 'তা বটে!...উঃ, একটুখানি শোবার জায়গার জন্যে কী পরিশ্রমই করতে হল। আর কত মিথ্যে কথা!...'

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, 'এর সবটাই কি মিথ্যে নাকি?'

অম্লানবদনে অসিত কহিল, 'নিশ্চয়ই। ই, আই, আর-এর গাড়িতে আমি খুব কম চড়েছি। এর আগে একবার কাশী গিয়েছিলুম, আর এই আজ যাচ্ছি এলাহাবাদ!'

সে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ওধারের শিখ-দম্পতিও একটু পরে শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই চোখ বুজিতে পারিলাম না। যদিও আমি পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, এ সব কথাই মিথ্যা এবং এখন নিঃসংশয়ে জানিতে পারিলাম, তবুও সারারাতই কেমন যেন গা ছমছম করিতে লাগিল, কিছুতে ঘুম আসিল না।

দায়ী

আর কোনদিকে কিছু বাকী রইল না। ওর বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবন ঘিরে সর্বনাশের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হ'ল এবার। ওর কুকর্মের ফল আরব্য উপন্যাসের সেই বোতলে পোরা দৈত্যের মতো এ কদিন ধরে ধোঁয়ার মধ্যে একটু একটু ক'রে একটা আকার নিচ্ছিল। আজ তার পরিপূর্ণ চেহারাটা দেখা গেছে।

ইন্‌স্‌পেক্টারকে দিয়ে এ সচেতনতার শুরু—নিজের মাকে দিয়ে শেষ।

এটুকু বুঝে নিয়েছে যে, এই কালি তার বাকী সারা জীবন ধরে তার মুখে কপালে লেপাই থাকবে, কেউ বিশ্বাস করবে না ওর স্বামীর লিখে-রেখে-যাওয়া কথাটা, চিরজীবন ধরে এই নীরব ধিক্কার ও অভিযোগ তাকে তাড়া ক'রে বেড়াবে, আইনমত শাস্তি হোক বা না হোক—এই মৃত্যুর দায়িত্ব তাকে বয়ে বেড়াতে হবে, অপ্রমাণিত অপরাধের বোঝা।

প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি। এ পরিণামও কল্পনা করতে পারে নি। আসলে কিছু তলিয়ে ভাবারও তখন সময় পায় নি। সদ্য স্বামী-বিয়োগের ব্যথা ও ঘটনার এই আকস্মিক নাটকীয়তায় স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে কোন প্রবল আঘাতের গুরুত্ব, তার বেদনা অনুভব করতে কিছুটা অবসর লাগে—সেটুকু সময়ও পায় নি তখনও।

হ্যাঁ, আজ ওর মুখে কথাটা অবিশ্বাস্য পরিহাস বলে মনে হবে, কিন্তু সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট শূন্যতা, একটা বিপুল অসহায় বোধ—এমন কি কোথায় যেন একটা প্রিয়-বিয়োগ-ব্যথাও বোধ করছে। এ অনুভূতি তার কাছেও কম বিস্ময়কর নয়। লোকে তুলনা দেয় 'একটা পাখী পুষলেও মায়া পড়ে যায়'—কথাটা যে কত খাঁটি—আজ সে বুঝল। হয়ত এও তাই—দীর্ঘকাল একত্র থাকার ফলে, কিম্বা সে লোকটা এত অবহেলা নির্যাতন সহ্য ক'রে তিলে তিলে ওকে জয় ক'রেই এনেছিল, ও টের না পেলেও এটা সে একত্রবাসের মায়ার চেয়েও বেশী কিছু। কে জানে। কী তা ভাবার মতোও তো একটু ব্যবধান মিলল না, প্রতিশোধ তার দানবীয় রূপ নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার যখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই প্রশ্ন করছেন বারবার, ওর সঙ্গে নীতীশের সদ্য কোন কলহ বিবাদ হয়েছিল কিনা; অথবা দীর্ঘদিন ধরে কোন মনোমালিন্য চলছিল কিনা, ইতিমধ্যে ও স্বামীকে কোন কারণে একটু কঠিন রকমের কোন ধিক্কার দিয়েছিল কিনা—কিম্বা নীতীশই কোন গর্হিত আচরণ করেছিল কিনা, স্ত্রীলোকঘটিত কোন অবিশ্বাস—তখন বিরক্ত হয়ে উঠেই মালা জবাব দিয়েছিল, 'বারবার একই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? এসব যে কিছু নয়—উনিই তো লিখে দিয়ে গেছেন।...মিছিমিছি আমার এই অবস্থায় উত্যক্ত ক'রে আপনাদের কি লাভ হচ্ছে!'

ইন্‌স্‌পেক্টার তাতে বিন্দুমাত্র অনুতাপ বা দুঃখ প্রকাশ না ক'রে—সে

রকম কিছু জান পর্যন্ত না ক'রে তাঁর অভ্যস্ত ব্যঙ্গ-কঠিন কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন 'ঐটে লিখে দিয়ে গেছেন বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। কিছু মনে করবেন না, আপনি তো ছেলেমানুষ নন, কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে একেবারে নিরক্ষরও নন—দেখেছেন শুনেছেনও বিস্তর—চিঠির বয়ানটা একটু আনইউজুয়াল নয় কি? আপনিই ভেবে দেখুন না, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত কি লেখে? "আমার মৃত্যুর জন্য কি আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়"—তাই না? বিশেষ ক'রে এত লোক থাকতে আপনার কথাই বা লিখবেন কেন? "আমার মৃত্যুর জন্য আমার প্রিয়তমা পত্নী দায়ী নন"! মার্ক ইউ—মৃত্যুর জন্য, আত্মহত্যার জন্যেও লেখেন নি।'

তারপর নোটবই পেন্সিল গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'পোস্ট মর্টেমের পর ডেড-বডি ছাড়া হবে—কে আত্মীয় আছেন আর জানি না—বডি নেবার ব্যবস্থা করবেন। আর আপনাকে অনুরোধ করোনারের রায় না বেরনো পর্যন্ত আপনি কাইগুলি শহরের বাইরে কোথাও যাবেন না।'

তারপর—শোভনতার খাতিরেও একটা নমস্কার পর্যন্ত জানাবার চেষ্টা না ক'রেই—কঠিন মুখে বেরিয়ে চলে গিছলেন। বাইরে গিয়েই বোধ করি কোন সহকর্মীর কাছে বলেছিলেন—মালার শ্রুতিগম্য জেনেই—'শি'জ রেসপনসিবল অল রাইট—সামহাউ অর আদার।'

সেই শুরু। খবরের কাগজে বর্তমানে এত স্থানাভাব সত্বেও বেশ টীকা-টিপ্পনী দিয়েই খবরটা ছাপা হয়েছিল—সব টীকারই মূল ইঙ্গিতটা এক, এত কথা লেখার থাকতে মৃতব্যক্তি ঐ কথাটাই বা লিখতে গেলেন কেন? কোন কাগজের রিপোর্টার বা আর একটু বেশী এগিয়েছেন, লিখেছেন: 'আত্মহত্যা ঠিকই, টাটা বিল্ডিং-এর সর্বোচ্চ তলা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে—যে ব্যক্তি এক ঘণ্টা আগেও সহকর্মীর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলেছে; তাছাড়া লিফ্‌ট্‌-এ ক'রে ওপরে উঠেছে, লিফ্‌টম্যানও কোন অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করে নি। অসুস্থ বা বিষক্রিয়ায় ভুগছে—এমন মনে হয় নি। তবে মৃত ভদ্রলোকের পকেটের চিঠিটাতে অনেকে অনুমান করছে দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য কলহই এর জন্য দায়ী। সেটা বহুলোক জানে বলেই স্ত্রীকে বাঁচাবার কথাই লোকটির সর্বাগ্রে মনে হয়েছে।'

এই সংবাদপত্রগুলি মালার তথাকথিত আত্মীয়রা—ওর কাকারা, খুড়তুতো

ভাইরা, দেওররা, মামাশ্বশুর-খুড়শ্বশুরের দল বেশ যত্নসহকারেই হাতে ক'রে এনে অন্যমনস্কভাবে ফেলে চলে গেছেন, যাতে সে টিপ্পনীগুলি ওর পড়ার অসুবিধা না হয়।

এই পাড়ায় দীর্ঘকাল আছে—ওপরতলার ভাড়াটে, বাড়িওলা—আশ-পাশের বাড়ির অধিবাসী, প্রায় সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা জন্মে গেছে—এ বিপদে যেটুকু কর্তব্য করার তাঁরা করেছেন—কিন্তু নীরবে, ভাবলেশহীন মুখে, দু'একজন মামুলী সান্ত্বনাও দিয়েছেন—তবে তা এতই শুষ্ক, ওষ্ঠসর্বস্ব যে, বলে নিজেরাই বোধ হয় লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে গেছেন। কোন ধিক্কার, লাঞ্ছনা কি অভিযোগ ওর সামনে উচ্চারিত হয় নি বটে—তবে মালা তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে—সে অব্যক্ত ধিক্কার ও অভিযোগ যেন প্রতিনিয়ত তাকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। অব্যক্ত বলেই তার প্রতিবাদ করা যায় না, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। নীরব অভিযোগের উত্তর দেওয়া মানেই সে অভিযোগ স্বীকার ক'রে নেওয়া—এটুকু বুদ্ধি এমন কি ওরও আছে।

আর বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে লাভ কি, এই তো এইমাত্র ওর মা এতলোকের অনুচ্চারিত কথাগুলোকে সরব-রূপ দিয়ে গেলেন, 'ছিঃ! আমার পেটের মেয়ে হয়ে তুই এমন করলি—ছেলেটা আমার দুখের ভাত সুখ ক'রে খেয়ে বেঁচে থাকবে শুধু—তাও পারল না। তোর সামনে বলছে না সত্যি কথা—কিন্তু আমার কানে কী না যাচ্ছে। ঘরে বাইরে যে কান পাততে পারছি না।···তোকে যে সে বে করেছিল এই তো তোর ভাগ্যি—তোর কেলেঙ্কারি কে না জানে, কে না শুনেছে। ভাবছিস এই পনেরো বছরেই সবাই ভুলে গেছে? নিহাৎ ভালমানুষ গোবেচারা ছিল বলেই কোনদিকে কান দেয় নি—সুন্দর বৌ পেয়েই কেতাত্থ হয়ে গিছল। নইলে কি ভাবিস তার কাছেই কেউ খবর পৌঁছে দেয় নি? বেনামে চিঠি দিয়েছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি—হাসতে হাসতে দেখিয়ে গেছে। বলেছে, "এমন বৌ আমি পেয়েছি, কারও সহ্য হচ্ছে না মা।"—সে দেবতা ছিল—এমন স্বামীকে তুই যমের মুখে ঠেলে দিলি!'

বলতে পারত মালা, চিৎকার ক'রে প্রতিবাদ করতে পারত—কিন্তু তার গলা দিয়ে সেই মুহূর্তে কোন স্বরই বেরোল না। আর যা-ই হোক, মার কাছ থেকে এ অভিযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

তেমনি প্রস্তুত ছিল না এ সংবাদটার জন্যেও।

নীতীশ জানত! বেনামী চিঠি পেয়েছিল সে—হয়ত একাধিকই, গ্রাহ্য করে নি। ওকেও বলে নি।

আশ্চর্য!

হায় রে! এই খবরটাই কেউ দেয় নি ওকে।

তুমি কি করছিলে মা, এ কথাটা আগে বলো নি কেন?

তাহলে—তাহলে হয়ত এ সর্বনাশের প্রয়োজনই ঘটত না।

কিন্তু নীতীশ যে এমনভাবে শোধ নেবে, এইভাবে ওর কথাটাই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এমন চরম মার দেবে—এত বড় অভিসম্পাত চাপিয়ে দিয়ে যাবে চিরজন্মের মতো—তাও তো মালা ভাবে নি কোনদিন, কল্পনা পর্যন্ত করে নি। এতকাল, এই পনেরো-ষোল বছর লোকটার সঙ্গে ঘর করেছে—এর মধ্যে বোধ হয় মোট তিনশোটা দিনও আলাদা থেকেছে কিনা সন্দেহ—অযোগ্য ভেবেছে, ঝগড়া করেছে, অবহেলা করেছে, ঘৃণা করেছে, অসদ্ব্যবহার করেছে—তবু ঘর করেছে ঠিকই, একই শয্যায় পাশাপাশি শুয়েছে বেশির ভাগ দিন—স্বামীস্ত্রীর দৈহিক মিলনও ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই—চিরাচরিত রীতি মতোই—তবু, আজ স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল মালা যে নীতীশকে সে কিছুই চিনতে পারে নি এই দীর্ঘকালেও। তার দ্বারা কতটা সম্ভব তা বোঝে নি। বোঝবার চেষ্টাও করে নি।

আজ এই চরম আঘাতের পর, সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে মনের কোন গোপন কোণে এই চিন্তাটাও জাগছে, এসব তথ্য জানলে—এ প্রতিশোধ তার সাধ্য জানলে বোধ হয় এতটা অবহেলা করত না—এটুকু বুদ্ধি আছে জানলে ওদের জীবনে এত অশান্তিও থাকত না। শ্রদ্ধা ছিল না বলেই—সাধারণের বাইরে বলে ভাবা যায় এমন কোথাও কোন চিহ্ন দেখতে পায় নি বলেই—সে ভালবাসতে পারে নি স্বামীকে।

আজ সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হয়ে—জীবন থেকে সর্বরকম অসাধারণত্বর সম্ভাবনা চলে যাবার পর—দূর থেকে দেখলে যেমন কোন জিনিসের পৃষ্ঠপটসুদ্ধ সব ছবিটা পাওয়া যায়, ওর নিজের জীবনটাও সেইভাবে দেখতে পাচ্ছে মালা।

আসলে এই অসাধারণত্বের নেশা—এই মিথ্যা মোহই ওর জীবন, ওদের

জীবন নষ্ট করেছে। ওর চেয়ে নীতীশেরই অনিষ্ট করেছে বেশী। কারণ সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করলে নীতীশ আদৌ অযোগ্য পাত্র ছিল না। সেদিনও না, তার পরেও না। মালা যদি অকারণ মরীচিকাকে জ্যোতি মনে ক'রে তাকেই আঁকড়ে থাকার চেষ্টা না করত—সত্যর দিকে এমনভাবে চোখ বুজে না থেকে অবাস্তব কল্পনাকেই জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য না ভাবত—তাহলে ওদের জীবন, ওদের সংসার এমন ভাবে ব্যর্থ, নষ্ট হয়ে যেত না।

না, এমন কিছু রূপসী নয় মালা। সেদিনও ছিল না। সাধারণ বাঙালী ঘরে খেঁদি-পেঁচিদের মেলা—তার মধ্যে একটু সুশ্রী দেখতে হলেই পাঁচজনে, আত্মীয়রা বিশেষ ক'রে—একটা ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে সে সুন্দরী। আরও কাল হ'ল জীবনে—ও যতটা ভাল দেখতে, ফোটোতে তার চেয়ে অনেক ভাল দেখায়। এখন দেখায় কিনা কে জানে—সেভাবে ছবি সে তোলে নি দীর্ঘকাল—এককালে দেখাত।

এই তথ্যটিই ওর সর্বনাশের মূল কারণ—এতদিনে সেটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছে— আর সে-সর্বনাশের হোতা হ'ল মালার জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্গ্রহ, সবচেয়ে বড় শত্রু—ওর সেজকাকা তপেন। আপন কাকা নয়, বাবার পিসতুতো ভাই, কাছাকাছি বাড়ি, এ-পাড়া ও-পাড়া বলেই যাতায়াত অন্তরঙ্গতা ছিল। তপুরা বিত্তবান, সেজন্যও কতকটা—আজ মনে হয়—মালার মা-বাবা এদের একটু বেশী খাতির করতেন, সমীহ ক'রে চলতেন। বাকী সব ভাই-ই সে বিত্ত বজায় রেখেছে, কেউ কেউ বাড়িয়েছেও, কেউ চাকরি ক'রে, কেউ ব্যবসা ক'রে—শুধু তপুই যথাসর্বস্ব ক্ষুইয়ে বসে আছে—বস্তুত, এখনও একান্নবর্তী পরিবার আছে বলেই খেতে পাচ্ছে, নইলে হয়ত ভিক্ষেয় নামতে হ'ত—কিম্বা টিউশানী খুঁজতে যেতে হ'ত।

অন্য ভাইরা বি-এ পাস করার পর কেউ এম-এ পড়েছে, কেউ ডাক্তারী, কেউ বা অন্য কোন আত্মীয়ের সঙ্গে নিরাপদ ব্যবসায়ে নেমেছে; তপুরই ভাগ্য, সে জীবনের সোজা পথগুলো খুঁজে পায় নি। যে দুর্ভাগা হয়, সে বোধ হয় এমনি ক'রেই নিজের পরের সকলের অনিষ্ট ক'রে বেড়ায়। তার চারপাশে থাকে সর্বনাশের বীজাণু—তপু বি-এ পরীক্ষা দেখার আগেই বাবা মারা গেলেন, পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হিসেবে লাখ-খানেকেরও বেশী টাকা

হাতে এসে গেল। তখনই না এলেও চলত, তপুই সেটা জোর ক'রে আদায় ক'রে নিল—এবং একেবারেই নেমে পড়ল ফিল্মের ব্যবসায়ে। তখন ওর মাত্র একুশ বছর বয়স।

তারপর অল্পবয়সে এ-পথে গেলে যা হয়—কিছু মোসাহেব জুটল, কিছু আনুষঙ্গিক কুঅভ্যাস। ছবি শেষ হ'ল যখন, তখন সে দেড় লাখ টাকা কোথায় উবে গেছে—ছবির ওপর চেপেছে দেনা। ফলে ছবি মোটামুটি চলাতে ও, তপু এক পয়সাও ফেরত পেল না। তবে প্রথম ছবি একেবারে অচল হয় নি বলে অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে জনদুই মহাজন পেয়ে আরও দু'খানা ছবির মতো টাকা যোগাড় করেছিল—কিন্তু সেও যথেষ্ট নয়—যথেষ্টর জন্য অপেক্ষা করতে পারে নি। ছবি ওঠার আগেই সে-টাকা শেষ হয়েছে। সেই অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই হস্তান্তর করতে হয়েছে ছবির স্বত্ব; সবচেয়ে বড় কথা, ছবিও—ঐ লাইনের ভাষায় 'ফ্লপ' করেছে। সেই থেকে নিশ্চিন্ত—আর কেউই টাকা দেয় নি, কোন কাজও না। ডিরেক্টারের কাজের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই কৃতিত্বের ইতিহাস জেনে কে চাকরি দেবে ওকে?

কিছুই নেই, কোন কাজ নেই—কাজ পাবার সম্ভাবনাও নেই, তবু তপু-কাকা আজও ও-লাইনটা ছাড়তে পারে নি। ঐ পাড়াতেই ঘোরাঘুরি করে—আড্ডা দেয়, অনেক সময় অবাঞ্ছিত অতিথিরূপেই, সেটা বেশ ভাল ক'রেই লক্ষ্য করেছে মালা—ও-লাইনে তার কোন সুবিধে হবে না বুঝে নিলেও, সেটা স্বীকার করতে পারে নি—কারণ, তাহলে আর কোন আশা কোন অবলম্বন থাকে না। এই বয়সে কেরানীর চাকরি খোঁজা সম্ভব নয়, খুঁজলেই বা কে দেবে? সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, বয়সও চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

এই তপুই একদিন ধূমকেতুর মতো উদিত হ'ল মালার জীবনে। হঠাৎ একদিন এসে বললে, 'এই বুড়ি, ফিল্ম-এ নামবি? ভাখ, ব্রাইট চান্স, বরাত খুলে যেতে পারে।'

মালার তখন সতেরো বছর বয়স, সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে, রূপের মিথ্যা ধারণাটা পাঁচজনে ঢুকিয়ে দিয়েছে মাথায়—তার তো এ-প্রস্তাবে নেচে ওঠারই কথা। কিন্তু তার চেয়েও নেচে উঠলেন ওর মা। বাবা পছন্দ করেন নি ব্যাপারটা—সঙ্গত ক'টা আপত্তিও তুলতে গিছলেন—'এখন লেখাপড়ার

সময়, ঐদিকে মন গেলে লেখাপড়া আর হবে না, তাছাড়া শুনেছি বড় কুসংসর্গ, খারাপ লাইন—ও কিছু করুক না করুক, বদনাম লেগে থাকবে একটা—' ইত্যাদি। কিন্তু মা সেসব কানেই তুললেন না। 'আরে, আজকাল কত শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়ে এ-লাইনে যাচ্ছে জানো? এদিকে একটা চান্স পাবার জন্যে কী না করছে। ভাল ভাল শিক্ষিত লোক সব এখন ছবি তুলতে আসে—এখনকার যারা ডিরেক্টর, কেউই অশিক্ষিত নেশাখোর নয়। এতবড় বংশের ছেলে, সত্যসখা রায়—সে-ও তো এ-লাইনে রয়েছে।'

প্রবল যুক্তির ঝড় তুলল তপুকাকাও। ভবিষ্যতের রঙীন ছবি তুলে ধরল সামনে। বলল, 'হ্যাং ইয়োর পড়াশুনো—এদিকে একবার নাম করতে পারলে লক্ষ লক্ষ টাকা যেচে সেধে ঘরে আসবে, দেখবে তখন ওকে বিয়ে করার সুযোগ পেলে কত ভাল ভাল ছেলে ধন্য হয়ে যাবে। এখন যারা স্টার, তারা ব্ল্যাকেই লাখ লাখ টাকা নেয়, লেখাপড়াতে তো মোট একটা নাম থাকেই। আর সব সময় তো ছবি তুলছে না, কলেজ বন্ধ করার দরকারই বা কি? এক্ষুনি তো ওকে নায়িকার পার্ট দিচ্ছে না কেউ, ছোটখাটো রোল, বড়জোর চারদিন কি পাঁচদিন যেতে হবে। এ তো রায় নয় যে তিনদিন রিহার্স্যাল দেওয়াবে। আর সে দেওয়ালেও—কলেজের সময় তো দিতে হবে না।'

এই পিসতুতো ভাইদের গুষ্টিকে সাধারণ কেরানী ওর বাবা চিরকালই সমীহের চোখে দেখতেন। তার ওপর স্ত্রীর মতেই চলে এসেছেন চিরকাল। বেশী আপত্তি তুলতে সাহস করলেন না।···বরং ছবি তোলা শুরু হ'তে যখন ঘরে-বাইরে এ নিয়ে ঈর্ষাতুর সসম্ভ্রম আলোচনা শুরু হয়ে গেল—সিনেমা মাসিক-সাপ্তাহিকগুলোয় মেয়ের দু'একটা ছবিও ছাপা হতে লাগল, এমন কি আপিসেও দেখলেন যেন কোন মন্ত্র-মন্তরে খাতির বেড়ে গেছে—তখন তাঁরও বেশ একটু নেশা লেগে গিছল। আপিস কামাই ক'রে—এসব পুণ্য কাজে অফিসাররা খুব সহানুভূতিশীল, ছুটি নিজেরাই দিয়ে বসে থাকেন—মেয়েকে নিয়ে স্টুডিওতে যেতে শুরু করেছিলেন, আপিসের সহকর্মীরা শুটিং দেখতে চায়—সসঙ্কোচে কথাটা বলাতে ডিরেকটার ও প্রোডিউসার যখন বললেন —'নিশ্চয় নিশ্চয়, আসবেন বৈকি!' এবং দেখতে এলে তাদের চা সিগারেট অফার করলেন—তখন বাবাও একটু গর্ব অনুভব না ক'রে থাকতে পারেন নি। আবার যেদিন ছবি শেষ হতে দুশোটা টাকাও পেল মালা, রীতিমতো ভাউচারে

সই ক'রে— সেদিন তো কথাই নেই, ভবিষ্যতের সোনার প্রাসাদের ছবি বোধ করি তিনিও সেদিন আব্‌ছা আব্‌ছা দেখতে শুরু করেছিলেন।

কিন্তু এসবই ছবি, কল্পনা। সে সোনার প্রাসাদ রামায়ণের সোনার হরিণের মতোই—মিথ্যা, অবাস্তব, অনিষ্টকর। বাস্তব যা তা হ'ল, চেহারা যতই যেমন হোক—স্টার হবার মতো শক্তি বা প্রতিভা মালার ছিল না, আর প্রোডিউসার-ডিরেকটারদের অভিজ্ঞ চোখ সেটা একটা দুটো আঁচড়েই অর্থাৎ একটা-দুটো ছবি দেখেই বুঝে নিয়েছিল।

বুঝতে পারে নি মালা নিজে—আর তার তপুকাকাও। কোথায় তার শক্তির ন্যূনতা, কোথায় ট্যালেন্টের বা গ্ল্যামার-এর অভাব, মালার চোখে সেটা ধরা পড়ে নি। তার নিজের অভিনয় দেখে মনে হয়েছে, 'এই তো বেশ হয়েছে, এইটুকু রোল—এর চেয়ে আর ভাল কী হবে। দিয়ে দেখুক না হিরোইনের পার্ট, ভাল করতে পারি কিনা যাচাই হয়ে যাক।'

কিন্তু সে-ঝুঁকি নিতে কেউই রাজী হয় নি। সূর্য সিংহ তো পরিষ্কারই বলে দিয়েছিলেন, 'অত ভাল চেহারাতেও দরকার হয় না—যদি সত্যিকারের অভিনয়ের ক্ষমতা থাকে। তাছাড়া চেহারা ভাল ঠিকই, তবে পাথরের চেহারা, প্রাণ নেই। মানে—কী বলব, বুঝতেই তো পারছ—তোমার ভাইঝি, সেক্‌স-য়্যাপীল নেই। সেটা থাকলেও চেষ্টা ক'রে দেখতুম।'

তপু তবুও হাল ছাড়ে নি। তার এ ব্যগ্রতার কারণ মালা বুঝে নিয়েছিল এতদিনে। তপুর আশা ওকে নৌকো ক'রে ঐ ভবসাগরে পাড়ি জমাবে—। মালা যদি 'স্টার' হয় তাহলে সে ওকে আবার কাজ দেওয়াতে পারবে। বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মর্জি বা খেয়ালের খেসারত দিতে এমন অনেক কুপোষ্য পোষণ করতে হয়। এমন কি আবার ডিরেকশ্যনের ভার পাওয়াও অসম্ভব নয়।

সুতরাং—সে নৌকো ফুটো হলে তার চলে কি ক'রে?

সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কোথাও কোথাও—মালার সামনেই গরম গরম কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। মালার তাতে লজ্জার সীমা থাকে না —কিন্তু ঐরকম ছোটখাটো 'রোল' ছাড়া কোন প্রথম এমন কি দ্বিতীয় নম্বরের হিরোইনের পার্ট'ও কেউ দিতে রাজী হ'ল না। দু'দিন তিনদিনের কাজ—

বড়জোড় চার-পাঁচদিন। দেড়শো-দুশো টাকা পাওনা।

ওদের দু'জনের তখনো না হলেও, ওর বাবা-মা'র ততদিনে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। এতে কিছু হবে না, তা তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন—তাঁদের চারিপাশ ঘিরে ঈর্ষা ও সম্ভ্রমের সে উষ্ণতা কমে আসতেই তাঁরা এবার চাইলেন এই গ্ল্যামার একেবারে নিভে যাবার আগেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে। লেখাপড়া আর হবে না সেটা প্রত্যক্ষ, মেয়ে না ইতিমধ্যে গভীর জলে, বা আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে—গভীর পঁকে গিয়ে না পড়ে। এখনও এই টোপ দেখিয়ে বিয়ে হতে পারে, পরে ভাল পাত্র পাওয়া মুশকিল হবে। ততদিনে এ জৌলুস থাকবে না, থাকবে শুধু এই সংসর্গের আঁশটে গন্ধটা।

এই বিয়ের চেষ্টার ব্যাপারে ওর মা-ও যখন বাবার সঙ্গে একমত হলেন, তখন মালা চোখে অন্ধকার দেখলে। তার চেয়ে বেশী পাগল হয়ে উঠল তপুকাকা। কারণ শেষ চেষ্টা হিসেবে সে যা করল, পাগল না হ'লে তা কেউ করে না।

লোকেন বলে একটি ছেলে সেই সময় স্টুডিও মহলে ঘোরাঘুরি করছিল। বয়স অল্প, চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। ভাল ভাল পোশাক, হীরের আংটি, হীরের বোতাম জামায়—চোরাই আমদানি করা বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট হাতে—অর্থাৎ বিপুল টাকার গন্ধ তাকে ঘিরে। এই বয়সে কাঁচা টাকা অর্থেই উত্তম শিকার। অবশ্য ফিল্ম লাইনের লোকও পোড় খাওয়া, তারা বাজিয়ে না দেখে ব্যস্ত হয় না। দেখলেও। ভাল হোটেলে নিয়ে গিয়ে বিলিতি মদ খাওয়াল বেশ কয়েকদিন ; তার চেয়েও বড় কথা, আসল বিলিতি স্কচ হুইস্কি বোতল আমদানি ক'রে বিতরণ করল উদার হাতে।

তপুর মনে হ'ল টাকাটা অফুরন্তই—অন্তত আশু ফুরোবে না। পাছে বড় ডিরেকটাররা কেউ বাগিয়ে বসে, এই ভয়ে সে বেশ জেনেশুনেই, হিসেব ক'রে, মালাকে তার দিকে ঠেলে দিলে। মালারও তখন মাথায় আগুন জ্বলছে—সেও নির্বিচারে ঐ ছেলেটার কাছে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বসে রইল। বিলিয়ে দিল কথাটা সত্য অর্থেই। এখনও হাতে কিছু পেল না—(নিল না, নেবার কথা মনেও হয় নি) ভবিষ্যতেও কিছু পাবার আশা রইল না। যখন দুপুরের দিকে দেশী পাড়ার কুখ্যাত হোটেলে ঘর ভাড়া ক'রে নিয়ে গিয়ে তুলল দু-তিনদিন —তখনই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সেসব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা মালার নেই,

বুঝবে কী ক'রে? এর পরই ধরা পড়ল—ছোকরার পুঁজি সামান্য। পনেরো বিশ হাজার—সে এ বাজারে ঐ টাকাটা পণ ক'রে জুয়া খেলতে এসেছে। অনেক টাকা আছে এইটে 'রাও' হয়ে গেলে মহাজনরা টাকা দেবে ছবি করার, এই আশাতেই সে সবটা পণ করেছিল। পেল না কিছুই—এক মালার কুমারীত্ব ছাড়া।

এরপর আর বিবাহের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করার কি বাধা দেবার সাহস রইল না। মালার মনে হয় তপুকাকার সেদিন আত্মহত্যা করাই উচিত ছিল, অন্তত ঐ সংসর্গ চিরদিনের মতো ত্যাগ করার—কিন্তু তার কোনটাই সে পারল না। আজও, এই প্রায় বৃদ্ধবয়সেও তালি দেওয়া প্যাণ্ট পরে সস্তার সিগারেট হাতে ফিল্মী আড্ডায় ঘুরে বেড়ায়। তারা ভদ্রতা ক'রে গলাধাক্কা দেয় না, সেইটুকু সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে চরম নির্লজ্জের মতো আলোচনার মধ্যে কথা বলে ফটফট ক'রে; অনিমন্ত্রিত ভাবে মহরতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

প্রথম প্রথম ভাল পাত্রর দিকেই হাত বাড়িয়েছিলেন মালার বাবা। ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার—নিদেন আই-এ-এস অফিসার। অপছন্দের মেয়ে নয়, বি-এ পাস করে নি শুনেও মেয়ের ছবি দেখে অনেক ঝুঁকে পড়েছিলেন। ছবির সঙ্গে অতটা না মিললেও তাঁদের পছন্দ হয়েছিল প্রায় সবারই, বাবা-মার একমাত্র মেয়ে, অবস্থা ভাল না হলেও যথাসর্বস্বর চেয়েও বেশী খরচ করতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত অকারণেই, মানে কোন কারণ না দেখিয়েই নীরব হয়ে যেতে লাগলেন পাত্রপক্ষরা।

ক্রমশ এইরকম ঘটনা বেশ কটা ঘটে যাবার পর অক্ষয়বাবু বুঝলেন, তাঁরা যে আশঙ্কা করেছিলেন তাই-ই হয়েছে। গ্ল্যামারটা নেই, দুর্গন্ধটা আছে। বরং এখন সেটা বেশী ক'রে ছড়াচ্ছে। লোকেনের সঙ্গে অশোভন অন্তরঙ্গতা—মালার দিক থেকে সম্পূর্ণ গায়েপড়া, লোকেনের নাকি অত দোষ নেই, এ কথাও বলতে লাগলেন অনেকেই—অক্ষয়বাবু না জানলেও দেখা গেল অন্য অনেকে জানেন।

একসময় তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শুনলেন। শুনিয়ে গেলেন আত্মীয়েরাই কেউ কেউ—যাঁরা একদা এটাকে সৌভাগ্য বলে মনে ক'রে বিচলিত হয়ে হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের সেই ঈর্ষাবোধের জ্বালার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই—

সবিস্তারে ডালপালাসুদ্ধ শুনিয়ে এতদিনে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হলেন। শিয়ালদার কাছে কোন্ হোটেল এই উদ্দেশ্যেই দুপুরে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে ঘর ভাড়া দেয়, সেইখানেই যেত ওরা—অমুকের অমুক স্বচক্ষে দেখেছে, সেই অমুকের শালার ভায়রাভাই ঐ হোটেলের ক্যাশিয়ার। সে মেয়েকে চেনে, আর তখন কে না চিনত ছবি ছাপার কল্যাণে? 'কী বোকা তোমাদের ঐ মেয়ে বাপু, তাও বলি। বড় বিলিতি হোটেলে তোলবার যার ক্ষ্যামতা নেই, সে কী রকম শান্‌সালোক তখনই তো বোঝা উচিত। জাতটাও দিলি পেটটাও ভরাতে পারলি না।' 'মেয়েকে তিরস্কার চেঁচামেচি করতে পারতেন, গালাগালি দিতে পারতেন—কিন্তু সে তো আরও নিজের অনিষ্ট নিজে করা? আকাশের গায়ে থুথু ছেটানোর মতো। অক্ষয়বাবু কিছুই বলেন নি, মা বলেছিলেন, চাপাগলায় যতটা ধিকার দেবার দিয়েছিলেন। অক্ষয়বাবু নিরস্ত করেছিলেন তাঁকে—মেয়ে না আত্মহত্যা ক'রে বসে এই ভয় দেখিয়ে।

আত্মহত্যা করাই সেদিন উচিত ছিল, বুদ্ধির কাজ হ'ত যদি করত। ভাগ্য যে কী তা তো সেদিনই জানা হয়ে গিয়েছিল, তবে কেন, কিসের জন্যে কিসের আশায় সে বসে ছিল সেদিন। ও সেদিন আত্মহত্যা করলে তো আজ এই মর্মান্তিক আত্মহত্যার প্রয়োজন হ'ত না।...

অবশেষে এই সম্বন্ধটি খোপে টিকল।

নীতীশ। ধাপার কাছে পৈতৃক বাড়ি, মা আর একটি ছোট ভাই। সাধারণ বি. কম পাস—কোনমতে একটু ভদ্রগোছের একটা চাকরি ছাড়া কোন উচ্চাশা ছিল না নীতীশের—সে চেষ্টাও করে নি। ব্যাঙ্কের চাকরির চেষ্টা করেছে, পায় নি, একটা আধা বিলিতি সওদাগরি অফিসে কাজ জুটেছে, যখন বিয়ে হয়েছে তখন শ' পাঁচেকের মতো পাচ্ছে—মাইনে আর কী সব ভাতা-টাতা নিয়ে। তাছাড়া নাকি কিছু উপরিও আছে, ওর মা বলেছিলেন। পুজোর সময় বোনাসও। দেখতে সাধারণ গোলগাল চেহারা, বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। মাথার মাঝখানে এরই মধ্যে একটু টাকাভর টাক দেখা দিয়েছে, নিরীহ আত্মতৃপ্ত গোছের লোক।

এইখানেই মালার মা-বাবা একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এ পাত্র ওঁদের পছন্দ হয় নি, তাঁদের সুন্দরী 'ট্যালেণ্টেড' (হায় রে তখনও ট্যালেণ্টের কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয় হচ্ছে না তাঁদের!) মেয়ের যোগ্য

নয় এ পাত্র ; কী করবেন মেয়ের যা বরাত আর তাঁদের যা কর্মফল—তাই তো হবে। এই 'মনোভাবটি নিজেদের জন্যেই যদি রাখতেন তো হ'ত—এমন তো বহু মা-বাপেরই মনে হয় মেয়ের বিয়ের সময়—অধিকাংশ মা-বাবার কাছেই তাঁদের মেয়ে অদ্বিতীয়া—কিন্তু তা তাঁরা রাখতে পারেন নি, প্রয়োজন বোঝেন নি। সেটা মেয়ের কাছেও গোপন করার চেষ্টা করেন নি। বরং এই কথাগুলো বললে সহানুভূতি জানানো হবে, সান্ত্বনা দেওয়া হবে এইটেই ভেবেছিলেন। তাঁদের যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি, মেয়ের নিজের দোষেই যে ভাল ভাল পাত্র এসে ফসকে গেল—সেইটেই বোধ করি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন। অথবা মনের হতাশা চেপে রাখতে পারেন নি কোনমতেই।

এটা যে অসম বিবাহ, পাত্র যে কন্যার যোগ্য নয়—এ কথাটা তাঁরা এমনভাবে মাথায় ঢুকিয়ে না দিলে হয়ত মালার এতটা খারাপ লাগত না—অদৃষ্টকে মেনেই নিত, মানিয়ে নিত।

কিন্তু কদিন—প্রায় মাসখানেক ধরে এই বিলাপ প্রতিনিয়ত শুনতে শুনতে মালার ধারণা হয়ে গেল যে ছোটবেলায় পাঠ্য বইতে পড়া 'বিউটি য়্যাণ্ড দ্য বীস্ট' ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। তবে সে রূপকথার জন্তু রাজপুত্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল এক দিন—বাস্তব সংসারে সে সম্ভাবনা নেই।

ওর একবারও মনে পড়ে নি যে ওর বাবাও এই সাধারণ কেরানীই এবং এই পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়সেও সাতশো টাকার বেশি পান না, সব মিলিয়েও। পৈতৃক ছোট্ট এই একতলা বাড়িটা ছিল তাই—নইলে এর ওপর বাড়ি ভাড়া টানতে হলে কষ্টেই দিন কাটত।

সুতরাং বিয়ের রাত্রে নাপিতের ছড়ার পৃষ্ঠপটে 'অশুভ' দৃষ্টিই হ'ল ওদের, অন্তত মালার দিক থেকে।

নীতীশ কিন্তু কৃতার্থ, গদগদ। সে এতটা অভিভূত ভাব দেখানোতেই মালার ধারণা হ'ল যে বাবা-মার বিলাপের কারণটা সত্য, প্রত্যক্ষ। সে যত ঘটনাটাকে নির্ঘাৎ সৌভাগ্য বলে মনে করে—ততই সেটা মালার চরম দুর্ভাগ্য বলে বোধ হয়।

নীতীশ আত্মতৃপ্ত ও নির্বোধ হোক—স্ত্রীর অসন্তুষ্ট ভাবটা বুঝতে বেশীদিন সময় লাগে নি তার। শুধু কারণটা বুঝতে পারে নি। মালার শাশুড়ী দেওর খুব খারাপ লোক নন, কোন উল্লেখযোগ্য অসদ্ব্যবহার করেন

নি—বরং মালাই বেশ একটু মেজাজ নিয়ে থাকত, এই শ্বশুরবাড়ি ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ওর যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে মনে, সে ভাব থাকার সঙ্গত কারণ ও দেখানোর অধিকার আছে—তাও গোপন করার চেষ্টা করে নি। এও তাঁরা সহ্য করতেন—সুন্দরী বধূ সম্বন্ধে সমীহর ভাব ছিল বলেই এ মেজাজও স্বাভাবিক মনে করতেন।

নীতীশের মনে হ'ল শাশুড়ী দেওরের সঙ্গে ঘর করতে হচ্ছে বলেই মালা এমন উদাস, বিমর্ষ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তখন তার ছোট ভাই একটা চাকরিতে ঢুকেছে, পৃথক হলে একেবারে ভাসিয়ে দেওয়াও হবে না। সে মাকে গোপনে ডেকে বোঝাল, 'ছাখো মা, ও তোমাদের এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য হেনস্তা করে এটা আমার ভাল লাগে না, অথচ স্ত্রী তার সঙ্গেই বা দিনরাত অশান্তি করি কী ক'রে? তার চেয়ে আমি বলি কি—দিনকতক কোথাও একটা আলাদা বাসা ক'রে থাকি, একা সংসার করার কত সুখ বুঝুক একটু। তারপর যদি শিক্ষা হয়েছে বুঝি—তখন আবার ফিরে আসব। ভাই তো কিছু আনছে, আমিও কিছু দোব—তোমাদের অসুবিধে হবে না।'

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'এখনকার দিনে ছেলের বিয়ে দেওয়া মানেই পর ক'রে দেওয়া—সে জানি বাবা। সুন্দরী বৌ এনেছ—সে এ সংসারে থাকবে না তাও জানতুম। আর, কার দোষ দোব—চারদিকেই তো দেখছি, এখনকার কোন মেয়েই আজকাল শ্বশুর-শাশুড়ী-দেওর ননদের সঙ্গে ঘর করতে চায় না। তা তাই যাও। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তা তো হবেই—তুমি আর কী করবে।'

লজ্জা পাবারই কথা—পেয়েও ছিল নীতীশ। তবু স্ত্রীর কথা ভেবে, সে শান্তি পাবে খুশী হবে এই আশায় একান্ত বেহায়ার মতোই চুপ ক'রে থেকে—শেষ পর্যন্ত পৃথক বাসায় উঠে এসেছে।

আলাদা সংসার করা মানেই সহস্রবিধ খরচা। বাড়ি ভাড়া ও একটা লোক—যে বাসনমাজা রান্না করা সব করবে, খাওয়া পরা ছাড়া তাকে সেরকম মাইনেও দিতে হবে বৈকি—একটা মোটা খরচ। সংসারের যেটা প্রাত্যহিক খরচ সে তো আছেই, ওরা চলে আসাতে ওখানেও বিশেষ কমে নি, এখানে পুরো একটা সংসারের খরচ চেপেছে। এসব টেনে মাকে কোন মাসে একশো কোন মাসে আশি টাকা দিতেই প্রাণান্ত হ'ত। এর জন্য একটা লজ্জা

—বিবেকের দংশন বলাই উচিত বোধ হয়—প্রতি মাসেই একবার ক'রে বিঁধত—কিন্তু স্ত্রীর মন পাবার জন্যে তাও সহ্য করেছে।

তবু সে মন পায় নি নীতীশ। পায় নি, পাচ্ছে না সেটা বুঝত, শুধু কারণটাই বুঝত না। স্ত্রীর মন মর্জি মেজাজের তল পেত না। সে সাধারণ গেরস্ত ঘরের ছেলে, সংসারী। সংসার ভালবাসে। মা'র রান্নার স্বাদ ঝিয়ের হাতে পায় না, তবু সেই স্মৃতির বশেই মোচা ডুমুর শাক কিনে আনে। কোনদিন যদি মালা নিজে কোন রান্না করে তাহলে হাতে স্বর্গ পায়—না হলেও দুঃখিত হয় না। তৃপ্তি ক'রে খায়, রান্নার ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করে।

এ সমস্তই মালার কাছে নিতান্ত নিম্ন-সাধারণ মনোভাব, গোলা লোকের লক্ষণ। খবরের কাগজ নেয় একখানা, নিজে পড়ে না, বলে সময় নেই। রেডিওতে নাটক হচ্ছে, সে গল্প জুড়ে দেয়। সিনেমায় যায় স্ত্রীর জন্যে—কিন্তু নাটকের ভালমন্দ অভিনয় কিছু বোঝে না। বোঝেও না যে তা সে নিজেই স্বীকার করে। আসলে সময়ও কম। ওদের মার্চেন্ট আফিস—ওভারটাইম দেবার ব্যবস্থা আছে, নীতীশের সমস্ত মন পড়ে থাকে কী কৌশলে প্রতিদিন ওভারটাইম পাবে—নইলে মাকে টাকা দেওয়া দূরে থাক—ওর সংসার খরচই চালানো দায়।

লোকটা ভাল, ভালমানুষ। তা মালা বোঝে। সেইখানেই ওর আপত্তিও। আর যাই হোক—স্মার্ট বলা চলে না কোন মতেই। ক'মাস—মোট হয়ত সব জড়িয়ে বছর খানেক—স্টুডিওতে আসা যাওয়া করেছিল—তাও সে ছাড়া ছাড়া ভাবে, চারখানা ছবিতে সামান্য 'রোল' অভিনয় করার জন্যে যে ক'দিন যাওয়া লাগে সেই ক'দিনই—তাতে স্মার্টনেসের একটা ছদ্ম চেহারা দেখেছে, আসল-নকল চিনতে শেখে নি। ঐ একটা জগৎ—যেখানে সকলেই স্মার্ট হবার, অন্তত দেখাবার চেষ্টা করে। যে সামান্য রোজগার করে, মিস্ত্রী শ্রেণীর—অথবা যারা নিতান্ত কর্মপ্রার্থী, তারাও স্মার্ট। সুবেশ স্মার্ট তরুণ—দেখতে দেখতে স্বামী সম্বন্ধে একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। যে রকম চেহারাই কল্পনা করুক—কালো-কুশ্রীও মাঝে মাঝে ভেবেছিল বৈকি—আধুনিক পোশাক পরা, কাটাকাটা কথা, ঠোঁটে সিগারেট—এটার কোন তফাৎ হয় নি। কিন্তু নীতীশ সে কল্পনার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে নি। সিগারেট খেত না—মালার তাড়নাতেই ধরেছে। কিন্তু তাতেও মন ভরে না, আনাড়ী

মনে হয়।

আরও একদিকে খামতি—সেটা কাউকে বলার নয়, এমন কি নিজের কাছে স্বীকার করতেই লজ্জা করে। স্ত্রী সম্বন্ধে যতটা সভয় সম্ভ্রম নীতীশের, যতটা পুতুপুতু ভাব, ততটা ক্ষুধা ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন কর্মটাকে সে কতকটা কর্তব্য পালন বলেই মনে করত—নিজের তরফ থেকে কোন প্রবল আকৃতি ছিল বলে বোধ হ'ত না। অন্তত মালার সেইরকম ধারণা। এর সঙ্গে যখন লোকেনের প্রায় হিংস্র উগ্রতার তুলনা করত, সামর্থ্য শিক্ষা কামনা সব দিক দিয়েই—নীতীশকে অপদার্থ অনুপযুক্ত বোধ হ'ত।

দীর্ঘদিন এই অবহেলা ঔদাসীন্য সহ্য করেছে নীতীশ। ক্রমে লক্ষ্য করেছে স্ত্রীর আচরণের মধ্যে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার চেহারাটাও। ক্রমশ সেও তিক্ত হয়ে উঠেছে, তিক্ত ও বিরক্ত। কথাকাটাকাটি শুরু হয়েছে। ক্রমশ সামান্য যেটুকু মুখোশ ছিল তাও খসে পড়ছে। তার ফলে—এক এক সময়ে সে বাদানুবাদ কুৎসিত কলহে পরিণত হয়েছে। নীতীশের সংসারানুরক্ত মন সন্তান চায়, বোধ করি বিবাহের কল্পনা থেকেই চেয়ে এসেছে। সন্তান হলে হয়ত সে স্ত্রীর সব অবিচার অবহেলা অনায়াসে সয়ে যেত—তাও হয় না। তবু ওর মধ্যে যে স্ত্রীর ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থা আছে সেটা কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে নি।

সেইটেই জানল একদিন। এই সেদিন।

অকস্মাৎই বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

এটা যে কেন করেছিল মালা তা সে নিজেই জানে না। এই ট্যাবলেটটার সন্ধান দিয়ে গিয়েছিল তাকে লোকেন, কিনে দিয়েছিল সতকর্তা হিসেবে। কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বলে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই এদিকে ঐ বয়সেই তার দীর্ঘ ইতিহাস—ক্রমে সেটা বুঝেছে মালা। না, লোকেনকে সে শ্রদ্ধা করে না, কামনাও না। তবু তাকে জড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতাটাও ভুলতে পারে না। তাকে আর মনে পড়ে না, তার আলিঙ্গন মনে পড়ে।

কিন্তু এখন এ সতর্কতার কী প্রয়োজন ?

মুখে সে নীতীশকে যা-ই বলুক—নিজের রূপ এবং যৌবন সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতনতা, বারাঙ্গনাসুলভ ব্যগ্রতা সেটাকে ধরে রাখার—এই কি

আসল কারণ নয় ? কে জানে, আজও কি সে আশা পোষণ করে যে, একদিন ফিল্ম জগৎ তার মূল্য বুঝবে এবং এসে ডেকে নিয়ে যাবে ? সেইজন্যই নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চায় ? এটা সচেতনভাবে ভাবে নি হয়ত, অন্তত মুখে স্বীকার করতে পারত না—কিন্তু চরম সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনের দিকে চেয়ে আজ কেমন সন্দেহই হচ্ছে ওর। বোধ হয় এই অবাস্তব অসম্ভব আশাই তার নিজের জীবন সার্থক করতে দেয় নি। একটা সন্তান হলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবলম্বন হ'ত—মনের মধ্যে অকারণ এই ব্যর্থতা-বোধ ও জ্বালা থাকত না, স্বভাবের উগ্রতা কমে আসত, সংসারও ভাল লাগত।

আশ্চর্য ! জীবনভরই সে নিজের জীবন নষ্ট করেছে, সমস্ত সফল সম্ভাবনার মূলে ঘা দিয়েছে, যে ডালটা আশ্রয় হতে পারত সেটাই কেটেছে নিজের হাতে।

কথাটা এই প্রসঙ্গেই বেরিয়ে গেল।

প্রায়-প্রাত্যহিক কলহের মধ্যে ক্ষিপ্ত নীতীশ ওর সন্তানহীনতাকে বন্ধ্যাত্ব বলে ধরে নিয়ে—একটা কটু মন্তব্য করেছিল। সেটাও সহ্য হয় নি মালার। স্ত্রীলোকের চিরন্তন দুর্বলতায় ফোঁস করে উঠেছে, 'কে বলেছে আমি বন্ধ্যা ! তোমার ছেলে তোমার মতোই তো হবে, সেইজন্যে আমি ইচ্ছে ক'রে হতে দিই নি। স্বামী নিয়ে জ্বলছি আবার ছেলে নিয়ে জ্বলতে সাধ নেই।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল নীতীশ। অন্য সব স্বাভাবিক মনোভাবের চেয়ে বিস্ময়ই তার বেশী।

কথাগুলো বুঝতেই অনেক সময় লাগল।

এ কি বলছে মালা ! পাগল হয়ে গেছে নাকি ? না, না, এ অসম্ভব। তাই কি কোন মেয়ে পারে ! এ তাকে রাগাবার জন্যে বলছে ! নাকি আঘাতটা গভীর ক্ষতস্থানে লেগেছে বলে যা মুখে আসছে তাই বলছে !

তবু, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অপমানের জ্বালাটাই প্রবল হয়।

সেও কঠিন কণ্ঠে বলে, 'তা মন্দ বলো নি, সে রিস্‌ক্ তো ছিলই। আমার মতো না হয়ে তোমার মতো হলে আমাকে সারাজীবন জ্বলতে হ'ত। অবশ্য তাতে তুমিও বুঝতে—কী জ্বালায় অপরকে জ্বালিয়েছ !'

মালা সত্যিই ক্ষেপে যায় যেন, বলে, 'ভাবছ আমি মিছে কথা বলছি !…এই ভাখো—'

সে ভেতরে গিয়ে আলমারী খুলে কাপড়ের তলা থেকে ওষুধের শিশিটা এনে সামনে ফেলে দেয়। বলে, 'তোমার এত বিদ্যে নেই জানি, কোন ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখিয়ে এসো—কিসের ওষুধ এটা!'

ওষুধের শিশিটা তুলে দেখার মতো অবস্থা থাকে না আর।

পাথর হয়ে যায় সে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্নায়ু, পেশী সব অবশ ভারী হয়ে যায়।

এ যে মিথ্যা নয়—তা বোঝার মতো জীবনের অভিজ্ঞতা তার আছে।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে—নিজেরই মনে হয় এক যুগ—সে কেমন এক ধরনের বিকৃত কণ্ঠে বলে, মনে হয় কান্না চাপার চেষ্টা ক'রে কথা বললে যেমন এলিয়ে যায় গলা তেমনিই—বলে, 'এত ঘেন্না করো আমাকে মালা? তাহলে, তাহলে তুমি ডিভোর্সে'র ব্যবস্থা করো নি কেন?'

'কে ব্যবস্থা করবে? কে আছে আমার? বাবা-মাকে বললে তো সদুপদেশ দেবে আর কান্নাকাটি করবে। তারাই তো দেখেশুনে এ বিয়ে দিয়েছে। কোথায় দাঁড়িয়ে করব, কার জোরে! টাকাই বা কোথায়?'

'ও, উপায় থাকলে করতে! আমাকে, আমাকে ভালভাবে বললে আমিই টাকা দিতুম। সেটুকুর জন্যেও যদি দুটো মিষ্টি কথা বলতে!'

'কী কারণ দেখাতুম! তুমি যে অন্য কারও সঙ্গে প্রেম কি ব্যভিচার করবে সে যোগ্যতাও তো তোমার নেই!'

আবারও কথা বন্ধ হয়ে যায় অনেকক্ষণ।

তারপর তেমনিই এলানো এলানো গলায় বলে নীতীশ, 'এর পর—এর পর আর আমার বেঁচে থাকার কোন কারণ নেই, না? আয়নায় নিজের মুখ দেখতে নিজেরই লজ্জা করবে।...তুমি, তুমি—আমার অন্য কোন সম্ভাবনাও রাখলে না আর মালা। এ কী করলে! এরপর তো আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।'

বিদ্রূপ-তিক্ত কণ্ঠে মালা উত্তর দিয়েছিল, আত্মঘাতী সেই কটা কথা, 'ও, সেইটে বুঝি বাকী আছে, জ্যান্ত পেরে উঠলে না—মরে আমার ওপর শোধ তুলতে চাও? মরার আগে ফলাও ক'রে লিখে রেখে যাবে যে আমার জন্যেই তোমাকে মরতে হ'ল!'

এবার এক রকমের—নীতীশের পক্ষে অস্বাভাবিক শান্ত—বিচিত্র দৃষ্টিতে

চেয়ে ছিল নীতীশ ওর মুখের দিকে, সেদিন মালা সে চাওয়ার মানে বুঝতে পারে নি—তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, 'না, বরং পরিষ্কার ক'রে লিখে রেখে যাবো যে তুমি দায়ী নও। তাতেই তুমি খুশী তো ?'

তা-ই লিখে রেখে গিয়েছে সে।

সত্যিই মরে প্রতিশোধ নিয়েছে। বোধ করি এতদিনের এই দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবনের—দুঃসহ বলেই দীর্ঘ—সব অন্যায় সব অবিচারের শোধ নিয়েছে সে, নিজের প্রাণটারও চরম মূল্য আদায় করেছে।

এর চেয়ে যদি সে লিখে রেখে যেত যে, তার স্ত্রীই দায়ী, তবু মালা বলতে পারত যে ঝগড়ার ফলে রাগের মাথায় লিখে রেখে গেছে কথাটা। অনেকে বিশ্বাসও করত তা। এখন আর সে পথও রইল না। কোথাও কোন উপায় রইল না—কোন যুক্তি দেবার কোন কারণও রইল না যে।

কে জানে আরও কতকাল বাঁচবে সে। যতদিন বাঁচবে ততদিনই পরিচিত সকলে হয়ত তাকে পরিহার ক'রে চলবে। মা-বাবা তিরস্কার করবেন, অনুযোগ করবেন, তাকে শুনিয়ে বিলাপ করবেন। একদিন যে তাঁরাই জামাইকে অযোগ্য ভেবেছিলেন—সে কথা আর মনেও পড়বে না তাঁদের। ঘরে বাইরে কোন সহানুভূতিই পাবে না কোনদিন, কোন ভালবাসা কি অবলম্বনও না। যে লোকটা তাকে বিপদে রক্ষা করতে, ভালবাসতে পারত, একটু সহানুভূতি কি দুটো মিষ্টি কথার জন্য প্রাণপণ করতে পারত—একমাত্র যে বন্ধু ছিল জীবনের, শুভানুধ্যায়ী—তাকে সে নিজেই মেরে ফেলেছে !

পুত্রার্থে

নরহরিবাবু তাঁর নাতনীমণিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই আর। দিনের আলো চারদিকের গাছপালার পত্রপল্লবে ইতিমধ্যেই ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। চোখেও কম দেখছেন আজ-কাল। অনভ্যস্ত হাতে চাবি বেছে লাগাতে গেলেন কিন্তু একটাও ঠিক লাগল না। প্রত্যেকটি তালাই তিন-চারবার চাবি পাল্টে পাল্টে লাগিয়ে খুলতে হ'ল। সদরে আবার দুটো তালা লাগিয়ে গেছে অসীমা, তার জন্য

একটু বেশী। বসবার ঘরে, শোবার ঘরে, ভাড়ারে—অসংখ্য তালা। এ সব অভ্যাস নেই দীর্ঘকাল। অসীমা এমনিই বড় একটা বেরোত না, কোথাও গেলে সাধারণত নরহরিবাবু বাড়িতে আছেন, থাকবেন—জেনে তাঁকে দোর দিতে বলে, বার বার হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে যেত। দুজনে একসঙ্গে বেরোত কদাচিৎ, বেরোলেও এ সব ঝামেলা অসীমাই পোহাত। তালাগুলো সে যে কোথায় গুছিয়ে রাখত তাই তো জানেন না তিনি। এদিকওদিক চেয়ে কোথাও তেমন জায়গা চোখে পড়ল না তাঁর, যেন বিরক্ত হয়েই তাঁর ডাক্তার-খানার টেবিলের ওপর জড়ো ক'রে রাখলেন। ঘরের মধ্যে একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেছে, ভাগ্যে টেবিলের ওপরই হ্যারিকেন তার ওপর দেশলাই ঠিক ক'রে রেখে তাঁকে বলে দিয়ে গেছে—নইলে সারারাত বোধ হয় অন্ধকারেই কাটাতে হ'ত।

একটা আলো জ্বেলে দেখলেন দেওয়ালের কাছে আরও দুটো আলো সাজিয়ে ঠিক ক'রে রেখে গেছে সে। সে থাকলে সব কটাই লাগত, আজ আর কী দরকার—সেগুলো আর জ্বালবার চেষ্টাও করলেন না নরহরিবাবু। দেশলাইটা যে অন্যমনস্কভাবে কোথায় রাখলেন, তাও তো খুঁজে পাচ্ছেন না ছাই। বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি। যাক গে, কী আর দরকার হবে। খাবার তো সে ক'রেই রেখে গেছে রাত্রের মতো—এক দুধ গরম করা স্টোভ্ কি কাগজ জ্বেলে—না-ই করলেন। একদিন না হয় ঠাণ্ডা দুধই খাবেন, না খেলেই বা কি এসে যায়।

নাঃ, কিছুতেই কিছু এসে যায় না আর। কাল থেকে এই আলোই জ্বলবে কিনা সন্দেহ। তাঁর যে জরদগব ঝি-টি এসে দুবেলা কাজ ক'রে দিয়ে যায়—হ্যারিকেন খোলা দেওয়া চিমনি-মোছার রহস্যটা আজও তার আয়ত্ত হ'ল না। সে তার বাড়িতে লম্প জ্বালে—এরা বলে কুপী, তার বেশী কোন আলোর খবর রাখে না। এ শহরে ইলেকট্রিসিটি এসেছে দীর্ঘকাল, নরহরি-বাবুই জেদ ক'রে নেন নি আজও। কেন যে তাঁর এই জেদ তা তিনিই জানেন না। এই রকম এক একটা অদ্ভুত জেদে পেয়ে বসে তাঁকে। আজ প্রথম আপসোস হতে লাগল তাঁর—আলো না নেওয়ার জন্যে। কাল থেকে তো তাঁকেই আবার হ্যারিকেন সাজাতে বসতে হবে। তাই কি এমনভাবে পারবেন তিনি ? তিনিও তো বড়-একটা কখনও করেন নি, স্ত্রীই করত বেশির

ভাগ, মেয়েরা বৌরাও করেছে কেউ কেউ। তাও এমন সুন্দর ক'রে কেউ সাজাতে পারে না। কী চমৎকার ক'রে পলতে কেটেছে অসীমা। কোথাও একটু ছোট-বড় উঁচু-নিচু হয় নি শিখাটা। সবটা সমান হয়ে জ্বলছে।

নাঃ, এবার না হয় ইলেকট্রিকটা নিয়েই নেবেন। আর কেন, কার জন্যে কষ্ট করবেন তিনি। যে কটা দিন বাঁচেন এ সব ঝঞ্ঝাট আর পুইয়ে লাভ কি! ইলেকট্রিক এলে (সাধারণভাবে ইলেকট্রিকই বলে তো সবাই—ইলেকট্রিসিটি অতটা বলতে পারেন না নরহরিবাবু) একটা পাখাও নিতে পারেন, গরমের সময় এক একদিন বড়ই কষ্ট হয়। আহা, স্ত্রীর কথা মনে হলে বুকের মধ্যেটা কেমন ক'রে ওঠে যেন—কতবার বলেছে, 'এলেক্‌টারটা নাও না, তাহলে একটা পাখা কেনা যায়।' তখন খিঁচিয়েছেন তাকে—'হ্যাঁ, আমার একেবারে টাকার আণ্ডিল দেখেছ কিনা।' স্ত্রী তবু ভয়ে ভয়ে বলেছেন, 'তা নিদেন একটা টেবিল-পাখাও কি আর কেনবার পয়সা নেই তোমার!' —তিনি ধমক দিয়ে উঠেছেন, 'চারটে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো, তিনটে মেয়ের বে দেওয়া—টাকার কি গাছ পোঁতা আছে নাকি আমার—যে নাড়া দেব আর পড়বে? এগুলো হয় কোত্থেকে, হ'ল কোত্থেকে? সাতটা ছেলেমেয়ের মা হবার সময় মনে ছিল না।'···এখন সে সব কথা মনে হ'লে নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। অনায়াসেই করতে পারতেন তখন, টাকাও ছিল, দেখাশুনো করার লোকও ছিল—এখন করবে কে? মিস্ত্রীদের বললেই এসে দেওয়াল খুঁড়ে নোংরা করবে ঘর, বলবে এ আলমারি সরাও ও টেবিল সরাও। সে সব করে কে, ঘরদোরই বা নিত্য সাফ করে কে। তাও যদি অসীমা থাকতে থাকতেও নিতেন!

অথচ এখন এ তো সত্যিই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ঝি যে আছে সে উনুনই ধরাতে জানে না। কয়লার উনুনে রাঁধে না তারা—বিহারীও নয়, সাঁওতাল না হো না মুণ্ডা কে জানে কে—ওরা জানে শুধু কাঠের উনুন জ্বেলে ভাত ফুটোতে। ওদের মেয়ে নাতনীরা তবু শিখেছে—বুড়ীটা কিছু জানে না। এখন থেকে স্টোভই ভরসা। তাও তাঁকেই তেল ঢালতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে, জ্বালতে হবে। যদি কোনদিন তেল আনাবার কথা মনে না থাকে—দুপুরবেলা জ্বালতে গিয়ে হয়ত দেখবেন কিছুই নেই, পেটে কীল মেরে শুয়ে থাকতে হবে। ইলেকট্রিক এলে ঢের সুবিধা, একটা হিটার

রাখা যায়—স্টোভ হিটার দুটো থাকলে একটা না একটা জ্বলবেই।

নাঃ, নিতেই হবে এবার, না হয় কোন তাঁর রোগীকেই বলবেন এসে একটু সাহায্য করতে।

অথচ আজ তাঁর এত কাণ্ড করার কথা নয়। কী না ছিল তাঁর—কী বা নেই। এক স্ত্রীই গেছে, আর তো সবাই আছে। চার-চারটে ছেলে, তিনটে মেয়ে—তিনটে বৌ; ছোটছেলে এখনও বিয়ে করে নি, সে নাকি বাপের আচরণে ঘেন্নায় বিয়ে করতে চাইছে না, বিয়ের সময় পিতৃপরিচয় দিতে হবে বলে; নাতি-নাতনী, জাজ্বল্যমান সংসার যাকে বলে। তাঁর কি আজ এই এতবড় বাড়িতে একা থেকে নিজে হ্যারিকেন সাজিয়ে স্টোভে তেল ভরে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবার কথা?

বহুকাল আগে, কতকাল মনেও পড়ে না যেন, সতেরো না আঠারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিলেন। তখন এখানে বাঙ্গালী বলতে ছিল অল্প দু'চার ঘর। তাঁদেরই একজন বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে এক সাহেব কোম্পানী এসে এখানে কারখানা খোলবার তোড়জোড় করছে—তাদের বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে সব—তিনিই বুদ্ধি দিলেন, মিস্ত্রী খাটাবার কাজ নিতে। পাস না ক'রেই ওভারসিয়ারী শুরু করলেন নরহরিবাবু। সেই ভদ্রলোক, ললিতবাবু মারা গেছেন আজ—তিনিই একটি সুপাত্রী দেখে দাঁড়িয়ে বিয়েও দিয়ে দিলেন। সেই থেকে এখানেই আছেন। হালিশহরে দেশ, আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ হয়ত আজও আছে সেখানে—তাদের আর কোন খবর রাখেন না তিনি। মা ওঁর শৈশবেই গেছেন, বাবা মারা যেতে একবার মাত্র গিয়েছিলেন দেশে, ভাইদের সঙ্গে এক-ঘাট করতে। সেই প্রথম ও সেই শেষ।

তা এই ওভারসিয়ারীতে করেওছেন মন্দ নয়। ছেলেদের শহর বোর্ডিংএ রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন ভাল ভাল ঘরে—প্রচুর টাকা খরচ ক'রে। এখানে ধানজমি করেছেন বিস্তর, একটা ভাড়াটে বাড়িও করেছেন বাবু লাইনের ধারে, তাতে মাদ্রাজী অফিসার একজন ভাড়া আছে—নিয়মিত ভাড়া পান। এছাড়াও একটা আয়ের পথ আছে তাঁর। উনি যখন প্রথম এখানে আসেন—ডাক্তার বলতে কেউ ছিল না, এক কম্পাউণ্ডার এসে ডাক্তারী ক'রে জমিজমা ক'রে ফেলেছিল। তারও এক টাকা ফী—এখানের

যারা আদিম বাসিন্দা, অধিকাংশই কৌপীনবস্ত নিঃস্ব, তাদের সে ফী দেবার সামর্থ্য ছিল না। ললিতবাবুরই পরামর্শে একবার আফিসের কাজে কলকাতা গিয়ে একখানা বাংলা হোমিওপ্যাথীর বই আর এক বাক্স ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন, ফী নিতেন না—দেবেই বা কে—শুধু দু পয়সা ক'রে ওষুধের দাম নিতেন পুরিয়া পিছু। তার মধ্যে এক পুরিয়ায় হয়ত ওষুধ থাকত, বাকী তিন পুরিয়াই শুধাগুলি কিম্বা ময়দার গুঁড়ো। কিন্তু এইটেই লেগে গেল খুব। প্রথম প্রথম নরহরিবাবুরই বিশ্বাস হ'ত না যে, তাঁর ওষুধে কারও অসুখ সারছে। পসার জমে উঠতে তিনি আরও দু-একটা বই আনালেন, একবার মরীয়া হয়ে দামী ইংরেজী বইও কিনে ফেললেন একখানা—ইংরেজী অভিধান দেখে দেখে পড়তে শুরু করলেন। ক্রমশ দু পয়সা থেকে এক আনা হ'ল পুরিয়া—এক আনা থেকে দু আনা। এখন সুবিধে বুঝলে হায়ার ডায়ল্যুশনের ওষুধ চার আনাও নেন। আগে এক টাকা—এখন দু টাকা ফীও করেছেন। এখন অবশ্য এখানে অনেক ডাক্তার—বড়-ছোট মিলিয়ে পাঁচজন, কারখানায় দুজন। এ ছাড়া পাসকরা হোমিওপ্যাথও একজন এসে বসেছেন। তবু নরহরিবাবুর পসার একেবারে যায় নি, এখনও—হিসেব ক'রে দেখেছেন—খরচ-খরচা বাদ একশো-সওয়াশো টাকা থাকে মাস গেলে।

ভালই চলছিল, পরিপূর্ণ সুখের সংসার যাকে বলে। ছেলেরা সকলেই মানুষ। বড়টি রেলে কাজ করে—বি. এন. আরে—উনি বি. এন. আরই জানেন, কতবার নাম বদল হ'ল, অত-শত মনে থাকে না; সে-ই তবু একটু নিরেশ, কারণ ম্যাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মেজটি বিহার সরকারে ভাল চাকরি করে, কী সব আজকাল নতুন নতুন পদ হয়েছে জানেন না তিনি, তবে ভাল চাকরি, এই বয়সেই গেজেটেড র‍্যাঙ্ক। সেজ একটা বড় কারখানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। ছোটটি সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং পাস ক'রে সরকারী চাকরি পেয়েছে। বড় তিনজনেরই বিয়ে দিয়েছেন—ভাল ঘরের মেয়ে তারা। মেয়েদের লেখাপড়া বেশী শেখাতে পারেন নি, তখন এখানে ভাল ইস্কুল ছিল না—কিন্তু বিয়ে দিয়েছেন বেশ ভাল পাত্র দেখেই। সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত, সকলেই সুখী। একজন কলকাতায় থাকে, বাকী দুজনের একজন এলাহাবাদে, একজন দিল্লীতে।

ছেলেরা বিয়ে-থা ক'রে কর্মস্থানেই বাস করছে, তিনজনেরই কোয়ার্টার

আছে, স্বচ্ছন্দেই আছে তারা। তাই থাকাই স্বাভাবিক। নরহরিবাবুর ভরসা ছিল ছোটটির ওপর, এখনও এখানে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, পাস ক'রে বেরোলে তাকে এইখানেই চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন, বিয়ে-থা দিয়ে ঘরবাসী করবেন, সে ই বৃদ্ধ-বয়সে কাছে থাকবে, দেখাশুনা করবে বাপ-মাকে—আর এই সম্পত্তিও। সম্পত্তি তো কম নয় তাঁর—যা জমি আছে, খেয়ে-পরেও উদ্‌বৃত্ত ধান বিক্রী করলে একটা পরিবারের বাড়তি খরচা চলে যায়। ও বাড়িটার ভাড়া তো আছেই। তখন তাঁর গোয়ালে গরু ভর্তি ছিল, নিজস্ব হালবলদ ছিল—সম্পন্ন গৃহস্থ বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তাঁরা।

কিন্তু প্রথম বিগড়ে বসল ছোটছেলে, সে একেবারে বেঁকে দাঁড়াল—কোন প্রাইভেট ফার্মে সে কাজ করবে না। মাইনে হয়ত বেশী—কিন্তু খোশামুদি না করলে উন্নতি নেই, চাকরি যদি করতেই হয় তো সরকারী চাকরি, কাজ না করলেও চলে, বয়স বাড়লেই মাইনে বাড়ে, শটকের নিয়মে। খাটুনি কম, ঝুঁকি কম। কাজ সে যোগাড়ও ক'রে নিল একটা, পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই।

তবু তখনও এমন অসহায় হয়ে পড়েন নি, তখনও স্ত্রী ছিল। সে গরিবের মেয়ে, গরিবের ঘরেই এসে পড়েছিল। চিরকালই খাটুনিতে অভ্যস্ত, সংসারের যাবতীয় কাজ ক'রেও ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছে, প্রথম প্রথম তো বাসন মাজারও লোক ছিল না। কুয়া থেকে জল তোলা, বাসন মাজা, কাঠের জ্বালে রান্না—মায় গরু-বাছুর দেখা সবই করতে হয়েছে তাকে। নরহরিবাবু দুপুরে আধ ঘণ্টার জন্য খেতে আসতেন—তখন জল তুলে স্নান করতে দেরি হয়ে যাবে বলে বেচারী তাঁর স্নানের জলটা পর্যন্ত তুলে রাখত।

সে অভ্যাসের সবটা যায় নি তার। ইদানীং অবশ্য কুয়ায় পাম্প বসিয়ে নিয়েছিলেন—হাতপাম্প, ঝিও ছিল বরাবর। গরু-বাছুর দেখার আলাদা লোক ছিল—তবু যা কাজ করতে হ'ত তাও ঢের। তবে সেটুকু তাব হাতে-পায়ে লাগত না। আর লাগত না বলেই—তার শরীর যে এত খারাপ হয়ে পড়েছে, টের পান নি নরহরিবাবু। যখন টের পেলেন তখন আর বাঁচানোর সময় ছিল না, দশ-বারো দিন ভুগেই মারা গেল সে। তবু তার মধ্যেই বিস্তর টাকা খরচ ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার এনেছিলেন, সে ভদ্রলোক পরোক্ষে নরহরিবাবুকেই দায়ী ক'রে গেলেন। বললেন, 'শুকনো চেলা-কাঠে জল ঢাললে

কি আর তাতে পাতা গজায়, না ফুল ফোটে। কী আছে দেহে যে ওষুধ কাজ করবে?'

স্ত্রী মারা যেতেই, যাকে বলে চোখে অন্ধকার দেখা, তাই দেখলেন। অশৌচ উপলক্ষে ছেলে-মেয়ে সকলেই এসেছিল অবশ্য, বাবার জন্যে তাদের সেদিন সহানুভূতিও কম ছিল না। অনেকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু নরহরিবাবু যখন আকুল হয়ে বললেন, 'তার পর, এসব দেখবে কে?' তখন কেউই ভাল উত্তর দিতে পারল না। শ্রাদ্ধ চুকে যেতেই ছেলে-বৌ-মেয়েরা উশখুশ করতে লাগল। মেয়ে-জামাইরা আগেই চলে গেল, সবাই বলে গেল, 'একবার যেও বাবা আমার ওখানে। তোমার কিসের ভাবনা, বছরে দু মাস ক'রে এক এক সন্তানের কাছে থাকলেই তোমার দিন কেটে যাবে। যেখানে যাবে সেখানেই তোমায় মাথায় ক'রে রাখবে।'

মেয়েদের পরেই ছেলেদের পালা। ছোটছেলের নতুন চাকরি, সে-ই সর্বাগ্রে চলে গেল। তারপর মেজছেলে। বৌমা সুবিবেচক, স্পষ্টবাদীও; তিনি পরিষ্কারই বললেন, 'আমাদের সেখানে একটা পুরো সংসার আছে বাবা, ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল, ওঁর আফিস—ঝি-চাকরের ওপর তো ফেলে রাখা যায় না। আমাকে যেতেই হবে। তবে আপনার উচিত এখানের পাট চুকিয়ে আমাদের কাছে গিয়ে থাকা। পালা ক'রেই বা থাকতে হবে কেন, আপনি আমার কাছে গিয়েই থাকবেন, আপনার কোন অসুবিধা হবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনার ছেলের তো কোন অভাব নেই—আপনারও যা আছে, আপনি কারও এন্তাজারি নন। কিসের চিন্তা আপনার!'

মেজর পর সেজছেলে। বড়রই চক্ষুলজ্জা একটু বেশী, বোধ হয় সবচেয়ে গরিব বলেই। তাকে আগেই চলে যেতে হয়েছিল, বড় দুই ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছিল—স্ত্রীকে আর ছোট দুটো মেয়েকে রেখে। সে প্রস্তাবও করেছিল যে, সব ভাইয়ের স্ত্রীরাই যদি পালা হিসেবে এক মাস ক'রে থাকে—তাহলে তার স্ত্রীকেও সে দু মাস অন্তর এক মাসের জন্যে পাঠাতে পারে। যদিও তার স্ত্রী শ্বশুরকে শুনিয়েই বলেছিল, 'আহা, তা আর নয়! অত সুখে আর কাজ নেই। আমার ঘর-বাড়ি সংসার সব ফেলে আমি তোমার বুড়ো বাপের সেবা করার জন্যে এখানে পড়ে থাকব, না?'

তবুও মাসখানেক রেখেছিল বড়ছেলে। কিন্তু নিজে হাত পুড়িয়ে খেতে

গিয়ে সত্যিই যখন একদিন হাত পুড়ে গেল তার—তখন কিন্তু তাঁকেই লোক দিয়ে বৌমাকে পাঠিয়ে দিতে হ'ল। বড়বৌমা খুশী হয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে গেল যাবার সময়, 'যাচ্ছি বটে কিন্তু মনটা এইখানেই পড়ে রইল। আপনি চলুন না বাপু, কী হবে আর এসব ক'রে? আপনার বড়ছেলে বড়লোক নয়—তবে দুবেলা দুমুঠো ভাত বাপকে দিতে পিছপা হবে না। আর আমি যদ্দিন আছি, আপনার সেবারও ত্রুটি হতে দেব না।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন নরহরিবাবু, 'তা হয় না মা। জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, গরু-বাছুর এসব ফেলে রেখে কোথায় যাবো? যাই হোক একটা প্র্যাকটিসও আছে—কিছু না হোক, মাস গেলে দেড়শো-দুশো টাকা আয় হয়—একটা কাজ নিয়েও ভুলে থাকি—সব ফেলে সেখানে গিয়ে মৃত্যুর দিন গোনা, সে আমার পোষাবে না। অনেক কষ্ট ক'রে এসব করেছি মা—গোপাল কতক কতক জানে—এসব বিলিয়ে কি ফেলে রেখে দিয়ে যেতে পারব না। জানি, মরবার পর পাঁচ ভূতে খাবে—কিন্তু তখন তো আর দেখতে আসব না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বেঁচে থাকতে এখান ছেড়ে যাওয়া হবে না। পঞ্চাশ বছর আছি এখানে—অন্য কোথাও মন বসবে না এখন আর। তুমি যাও বৌমা, একেবারে যদি কখনও অক্ষম হয়ে পড়ি তখন খবর পেলে এস একবার, এইটুকু বলা রইল।'

'সে কি আর বলতে হবে বাবা!' অদৃশ্য দু ফোঁটা অশ্রু আঁচলে মুছে বৌমা গিয়ে রিক্সাতে চেপেছিল।

সেই থেকে একাই ছিলেন তিনি, কষ্ট হোক—একরকম ক'রে চালিয়ে নিচ্ছিলেন, মাঝখান থেকে সব ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেল অসীমা এসে। অভ্যাসটা খারাপ ক'রে দিয়ে গেল।

অসীমা তাঁর নাতনী, আদর ক'রে তিনি নাতনীমণি বলে ডাকতেন। দৌহিত্রী সম্পর্ক। আপন নয়—আপন ভাগ্নীর মেয়ে। একটিই সহোদর বোন ছিল তাঁর, অল্পবয়সে মেয়েটি রেখে মারা যায়। আপনার জন বলতে এই ভাগ্নীর সঙ্গেই যা-কিছু সম্পর্ক রেখেছিলেন। তার বিয়ের সময় পাঁচশো টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছিলেন ভগ্নিপতিকে, বিধবা হবার পরও যতদিন না তার বড়ছেলের চাকরি হয়, মাসে কুড়ি টাকা ক'রে পাঠাতেন। স্ত্রী ছাড়া

কেউ জানত না এসব, তবে সে কখনও এই শ্রেণীর দয়া-দাক্ষিণ্যে আপত্তি করে নি, বরং বলেছিল, 'অর্চনাকে এখানেই এনে রাখ না বাপু, আমার তো জায়গার অভাব নেই—ভাতেরও অভাব নেই।' নরহরিবাবুই ভবিষ্যৎ ভেবে রাজী হন নি তখন।

হঠাৎ এই অর্চনার একটা চিঠি এল, 'মামাবাবু, মেয়ে তো একুশ বছরের হয়ে উঠল, এখনও তো বিয়ের কিছু করতে পারলুম না। খোকা যা মাইনে পায় খেতেই কুলোয় না এতগুলি প্রাণীর—বিয়ে দেব কোথা থেকে। আপনার তো ওখানে দেখাশুনো করার কেউ নেই, বলেন তো ওকে পাঠিয়ে দিই, আপনার ওখানে কারখানায় তো কত লোক কাজ করে, সজাতি দেখে যদি কারুর সঙ্গে জোড়া-গাঁথা ক'রে দিতে পারেন তো বেঁচে যাই।'

বেঁচে গেলেন নরহরিবাবুই। হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন যেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশটা টাকা মণিঅর্ডারে পাঠিয়ে দিলেন, কেউ যেন এসে রেখে যায়। বিয়ের চেষ্টা অবশ্যই করবেন, তবে পাত্র ঠিক হলে ওদের কাউকে এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইতে হবে, উনি কোন ঝঞ্ঝাটে যাবেন না, দু-পাঁচশো টাকার দরকার হয়—তা তিনি খরচ করতে পারবেন।

অসীমাকে দেখে আরও খুশী হলেন। খুব সুন্দরী কিছু নয়, উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ, তবে স্বাস্থ্য ভাল। মুখশ্রীও চলনসই। পাত্র পাওয়া খুব কঠিন হবে না।

কিন্তু রূপ যাই হোক, অসীমা যে অসীম গুণবতী সেটা বোঝা গেল আর কদিন পরে। তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন নরহরিবাবু। খাটতে পারে মেয়েটা অসাধারণ। খাটত তাঁর স্ত্রীও—কিন্তু এতটা পটুতা ছিল না। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই বাড়ির শ্রী ফিরিয়ে দিল সে। প্রত্যেকটি জিনিসই হিসেব ক'রে সাজাত গুছোত, প্রত্যেকটি কাজে ভবিষ্যতের কথা ভাবত। বিকেলে কোথাও বেরোলে—আজও যেমন রেখে গেছে—হ্যারিকেন আর তার মাথায় দিয়াশলাইটি সাজিয়ে ঠিক দরজার পাশেই রেখে যেতে ভুল হ'ত না, যাতে চাবিটা খুললেই আলো জ্বালতে পারা যায়। নির্ভুল ফর্দ দিয়ে মাসকাবারী জিনিস আনাত, হাঁড়ি টিনের গায়ে নিজে লেবেল লিখে আটা দিয়ে আটকে—সেইসব জিনিস ঝেড়ে বেছে সাজিয়ে রাখত। দুপুরে ঘুমোত না কোনদিন, সারাদিন ধরে এইসব করত। গোছ ছিল সব কাজেই, কখন গোয়ালে ধোঁয়া দিতে

হবে, কখন বাড়িতে ধুনো পড়বে সন্ধ্যা দেখাতে হবে—রাতে শুতে যাবার আগে নরহরিবাবুর খাটের পাশে এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে—কোনদিন ভুল হ'ত না, বা সময়ের এদিক-ওদিক হ'ত না। তারই জেদে কত বছর পরে বাড়িতে চুন, দরজা-জানলায় রঙ পড়েছে, গোয়ালের টিন পাল্‌টানো হয়েছে। মিস্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে খাটাবেন—এ সামর্থ্য আর নরহরিবাবুর নেই। অসীমাই সব করেছে।

সবচেয়ে যা বড়গুণ, হাতের রান্না চমৎকার। রাঁধতে শুধু জানেই না, উৎসাহও আছে। কদিনেই যেন নরহরিবাবুর মুখটা ছাড়ল। নিজে তো অর্ধেক দিনই ভাতে-ভাত খাচ্ছিলেন, নাতনীর আমলে কোন তরকারী পর পর দুদিন খেতে হ'ত না। পিঠেপুলি, তালের বড়া এসব তো ভুলেই গিয়েছিলেন—তাঁর স্ত্রীও সংসারের সমস্ত কাজ সেরে পেরে উঠত না ইদানীং। বরাবর স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকেন নরহরিবাবু, খেতে পারেন এখনও বেশ, হজমও করতে পারেন। অসীমা আসাতে বহুদিন পরে যেন নবজীবন লাভ করলেন আবার।

ফলে ওর বিবাহের চেষ্টাটা বিলম্বিত হতে লাগল। না, একেবারে ইচ্ছা-পূর্বক বিলম্ব তা বলব না। আগে যে ধরনের পাত্র মনের মধ্যে স্থির ক'রে রেখেছিলেন এখন আর সে শ্রেণীর পাত্রে মন ওঠে না। মনে হয় এমন গুণের মেয়ে যাকে-তাকে দেব? যে পাত্র পছন্দ হয়—তারা মেয়ে পছন্দ করে না, গুণটা কেউ চোখে দেখতে পায় না, আর পাত্রীর গুণের ফর্দ কে-ই বা কম দেয়. আজকাল আর ওসব কেউ বিশ্বাস করে না।

সত্যি কথা বলতে কি, খুব উঠে-পড়ে যে লেগেছিলেন নরহরিবাবু, তাও নয়। ইংরেজীতে যাকে বলে 'হাফ-হার্টেড' চেষ্টা—বাংলায় দায়সারা বললেও ঠিক যেন বোঝায় না, সেইরকমই চলছিল বেশীর ভাগ। একে ওকে বলেন একবার—অলস অনুরোধ মাত্র—যতখানি তাগাদা করলে ময়লা মেয়ের পাত্র জোটে তার সিকিও করা হয় না। অথচ কতটা যে করা দরকার তা নরহরিবাবু জানেন ভাল ক'রেই—তিনটি ময়লা মেয়ে পার করেছেন তিনিও। যথেষ্ট চেষ্টা যে হয় না সে বিষয়ে নরহরিবাবু একেবারে অচেতনও নন, মধ্যে মধ্যে অনুতপ্তও হন—কিন্তু মনের অবচেতনে নিজের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নব অনুভূতিটা কিছুতেই যথেষ্ট উৎসাহ যোগাতে চায় না—ক্রমশ স্বার্থবোধটাই প্রবল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ইতিমধ্যে কখন যে এই বিহারী শহরটির প্রায় তাবৎ বাঙালী অধিবাসীর আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছেন তাঁরা—তা অনেকদিন পর্যন্ত নরহরিবাবু টের পান নি। অসীমাও না। যে মেয়েটা প্রায় অনাত্মীয় (সে দাদুকে দেখল এই প্রথম—একুশ বছর বয়সে) এক বৃদ্ধের জন্য দিনরাত এই ভূতের মতো পরিশ্রম করছে, তার প্রীতির জন্য সে বৃদ্ধও কিছু করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেমেয়েদের স্বার্থপরতায় ক্ষুব্ধ মনের সমস্ত বাৎসল্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই একটি মেয়েতে। ফলে খুবই আদরের পাত্রী হয়ে উঠেছিল অসীমা। আগে ওর বিয়েতে পাঁচশো টাকা দেবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেকথা ভুলেই গেছেন—এখন স্যাকরা ডেকে একে একে ওর গা-সাজানো সব গহনাই গড়িয়ে দিলেন। দুটো হার, হাতের চুড়ি, বালা, কানের গহনা প্রায় গোটা চারেক—মায় দুতিনটে আংটি পর্যন্ত। অসীমা প্রবল প্রতিবাদ করলে বলতেন, 'এতে কি হবে রে পাগলী, আরও তো ঢের লাগবে। তোমার যা গায়ের রঙ, সোনা দিয়ে মুড়ে না দিলে বর পছন্দ করবে ?' এর ওপর শাড়ি। এখানে অতিসাধারণ শাড়ি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না, ব্যস্ত এবং ব্যাকুল নরহরিবাবু চেনাশোনা যে যায় তাকে দিয়েই ভাল ভাল শাড়ি আনান। ব্লাউজের কাপড়—টাকা দিয়ে বলে দেন, 'ভাল দামী জিনিস যা তাই আনবেন, দামের জন্যে ভাববেন না।' জামা নিজেই হাতে সেলাই ক'রে নিত অসীমা, সেলাইয়ের কলও আছে বাড়িতে, তার জন্যে আটকাত না।

অসীমা এই উপহারের বন্যায় যেন হাঁপিয়ে উঠত, সে প্রতিবাদ করত, ঝগড়া করত কিন্তু নরহরিবাবু শুনতেন না, বলতেন, 'পয়সাগুলো তাংড়ে রেখে কি করব বল্ ? ছেলেরা তো কেউ আমার এ সম্পত্তির পরোয়া করে না, বলে সব পড়ে থাক্—আমার এখানে চলে এসো, ওতে আমাদের কী হবে, কে যাবে কোন্ কালে ভোগ করতে ? ছোটছেলে তো এ বাড়ির নাম দিয়েছে বাঁশের কেল্লা, বলে ও থাকলেই বা কি গেলেই বা কি ? তা এ বাঁশের কেল্লার আয় না হয় তোর কাজেই লাগুক।'

ছেলেমানুষ একা এই বনদেশে পড়ে থাকে, এতবড় বাড়িটায়—একটা সমবয়সী কেউ নেই যার সঙ্গে দুটো গল্প করে—এই সাত-পাঁচ ভেবে নরহরিবাবু যা কখনও করেন না—তাও করতে শুরু করলেন,—এখানের অদ্বিতীয় সিনেমা হাউসে মধ্যে মধ্যে ওকে নিয়ে ছবি দেখতে যেতে শুরু করলেন।

এতেই এখানকার বাঙালী সমাজের মনস্বিনীদের টনক নড়ল। কারণ শাড়ি গহনাগুলো এর আগে তাঁরা দেখতে পান নি ভত—এখন সকলেই দেখলেন। এসব শাড়ি তাঁদের কাছে এখনও ধ্যানের ধন, এমন কি কারখানায় যে সব ফোরম্যান মেকানিকের দল মোটা টাকা মাইনে পান তাঁরাও এত বিচিত্র এত মূল্যবান শাড়ি এত অধিক সংখ্যায় কিনে দিতে পারেন না। গহনাও দেখলেন তাঁরা, যদিও অসীমা খুব বেশী গহনা একসঙ্গে পরত না—তবু যার হাতে প্লাস্টিকের চুড়ি ছাড়া কিছু ছিল না, তার কোন দিন চুড়ি, কোন দিন বালা, এক একদিন এক একরকম দুল—মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য।

বুড়োর এতাদৃশ ভীমরতির একমাত্র যে কারণ তাঁদের সম্ভব বলে মনে হ'ল সেই কারণই ঘটেছে—সকলে একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।···

নরহরিবাবু এসব কিছুই জানতেন না, কখনও কল্পনাও করেন নি। প্রথম ঝড়ের সঙ্কেত পেলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার কাছ থেকে। তাঁর কানে বাড়ি বয়ে এসে এ সব কথা তোলা যায় না। নরহরিবাবুও অপরের বাড়ি যান কদাচিৎ, তাঁর কাছে ওষুধ নিতে আসে বেশির ভাগই স্থানীয় আদিবাসী। কিম্বা চেঞ্জারের দল, এখানে এসেই ছেলেমেয়েদের গুচ্ছের খাইয়ে যখন পেটের অসুখ বাধিয়ে বসেন, তখনই হোমিওপ্যাথের খোঁজ পড়ে, তা তাঁরা এসব কথা জানেনও না, বলবেনও না—তাই যাদের কানে তোলা যায়—অতি যত্নে ও চেষ্টায় আত্মীয়ের আত্মীয়কে ধরে তাদের কানেই এখানের এঁরা পেঁ ৗছে দিলেন কথাটা। অর্থাৎ ওঁর ছেলেমেয়েদের কাছে।

মেয়ে লিখল, 'বাবা, আমাদের সতীসাধ্বী মায়ের চিতার আগুন যে এখনও সম্পূর্ণ নেভে নাই—আমাদের জননী যে আপনার সংসারে আপনার সুখের জন্যই আত্মবিসর্জন করিয়া গেলেন, তাঁহার কথাটা একবার চিন্তা করিলেন না! ছি ছি, এ কেলেঙ্কারির কথা শুনিবার আগে যে আমাদের মৃত্যুও শ্রেয় ছিল। এ কী করিলেন বাবা, এ কী করিলেন!'

তবু তখনও বুঝতে পারেন নি নরহরিবাবু, বিহ্বলভাবে বার-দুই পড়ে অসীমাকে দিয়েছিলেন, 'পড়ে ছাখ তো ভাই, এর মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারলুম না।'

অসীমারও মিনিট কতক দেরি লেগেছিল বুঝতে, তারপর অঙ্গার বর্ণ হয়ে

উঠেছিল সে, চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'আমাকে কালই মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন দাদু, আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়।'

তবুও বুঝতে পারেন নি প্রথমটায়, তারপর যখন বুঝলেন তখন বলে উঠলেন, 'না না—এ কী বলছিস দিদি, ছিঃ ছি। তা কখনও বলতে পারে। যাঃ, আমার কি সেই বয়স আছে। এ আর কিছু বলেছে। তুই ওসব ভাবতে গেলি কেন? ছিঃ!'

বুঝিয়ে দিলে ভাল ক'রে—সেজছেলে। সে লিখলে, 'বাবা এর চেয়ে যদি আপনি খারাপ পাড়ায় যেতেন আমাদের এতটা অসম্মান হ'ত না, ঐ বাড়িতে ঐ ঘরে—এখনও আমাদের মায়ের গায়ের গন্ধ লেগে আছে—ঐখানে এই বেলেল্লাপনা করতে পারলেন আপনি! আপনার না পঁয়ষট্টি বছর বয়স হয়েছে। ঐ মেয়েটাই বা কি, ও আমাদের আত্মীয় একথা স্বীকার করতেও যে ঘৃণা বোধ হয়। এর চেয়ে ও কলকাতায় এসে প্রকাশ্যে রোজগার শুরু করল না কেন। তাতেও তো ঢের পয়সা পেত!'

এ চিঠি আর অসীমাকে দেখান নি নরহরিবাবু, দেখাতে সাহস করেন নি, তখনই কুঁচি কুঁচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই ছিঁড়ে ফেলা দেখেই অসীমার বুঝতে বাকী ছিল না চিঠিখানার বিষয়বস্তু কি।

মেজছেলে আরও ভাল ব্যবস্থা করল।

সে একটি পাত্রী—অর্থাৎ তারই শালীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে ছোটভাইকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিল। তার জবাবে ছোটছেলে ঐ চিঠি লিখেছে—এই বাপ বেঁচে থাকতে সে বিয়ে করবে না, কখনও যদি শোনে যে সে পিতৃহীন হয়েছে, তবেই বিয়ে করার কথা ভাববে। মেজছেলে ছোটভাইয়ের সেই চিঠিটিই খামে মুড়ে পাঠিয়ে দিল নরহরিবাবুর কাছে।

নরহরিবাবু এবার যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনিও কড়া-কড়া চিঠি লিখলেন। লিখলেন, 'তোমাদের যা করা উচিত ছিল তা তোমরা করো নি, এই অবস্থায় বৃদ্ধকে ভাগ্যের হাতে ফেলে যে যার সুখভোগ করছ। এখন এই দুধের মেয়েটা এসে একটু সেবা করছে, সেটাও তোমাদের সইছে না!'

তার উত্তরে ওদের কাছ থেকে মেয়েটির উদ্দেশে আরও বেশী গালাগালি এবং ওঁর উদ্দেশে আরও বেশী ধিক্কারভরা চিঠি এল। তারা তো আর দেখতে যায় নি, যারা দেখেছে তারাই বলছে। শহরসুদ্ধ লোক এতকাল পরে খামকা

তাঁর নামে মিথ্যা কুৎসা রটাচ্ছে, এটা কিছু বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এ পর্যন্ত বড়ছেলেই নীরব ছিল, নরহরিবাবু তার কাছে করুণ চিঠি লিখলেন একখানা। সে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে আসুক, এসে থেকে দেখে যাক কী এমন অন্যায় করেছেন তিনি। তার উত্তরে সে লিখল, 'আমি ঘৃণায় আপনাকে এতকাল চিঠি লিখি নাই, ইচ্ছা ছিল এ জন্মে আর লিখিবও না। কাল আপনার পত্রখানি নিজ হস্তে পোড়াইয়া হাত ধুইয়াছি। যদি কখনও শুনি আপনার মৃত্যু হইয়াছে, তবেই আবার ও বাড়ি যাইব, তাহার পূর্বে নহে।'

অসহায় ক্রোধে আস্ফালন করেন নরহরিবাবু, ছেলে-মেয়েদের অভিসম্পাত দেন। অসীমা কেবল বলে, 'আমিই আপনার জীবনে শনির মতো এসে পড়লুম। জন্মে বাপকে খেয়েছি—আমি চির-অভাগা। আমার জন্যেই আপনার এই অশান্তি। আমি বারবার বলছি, আপনার পায়ে ধরে বলছি—আমাকে পাঠিয়ে দিন, তাহলেই সব মিটে যাবে!'

'বলিস কি ভাই, তুই আমার জন্যে এত করলি, আর তোর মাথায় একটা মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে ছেড়ে দেব, তোর যে বিয়ে দিয়ে দেব বলে আনিয়ে ছিলুম রে!'

এক-একদিন কাঁদেন হাউ-হাউ ক'রে, 'ওদের যা করবার কথা, কেউ করল, না, বুড়ো বাপ কী করে কী খায়—তা কেউ খোঁজ নিল না। এখন সবাই আমার বিচারক হয়ে বসল! এই জন্যে কি লোকে ছেলেমেয়ে কামনা করে—ছেলেমেয়ে না হলে হাহাকার করে! এর চেয়ে সাত জন্ম আঁটকুড়ো হয়ে থাকাও যে ঢের ভাল ছিল!'

এইবার অসীমার বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লাগেন নরহরিবাবু। আর বাছ-বিচার করবেন না, একটু চলনসই পাত্র পেলেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু এবার এই পাত্র খুঁজতে বেরিয়েই বুঝলেন—ছেলেমেয়েদের সংবাদ-সংগ্রাহক কারা। পাত্রের কথা বলতে গেলেই সবাই কেমন মুচকে হাসে, অন্য কথা পাড়ে। যারা খুব ভদ্র তারা বলে, 'এখানে ওসব সুবিধা হবে না ডাক্তারবাবু, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিন!' যারা অতটা ভদ্রতার ধার ধারে না—তারা টিটকিরি দেয়, আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে এখানে কারুরই ও মেয়ের কীর্তিকাহিনী

জানতে বাকী নেই, এখানে ওসব চালাকি করতে না যাওয়াই ভাল।

জেদ বেড়ে যায় নরহরিবাবুর, তিনিও পরোক্ষে ঘোষণা করেন যে ভাল পাত্র পেলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করবেন, অথবা—চায় তো তাঁর এখানকার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি লিখে দেবেন, ভিটেটা বাদে। এই কথাটা বলতে গিয়েই চরম আঘাত খেলেন মন্মথবাবুর কাছ থেকে, ঠোঁটকাটা লোক তিনি, বয়সেও ওঁর থেকে বড়—বললেন, 'কেন ওসব কথা তুলছ ডাক্তার, মিছিমিছি সকালবেলা কতকগুলো মন্দ কথা শুনবে। তোমার শখ মিটে গেছে, এখন ঐ মেয়েটিকে ঘাড় থেকে নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, তা এখানে কে জেনে-শুনে ওকে নেবে?'

মাথা হেঁট ক'রে ফিরে এলেন নরহরিবাবু। সকলেই এককাট্টা, সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে গেছে—এদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বা ঝগড়া করা মানে আরও গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

অসীমা কিছু জিজ্ঞাসা করে না—কিন্তু ওঁর অসহায় করুণ ভাব দেখে অনেকটা অনুমান ক'রে নেয়। সেদিন মন্মথবাবুর ওখান থেকে এসে এমন ক'রে শুয়ে পড়লেন নরহরিবাবু যে রীতিমতো ভয়ই হয়ে গেছল তার। সেই-দিনই একটু সুস্থ হয়ে বিকেলের দিকে বাইরের ঘরে বা ডাক্তারখানায় এসে বসতে কথাটা পাড়ল অসীমা, বলল, 'যখন দুর্নাম হয়েইছে, আপনি এক কাজ করুন দাদু, আপনিই রেজেস্ট্রী ক'রে বিয়ে ক'রে ফেলুন আমাকে, তাহলে তো আর কারুর কিছু বলবার থাকবে না।'

'দূর পাগল, তা কখনও হয়।'

এত দুঃখেও হেসে ফেলেন নরহরিবাবু।

'কেন হয় না?' জেদ করে অসীমা, 'আপন নাতনী তো আর নয়' ভাগ্নীর মেয়ে। শুনেছি রেজেস্ট্রী বিয়েতে এসব আটকায় না।'

'তার পর? তোর গতি?'

'আমার আর কি গতি! এখন এখান থেকে চলে গেলেই কি আর বিয়ে হবে আমার? আত্মীয়মহলে তো ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে। ভাল করতে না পারুক মন্দ করতে তো পারে সবাই। যারা কখনও খবর নিত না, তারাও এখন হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে মাকে চিঠি লিখেছে। পরশুই মায়ের চিঠি পেয়েছি। এমনিও হয়তো কোন দূরদেশে গিয়ে ঝি কি রাঁধুনীগিরি ক'রে খেতে হবে।

সে জায়গায় এ তো সম্মানের। আপনি গেলে এসব যদি ওরা দাবীও করে, আমাকে খেতে পরতে তো দিতে হবে। কিম্বা, যদি সাহস থাকে, আমার নামে বিঘে-পাঁচেক জমি লিখেই দিয়ে যাবেন, একটা জীবন তাতেই কেটে যাবে আমার।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন নরহরিবাবু, বলেন, 'তাহলে তো ওদের এই মিথ্যে অপবাদটাই সত্যি হয়ে যাবে ভাই, আরও তো সকলে যা-তা বলবে। সবাই বলবে যা বলেছিলুম মিলিয়ে পেলে তো—এখন আমাদের চাপে পড়ে লিগালাইজ ক'রে নিলে! না, সে হয় না···আর, আর তোর দিদা তো কোন অন্যায় করে নি, তার জায়গায় আর একজনকে এনে বসাব, সে স্বর্গে বসেও অসুখী হবে।'

'সবাইকার কথাই ভাবছেন দাদু—কিন্তু আমি কি করলুম, আমারই এই দুর্নামটা অক্ষয় হয়ে থাকবে?' এবার অসীমাও কেঁদে ফেলে।

নরহরিবাবু বলেন, 'তুই না হয় কোন হোস্টেলে থেকে আবার পড়াশুনো কর ভাই,—যা খরচ হয় আমি দেব, না হয় থোক টাকাটাই একেবারে জমা ক'রে দেব তোর নামে—'

'না—এবার আমাকে অব্যাহতি দিন দাদু, অনেক হয়েছে আর আপনার এ টাকা দিয়ে আমাকে বিড়ম্বিত করবেন না, এসব কাপড় গয়না যদি না দিতেন তো চোখ টাটাত না কারও, এসব কথাও উঠত না।'

আরও খানিক পরে সে বলে, 'একটা কাজ করুন—এসব বেচে কিনে দিয়ে কোন তীর্থস্থানে চলে যান, সেখানে ভাল দেখে চাকর রেখে তোফা থাকতে পারবেন, কিম্বা কোন হোটেলেও বন্দোবস্ত করতে পারবেন। আর কতদিনই বা বাঁচবেন—বড়জোর আর পনেরো বছর,—যা টাকা আপনার আছে, আর সব বেচে দিলে যা পাবেন বেশ চলে যাবে।'

হাসলেন নরহরিবাবু, ম্লান হাসি, বললেন, 'তাই যদি পারব তাহলে তো এসব কোন কথাই উঠত না, যে কোন ছেলের কাছেই তো গিয়ে থাকতে পারতাম।'

'তা কেন পারছেন না তাই শুনি—কার জন্যে যক্ষের মতো আগলে রাখছেন?' রাগ ক'রে বলে অসীমা।

'রাখছি ঐ বেইমান—ছেলেগুলোর জন্যেই। এখনও মনে হয়—আগলে

আছি তাই, আমি মরে গেলে কি আর সত্যি সত্যিই ভাসিয়ে দেবে এতখানি বিষয়, কেউ না কেউ এসে বসবেই। বড়ছেলের তো ঐ আয়, ছেলেপুলে মানুষ ক'রে যে কোনদিন কোথাও মাথা-গোঁজার জায়গা করতে পারবে তা তো মনে হয় না—ওর কথা ভেবেই আরও এ সব আগলে রাখছি বুক দিয়ে। যতই হোক, প্রথম সন্তান!'

সেদিন আর কিছু বলল না অসীমা। পরের দিন বলল, 'আমি চিঠি লিখে দিয়েছি দাদাকে—এসে নিয়ে যাবে। টাকা ধার ক'রে আসতে বলেছি, ঐটে আপনি শুধু দিয়ে দেবেন—আর কিছু চাই না। তার এমন সঙ্গতি নেই যে, তিনটে গাড়ি ভাড়া টানবে।'

'চিঠি লিখে দিয়েছিস—একবার বললি না?···আমি ভাবছিলুম যদি তোর মা এসে মাসকতক থাকতে পারত—'

'সেখানে তার সংসার দেখবে কে? তারও ছেলেমেয়ে আছে, সে টানও কম নয় দাদু', কেমন যেন শানিত শোনায় তার কণ্ঠস্বর, 'তাছাড়া আর নয়, মিছিমিছি আর একটা পরগাছা এনে আর অশান্তি বাড়িয়ে কাজ নেই, আপনার আর আপনার সন্তানদের মধ্যে বেড়া হয়ে আর থাকতে চাই না আমরা। কেউ না থাকলে ঠিকই আবার ওদের মন ফিরবে। আসবেও, খোঁজখবরও নেবে হয়ত—তা নিলেও আপনার শান্তি, বুঝবেন তবু মরবার সময় অন্ততঃ আসবে, এক ফোঁটা জল পাবেন। সেই ভাল, আর জড়াবেন না আমাদের।'

তবু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিলেন—অসীমা একেবারে অন্নজল ত্যাগ করল। আর বাধা দিতে সাহসও করলেন না। ট্রেনভাড়া বাবদ চল্লিশটি টাকা ছাড়া নিয়েও গেল না কিছু, গহনা কাপড়ের স্তূপ পড়ে রইল। বলল, 'রোজগার করতে আসি নি—এগুলো দেখলে বুঝবে মামারা। থাক্—তাদের ভোগে লাগবে। তাদেরই তো প্রাপ্য।' অনেক ক'রে বলাতে, ওর পায়ে মাথা খুঁড়বেন ভয় দেখাতে একগাছি মাত্র ক'রে চুড়ি হাতে দিয়ে গেছে। শুধু ভাইকে আড়ালে ডেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছেন যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করার চেষ্টা করবে সে, আর কোথাও সম্বন্ধ ঠিক হলে তাঁকে গোপনে জানাবে, তিনি ওর আপিসে গিয়ে টাকাটা পৌঁছে দিয়ে আসবেন, অসীমা জানলে নিতে দেবে না হয়ত, ও আপিস থেকে ধার করেছে এই কথা বলে যেন চালায়।

তাতেই রাজী হয়ে গিয়েছে অসীমার দাদা, কী যেন নাম ভুতু, বোধ হয় বিভূতি।

কিন্তু তিনি সক্ষম থাকতে কি পারবে সে সম্বন্ধ করতে?

আর কি তিনি বাঁচবেন বেশী দিন! বাঁচতেন হয়ত, কোথা থেকে এই মেয়েটা এসে, তাঁর সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য—মনের বল সব যেন হরণ ক'রে নিয়ে গেল।

ঠিক এতখানি স্থান যে জুড়ে ছিল সে—তার অভাবে এতখানি শূন্যতা যে বোধ করবেন—তা আজ সকাল পর্যন্তও তো ভাবতে পারেন নি।

অন্ধকার শূন্য শোবার ঘরটার দিকে তাকালেন নরহরিবাবু, বিহ্বল ক্লান্ত দৃষ্টিতে। হ্যারিকেনের আলো এ ঘর থেকে যেটুকু গিয়ে পড়েছে, তাইতেই টুলের ওপর জলের গ্লাস আর টেবিলের ওপর পেতলের ঢাকা চাপা দেওয়া খাবারটা নজরে পড়ল।

অনেকক্ষণ পরে উঠে আস্তে আস্তে এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন, যেন অন্য-মনস্ক ভাবেই, টেবিলের দিকেও চাইলেন একবার। কিন্তু যেন চোখে কি আঘাত লাগতেই—চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সুনিপুণ হাতে সাজানো ঐ খাবারের থালার ওপরে মাজা চকচকে ঢাকাটায় ওঘরের আলোটা প্রতিফলিত হয়েই বুঝি এতটা লাগল চোখে। তিনি ছোট টেবিলটাসুদ্ধ আলোর গণ্ডী থেকে সরিয়ে রাখলেন। তবুও ঐ চকচকে ঢাকাটা যেন তাঁকে বিদ্রূপ করছে মনে হ'ল তাঁর। ওর দিক থেকে চোখ যেন সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। তিনি ঢাকা আর খাবারের থালা বার ক'রে বাইরের বারান্দায় রেখে দিয়ে এলেন, চোখের সীমার বাইরে।

তারপর গ্লাসের জলটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরের জামাকাপড়সুদ্ধই বিছানায় শুয়ে পড়লেন—সেই সন্ধ্যারাত্রেই। ঘরের দরজা দুটো যে বন্ধ করা হ'ল না, ওঘরে হ্যারিকেনটা যে সমানেই জ্বলতে লাগল—সেটাও খেয়াল রইল না।

অসীমাই এ সব করত রোজ, তাঁর অভ্যাস চলে গেছে বহুদিন। মনে পড়ার কথাও না।

যোগাযোগ

দুটো ঘটনা দু জায়গার। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক- ও যোগাযোগহীন। একটার বিবরণ সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, বেশ ফলাও ক'রেই, অন্যটার কথা কেউ জানেও না।

ট্যাংরা অঞ্চলের সাতাশের-চারের-এ গুইরাম পারি লেনের স্বদেশ সামন্ত বছর-দুই মল্লিকদের বাড়ি কাজ করছিল। বেশ মন দিয়েই কাজ করত, চুরি-চামারিও বিশেষ করেছে বলে শোনা যায় নি। অন্তত ধরা পড়ে নি, সুতরাং সেজন্যে কেউ মারধোর বা গালিগালাজ করেছে সে কারণও নেই। মেদিনীপুরে বাড়ি, কুড়ি-একুশ বছর বয়স, শ্যামবর্ণ ছিপেছিপে চেহারার ছেলে, মুখখানি খুব সুশ্রী, বিশেষ টানাটানা চোখের খুব বাহার বলে সবাই পছন্দ করত। চটপটে বলে মল্লিক মশাইয়েরও খুব প্রিয় ছিল।

মাইনে জমিয়ে শ'খানেক হলেই—সাধারণত তিন মাস হলেই একশো টাকা জমে যেত, মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল মাইনে—দেশে পাঠাত সে। কখনও ডাকে পাঠাত, কখনও বা ওর দাদা এসে নিয়ে যেত। সেদিনও ওর দাদাই এসেছিল। এবার বাকি পাঁচ মাস টাকা পাঠায় নি, উপরি উপরি চিঠি লিখেও উত্তর পায় নি তারা, তাই একটু ব্যস্ত হয়েই এসেছিল সে। ভোরে এসে পৌঁচেছে, একটু কথা কাটাকাটিও হয়েছে, স্বদেশ বলেছে টাকা সব আছে, ওড়ায় নি সে, নিজে দেশে যাবে বলেই পাঠায় নি। আর নিজে খেটে রোজগার করছে, কটা টাকা কি ওর নিজের খরচ করার অধিকার নেই? তাদের দিচ্ছে সে ঠিকই, দেবেও—কিন্তু তার জন্যে এমন রণমূর্তি ধরে আসার কি আছে? দেশের সম্পত্তিও সে ভোগ করছে না—দু বিঘে জমির দশ কাঠা তো ওর ভাগে—মায়ের আদরযত্নও সে ভোগ করছে না—সে তো দাদা একলাই দখল ক'রে রেখেছে। স্বদেশ কি এমন চোরের দায়ে ধরা পড়েছে যে যথাসর্বস্ব তাদের হাতে তুলে দিতে হবে—নিজে এক পয়সা খরচ করতে পারবে না? সে ভাল আছে তো খুবই ভাল, তবে চোখ রাঙিয়ে 'কৈফিয়ৎ' তলব করলে সে এক পয়সাও দেবে না—সাফ কথা। ইত্যাদি—

এ সব সকালের ব্যাপার, সে সব চুকেবুকে গিছল। দাদা চা-রুটি খেয়েছে, বেলায় এইখানেই খাবে। স্নান ক'রে এসে বসে আছে। রান্না শেষ ক'রে স্বদেশ তাকে বলেছে, আজ সে পুকুরে যাবে—বাড়ির পিছন দিকে আমবাগানে একটা পুকুর আছে—চান ক'রে এসে একসঙ্গে দুজনে খাবে। সেই গেছে আর ফেরে নি। উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখেছে, স্বদেশ একটা আম গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে—তাকে তখন বাঁচানোর চেষ্টা করার আর কোন অর্থ হয় না।

কেন সে মারা গেল, কী দুঃখে—অনেক খোঁজখবর ক'রেও তা জানা গেল না, যেমন জানা গেল না এই পাঁচ মাসের মাইনেটা সে কোথায় রেখেছিল। ওর কাপড়জামা হাঁটকে, ও বাড়ির সকলকে জনে জনে জিজ্ঞাসা ক'রেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নিউ আলিপুরের।

পরেশবাবু ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়স, কিন্তু দেখায় আরও অনেক কম। শক্তসমর্থ ডাঁটো শরীর, এখনও বহুকাল চাকরি করবেন এই আশাই করত লোকে। সরকারীভাবে রিটায়ার করার পরও যেসব কর্মচারীকে সময়ে অসময়ে সরকার ডেকে পাঠান, বিভিন্ন কমিটি-কমিশন-কর্পোরেশনে যাঁদের অহরহ ডাক পড়ে, নৈবেদ্যের মাথার চুড়োর মতো বসাবার জন্যে—মৃত্যু পর্যন্ত যাঁরা অবিরাম কাজ আর উপার্জন ক'রে যান, বলতে গেলে পদোন্নতি যাঁদের শুরু হয় রিটায়ার করার পর—পরেশবাবু সেই শ্রেণীর কর্মঠ অফিসার। ওঁর বড় ছেলে রাজ্যেশ্বর ইঞ্জিনীয়ার, সেও এক আধা-সরকারী কারখানায় মোটা মাইনের চাকরি করে, ছোটটি রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা গিছল, সেখানেই অধ্যাপকের কাজ করছে, হয়ত কোন মার্কিন মেয়েকে বিয়ে ক'রে সেখানেই সংসার পাতবে। অন্তত সেই রকমই শোনা যাচ্ছে।

এ-হেন পরেশবাবুর জ্যেষ্ঠাপুত্রবধূ—অসামান্য সুন্দরী শিক্ষিতা পূর্ণিমা যেদিন প্রথম সন্তান প্রসবের জন্যে নার্সিং হোমে গেল—সঙ্গে গেলেন পরেশ-বাবুর স্ত্রী কল্যাণী দেবী, সেদিনই অসময়ে আপিস থেকে ফিরে বড় ছেলে রাজ্যেশ্বর পরেশবাবুকে গুলি ক'রে মারল।

এ খবর কাগজে ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছে। মায় কল্যাণী দেবীর

প্রতিক্রিয়া, পূর্ণিমার হাহাকার ক্রন্দন, সদ্যপ্রসূত ছেলেটি কেমন দেখতে হয়েছে, কী জলখাবার টেবিলে সাজানো পড়ে আছে, কোন্ রঙের শাড়ি ঝুলছে আলনায়, পরেশবাবু যে তাঁর বংশের প্রথম পৌত্র, পিণ্ডধরকে দেখে যেতেও পারলেন না—ইত্যাদি কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যও বাদ রইল না ছাপতে। রাজ্যেশ্বরকে সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মামলা চলছে। রাজ্যেশ্বর অপরাধ স্বীকার করেছে, কেবল এমন অস্বাভাবিক অপরাধ কেন করল সেটাই কিছুতে কাউকে বলছে না। বলছে, 'আমি অপরাধ স্বীকার করেছি, আমাকে ফাঁসিতে দিন, অত খবর জানতে চাইছেন কেন ? ওতে কি আমার অপরাধ স্খালন হবে ? না শাস্তি মকুব করবেন আপনারা ?'

সেও যেমন বলছে না, কল্যাণী দেবী, পূর্ণিমা—কিম্বা ও-বাড়ির কোন কর্মচারী—কেউই কিছু বলতে পারছে না। কেউ জানে না এ বিষম ক্রোধ ও জিঘাংসার হেতু কি।

হেতুও যেমন জানা গেল না—সে হেতু কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে পারবে না—তেমনি এই কল্পনাতীত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐ অজ্ঞাত অখ্যাত গুইরাম পারি লেনের নগণ্যতম এক গৃহভৃত্যের আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে তাও না। না, এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে শুনে যদি আপনারা বসে যান ক্রমাগত অনুমানের পর অনুমান, কল্পনার পর কল্পনা করতে—এ সম্পর্ক বা যোগাযোগ তবু জানতে পারবেন না।

রাজ্যেশ্বর উপযুক্ত ছেলে—মানে পরেশবাবুর পদমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদার উপযুক্ত। ইস্কুলে বরং মাস্টার রাখতে হয়েছিল, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ঢুকে বিনা ধর-পাকড়েই সসম্মানে পাস করেছে, কিছু মেডেল ইত্যাদি পেয়েই। সুশ্রী চেহারা, স্বাস্থ্যবান—খেলাধুলোতেও যথেষ্ট সুনাম ছিল এককালে। চাকরি সে পেয়েছে বলতে গেলে নিজের জোরেই। সুতরাং তাঁর জন্যে পরেশবাবু বেছে বেছে উপযুক্ত বধূ আনবেন সে তো খুবই স্বাভাবিক। অনেক খুঁজেছেন দুজনে, বিস্তর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছেন, মেয়ে দেখতে গেছেন। কর্তার পছন্দ হয় তো গিন্নীর হয় না, গিন্নীর হলে কর্তা খুঁৎ ধরেন। এই ক'রে পুরো দেড়টি বছর কেটে গেছে প্রায়।

ছেলে সে সব দিক দিয়েই ভাল—এও তার একটা বড় প্রমাণ। আজকালকার দিনে কোন তরুণ ছেলে বাপ-মায়ের পছন্দর জন্মে এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে? বিশেষতঃ রাজ্যেশ্বরের মতো সবদিক দিয়ে ঈপ্সিত ও লোভনীয় পাত্র।

যাই হোক—খুঁজেছেন যেমন প্রাণপণে, সাধনার মতো ক'রে, সে খোঁজা পুরস্কৃতও হয়েছে। পেয়েছেন একবারে সব সেরা। অসামান্য সুন্দরী, এম-এ পাস তো বটেই—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। গানবাজনাও জানে কিছু, ছবির হাত তো বলতে গেলে পাকা শিল্পীর মতো।

এ পাত্রীর কাহিনী শুনে ও চোখে দেখে পাত্রের মনেও রং ধরেছিল বৈকি। রসে ডগমগো হয়েই ঘুরে বেড়িয়েছিল কদিন, বন্ধুদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা ক'রে, তাদের খাইয়ে, সিনেমা দেখিয়ে। এমন কি বন্ধুদের অবিরাম পরিহাসের পাত্র হওয়াও চরম সুখ মনে হয়েছিল। বিয়ে বৌ-ভাত ফুলশয্যাতেও এ আনন্দের সুর মিলিয়েই যেন রাজ্যেশ্বরের মনে সুর বেজেছিল।

প্রথম খটকা লাগল কল্যাণী দেবীরই মনে, অষ্টমমঙ্গলীর দিন যখন পূর্ণিমা বাপের বাড়ি যাচ্ছে। ওদের রীতি মেয়ে আগে বাপের বাড়ি যায়, জামাই গিয়ে নিয়ে আসে, জোড়ে যেতে নেই। একা বৌ চলে যাচ্ছে—কৈ তার চোখে তো এই অসামান্য যাত্রার, ক্ষণ-বিরহের করুণ-মধুর বেদনাবোধ নেই, প্রথম প্রেমের সে উচ্ছলতা, স্বামীর চোখে চোখ মেলাবার সে ব্যগ্রতা! ক্ষণে ক্ষণে তো কৈ কৌতুকের হাসি উপছে উঠছে না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ক্ষণেক অদর্শনের বেদনাতে ম্লান হয়ে উঠছে না—যেমন তাঁদের হয়েছিল? বরং পূর্ণিমাকে একটু ম্লান, রাজ্যেশ্বরকে ক্লান্ত বিরক্ত লাগছিল। তবু এটা কদিনের রাত্রি জাগরণের ফল ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কল্যাণী।

কিন্তু গোল বাধল, অষ্টমঙ্গলা সেরে যখন রাজ্যেশ্বর একাই ফিরল। শোনা গেল পূর্ণিমার অতিরিক্ত মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, নাকি দু'তিনবার বমি করেছে—তাই সে আসতে চাইল না।

'এ কী অলক্ষণ!' কল্যাণী বিরক্ত হলেন, পরেশবাবুও, 'তাই বলে আজকের দিনে জোড়ে আসবে না! কেন আমাদের এখানে কি ডাক্তার নেই, না ওষুধ নেই? ওদের সেই পাড়াগাঁতেই সব আছে!'

ক্রমে সে বিরক্তিটা উদ্বেগে পরিণত হ'ল যখন এর চার দিন পরেও

পূর্ণিমার আসবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। একদিকে কুটুম্ব-আত্মীয়দের কুটিল কৌতূহল, কোন মজা বা কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে তাঁরা উৎফুল্ল উৎসুক, অপর দিকে দাসী-চাকরদের অপরিসীম বিস্ময় ও প্রশ্ন—পরেশবাবু বিব্রতও হয়ে উঠলেন একটু। এর মধ্যে একদিন পূর্ণিমার বাবা এসে পরেশবাবুর আপিসে দেখা করলেন। বললেন, 'দেখুন, ব্যাপার কি আমি তো কিছুই বুঝছি না। আমি, খুকীর গর্ভধারিণী যত কথাই জিজ্ঞাসা করছি একটারও তো জবাব পাচ্ছি না। এদিকে ঘরে বাইরে অপরের প্রশ্নের জবাব দিতে আমাদের প্রাণান্ত হচ্ছে। বাবাজীর সঙ্গে কি—? আপনি জানেন কিছু?'

পরেশবাবু ঘাড় নাড়লেন। তবে তিনি পাকা লোক, না হলে এতবড় আপিস চালাতে পারতেন না—তিনি সেই দিনই আপিসের ফেরৎ বেয়াই বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রশ্ন ইত্যাদির ধার দিয়েও গেলেন না, সোজা পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'মা, পূর্ণিমার আলোয় একবার অভ্যেস হয়ে গেলে কি অমাবস্যায় টেঁকা যায়! তোমার ছেলে বৌ আমরা দুই বুড়ো-বুড়ী যে আর থাকতে পারছি না। ও বোম্বেটেটার সঙ্গে কী হয়েছে তোমার রাগারাগি—সে কথা জানতে চাই না, সে তোমাদের মান-অভিমান তোমরা মিটিয়ে নেবে—এখন আমাদের জীবনটা রক্ষা করো।'

পূর্ণিমা যথার্থ শিক্ষিতা মেয়ে, সে এই অভিযানপ্রক্রিয়া, ইংরেজীতে যাকে 'য়্যাপ্রোচ' বলে তার মর্যাদা বুঝল তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থাতেই 'চলুন' বলে শ্বশুরের সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠল। এবং সেরাত্রে যখন শাশুড়ী নিজে সঙ্গে ক'রে এনে ওদের নবসুসজ্জিত শয়নগৃহে পোঁছে দিয়ে গেলেন তখনও কোন প্রতিবাদ কি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করল না।

কিন্তু দেখা গেল রাজ্যেশ্বরের পরের দিনই আপিসে থাকার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে গেল। গঙ্গার ধারে আপিস-প্রদত্ত যে সুসজ্জিত কোয়ার্টার কদাচিৎ ব্যবহারে লেগেছে, সেই কোয়ার্টারেই—সেদিন তো বটেই—তার পরও কদিন তাকে থাকতে হ'ল।

এরপর আর ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া গেল না কোনমতেই, থলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসা—ইংরেজিতে যা প্রবাদ আছে—তাই হ'ল। পুত্র আর পুত্রবধূর দাম্পত্যজীবনে কোথাও যে একটা প্রকাণ্ড চিড় খেয়েছে অথবা সে জীবনটাই গড়ে ওঠে নি, তার আগেই একান্ত অনভিপ্রেত অভি

কদর্য একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে—সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না।

শ্বশুর প্রশ্ন করেন, শাশুড়ী প্রশ্ন করেন,—ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন, বধূ একই উত্তর দেয়, 'আমাকে ওঁর পছন্দ হয় নি বোধ হয়। হয়ত উনি আগে কাউকে ভালবেসেছিলেন।—নয়ত এই রকম মেয়ে ওঁর পছন্দ নয়। আপনাদের উচিত হয় নি ওঁর কি পছন্দ তা না জেনে এ বিয়ে ঠিক করা।'

অসহিষ্ণু পরেশবাবু বলেন, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, তোমাকে ও নিজে চোখে দেখে বিয়ে করেছে।'

এরপর নেমে আসে অখণ্ড নীরবতা।

ছেলেকেও প্রশ্ন করেন বাবা মা, ছেলে বিরক্ত মুখে চুপ ক'রে থাকে। অনেক প্রশ্নর পর হয়ত বলে, 'ভেরী অবস্টিনেট য়্যাণ্ড হটি। ও মেয়ে আমার চলবে না। তোমরা সেপারেশ্যনের ব্যবস্থা করো। খরচা সব আমি দেবো।'

পরেশবাবু বুঝিয়ে বলতে যান, তাঁর একটা পদমর্যাদা আছে, 'পোজিশ্যন' বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে, বিয়ের এক মাসের মধ্যে তাঁর পুত্র পুত্রবধূ যদি সেপারেশ্যনের দরখাস্ত করে—তিনি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। হয়ত খবরের কাগজে উঠবে কথাটা, অধস্তন কর্মচারীরা তা নিয়ে তাঁকে শুনিয়ে-শুনিয়েই হাসি তামাশা করবে, অনুমানে নির্ভর ক'রে নানা গালগল্প রটনা করবে, ফলে ভবিষ্যতে অগণিত সুযোগ পাবার সম্ভাবনা তো থাকবেই না, এখনই চাকরি রাখা দায় হয়ে পড়বে।

আরও দুচার কথার পর রাজ্যেশ্বর যেন রূঢ় হয়ে ওঠে। 'নিজের মান নিজের কাছে' এই মহাবাক্য স্মরণে অগত্যা পরেশবাবুকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

তবু কিছুদিন পরে ডাক্তার দেখানোর প্রস্তাবটা ছেলের কাছে পাড়তে গেলেন। তিনি বৃথাই এতদিন বড় আপিসের শীর্ষদেশে বসে নেই, ছেলে যাই বলুক, তাঁর ধারণা দুর্বলতা ছেলেরই, সেটা সে ঔদ্ধত্য ও অমার্জিত রূঢ়তা দিয়ে ঢাকতে চায়। তাই তিনি যথাসম্ভব বন্ধুভাবে, মিষ্টি ক'রে পেড়েছিলেন কথাটা, কিন্তু ছেলে দারুণ চেঁচামেচি ক'রে বাবাকে বিস্তর অপমানকর কথা শুনিয়ে দিল। শুধু তাই নয়,—যেন এর পাল্টা জবাব হিসেবেই প্রকাশ্যে কারখানার মেয়েমজুরদের এনে কোয়ার্টারে তুলতে লাগল।

তাতেও পরেশবাবু ভুললেন না। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান পড়া লোক, স্ত্রীকে বললেন, 'এও হয়। পায়েস খায় না—পচা মাছের ঝালচচ্চড়ি ভালবাসে এমন লোকের অভাব নেই পৃথিবীতে।' তিনি তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক সমরবাবুকে বলে কৌশলে এক সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলেন। রাজ্যেশ্বর টের পেয়ে যেন ক্ষেপে গেল—সে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে ঐ এক কুলীকামিনকে সঙ্গে ক'রে কালিম্পং-এ চলে গেল—ওদের কোম্পানীর হলিডে হোমে।

অতঃপর পূর্ণিমা বাপের বাড়িতেই ফিরে যেতে চেয়েছিল। সেপারেশনেও আপত্তি নেই তার—তা-ও জানিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু যাকে আড় হয়ে পড়া বলে পরেশবাবু তাই পড়লেন। পূর্ণিমার দু-হাত ধরে বললেন, 'মা, যদি দয়া ক'রে ছেলের বাড়ি আলো করতে এসেছিস—দু-মাসেই সব অন্ধকার ক'রে ছেড়ে যাস নি। আর কিছুদিন চেয়ে চেয়ে দেখতে দে। এখন এভাবে চলে গেলে আমি আর ঘরে-বাইরে মুখ দেখাতে পারব না।'

পূর্ণিমা শক্ত হতে পারে নি। যদিও মনে হয় তার মনের আনন্দ-কমলটি চিরকালের মতো দল মুদেছে—তবু বাইরের হাসিটা অব্যাহত রেখে শ্বশুর-ঘরের শ্রী ও শোভনতা বজায় রেখে চলেছে প্রাণপণেই।

শ্বশুর পরেশবাবুও সে করুণার মর্যাদা দিতে ভোলেন নি। শাড়িতে-অলঙ্কারে আদরে প্রাধান্য-দানে তাকে অভিভূত ক'রে দিয়েছেন। সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে গেছেন, সর্ব ব্যাপারে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছেন। তাঁর কাছে যে কোন সুবিধা আদায় করতে চায় তাকে গিয়ে তাঁর পুত্রবধূকে ধরতে হবে—একথা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন সবাইকে। যাতে সে স্বামীর মনোরাজ্যের ঈশ্বরী হতে না পারার বেদনা স্বামীগৃহের সংসার ও বহিঃরাজ্যের ঈশ্বরী হওয়ার আনন্দে ভুলে থাকতে পারে, তারই নেশা লাগে।

এইভাবে বছর খানেক কাটার পর ছেলের বদ-অভ্যাসগুলো দূর হয়েছে, সরীসৃপের ময়লা খোলসের মতো খসে পড়েছে; খবর পেয়ে কল্যাণী একবার একটা শেষ চেষ্টা করলেন ছেলে-বৌয়ের পুনর্মিলন ঘটাতে। কুলীকামিন নিয়ে বাস করা যে কতকটা ওঁদের ওপর প্রতিশোধ তুলতেই, এবং তার পৌরুষ সম্বন্ধে ওঁদের সন্দেহের মূলে যে কোন সত্য নেই সেইটে প্রমাণ করতেই—

সে বিষয়ে মায়ের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

এখন আবার ভদ্রভাবে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে কোয়ার্টারে, নেশাভাঙ করে না—এমন কি আড্ডাও জমায় না—সে সংবাদে তাঁর ধারণাই সমর্থিত হ'ল। আর তিনি সে অবস্থার সুযোগ নিতেও দেরি করলেন না। ছোট ভাইয়ের জন্মদিন, এই অছিলায় রাত্রে খেয়ে যেতে বললেন, চিঠি লিখলেন মিনতি ক'রে, টেলিফোনও করলেন। যে ভাই দীর্ঘকাল অনুপস্থিত তার জন্মদিনে ঘটা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তা তাঁরা করছেনও না—শুধু একটু পায়েস করবেন। সে পায়েস তো তাঁদের খেতে নেই—তবু যদি একটা ছেলেও খেত। ইত্যাদি—

সে মিনতি রাজ্যেশ্বরও উপেক্ষা করতে পারে নি। তবে আগেই শর্ত ক'রে নিয়েছিল পূর্ণিমা যেন তার ধারেকাছেও না আসে। সে চেষ্টাও করেন নি কল্যাণী দেবী, অত অসহিষ্ণু ও নির্বোধ তিনি নন। যেটা করেছেন সেটা হ'ল আহারের আয়োজনে অযথা বিলম্ব। রাজ্যেশ্বরের খাওয়া যখন শেষ হ'ল তখন এগারোটা বেজে গেছে। স্বভাবতই তাঁরা রাতটা থেকে যেতে বললেন। মা বললেন, 'তুই আমার ঘরে গিয়ে শো, আমি আর বৌমা তোর ঘরে শোব'খন।'

এতেও অবিশ্বাসের কিছু পায় নি রাজ্যেশ্বর। কিন্তু মার অন্ধকার ঘরে গিয়ে সুইচ জ্বালামাত্র আবিষ্কার করেছে যে শয্যায় আর একটি প্রাণী শুয়ে আছে। সম্ভবত পূর্ণিমাকেও ঐ কথাই বলা হয়েছিল—'তুমি আমার কাছে শুয়ো, খোকা একাই ওঘরে শোবে'খন।' কারণ পুত্রবধূ যে অত্যন্ত প্রখর আত্মমর্যাদা জ্ঞান, সে প্রমাণ এতদিনে বার বার পেয়েছেন বৈকি।

দুজনেই চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ও বাথরুমের দুই দরজাতেই তালা পড়ে গেছে বাইরে থেকে।

নিতান্তই ছেলেমানুষী প্রচেষ্টা। তার ফল হ'ল এই যে, ভোরে চাবি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যেশ্বর যে গিয়ে সোজা নিজের গাড়ি বার ক'রে কর্মস্থানে চলে গেছে তাই নয়—পূর্ণিমাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রথম যে ট্যাক্সি পেয়েছে তাতেই চেপে ট্যাংরায় দিদির বাড়ি গিয়ে উঠেছে। ওর বাপেরবাড়ি একটু দূরে, সেখানে এই বর্ষায় ট্যাক্সি হয়ত যেতে চাইবে না—এই আশঙ্কাতেই পূর্ণিমা দিদির বাড়ি গেছে। সে তখন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য—

'অন্য কোথাও, অন্য কোথাও, এ রাজ্যে আর নয়। ভাগ্যে মম স্বর্গপুরী হ'ল বিষম ভয়।' বোধ করি এই তখন তার মনোভাব।

দিদির বাড়ি থাকবে বলে যায় নি পূর্ণিমা। ওখান থেকে বাপের বাড়ি চলে যাবে, অথবা এমন জায়গায় যাবে যেখানে খুঁজে গিয়ে শ্বশুরের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না—এইরকমই ভেবেছিল। কিন্তু এই দিদি ওর চেয়ে অনেক বড়, ছোটবেলায় কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছেন ওকে—তিনি ওর মুখ দেখে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয়ের আভাস পেয়েছেন, একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের। এ মেয়ে বড় অভিমানী, তেমন কিছু হ'লে একটা সর্বনাশ ক'রে বসাও আশ্চর্য নয়। তাই তিনি তখনই ছাড়তে রাজী হলেন না, ওকে কোন প্রশ্নও করলেন না, শুধু প্রায় জোর ক'রেই ধরে রাখলেন। পাগলের মতো চারিদিকে খোঁজখবর করে পরেশবাবু যখন বেয়াইকে নিয়ে এসে হাজির হলেন—তখন ওর দিদি বাসন্তী হাতজোড় করল, 'কী কারণে জানি না ওর মন ভাল নেই তালুইমশাই, শরীরও ভাল যাচ্ছে না। থাক না আমার কাছে দু-এক মাস।' বাবাকে আড়ালে ডেকে বলল, 'কী হয়েছে এসব জানতে চেয়ো না, জিজ্ঞাসাবাদ করতে যেয়ো না, হিতে বিপরীত হবে। ওকে আমি চিনি। কিছু একটা অশান্তির কারণ হয়েছে বুঝতেই তো পারছি—কিন্তু কী সেটা ও যতক্ষণ নিজে থেকে না বলে, আমি জানতে চেষ্টা করব না।'

তাই থেকেই গেল পূর্ণিমা দিদির বাড়িতে, এক মাস নয়, আড়াই মাস প্রায়। এর ভেতর কিছুটা বলেছে পূর্ণিমা, কিছুটা বলে নি। তাকে স্বামীর পছন্দ হয় নি, তার চেয়ে মজুর মেয়েদের বেশী পছন্দ। সেই অপমানটাই অহরহ কাঁকড়া-বিছের কামড়ের মতো জ্বলছে, সেই কথাটাই বলেছে দিদিকে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যা—তা ঠোঁটের ডগায় আসা সত্ত্বেও করতে পারেন নি দিদি। পছন্দ যদি নয়—তবে নিজে দেখে অত আমোদ ক'রে বিয়ে করতে এসেছিল কেন? একরাত্রে কী এমন পরিবর্তন হয়ে গেল পূর্ণিমার!

আরও একটা প্রশ্ন যা করতে পারলেন না, যেদিন দরজার মধ্যে দুজনে বন্ধ হয়ে ছিল সারারাত, সেদিনও কি বরফ গলে নি? সামান্যও? দুটি দেহ কি দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা অনুভব করে নি?

প্রশ্ন ক'রেও যেমন জানা গেল না, নিজে থেকেও কিছু বলল না পূর্ণিমা।

আসলে মনের কোন দুর্বোধ্য অযৌক্তিক জটিলতায় তার কাছে ঐ অপমানটাই বড়। কুচকুচে কালো, হাড়ি কি ডোমের মেয়ে, বীরভূম অঞ্চলে বাড়ি—কদর্য ব্যাধির ভাণ্ডার—তাকে একদিন দেখেওছে পূর্ণিমা—ওকে অপমান করার জন্যেই যেন রাজ্যেশ্বর বেছে নিয়েছিল মেয়েটিকে, যাকে নিয়ে কালিম্পং গিয়ে ছিল পনেরো দিন।

তেমনি কারও সঙ্গে রাত কাটাতে না পারলে পূর্ণিমার মনের এ আগুন নিভবে না, এ জ্বালা শান্ত হবে না। আর কাটাতে হবে ওকে জানিয়ে, অথবা সে মিলনের ফল ভোগ করতে বাধ্য করবে।

বাপের বাড়ি সে প্রতিশোধের সুযোগ পাওয়া শক্ত। কলকাতার উপকণ্ঠে হলেও আসলে গ্রামই। সেখানে অত দাসী-চাকরও নেই, তাছাড়া সকলেই সকলের খবর রাখে। শ্বশুরবাড়িতেও তেমন কেউ নেই। ড্রাইভাররা পাঞ্জাবী, সুদর্শন। দারোয়ান কনৌজী ব্রাহ্মণ। পাচকও ব্রাহ্মণ তো বটেই, রীতিমতো অভিজাতদর্শন।

হয়ত আরও কতকটা সেইজন্যেই থেকে গেল সে এখানে। ট্যাংরার এ কারখানা অঞ্চল, শুয়োর ব্যবসায়ীর ঘাঁটি—এখানে তেমন লোক অনায়াসে মিলতে পারে।

তবু তা মিলল না। যা মিলল তা স্বদেশ সামন্ত। অল্পবয়স, ছিপছিপে গঠন, শ্যামবর্ণ হলেও সুশ্রী, দুটি আয়ত চোখে আকাঙ্ক্ষা ও পূজার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। সে চোখ যেন ওর পিছনেই ঘুরন্ত দিবারাত্র। ওর কোন ফরমাশ খাটতে পারলে সে নিজেকে ধন্য মনে করত। হয়ত বয়সে ছোট, তবে সে হিসাবটা কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি, সেটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় নি। পূর্ণিমাও আর অপেক্ষা করতে পারে নি। তারিখের হিসেবে বেশী ব্যবধান বাঞ্ছনীয় নয়। কোন অসুবিধাও হয় নি—সামান্যতম প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতেই কৃতার্থ হয়ে গেছে স্বদেশ।...

মুকলিত হওয়ার লক্ষণ চিনে নিতে কল্যাণীর বিলম্ব হয় নি। সময়ের মোটা-মুটি আন্দাজেও মিলেছে। নিজের নির্বুদ্ধিতা ভেবে যে ঘটনার জন্য মনে মনে লজ্জিত ছিলেন, সেটাই বিজয়-পতাকা হয়ে উঠল, কল্যাণীর কাছে এটাই বড় কথা। তিনি সগর্বে গিয়ে জানালেন পরেশবাবুকে। পরেশবাবু যেন আনন্দে দিশাহারা হয়ে গেলেন। ভাল ডাক্তার, সবচেয়ে মূল্যবান নার্সিং-হোম

কোনটারই ত্রুটি ঘটল না। এদিকেও—কী যে করবেন ভেবে না পেয়ে দামী দামী শাড়ি, নূতন নূতন গহনার স্তূপ জমিয়ে তুললেন পুত্রবধূর ঘরে, নিত্য-নূতন আহার্যের আয়োজনে যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বধূ যে তার একটাও প্রায় স্পর্শ করছে না—এ সামান্য তথ্যটুকু নিয়ে মাথা ঘামাবেন—পরেশবাবুর অসামান্য আনন্দ-ব্যস্ততার মধ্যে সে অবসর ছিল না।

আহার্য অস্পর্শিত থাকতে লাগল অন্যত্রও।

শুভ সংবাদ যে 'প্রাপ্তিমাত্রেন' সরবে রাজ্যেশ্বরকে জানানো হয়েছিল—ইংরেজীতে যাকে 'উইথ ট্রাম্পেটস' বলে—সে কথা বলা বাহুল্য। আর তাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু সে খবরে যার সর্বাধিক আনন্দ হবার কথা, খুশী হয়ে সংবাদদাতাকে মোটা টাকা বকশিশ করার কথা—তার মুখেই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়-বিহ্বলতা ও স্পষ্ট অবিশ্বাস ফুটে উঠল। তারপরই মনে হ'ল সে মুখে কে কালি মেড়ে দিল তার। খানিকটা তেমনি হতভম্ব ভাবে বসে থেকে ভেতরের ঘরে গিয়ে সে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

এর পর থেকেই তার দিনরাত্রি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। খাওয়া তো প্রায় ঘুচেই গেছে, বেশির ভাগ দিন বিছানাতে শোওয়াও হচ্ছে না। একটা কুটিল সন্দেহ তার জীবন, ভবিষ্যৎ-চিন্তা, তার কর্ম, তার অবসরকে তিক্ত, অসহ্য, অস্থির ক'রে তুলছে। সে যেন নিজের ভেতরেই সে চিন্তা সে সংশয় থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে—কিন্তু মনের বিস্তীর্ণ সীমার মধ্যেও এতটুকু আশ্রয় পাচ্ছে না কোথাও।

রাজ্যেশ্বর তার সুন্দরী শিক্ষিতা মার্জিতরুচি স্ত্রীর মূল্য যে বোঝে না তা নয়। এ স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলন হ'ল না—তার কারণ তার পক্ষ থেকে যে ইচ্ছার অভাব ছিল না তা নয়, আসক্তির অভাব ছিল ; অর্থাৎ পর্যাপ্ত আসক্তি, দৈহিক পিপাসার অভাব ছিল। তাতে তার দুঃখ কারও চেয়ে কম ছিল না, বরং অনেক বেশী ছিল বলেই লজ্জা ও পরিতাপ—বিরক্তি, রূঢ়তা ও উষ্মার রূপ ধরে বেরিয়ে আসত। ট্যাণ্টালাস-এর অবস্থা—পিপাসার সময় সুশীতল, সুমিষ্ট, সুপেয় পানীয় সামনে থাকা সত্বেও পান করতে না পারার যে যন্ত্রণা—সে কাউকে জানানো যায় না, সহ্য করা আরও কঠিন। সে সময় কেউ অযাচিত উপদেশ দিতে এলে ক্রোধ ও বিরক্তিই বোধ করবে বৈকি!

কিন্তু এ কী হ'ল ?

কেমন ক'রে হ'ল ?

সমস্ত প্রশ্ন ও কৌতূহল ঘুরেফিরে একটিই ব্যক্তিতে আবর্তিত হয়—বিশেষ তার এই আনন্দ-ব্যস্ততা ও সর্বস্ব উজাড় ক'রে দেবার প্রবণতা দেখে—সারা পৃথিবীতে একমাত্র যে লোককে সে প্রশ্ন করা যায় না।

ট্যাংরা অঞ্চলের এক প্রান্তে আরও এক বাড়ির সিঁড়ির নিচের ঘরে এ সংবাদ পোঁছেছিল যথাসময়ে।

না, তাকে কেউ বকশিশের লোভে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় নি, তাকে এ সংবাদ দেবার কথা কারও মনেও আসে নি—আসার কথাও নয়—যথা-নিয়মে বাড়ির কর্তৃস্থানীয়দের আলোচনা থেকে নির্গলিত হয়েই সেখানে পৌঁছেছিল।

অকারণেই খুশী হয়েছিল সে।

তার মনে হয়েছিল, লাট্টুর মতো পাক খেয়ে বেড়ায় সে। চিৎকার ক'রে সংবাদটা দেয় সকলকে।

কিন্তু কী সংবাদ দেবে সে ?

কলকাতার ধনী পল্লীতে এক বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত জনৈক পরেশ চৌধুরীর পৌত্র বা পৌত্রীর আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—এ সংবাদে ট্যাংরা অঞ্চলের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহভৃত্যের আনন্দের পরিসীমা নেই—এই সংবাদ ?

তা হয় না। এ আনন্দ প্রকাশ করা যায় না। কাউকেই, কারও কাছেই বলা যায় না কথাটা।

তবে সে আনন্দ থাকেও না বেশীদিন। অন্য এক প্রবলতর দুঃখ দেখা দেয় তার স্থানে। এবং সেই সঙ্গে একটা তীব্র ঈর্ষা। অকারণ, অবোধ ঈর্ষা।

আর—এই অস্থিরতার মধ্যেই একটি একটি ক'রে দিন সপ্তাহ মাস কাটে।

ও বাড়ির আনন্দ-সমারোহের, উপহার প্রাচুর্যের বিবিধ বিচিত্র সংবাদ এ বাড়িতে এসে পৌঁছয়। সে সংবাদ স্বদেশ সামন্তরও পেতে কোন অসুবিধা হয় না। এমন কি সাধের তারিখও।

অবশ্য সে হিসেব তো মোটামুটি জানাই। এর জন্যে স্বদেশ প্রস্তুতও

হচ্ছে গত পাঁচ মাস ধরে। মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে তার, সবটাই জমিয়েছে। এক অভাব ছিল সুযোগের—সেও একদিন এ বাড়ির গৃহিণীই ক'রে দিলেন। সাধের তারিখের দুদিন আগেই তাঁর দেয় যা—শাড়ি, মিষ্টি, আলতা, সিঁদুর পাঠিয়ে দিলেন, পাঁচ রকম ভাজাভুজি দিয়ে। সাধের দিনে পাঠালে এসব খাবার কোনটাই বোনের ভোগে লাগবে না—কারণ সেদিন প্রচুর ভিড় হবে, প্রচুরতর খাবার আসবে। দুদিন আগে পাঠালে তবু এটা-ওটা হয়ত মুখে দিতে পারবে সে।

সে সঙ্গে যে নিচের ঘর থেকে আর একখানি দেড়শো টাকা দামের সিল্কের শাড়ি নিয়ে নিল স্বদেশ—তা কেউ টের পায় নি।

নিউ আলিপুরে পৌঁছেও কাউকে বলে নি সে, পূর্ণিমাকেও না। সব যখন সাজিয়ে দিয়েছে, গৃহিণী ভেবেছেন পূর্ণিমার দিদিই দুখানা শাড়ি দিয়েছেন। 'এত কেন এত কেন, এত বাহুল্যতার কী দরকার ছিল' বলে দিদির বিবেচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বলা সম্ভব নয়, বলতে চায়ও নি স্বদেশ, পূজা এ বাড়ি পৌঁচেছে এতেই সে খুশী—কিন্তু দেখা গেল যথাস্থানেও পৌঁচেছে অর্থাৎ পূর্ণিমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি। সবাই নানা কাজে সে ঘর থেকে সরে গেলে পূর্ণিমা ওর মুখের দিকে চেয়ে সিল্কের শাড়িখানায় হাত রেখে স্বদেশের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে। প্রশ্ন করা অনর্থক। আরও অনর্থক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। স্বদেশের আরক্ত মুখ সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে শুধু।

পূর্ণিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওর মুখটা জোর ক'রে তুলে ধরেছে, এর মধ্যেই ওর কপাল ঘেমে বড় বড় ফোঁটায় সে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, এই ফাল্গুন মাসেই—তা পরিশ্রমে নয় অবশ্যই—এতেই স্বীকৃতিটা পুরো হয়েছে। সে বলেছে শুধু, 'কেন এ কাজ করতে গেলে! এ তো তোমার ছ মাসের মাইনে! একখানা সাধারণ তাঁতের শাড়ি আনলে আজই, এখনই পরে ফেলতাম, তুমি চোখে দেখে যেতে পারতে। কাল তো এ শাড়ি পরা যাবে না, এঁদের শাড়িই পরতে হবে।'

এর উত্তর দেওয়া যায় নি, দিতে পারে নি স্বদেশ।

সে চেষ্টাও করে নি। নিঃশব্দেই বেরিয়ে ঘর থেকে নিচে নেমে এসেছে।

পূর্ণিমাও চলে গেছে অন্য ঘরে।

স্বদেশ যে তার প্রাপ্য বকশিশটা নিয়ে গেল না, তাকে একটু মিষ্টি খাওয়ানোও হয় নি—এটা যখন আবিষ্কার করলেন কল্যাণী দেবী, তখন বহু বিলম্ব হয়ে গেছে, পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর আবার সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে বলেছে, 'নতুন জায়গা, এত বড় বাড়ি, এত লোকজন—কোথায় বসবে, কে কী বলবে—ভয় পেয়েই চলে গেছে বোধ হয় তাড়াতাড়ি।···দিদির যেমন কাণ্ড।···'

অনেকদিন পরে এই ঘটনায় খুশীই ছিল স্বদেশ। পূজা যথাস্থানে পৌঁচেছে, দেবী সে সম্বন্ধে অবহিত—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে।

কিন্তু সেদিন সকালের টেলিফোনটা পেয়ে কী যে হ'ল।

বোধ হয় মৃত্যুর পূর্বে স্বদেশ নিজেও বুঝতে পারে নি—ঠিক কেন, কোন্ দুঃখটা বড় হয়ে উঠে তাকে এই আত্মনাশের পথে পাঠাল।

কল্যাণী দেবী ছেলেকে টেলিফোন করতে বলেন নি।

পরেশবাবুও না। ছেলের আচরণের অর্থটা দুর্বোধ্য হলেও তার রূঢ়তা বা অভদ্রতা না বোঝার কোন কারণ ছিল না।

এ উপকারটুকু কে করল তা কেউ জানে না, শেষ অবধি, পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদেও কেউ স্বীকার করে নি। যে করেছে সে হয়ত ভাল ভেবেই করেছে—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়বে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

কিন্তু তাই-ই হয়েছে। গত সাত মাসের তুষানলে যেন ঘৃতাহুতি পড়েছে —দিকদাহকারী আগুন জ্বলেছে রাজ্যেশ্বরের মাথায় ও মনে। যে পাপ-সংশয়টাকে এতকাল ঠেলে রাখার চেষ্টা করেছে, তা থেকে দূরে ছুটে পালাতে চেয়েছে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে সে।

বাড়িতে এসেছে নিরস্ত্র অবস্থাতেই। কিন্তু বাবার বন্দুকটা কোথায় থাকে সে তো তার জানাই।

সন্তুতি

পুনিয়াকে আপনারা অনেকেই দেখেছেন। যাঁরা নিয়মিত পুরীতে বেড়াতে যান—এমন কি দু'চার বছর অন্তরও—আর স্বর্গদ্বারের অসহ কুশ্রী ভিড় এড়াতে চক্রতীর্থের নির্জনতায় আশ্রয় খোঁজেন, তাঁদের সকলেরই দেখার কথা অন্তত। হয়ত সকলে লক্ষ্য করেন নি তেমন—চোখে পড়েছে এই মাত্র, সে চোখে পড়ার বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছয় নি। লক্ষ্য করার মতো কিছু আছে তাও বুঝতে পারেন নি—সম্ভবত সেই জন্যেই তা স্মৃতির ভাণ্ডারে ধরে রাখবার চেষ্টা করেন নি।

কারণ ও পাড়ায় থাকলে বা যাতায়াত করলে তাকে না দেখে আপনার উপায় নেই।

ভোরবেলা—ভাল ক'রে ফরসা হবার আগেই তার 'রোঁদ' শুরু হয়। পাকা চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, নিকষ কালো রঙ, দন্তহীন গোল মুখ, ধূসর হয়ে আসা চোখ—গায়ের চামড়া ভয়াবহ রকমের কোঁচকানো, একটি সামান্য ছেঁড়া কাপড় এককেরতায় পরা, তাতে কোন লজ্জাই নিবারিত হয় না—মনে পড়ছে মানুষটাকে? একটু মনে করার চেষ্টা করুন, ছবিটা পরিষ্কার ভেসে উঠবে চোখের সামনে।······

বি. এন. আর হোটেল ছাড়িয়ে (এখন কী যেন নাম বদল হয়েছে) চক্রতীর্থের দিকে এগিয়ে যেতে 'সোনার গৌরাঙ্গের' কাছাকাছি পৌঁছে যদি ডান দিকে একবার তাকান তো দেখতে পাবেন—যে বিপুলায়তন বাড়িগুলো সমুদ্রের তীর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের আড়ালে—অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ির মাঝখানে এখনও যে ছোট্ট খোলা মাঠটা পড়ে আছে, সব চেয়ে বড় আর ঝকঝকে বাড়িটার গা-ঘেঁষে, বলতে গেলে তার ছত্রছায়ায়; তার মাঝখানে একেবারেই এদের সঙ্গে বেমানান, সামঞ্জস্যহীন—একখানা নড়বড়ে কুঁড়েঘর—ঝোপ্‌ড়া। দেখতে পাবেন মানে দেখার সম্ভাবনা আছে, চেষ্টা করলে চোখে পড়বে। অবশ্য যদি এদিকের এই তালপাকানো বাড়ির ফাঁকটার মধ্য দিয়ে আপনার নজর পৌঁছয়। রিক্সা ক'রে গেলে সম্ভাবনাটা কম,

হেঁটে গেলে হয়ত দেখতে পারেন।

ঝোপ্‌ড়া বলছি—প্রকৃত অর্থেই। বছর পনেরো-ষোল আগে যখন প্রথম দেখি তখন, যাকে যথার্থ পর্ণকুটির বলে, তাই ছিল। গোটা কতক বাঁশের খুঁটির দেয়াল—তখনও তাতে মাটি ধরানো হয় নি—ফাঁকগুলো শুধু শুকনো ডালপালা আর কঞ্চির টুকরো দিয়ে ভরানো হয়েছে—ওপরে পাতা-লতার চাল, কোথাও বা তার মধ্যেই ভাঙ্গা ক্যানেস্তারার টুকরো গোঁজা।

তার পর অবিশ্যি পরিবর্তন কিছু হয়েছে।

বাঁশের ফাঁকগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। তাতে ভেতর দিকে গোবর-মাটির প্রলেপও পড়েছে। চালেরও পাতালতা ঘুচে খড় পড়তে শুরু হয়েছে। এখন তো পুরো খড়েরই চাল। আবার ঘরের সামনে একটু জায়গা—হাত চার-পাঁচ লম্বা—কঞ্চি ও কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘিরে 'হাতা'ও তৈরী করা হয়েছে।

শুধু কোন পরিবর্তন হয় নি মানুষটারই। সেই এক চেহারা, এক বেশ-ভূষা এবং এক বৃত্তি। বৃত্তি প্রধানত গোবর কুড়িয়ে বেড়ানো। যখন ঘোরা-ফেরা করে—দ্রুতই চলে—কিন্তু তার মধ্যেই তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি মেলা থাকে কোথায় কোনখানে কোন্ শুষ্ক পত্র-পল্লবের মধ্যে একটুখানি গোবর পড়ে আছে। এই গোবর কুড়িয়ে এনে ডেলা ডেলা লাড়ুর মতো ক'রে বালির ওপর ফেলে রাখে, কখনও কখনও থাবড়া ক'রে ঘুঁটের মতো আকৃতি ক'রে চালেও তুলে দেয়—শুকোলে জ্বালানি হিসেবে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বিক্রী করে। এইটেই ওর প্রকাশ্য জীবিকা।

অবিশ্যি এতে দিন চলার কথা নয়। চলেও না। কিসে যে চলে তা কেউ জানে না। গোবর কুড়োতে কুড়োতে কুড়নোটাই অভ্যাস হয়ে গেছে—যা পায় তাই কুড়োয়। ডাবের খোলা, শুকনো ডালপালা, কঞ্চি, কাঠের টুকরো মায় পাতা সুদ্ধ। জ্বালানি বলে লোকের বাড়ি যুগিয়ে যা দু'এক পয়সা পাওয়া যায় তা তো পায়ই—নিজেরও রান্নার পর্বটা ঐ শুক্‌নো পাতাতেই সারা হয়।

কিন্তু এহো বাহ্য।

এই কুড়নোর সঙ্গে আরও কিছু কিছু সংগ্রহ হয়। কার বাড়ি থেকে সমুদ্রের উন্মত্ত বাতাসে গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, স্নান করার কস্টিউম্ কি হাফপ্যাণ্ট উড়ে বালিতে এসে পড়েছে, কার বাড়ি থেকে এসেছে একটা সায়া—কিম্বা কোথা

থেকে কাক এনে ফেলেছে চামচ বা দুধ-খাওয়ানো ঝিনুক—সেদিকেও ওর সমান দৃষ্টি থাকে। দেখা মাত্র সংগ্রহ করে সেগুলো। তার মধ্যে যেটা ওর নাতি কীর্তনিয়ার কাজে লাগবে সেটা রেখে দেয়—বাকী জিনিস, কয়েকটা জমা হলে, নুলিয়া পাড়ায় গিয়ে বেচে আসে।

পুনিয়ার দর্শন অনুসারে এগুলো চুরি নয়। কারও বাড়িতে ঢুকে তার অজ্ঞাতসারে কোন জিনিস নিয়ে এলে চুরি হয়। চুরি সে করে না, এমন কি বাইরের রকে কি রেলিং-এ মেলে দেওয়া জিনিসও টেনে নেয় না। না, চুরি সে করে না। চুরি করা মহাপাপ। এ তো ভগবানই তাকে মিলিয়ে দিচ্ছেন। যাদের জিনিস তারা যদি লক্ষ্য না রাখে—সে দোষ কি পুনিয়ার? পথে কি মাঠে যে জিনিস পড়ে আছে তার গায়ে তো মালিকের নাম লেখা নেই যে ফিরিয়ে দেবে! আর ভগবান কিছু পয়সা খরচ ক'রে তাকে চৌকিদারও নিয়োগ করেন নি যে, কোন জিনিস কুড়িয়ে পেলে 'কার জিনিস গো?' 'কার জিনিস গো?' ক'রে বাড়ি বাড়ি খোঁজ ক'রে বেড়াবে। তাই এসব ও নিজের হকের পাওনা বলেই মনে করে।

উপার্জনের আরও পথ আছে। এসব ছাড়াও।

আশেপাশের বাড়িতে গরমের সময় বা পূজোর সময় যে সব চেঞ্জার বাবুরা আসেন—পৌঁছনো মাত্র তাঁদের ওপর গিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে পুনিয়া। না, কাজ করা কি জল তোলার জন্যে নয়—ওভাবে বাঁধা বন্দোবস্তের মধ্যে খেটে খেতে রাজী নয় সে, সে এসে ধরে ঘুঁটে কি শুকনো ছোবড়া বিক্রীর জন্যে। আর, কোন একটা মালের ফরমাশ দেওয়ার ওয়াস্তা—সরবরাহ করার পর পাওনা পয়সা বুঝে নিয়েই হাত পাতে—চাট্টি 'পকাড়' (পান্তা) বা 'অভড়া' (মহাপ্রসাদ)র জন্যে, নিদেন একটা বাসি রুটি কি পাঁউরুটি—তাও যদি না থাকে এক মুঠো 'চূড়া'? কিছুই থাকবে না গৃহস্থবাড়িতে তা সম্ভব নয়, সুতরাং কিছুক্ষণ কাকুতি মিনতি করলেই কিছু না কিছু খাদ্যবস্তু জুটেই যায়।

তারপর যে দিন যা আপনাদের ফেলা যাবে—বাসি, পচা, তাও একটা হাঁড়ি কি মাটির অন্য কোন পাত্র এনে সংগ্রহ করবে। যাবার দিন চাইবে একখানা ছেঁড়া 'লুগা' অর্থাৎ কাপড়। সে অবশ্য নুলিয়ারা—যারা যাত্রীদের ধরে সমুদ্রে স্নান করায় তারাও—চায়; তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে কোন কোন ক্ষেত্রে হেরে যায়, আবার কখনও কখনও কোন সজ্জন দুজনকেই

দুখানা দিয়ে যান।

এক কাপড়েই বারো মাস চালায় সে। উদ্বৃত্ত হলে শহরের বাইরে কোন হাটে গিয়ে বেচে আসে। স্থানীয় মঠমন্দির থেকে মধ্যে মধ্যে নতুন কাপড়ও পায়, মোহান্ত মহারাজ বা পূজারী মহারাজদের দেখিয়ে একদিন দুদিন নিজে পরে—তার পরেই সযত্নে পাট ক'রে কোরা অবস্থাতেই বেচে আসে মুচিসাহী কি মুলিয়াসাহীতে গিয়ে। আবার শুরু হয় সেই শতসেলাই গ্রন্থি দেওয়া কাপড়—যাতে আর যাই হোক, লজ্জা নিবারিত হয় না কোনমতেই। অবশ্য তার জন্য পরার ধরণও অনেকটা দায়ী।

এত রকম ক'রে পয়সা বাঁচানোর বা উপার্জনের কারণ পুনিয়ার পোষ্য অনেকগুলি। মানুষ পোষ্য মাত্র একটি— মা-বাপ-মরা নাতি কীর্তনীয়া—কিন্তু সে আর কতই বা খায়। খাবার মতো প্রাণী নাতি বাদেও প্রায় এগারো বারোটি।

কবে কোন্ একদিন একটা কালো কুকুর—নিহাৎ পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অন্ত্যজ, নেড়ি কুত্তা যাদের বলে—ওর এই ঝোপড়ার ধারে এসে চুপ ক'রে বসে থাকতে আর পুনিয়াকে দেখে ল্যাজ নাড়তে শুরু করেছিল—আর পুনিয়াও ধরে নিয়েছিল যে তাকে খাওয়াবার দায়িত্ব ওরই, সেই থেকে সন্তান-সন্ততিক্রমে পোষ্যসংখ্যা বেড়েই গেছে। এখন আর বোধ হয় ভাল ক'রে মনেও পড়ে না—কোনটা রস্তার (আদর ক'রে সে-ই প্রথম সারমেয়ীটির নাম রেখেছিল রস্তা) মেয়ে আর কোনটা নাতনী বা নাতি। সবগুলোই কালো, কোন কোনটার বা কালোর সঙ্গে ঈষৎ পাটকিলে রঙের মিশ্রণ আছে। নামও আছে প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা—তবে কোন্টা কে তা একমাত্র পুনিয়াই জানে বা চিনতে পারে। আশেপাশে যারা থাকে—এমন কি কীর্তনীয়ারও—তা সাধ্যাতীত।

এদের জন্যেই পুনিয়ার আজও এত পরিশ্রম, এই সারাদিনব্যাপী সদা-জাগ্রত পর্যটন, এত ভিক্ষা, এত উঞ্ছবৃত্তি। পচা পান্তা, 'তোড়ানি' (আমানি) যা পায় এনে আগে ওদের ডেকে ডেকে খাওয়ায়—যে দিন বিশেষ কিছু পায় না, সেদিন নাতির জন্যে কিছুটা ভাত ফুটিয়ে রেখে বাকী খানিকটা চালের সঙ্গে আশেপাশের বাড়ি থেকে সংগৃহীত আনাজের খোসা, এঁচোড়ের বুকো,

কুমড়োর ভুঁড়ি এবং পথের ধার থেকে সংগৃহীত শাকপাতা—সবসুদ্ধ খানিকটা নুন দিয়ে সেদ্ধ ক'রে নিজেও খায়—ওদেরও খাওয়ায়।

যেদিন তাও জোটে না, সেদিন চারিদিকের আকাশ বাতাস ফাটিয়ে ব্যর্থ আক্রোশে বসে বসে গাল দেয়—অকথ্য কুকথ্য। প্রথম গাল দেয় অবশ্য নাতিকে। খাটবার মতো বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্যও ভাল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বাঁধা কাজকর্ম ধরল না। যখন কোথাও কিছু খুচখাচ কাজ পায় করে, দুমাস তিনমাস পরেই ছেড়ে দেয় বা তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়—তখন শুধু টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় দিনকতক। হাতে পয়সা এলে সিগারেট খায়, সিনেমা দেখে, শৌখীন জামা কেনে। পয়সা কমে এলে বিড়ি খায়। একদম যখন থাকে না তখন দিদিমার কাছ থেকে আদায় করে। আজ পর্যন্ত এক পয়সাও দেয় নি কোনদিন। উল্‌টে পুনিয়াকেই ভাত আর পোশাক যোগাতে হয়। তাও বাবুর বাসি কি পান্তা রোচে না, ওর জন্যে দুবেলা হাঁড়ি চাপিয়ে গরম ভাত ক'রে দিতে হবে। না পেলে দিদিমার হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙ্গবে, পয়সার গোপন সঞ্চয় খুঁজে বার ক'রে সবসুদ্ধ হাতিয়ে নেবে—ইদানীং হাতও উঠেছে—কিছু না পেলে দুদ্দাড় ঘুষি-লাথি মারবে। অথচ 'পকাড়' ওদের সকলেরই প্রিয় খাদ্য—ছোঁড়া শুধু ওকে জ্বালাবার জন্যেই যেন খেতে চায় না।…

নাতির পালা শেষ হলে ধরে সে নিজের ভাগ্যকে। ভাগ্যও যেন কোন সজীব পদার্থের মতো ওর দৃষ্টি-গোচর হয় সে সময়টায়। অর্থাৎ সামনে কোন অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে পেলে যেমন গালাগাল দেয় মানুষ—তেমনিই দেয় পুনিয়া, বেশ হাত-পা নেড়ে, উত্তর-প্রত্যুত্তর, যুক্তি-প্রতিযুক্তি দেওয়ার ভঙ্গীতেই।

সে 'স্টকও' যখন শেষ হয়ে আসে তখন ধরে সে ঐ কুকুরগুলোকে। আক্রোশে ফেটে পড়ে যেন। এক একদিন যেটাকে হাতের কাছে পায় ধরে, কোন কঞ্চি কি গাছের ডাল সংগ্রহ ক'রে (নিদেন কোন ভাড়াটে বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া ভাঙ্গা পাখার বাঁট) মেরে আধমরা ক'রে ছেড়ে দেয়। সেগুলো বা সেটার কেঁউ কেঁউ শব্দে আশপাশের বাড়ির লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠে যখন খুব চেঁচামেচি করে তখন ক্ষান্ত হয়। মারের সঙ্গে মুখও চলে সমানে। আসলে কুকুরগুলোকে সে শুধু সজীব নয়—সজ্ঞান প্রাণী বলেই মনে করে, প্রতিদিনই প্রত্যূষ থেকে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত সে যে অবিরাম বকবক

ক'রে যায়, বকতে বকতে তার দন্তবিরল মুখে ফেনা কেটে কশের দুইপাশে জড়ো হয়—তা কিন্তু আদৌ অসম্বদ্ধ প্রলাপ নয়—ঐ নাতিপুতিদের সঙ্গে অবিরাম ঝগড়া।

হ্যাঁ—কথা বলতে 'গল্প' সে করে না। সর্বদাই কেজিয়া করে সে—অবশ্য একতরফা—ওদের সঙ্গে। কল্পনা নয়—সে যেন পরিষ্কার দেখতে পায় যে, ইচ্ছে ক'রে, ওকে বিরক্ত করার জন্যেই, তারা নানা রকম অন্যায় আবদার করছে, অসময়ে ওর কাজ বাড়াচ্ছে, ওর ঘরদোর নোংরা করছে। তাদের কাছ থেকে বিবেচনা আশা করে সে, আশা করে কিছু বা সহানুভূতি। ওর অবস্থা বুঝে সময়াভাব বুঝে কিছু সাহায্য করবে তারা, অন্তত খাটুনি বাড়াবে না—এইটে আশা করে। সম্ভব নয় বলেই সে আশা পূর্ণ হয় না—তাই দিনরাত তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয় ওকে, খুব উত্ত্যক্ত হ'লে গালিগালাজ শাপশাপান্তও করতে হয়।...

ক্বচিৎ কখনও, বুঝিয়ে বলারও চেষ্টা করে। বেশ মিষ্টি ক'রে নিজের অসহায় অবস্থা, নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা বুঝিয়ে দেয়, বলে লক্ষ্মী হয়ে থাকতে—কিন্তু এগুলোও হয়েছে তার নাতির মতোই বজ্জাত, অবিবেচক, শুধু ওর হাড় ভাজা-ভাজা করার জন্যেই ভগবান পাঠিয়েছেন।

অবশ্য আদরও করে। নিশীথ জ্যোৎস্না রাত্রে বালির ওপর যখন বিশ্রাম করতে বসে সে—রাত দশটা-এগারোটার সময়,—তখন এক একদিন কোনটা ঘাড়ে এসে চাপে, কোনটা কোলে—সে সময় আদরও তাদের করে। এত আদর বোধ হয় কোনদিন ওর নাতি কীর্তনিয়াকেও করে নি ছোটবেলায়। তাদের চুমু খায়, দুহাতে ধরে নাচায়, গালে গাল চেপে ধরে। আর—সেই সঙ্গে অবিরাম বকে যায়।

এই বকুনি আর ঘোরা—এর বিরাম নেই, চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমের সময় ছাড়া। গভীর রাত্রেও দেখা যায় জলের কলসীটা হাতে নিয়ে কিম্বা গোবরের ঝুড়ি—প্রেতমূর্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলসী আর ঝুড়ি দুটোই ছুতো, কারণ অত রাত্রে কলে জল থাকে না প্রায়ই—তাছাড়া সারাদিন জল কমও তোলে না, এত জলের দরকারই বা কি—আর গোবরও অন্ধকার রাত্রে দেখবে কি ক'রে? আসলে বোধ হয়, না ঘুরে থাকতে পারে না বলেই ঘোরে। ঘোরে আর বকে। বকে শুদ্ধ মাত্র ওর ঐ বিচিত্র সংসারের বিচিত্রতর

অমানব অধিবাসীগুলির সঙ্গে। কখনও কখনও কীর্তনিয়ার উদ্দেশ্যেও গাল দেয়। তবে তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয় না। সে দুবেলা খাওয়ার সময় ছাড়া বাড়ি আসে না। রাত্রে শুতেও আসে না। বেশির ভাগ দিন, সামনের বড় বাড়িটায় চাকরি করে ভীম, ওরই সমবয়সী, তার কাছেই শুয়ে থাকে। হাজার হোক পাকা ঘর, একটা চৌকিও আছে, এমন দীন শয্যায় শুতে হয় না। দৈবাৎ কোনদিন ভীম না থাকলে—বাড়িতে আসে, সেও গভীর রাত্রে। বোধ হয় দিদিমার ঐ বকুনি এড়াতেই—সে বাড়িটাও এড়িয়ে চলে।

এমনি ক'রে ওর নিজস্ব বিচিত্র বৃত্তেই আবর্তিত হচ্ছিল ওর জীবনের নিত্যগতি—হঠাৎ একদিন ওর ঐ আশ্রিত একটি জীবকে নিয়ে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল।

রম্ভার নাতিগুলির একটি, কী যেন—লোচনঅ না কি নাম (শব্দের শেষে হসন্ত থাকলে উচ্চারণ করতে পারে না পুনিয়া, অথবা উচ্চারণ ক'রেও একটা অ-যোগ করে শেষে। এমনি সব শব্দই—যথা লক্ষ্মণ্-অ, ভীম্অ), সন্ধ্যার কিছু আগে সামনের পরী বাংলায়—বারান্দায় কটা বিলিতিমাটির পরী আছে বলে স্থানীয় লোকেরা বাড়িটাকে ঐ নামে চিহ্নিত করে—কোন্ ফাঁকে ঢুকে রান্নাঘরে রাত্রের জন্যে ভেজে রাখা মাছের ঢাকা খুলে মাছ খাচ্ছিল, ওদের চাকর ধরে ফেলে। ধরে ফেলে মানে—চৌর্যটাই শুধু নয়—শারীরিক অর্থেও। চোর ঐ জীবটাকেও ধরে বেদম মার দেয় ওরা, চাকর আর বাবুর একটি ছেলে, ষোল-সতেরো বছরের—এমনিও প্রহারের মাত্রা থাকে নি, তার ওপর যখন বাচ্চাটা ছুটে পালাতে গেছে তখন একটা থান ইঁট ছুঁড়েছিল—তাতে বেচারার বাঁদিকের পা-টা ভেঙে যায়।

প্রথম দিকটায় পুনিয়া বাড়ি ছিল না, যথারীতি রোঁদে বেরিয়েছিল, নাটকের শেষ অঙ্কে এসে পড়ল।

ব্যাস, আর যায় কোথা।

চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে, বুক চাপড়ে, কেঁদেকেটে হাট বাধিয়ে তুলল। আধা উড়িয়ায়, আধা বাংলায় ছড়া কেটে শাপশাপান্ত করল, 'মারিলা কাঁইকি ?...অবোধঅ জীবঅ, কঁড় বুঝিকিরি খাইলা ? আপনকু পিলা খাইলে

কঁড় করিতে?···সর্বনাশ্ অ হব, ঝিম্নিতি অবোধঅ শিশুক মারিলা সিমিতি আপনি মরিব। যেত্তে পিলা আছি মরিব, সর্বনাশ্ অ হব। হে প্রভু জগড়-নথ্ অ, হে প্রভু সমুদ্দরঅ—সাক্ষী রহিলা সবঅ।' ইত্যাদি—

তাতে এত ক্ষতি হ'ত না, বরং পল্লী বাংলার নতুন ভাড়াটেরা কিছু কুণ্ঠিতই বোধ করছিলেন, চারিদিকের ভিড় জমা দেখে ঈষৎ লজ্জিতও—কিন্তু সহসা সেই দুই আসামীর একজন, ছেলেটিকে দেখে পুনিয়া অকস্মাৎ এক চেলা-কাঠের বাড়ি সজোরে মেরে বসাতেই ব্যাপারটা ঘুরে গেল। তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, অন্য পাঁচজন ভদ্রলোক যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরাও বিরূপ হলেন। সকলেই এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করলেন। একটা কুকুর বাচ্ছা, তায় রাস্তার নেড়ি কুকুরের—ঘরে ঢুকে রান্না-করা মাছ খেয়েছে—তাকে মারাই উচিত। হয়ত এতটা না মারলেও চলত, তবে তাই বলে একটা 'লোকার ক্লাসের' মেয়েছেলে ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলবে—এতটা বরদাস্ত করা যায় না।

তাঁরা সকলেই তিরস্কার করলেন। ধমকও দিলেন রীতিমতো। মেরে এখান থেকে উচ্ছেদ ক'রে তুলে দেবেন—এমন ভয়ও দেখালেন। চারি-দিকেই বিরোধী পক্ষ দেখে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হ'ল পুনিয়া—যদিচ গজ্‌গজানি থামল না, নিজের ঘরে গিয়ে গালাগালও দিয়ে যেতে লাগল সমানে—কুৎসিত কটু ভাষায়, সেই সঙ্গে অভিশাপও। তবে কোনটাই আর (বর্তমান সংবাদপত্রের ভাষায়) 'সোচ্চার' নয়, তার অভ্যস্ত বকুনির সুরে বলেই আর কেউ অত মাথা ঘামাল না। শুধু পল্লী বাংলার ভদ্রলোকেরা তখনও কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে রইলেন। শুধু একমাসের জন্যে চেঞ্জে এসে এত হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে হয় না বলেই তাঁরা ছেড়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত—এইটেই বার বার চেঁচিয়ে শোনাতে লাগলেন অদৃশ্য প্রতিবেশীদের।

সে যাই হোক, এ নাটকের এইখানেই যবনিকা পড়ল—এই কথাই ভাব-লেন সকলে।

কিন্তু দেখা গেল—পুনিয়াকে তখনও কেউ চেনে নি। নিরীহ মাথা-খারাপ আধাভিখারী বুড়ী—এ-ই জানত সবাই। তার যে ঐ ভঙ্গুর শীর্ণ চেহারার মধ্যে এত উষ্মা আর দুষ্টবুদ্ধি তা কেউ কল্পনাও করে নি।—

ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করেন মঠের সিদ্ধার্থ মহারাজ। তিনি রাত তিনটে নাগাদ ওঠেন প্রত্যহ—পুনিয়ার সেই হিসাবটাই ধরা ছিল। হঠাৎ যে সেইদিন রাত দুটোর সময় তাঁর বাথরুম যাওয়ার প্রয়োজন হবে অতটা বোঝে নি। সিদ্ধার্থ মহারাজ দেখলেন, পরী বাংলার দিক থেকে কালোমতো কে একটি মানুষ—সাদা কাপড় পরা—নিঃশব্দে দ্রুত এদিকে চলে আসছে। গ্রাম্য কোন লোক হ'লে ভূত মনে করত, চোর ভাবাই স্বাভাবিক—মহারাজও তাই ভাবলেন কিন্তু তখনই চেঁচামেচি করলেন না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ছায়ামূর্তিটা পুনিয়ার ঝোপড়া পর্যন্ত এসে ভেতরে ঢুকল, আবার মিনিট-খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে নিঃশব্দে পরী বাংলার দিকে চলল। এবার সিদ্ধার্থ মহারাজ চিনলেন—পুনিয়া। চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ততক্ষণে। তাছাড়া—পুনিয়া ভিন্ন অন্য কেউ হলে ওর কুকুরবাহিনী চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত।

কিন্তু পুনিয়ার এমন তস্কর-গতির কারণ কি? পুনিয়া কি শেষে চুরি ধরল নাকি?

কৌতূহল বেড়েই গেল মহারাজের। তিনি তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলেন।

এমনি তিন-চার বার যাতায়াতের পর হঠাৎ পরী বাংলার এ পাশের ঘরের জানালাটার কাছে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারেন নি—অনুমানের অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, এই একটি আলোক-বিন্দুতেই সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল।—

এর আগেই বোঝা উচিত ছিল, নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজের কাছেই লজ্জা অনুভব করলেন সিদ্ধার্থ মহারাজ।

সামনের বালতিটায় জল ভরাই ছিল—দ্রুত বাগানের পিছনের দিকের দরজাটা খুলে বালতি হাতে সেই দিকে দৌড়লেন—চিৎকার করে ওঁদের ভৃত্য হরি আর ব্রহ্মচারী প্রসূন মহারাজকে ডাকতে ডাকতে।

সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই আগুন বেশ জ্বলে উঠেছে। জানলার নিচে শুকনো ডালপালা ঘুঁটে ইত্যাদি দিয়ে একটা স্তূপ রচনা ক'রে তা কেরোসিন তেলে ভেজানো হয়েছে, তাতে সামান্য মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ

করলেও নিমেষে সে আগুন বিস্তারলাভ করবে—এইটাই স্বাভাবিক। করেছেও তাই। এক বালতি জলে সে আগুন নিভল না। ভাগ্যে মহারাজের চেঁচামেচিতে অনেকে উঠে পড়েছিল, ছুটেও এসেছিল বালতি জল ইত্যাদি নিয়ে—তাই একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটা কি বড় রকমের ক্ষতি হ'তে পারল না, জানলার কাঠে শুধু একটা পোড়া দাগ রেখেই আগুনটা নিভে গেল।

অতঃপর পুনিয়ার যা লাঞ্ছনা ঘটল তা অবর্ণনীয় হ'লেও অনুমেয়। মেয়েছেলে বলে আর এবার কেউ রেয়াৎ করল না, পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলল। গালিগালাজের ঝড় বয়ে তো গেলই—পরী বাংলার গিন্নী ছুটে এসে জুতোর বাড়ি ঘা-কতক বসিয়েও দিলেন। ছেলেটা কোথা থেকে একটা কাঁচি এনে একদিকের কতকগুলো চুল খাপ্‌চে কেটে দিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে আরও দু'একটা চড়চাপড়ও এসে পড়ল। হাতে-হাতে ধরা পড়ে পুনিয়া কেমন যেন হতবাক হয়ে গিয়েছিল, সে সব লাঞ্ছনা নির্যাতনই মুখ বুজে সহ্য করল।

পুলিসে দেওয়াই সাব্যস্ত করেছিল সকলে, মহারাজ নিষেধ করলেন। হাজার হোক মেয়েছেলে, বুড়ী—মাথার ঠিক নেই। দণ্ড যা দেবার ওঁরাই দিন, থানা পুলিস ক'রে কোন লাভ হবে না।

যেহেতু মহারাজের জন্যেই এত বড় সর্বনাশ থেকে বেঁচে গেছেন ওঁরা—সেহেতু তাঁর কথার ওপর আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। তবে সর্ববাদী-সম্মত ভাবে পুনিয়াকে শাসিয়ে দেওয়া হ'ল যে এই কুকুরের পাল আর এখানে রাখা যাবে না—কালকের মধ্যেই সব বিদায় করতে হবে, নইলে তাঁরা কুকুর-গুলো তো মারবেনই, পুনিয়াকেও পুলিসে দেবেন। এতগুলো সাক্ষী আছে, জেল কেউ আটকাতে পারবে না ওর।

পুনিয়া এর একটিও প্রতিবাদ করল না, দয়া ভিক্ষা কি কোন রকম আর্জিও জানাল না—নীরবে মাথা হেঁট ক'রে গিয়ে নিজের ঝোপড়ায় ঢুকল। মনে হ'ল—এই প্রথম—একেবারেই নির্বাক হয়ে গেছে সে।

পরের দিন সত্যিই আর কুকুরগুলোকে দেখা গেল না। সেই সঙ্গে পুনিয়াকেও না।

ঘর—এবং ঘরের সামান্য যা তৈজসপত্র, মায় শতছিন্ন কাঁথার সেই মলিন

বিছানাটাও—যেমন তেমনি পড়ে আছে, বাসনপত্র—একটি জিনিসও নিয়ে যায় নি। বোধ করি কুকুরগুলোকে সামলে নিয়ে যেতে অন্য কিছুই আর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

কোথায় যে গেল—কি ভরসায় তা কেউ জানে না। এমন কি নাতি কীর্তিয়াও না। সে এ দু'দিন বাড়ি ছিল না, কিছুই জানত না—এখন এসে শুকনো মুখে সবাইকে জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতে লাগল, পরিচিত স্থায়ী বাসিন্দা এপাড়ার যারা—কিন্তু কেউই তাকে কোন সদুত্তর দিতে পারল না। কেউ জানে না, কাউকেই বলে যায় নি পুনিয়া—সে কোথায় এবং কি ভরসায় যাচ্ছে।

দুর্জ্ঞেয়

রাধানাথবাবু বছর পাঁচেকের জন্য বদলি হয়েছিলেন বেরিলিতে। সেখানে সরকার থেকে বড় বাসা দেবার কথাও হয়েছিল কিন্তু তিনি তা নেন্ নি। প্রধান কারণ বাবা—বুড়ো মানুষ, তিনি কিছুতেই অ-গঙ্গার দেশে যেতে রাজী হলেন না। অবশ্য তিনি বারবারই বলতে লাগলেন যে,—'সে কি কথা—বৌমাকে নিয়ে যা, নইলে সেখানে তোর বড্ড কষ্ট হবে। আমি একটা চাকর নিয়ে বেশ থাকতে পারব।'

কিন্তু তাই বলে তো আর সত্যি-সত্যিই বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধকে চাকরের হাতে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। তিনি যদি তার হাতে খেতে রাজী থাকতেন—এমন কি কোন পাচক ব্রাহ্মণের হাতেও খেতে রাজী হতেন তো কথা ছিল। তিনি নিজে এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবেন—এটা রাধানাথবাবু বা তাঁর স্ত্রী রত্নমালা কেউই সঙ্গত বলে বোধ করলেন না। বরং একটি এক্সপার্ট চাকর তাঁরই সঙ্গে গেল—সেখানে রাঁধাবাড়া কাজকর্ম সবই করতে পারবে। আর এলাহাবাদ থেকে বেরিলি তো বেশী দূর নয়। ছুটিতে ছুটিতে আসা-যাওয়াও করতে পারবেন।

রাধানাথবাবুর ছেলেপুলে ছিল না—তাই ব'লে সংসার খুব ছোট নয়। তাঁর ভাইয়ের তিন ছেলেমেয়ে এখানে থেকেই স্কুলে পড়ে—কারণ ভাই

থাকেন বার্মায়, সেখানে পড়াশুনোর খুব অসুবিধা। ভগ্নিপতি পিলভিটের ডাক্তার—তাঁর মেয়েটিকে এখানে রাখা দরকার। সুতরাং রত্নমালার সংসারটিও বেশ বড়সড়, কাজের অন্ত নেই। এক-একদিন তিনি নিশ্বাস ফেলারও সময় পেতেন না। সেদিক দিয়েও এখানকার বাসা ভেঙ্গে দেবার একটা অসুবিধা ছিল।

রাধানাথবাবু পাঁচ বছর পরে তদ্বির-তদারক ক'রে আবার এলাহাবাদে ফিরে এলেন। না এলেও চলে না, কারণ বাবার এখন-তখন অবস্থা। ফিরে এলেন কিন্তু সঙ্গে তাঁর সেই পুরোনো চাকর রামলখিয়া নেই—কী যেন এক দুর্বিনীত আচরণের জন্য জবাব দিয়েছেন রাধানাথবাবু। সে নেই—কিন্তু আর একটি প্রাণী সঙ্গে আছে। একটি দুবছরের শিশু।

এ নাকি ওঁরই অফিসের এক সহকর্মীর মেয়ে। মেয়ের বাবা-মা একই দিনে মাত্র বাইশ ঘণ্টার তফাতে মারা যায়—কলেরা হয়ে। আর কেউ ছিল না ওদের, তাই রাধানাথবাবু নিজের কাছে নিয়ে এসে রেখেছিলেন। ওখানে দেখত রামলখিয়া আর একটি দাই। এবার এখানে নিয়ে এসেছেন—রত্নমালার কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন যে—রত্নমালা একবার ওকে কোলে তুলে নিলে আর কিছু ভাবতে হবে না।

ফুটফুটে পদ্মফুলের মতো মেয়েটি!

সবাই কোলে তুলে নিয়ে আদর করল। রত্নমালাও প্রথমটা কোলে করেছিলেন—তারপর নামিয়ে দিয়ে গুটিকতক প্রশ্ন করলেন। তাঁর কণ্ঠ অস্বাভাবিক রকমের নীরস।

'ওর বাপেরা কী জাত—খোট্টা না বাঙালী?'

'ইয়ে—বাঙালী বৈকি!'

'কী জাত?'

'জাত? জাতের কথা তো মানে—। হাঁা, জাত—কেন, আমাদের ব্রাহ্মণ!'

'তা ওর কি আর কেউ কোথাও নেই?'

'না।'

'তাহ'লে ওদের সংসারের জিনিসপত্রগুলো কী হ'ল? সে সব কে নিলে? অফিসের টাকাকড়ি? ওর মায়ের গহনা?'

রাধানাথবাবু বিব্রত হয়ে উঠলেন। খানিক যেন আমতা আমতা ক'রে

বললেন, 'সে রকম লোক ঢের আছে বৈকি।...ঐ তো ওর কে দূর-সম্পর্কের ভাই না কে এসে মুখ-অগ্নি করল। কিন্তু তাদের রকম-সকম ভাল নয়। আমি তাই ছাড়লুম না মেয়েটাকে। এর পর যদি মেরে ফেলে?'

'কিন্তু তারা ছাড়ল কেন?...এর পর মেয়ে বড় হয়ে যদি বিষয়ের জন্যে নালিশ করে?'

'নাঃ! সে রকম কিছু নেই।'

'তাহ'লে তারা শুধু শুধু মেয়েটাকে মেরে ফেলত—এমনটাই বা ভাবছ কেন?'

এবার রাধানাথ বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'তুমি অত জেরা করছ কেন বলো দিকি? তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?'

কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন রত্নমালা। তারপর বললেন, 'রামলখিয়াকে তাড়ালে কেন?'

'সে আর বলো না। ব্যাটার বড্ড মুখ হয়েছিল এদানীং। কথায় কথায় চোপা। সেদিন আর সহ্য হ'ল না—দিলুম গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে—।'

'এতদিনের লোক, বিশ্বাসী লোক। কাজটা ভাল হয় নি। তোমার ওখানে গিয়েও তো এতকাল রইল। সামান্য চোপা করার জন্যে তুমি তাড়ালে?'

'কি করব। কিছুদিন ধরেই বেগ্ড়াচ্ছিল—কিছু বলি নি। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে!'

কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে রত্নমালা আবার রামলখিয়ার প্রসঙ্গ তুললেন, 'আচ্ছা ওর বাড়ি তো এই দেহাতেই কোথায়, তা একবার খোঁজ করলে হয় না?'

'কেন? কী দরকার? চাকরের অভাব আছে?'—বেশ একটু যেন রেগেই ওঠেন রাধানাথ।

'না—ওর বাক্সটা পড়ে রইল তাও তো নিতে এল না!'

'গরজ থাকে আসবে। আমাদের কী গরজ?'

এসব প্রসঙ্গ ঐখানেই চাপা পড়ল। রত্নমালা মেয়ের প্রসঙ্গও আর তুললেন না। মেয়েকেও অযত্ন করলেন না—অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই তারও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা চলতে লাগল—একই ছাঁচে, একই ধারায়।

মেয়ের নাম রেখেছিলেন রাধানাথবাবু 'পঙ্কজা'। সে নাম পাল্টে

রত্নমালা রাখলেন 'কমল'।

বললেন, 'পঙ্কজা নামটা একেবারে জন্ম ধরে টানে। পাঁকে পদ্মফুল ফোটে ঠিকই, তবু সরোজ, শতদল—এসব নামগুলো হ'ল কেন? কমলই থাক, ডাকতে সুবিধে। মানে তো ঠিকই রইল—কমল বরং আরও মিষ্টি!'

মেয়ে মানুষ হ'তে লাগল বাড়ির পাঁচটা ছেলেমেয়ের সঙ্গেই। কিন্তু তবু এ কথাটা ক্রমে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে দেওর-পো দেওর-ঝি বা ভাগ্নীর প্রতি রত্নমালার যত টান—কমলের প্রতি ততটা নয়। বরং যেন কেমন একটু বিদ্বিষ্ট ভাবই। বিশেষত রাধানাথ ওকে আদর করছেন দেখলে রত্নমালা যেন জ্বলে যেতেন। অথচ তাঁর এ বিদ্বেষ বা ঈর্ষার কোন কারণও কেউ খুঁজে পেত না।

রত্নমালার স্নেহের অভাব পুষিয়ে দিলেন রাধানাথবাবুর বাবা। তিনি কমলকে যেন একটু বেশীরকম ভালবেসে ফেললেন। শেষ দু'তিনটে বছর বুড়ো সর্বদা ওকে কাছে ডাকতেন, আদর করতেন। মরবার আগে তাঁর নিজস্ব আট হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিয়ে গেলেন কমলের নামে। কমল কুড়ি বছর বয়স হ'লে সেই টাকা পাবে।

রত্নমালা সে খবর পেয়ে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'ভীমরতি! বজ্জাতি বুড়োর! চিরকালটা আমার সেবা নিলেন—মরবার সময় যথাসব্বস্ব দিয়ে যাওয়া হ'ল ঐ বেজাত কুজাতের মেয়েকে! কেন, আমরা ওঁর কী অনিষ্ট করেছিলুম?'

যে রত্নমালা এই দীর্ঘকাল শিশুপুত্রের মতো শ্বশুরের সেবা ক'রে এলেন—মরবার পরও নানা অকথা-কুকথা বলতে তাঁর বাধল না। এমন কি শ্রাদ্ধের সময়ও নানা দিক দিয়ে অসহযোগ করতে লাগলেন। এতে সকলেই অল্প-বিস্তর বিস্মিত হ'ল। রত্নমালার যে এত অর্থলোভ আছে তা কেউ জানত না।

রাধানাথবাবুর রিটায়ার করার সময় হ'ল। তিনি স্থির করলেন চাকরি গেলে কলকাতাতে গিয়ে থাকবেন। বাঙালীর ছেলে বাঙলা দেশে থাকাই ভাল। তিনি চাকরি থাকতে থাকতেই লোক লাগিয়ে দিলেন—ছোটখাটো একটি বাড়ির খোঁজে। ভাড়াবাড়িতে থাকার ইচ্ছা নেই, ছোটখাটো একটি নিজস্ব কুঁড়ে করা দরকার।

বাড়ি একটা পাওয়াও গেল মনের মতো। ঘরে সুবিধা—আলো বাতাস আছে।

রত্নমালাকে ডেকে সংবাদটা দিতে গেলেন রাধানাথ। রত্নমালা সব শুনে শুধু বললেন,—'বাড়ি যেন আমার নামে কেনা হয়। নইলে আমি সে বাড়িতে উঠব না।'

'তার মানে?'—অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন রাধানাথ—'কেন আমার বাড়ি কি তোমার বাড়ি নয়?'

রত্নমালাও পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন—'আমার বাড়িও কি তোমার বাড়ি নয়? তোমার নামে বাড়ি কিনে তুমি ঐ মেয়েটার নামে উইল ক'রে দিয়ে যাবে, সেটি হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, ওর ওপর তোমার অত রাগ কেন বল তো! অনাথা মেয়েটাকে কি তুমি হিংসে করো?'

'করি বৈকি। সম্পূর্ণ অনাথা হ'লে করতাম না। তুমি আছ যে!'

'তার মানে?'

'বুঝে ছাখো।'

'তুমি কি ভাবছ যে ও আমারই মেয়ে। ওখানে গিয়ে কিছু করেছি আমি, তারই ফল?'

'হ'তেও তো পারে—'

রাধানাথবাবু বিষম ব্যস্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন,—'তুমি বুঝি এই সন্দেহ করেই মেয়েটাকে বিষনজরে দেখছ? তাই বুঝি ওর ওপর তোমার এত বিদ্বেষ? তুমি যে-কোন দিব্যি গাল্‌তে বলো আমি গালছি, আমি বামুনের ছেলে এই পৈতে ছুঁয়ে—'

'ছি!'—রত্নমালা ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন,—'পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি গাল্‌তে নেই। আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করেছি? কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসল—তাই তো আমার রাগ!'

রত্নমালা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। আবারও বললেন, 'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ!'

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। রাধানাথবাবু রিটায়ার করার পর বেশীদিন

বাঁচেন নি। কলকাতার বাড়ির নিচেটা ভাড়া দিয়ে ওপরে থাকেন রত্নমালা।

কমল কলেজে পড়ছে। কমল আর একটি দেওর-ঝি ওঁর কাছে থাকে। কমলের বিয়ের কথা উঠছে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু দানা বাঁধছে না।

রত্নমালাও বিশেষ উৎসাহ দেখান না। প্রশ্নটা উঠলে উদাসীনভাবে বলেন, 'ও মেয়েকে কে আর নেবে বলো—জাত-কুল কিছুই জানি না। কলেজে পড়ছে, এর পর নিজেই দেখেশুনে নেবে কাউকে। টাকার তো অভাব নেই—ঠাকুরদার টাকা সুদে-আসলে দশ-হাজারের ওপর পৌঁচেছে। আর না হয় চাকরিবাকরি ক'রে খাবে। বিয়ে যে দিতেই হবে তার মানে কি!… আমি তা ব'লে মিছে কথা বলে, মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বিয়ে দিতে পারব না।'

রত্নমালা তাঁর বাড়ি এবং নগদ টাকাকড়ি সবই দেওরপোদের লেখাপড়া ক'রে দিয়েছেন—একথা সবাই জানে। কমল শুধু যতদিন খুশী এ বাড়িতে থাকতে পাবে—এবং যদি তার বিয়ে হয় তো বিয়ের সময় দু হাজার টাকা পাবে—অথবা এ বাড়ি যদি তার আগে বিক্রী হয়ে যায়—তা'হলেও ঐ পরিমাণ টাকা তাকে দিতে হবে। এর বেশী নয়।

কমলের প্রতি রত্নমালার মনোভাব সত্যিই দুর্জ্ঞেয়। আদর-যত্নের ত্রুটি হয় না তার। খাওয়া-পরার তো নয়ই। শাড়ি ও গহনা চাইতেও হয় না—তার আগেই পায়। অথচ যখন-তখন ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে জন্মের খোঁটা দেন রত্নমালা এবং কিছুতেই কোন কারণে মা বলতে দেন না। বহুবার কমল ওঁকে মা বলবার চেষ্টা করেছে—দেওরের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বড়মা বলে ওঁকে—কিন্তু কমলের ওপর কড়া হুকুম—তাকে মাসিমা বলতে হয়!

এইভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ রত্নমালা রোগশয্যায় পড়লেন। নানা রকমের জটিল রোগ—মাস-কয়েক ধরেই ভুগলেন।

কমল কলেজ কামাই ক'রে সেবা করতে যায়—কিন্তু রত্নমালা জোর ক'রে তাকে উঠিয়ে দেন। কোনমতে তাঁর স্নেহ যাতে ওর প্রতি না পড়ে—এই যেন তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা—ঐকান্তিক তপস্যা।

অবশেষে একদিন রত্নমালা বুঝলেন যে তাঁর আর দেরি নেই। তিনি দেওরকে ডেকে পাঠালেন টেলিগ্রাম করিয়ে।

দেওর আসতে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বললেন,—'ঠাকুরপো—আমি জানি

তুমি নির্লোভ। তাই আমার কোন চিন্তা নেই। তোমাকে আমি একটি দুরূহ কাজের ভার দিয়ে যেতে চাই। আমার যা ছিল—তোমার দাদাও মন্দ পয়সা রেখে যান নি—সবই আমি তোমাকে দিয়েছি উইল ক'রে। সে উইল আর পাল্‌টাতে চাই না। কিন্তু কমলের ওপর বড় অবিচার হয়েছে। আমি ওকে যা দিতে পারি নি তা অপরে দিয়েছে, এই বিষে জ্বলে মরেছি। তাইতেই এতবড় অবিচারটা করতে পেরেছি আমি। তোমার দাদার টাকা—তাঁর ইচ্ছা ছিল কমলই সব পায়। আমার ভয়ে শুধু পারেন নি দিয়ে যেতে। তুমি ওকে কিছু দিও।···আর, আর কমলই যেন আমার মুখাগ্নি আর শ্রাদ্ধ করে।'

'কেন বল তো বৌদি। টাকা ওকে আমি নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু শ্রাদ্ধ কেন ওকে করতে বলছ। কী জাতের মেয়ে তার ঠিক নেই—অনাত্মীয় তো বটেই।'

হাসলেন রত্নমালা।

'দীর্ঘকাল ঠকিয়েছি সবাইকে—সেই সঙ্গে নিজেকেও বঞ্চিত করেছি ঠাকুরপো। কিন্তু আর নয়। ও তোমারই ভাইঝি। ওঁর সন্তান থাকতে অপরে কেন আমার মুখাগ্নি করে।···ওঁর সন্তান জানতুম বলেই সারাজীবন জ্বলেছি আর দুহাতে ঠেলে ওকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। সতীন-কাঁটা যে।···কিন্তু মরণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার সে সব গেছে—আর ঠকাব না কাউকে।'

'কিন্তু এ তো তোমার অনুমান বৌদি!'

রত্নমালা হেসে বললেন, 'ঠাকুরপো, তোমার দাদার বাঁ কানের পিছনে একটা আঁচিল ছিল মনে আছে?'

'আছে বৈকি। আমারও আছে—এই যে! দিদিরও ছিল।'

'দু'বছরের মেয়ে এনে যখন উনি আমার কোলে দিলেন তখন আদরেই বুকে টেনে নিয়েছিলুম কমলকে। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ নজরে পড়ল—বাঁ কানের নিচে, অতি সূক্ষ্ম তখন, তবু ভুল হবার নয়।···সেই যেন চোখে কে আগুন ছড়িয়ে দিল। সে আগুন ছড়িয়ে গেল সারা দেহে-মনে। আর সে আগুন নিভল না। তোমরা কেউ লক্ষ্য করো নি, চুলে ঢাকা থাকে—কোন ছুতোয় দেখো—সন্দেহ ঘুচবে। মেয়ের সুখের জন্যে উনি পৈতে ছুঁয়ে মিছে কথা বলতে প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু আমি তা বলতে দিই নি। সে পাপ থেকে ওঁকে বাঁচিয়েছি।'

রত্নমালা যেন ক্লান্ত হয়েই দু চোখ বুজলেন। শুধু বন্ধ দুই চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কে জানে, মৃত স্বামীর কাছেই মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন কিনা।

অধিকার

গোবিন্দ নাম, পাড়ার লোকে তার সঙ্গে একটা শব্দ যোগ ক'রে বলত গবাগোবিন্দ ; কেউ কেউ হাবা গোবিন্দও বলত। প্রকাশ্যেই বলত, তার সামনে যে একটু রেখে-ঢেকে বলার প্রয়োজন আছে তাও মনে করত না। আসলে সে যে শব্দ দুটোর অর্থ বুঝবে, তার কোন প্রতিক্রিয়া জাগবে বোঝার ফলে—এটা কারও মাথাতেই যেত না।

লোকটিকে দেখেছি আমি, এখনও হয়ত বেঁচে আছে। ও পাড়া ছেড়েছি বহুকাল, তাই ঠিক বলতে পারব না আছে কিনা, থাকলেও কি অবস্থায় আছে। যে গল্প লিখতে বসেছি তার সবটা আমার প্রত্যক্ষ দেখা বা শোনা নয়, পরে কিছুটা লোকমুখে শুনেছি। আর গল্প লিখতে বসলে সবটা সত্যি কেউ লেখেও না। আজকাল ফটোতেই রঙ করার রেওয়াজ হয়েছে। কথাতেও যথেষ্ট রঙ চড়ালে কাহিনী হয়। তবে মোটামুটি বেশীটাই সত্যি ; এটা চুপি চুপি বলছি, বিশ্বাস করতে পারেন।

আমরা যে পাড়ায় থাকতুম, সেটাকে মিশ্রিত পল্লী বলা চলে। দেখেছেন বৈকি আপনারাও, শেয়ালদার দক্ষিণে রেলের ধারে—বস্তিতে আর পাকাবাড়ির সারিতে জড়াজড়ি। অবশ্য চার নম্বর পোলের ধারে যে বস্তি কটা চোখে পড়ে আমাদের বাড়ির পাশের এই বস্তিটা ঠিক সে রকম নয়। একটু ভদ্রমতো। টিনের দেওয়াল দেওয়া ঘর। টিনের কি খাপরার চাল। মেঝেটাও পাকা। আবার অন্য রকমও ছিল। চেরাবাঁশে মাটি ধরানো দেওয়াল—খাপরার চাল এমন বস্তিও একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সে এদিকটায় তত নেই। লাইনের ধারেই বেশী।

গোবিন্দরা যে ঘরে থাকত সেটা এই 'মেজ' বস্তির শ্রেণীতেই পড়ে। কিন্তু আর এক হিসাবে গোত্রছাড়াও বটে। এটা ঐ বড় টানা বস্তিটা থেকে

বিচ্ছিন্ন। একটা আলাদা টুকরো যেন। একটা কচ জমির কোণা—হঠাৎ পেয়ে গিছল বস্তির মালিক, দুটো ঘর তুলে নিয়েছে। তাতে এই মহলের প্রজারা যে একটু বেশী সুখে আছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। জায়গাটা বড় বস্তির পিছনের দিক, যত খাটা-পাইখানা খাটবার দরজা এই দিকে—তার ওদিকে বড় কাঁচা নর্দমা, পগারের মতো, সর্বদাই ভটভট করছে নোংরা জলে আর পাঁকে। তার ওপর, এদের যাতায়াতের পৃথক কোন পথ নেই, কারণ এ জমির তিন দিকেই অপরের জমির পাঁচিল—ঐ পগার বা কাঁচা ড্রেনের ওপর তিনখানা বাঁশ ফেলে পুলের মতো করা, তার ওপর দিয়েই এদের যাতায়াতের রাস্তা। কাঁচা মেঠো পথ, একটু জল পড়লেই পিছল হয়ে যায়—কল একটা দেওয়া আছে, তার জল বাঁধানো নালা বেয়ে ঐ পগারে পড়ার কথা, কিন্তু বেশিটাই পড়ে ঐ পথে ও তার দুপাশের ফালি জমিটুকুতে। ফলে বারো মাসই কাদা হয়ে থাকে, দুর্ভোগের অন্ত নেই।

এরই একটা ঘরে থাকে গোবিন্দ। কিন্তু জাতে ওরা বামুন। দেখতেও খুব একটা খারাপ নয়। রংটা তো বেশ ফরসা। তবে একেবারেই বোকা—সত্যি সত্যিই হাবা যাকে বলে। ভাল ক'রে কথাও বলতে পারত না। জিভ জড়িয়ে একটা আধো আধো উচ্চারণ হ'ত, ট ঠ তো উচ্চারণই হ'ত না কোনকালে—বলত, 'সালাতা দিন তোতো কলে হাঁতছি!' আমাদের কথাও বুঝতে পারত না সব, বোকার মতো তাকিয়ে থাকত হাঁ ক'রে (মুখে লাল পড়ত সেই সময়টায়), আর হাবার মতো হাসত। অর্থহীন বোধহীন অকারণ হাসি। একটু বেঁটে ধরনের গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, গায়ে জোরও ছিল, সেই গুণেই বেঙ্গল পটারীতে একটা চাকরি পেয়েছিল। বোধ হয় কোন সাদা পাউডার জাতীয় জিনিসের বস্তা বইতে হ'ত—কেন না, বিকেলে বাড়ি ফিরত যখন প্রায়ই দেখতুম ময়দার মতো মিহি কী একটা সাদা সাদা গুঁড়ো ওর সর্বাঙ্গে—দূর থেকে দেখলে মনে হ'ত একটা সাদা মানুষ আসছে।

ওদের এই অপকৃষ্ট অবস্থা, কিন্তু ওর এক কাকা বিলাসবাবু বেশ ভাল চাকরি করতেন। আপন কাকাই নাকি। অবশ্যই তিনি ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না, কোন খোঁজ-খবরও করতেন না, তিনি থাকতেনও বহুদূর উত্তর প্রান্তে। নিজের বাড়ি, একটা গাড়িও ছিল, তবে সেটা শোনা যায় আপিসের, ব্যবহার করা যায়, মালিকানা নেই।

সম্পর্ক না রাখুন, সেটা অস্বীকার করবেন কি ক'রে? তাঁর কাছে গিয়েই গবার মা একদিন কেঁদে পড়ল, 'তোমরা মাথার ওপর থাকতে আমার খোকার একটা বে হবে না ভাই?...আমার তো ঐ একটা। তোমার দাদার বংশ লোপ হবে যে শেষ পজ্জন্ত। আর আমিও তো চিরকাল থাকব না। ওকে কে দেখবে? ঐ তো হাবাগোবা ছেলে। ক্ষিদে পেলে বুঝতে পারে না। ওকে একটু দেখবে না, একেবারে ভাসিয়ে দেবে? যতই যা হোক, বোকা-সোকা আধপাগলা—তোমার দাদার ছেলে তো, বংশের বড়ছেলে।

এই বলে তিনি একটু কেঁদে দেওরের দুটো হাত চেপে ধরলেন।

বিলাসবাবু যে বেশ একটু বিচলিত হবেন তাতে আর সন্দেহ কি! তিনি যেন একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তুমি নিশ্চিন্তি থাকো, এই সামনের বোশেখেই আমি গবার বে দোব!'

দিলেনও তিনি তাই।

গবার বিয়ে হচ্ছে, বৌ আসবে—কথাটা শুনছিলুম কদিন আগে থেকেই। কোন মেয়ের কপাল ভাঙল এ নিয়ে একটা আলোচনাও শুরু হয়ে গিছল। তাই বলে বিলাসবাবু যে এই কাণ্ড করবেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি কেউ। অবশ্য উনি যে ঠিক কি করছেন তা কেউই জানত না এ পাড়ার। সম্বন্ধ এলে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছেলে দেখাতেন, গবাকে শাসন ক'রে দিতেন সে যেন নিজের নাম বলা ছাড়া একটি কথাও না বলে। বৌদিকে শান্তিপুরী থানধুতি পরিয়ে সামনে বসিয়ে রাখতেন, কন্যাপক্ষের যা কিছু প্রশ্নের উত্তর ওঁরাই দিতেন আগ-বাড়িয়ে। যাতে গোবিন্দর কথা বলার দরকার না হয়। হাঁ-হুঁ বললেও তো বিপদ—লাল ঝরে পড়বে সকলের সামনে।

এসব কথা আমরা পরে শুনেছি।

তখন যেটা শুনলুম—হঠাৎই একদিন—গবারা কদিনই এখানে ছিল না, দোরে তালা দেওয়া দেখেছি সব সময়ই—গবার বিয়ে বৌভাত সব সারা, আজ বৌ নিয়ে এখানে ফিরবে।

কৌতূহল ছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু সে কৌতূহল প্রকাশের আর বয়স নেই আমার। ভাইপো-ভাগ্নেরাই ছুটে গেল বৌ দেখতে—তাদের মুখে সব শুনলুম পরে। তবে বৌ আসাটা আমার জানলা থেকেই দেখা গেল। ওদের

ঘরের সামনে গাড়ি আসা সম্ভব নয়, ওদিকের বস্তির মধ্যে দিয়ে সেই পগার বা কাঁচা ড্রেনের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে বৌকে আসতে হ'ল বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে। গাড়িটা ট্যাক্সি নয়, বাড়ির গাড়িই—ট্যাক্সি হলে ঐ কাঁচা ড্রেনের সামনে পর্যন্ত আসত না—মেজ ভাইপো দীপু বললে, গবার কাকার গাড়ি নাকি, এর আগেও এসেছে, ও জানে। ওরা সবাই দেখেছে।

গবার বিয়ে হচ্ছে শুনে দুঃখিত হয়েছি, দুঃখিত হয়েছি মেয়েটার জন্যে—কিন্তু বিস্মিত হই নি। এদেশে কার বিয়েই বা আটকায়—কোন ছেলের ? যে যেমন তার মাপের বৌ হলে কিছু বলারও থাকে না। কিন্তু গাড়ি থেকে গবার সঙ্গে যে নামল, তাকে দেখে কিছুক্ষণের জন্যে যেন পাথর হয়ে গেলুম। এ কে ! এ কি সত্যিই গবার বৌ, না আর কেউ এল ওদের বাড়ি ? কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হবে ! ঐ তো গবার মাও নামল, কে একটা লোক ওদের গাড়ির পিছন থেকে ট্রাঙ্ক স্যুটকেস বাসনের ঝুড়ি নামাচ্ছে—সদ্য বিবাহিতের অবশ্য সাক্ষী—মাথার ওপরের ক্যারিয়ার থেকে শতরঞ্চি জড়ানো বিছানাও।

তাছাড়া—ছেলেরা ঠিক আসল খবরগুলিই বার ক'রে নেয় পাড়ার, ভুল হয় কদাচিৎ। এবারও তারাই এসে খবর দিয়েছে, দুপুরবেলা আসবে গবা বৌ নিয়ে—সে সময়টাও তো মিলে যাচ্ছে। আর গবার সঙ্গে অন্য কোন ভদ্রলোক তার বৌ মেয়ে পাঠাবে ? বিশেষ-আত্মীয়রাও তো ইতস্তত করবে। না, এ অন্য কেউ আর হতে পারে না।

কিন্তু তাই বলে এই মেয়ে গবার বৌ !

কেউ কি ছিল না সাতকুলে যে, যে-কোন একটা অন্য পাত্র ধরে দেয়।

মুটে মজুর, এমন কি রাঁধুনী বামুনও তো এর চেয়ে শতগুণে ভাল।

না পেলে—গঙ্গায় তো জলের এত অভাব হয় নি এখনও—সুপাত্রের মতো ?

সুন্দর মেয়ে এতটা বয়সে দু'চারটে দেখেছি বৈকি। কিন্তু এমন সুন্দরী বাঙালীর ঘরে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেই যে পুরাণে আছে—তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে নিখুঁত সুন্দরী তিলোত্তমা তৈরী হয়েছিল—এ সেই রকমই অবিশ্বাস্য রকমের সৌন্দর্য, যা সহসা চোখে পড়লে কিছুক্ষণের জন্যে যে কোন পুরুষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, অকারণেই বুকের মধ্যে একটা নাম-

না-জানা যন্ত্রণা অনুভব করে মানুষ—অপার্থিব অবাস্তব বলে মনে হয় সে মেয়েটাকে।

শুধু তাই নয়—আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখতেই অনেক কিছু নজরে পড়ল। এ শহরের মেয়ে—পাকা বাড়িতে বাস ক'রে এসেছে এতকাল। বস্তি দেখেও নি হয়ত এর আগে, দেখলেও দূর থেকে দেখেছে, ট্রেনে বা গাড়িতে ক'রে যেতে যেতে। যে রকম আতঙ্ক-বিহ্বল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, যেভাবে ভয়ে ভয়ে সেই তিনখানা বাঁশের সাঁকো পার হ'ল—তাতে এই ধারণাই সমর্থিত হয়।

আরও মনে হ'ল, যার তার বা ভিখিরীর হাতে দেবার মতোও অত দুরবস্থা নয় ওর বাবার। গায়ে মোটামুটি গহনাও সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি—চুড়ি হার বালা কানের গহনা—এখান থেকেই এক নজরে চোখে পড়ল। পরনের বেনারসী শাড়িখানাও জ্যালজেলে নয়, অন্তত এই দূর থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে তাই মনে হয়। ট্রাঙ্ক, দানের বাসন—কোনটাই দেনো বা খেলো মনে হচ্ছে না। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে যেমন দেয়, তেমনিই দিয়েছেন তাঁরা।

বিয়ের ইতিহাসটা বার করতেও দীপু কেলো ওদের বেশী সময় লাগল না। ওদের ঐ বস্তির কি আশপাশের পাকাবাড়ির ভাড়াটে সমাজ—সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। মেয়েদের সঙ্গেও সহজ মেলামেশা—কেউ কাকা, কেউ মাসী কেউ বৌদি। সুতরাং পাড়ার খবর সংগ্রহ করতে অসুবিধা হবার কথাও নয়।

মেয়ের বাবার—যা শুনলুম—সত্যিই এত খারাপ অবস্থা নয় যে, তিনি জেনেশুনে এই রকম পাত্রে দেবেন। তা তিনি দেনও নি। এক মাঝারি মার্চেণ্ট অপিসে কাজ করেন, সংসার বড় বলে তেমন বড়মানুষী দেখাতে পারেন না—নইলে মাইনেও একেবারে যৎসামান্য পান না।

আসলে মেয়েটি লেখাপড়ায় বেশীদূর যেতে পারে নি। যতটা রূপ দিয়েছেন ভগবান ততটা মাথা দেন নি। হয়ত বা সেই জন্যেই দেন নি। একদিকে যখন যথেষ্ট মূলধন দিয়েছেন—জীবনের পাথেয়—তখন আর এক-দিকে না-ই দিলেন, এই বোধ হয় ছিল তাঁর হিসেব। স্কুল ফাইন্যাল ফেল ক'রে ঘরে বসে ছিল সরমা—গবার এই বৌ। এই অবস্থাতে বিলাসবাবুর ঘটক গিয়ে এই সুপাত্রটির খবর দেয়। বিলাসবাবু ঘটককে আগাম বকশিশ দিয়ে

রেখেছিলেন, কবলেছিলেন আরও বেশী। ঘটক বলেছিল, বিলাসবাবু ধনী ব্যক্তি সে তো সবাই জানে, ভাইপোও বংশের সেই মান রেখেছে। সে বেঙ্গল পটারীর ফোরমান, যাদবপুর থেকে ইলেকটি ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে—ডিপ্লোমা কোর্স অবশ্য—কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার হ'লেই বা এর চেয়ে বেশী কি করত? দেখতেও সুন্দর, খাঁই বেশী নেই, মেয়ে পছন্দ হলে দরদস্তুরে আটকাবে না। সরমার বাবা হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিলেন। বিলাসবাবুদের গাড়ি চেপে দেওর সঙ্গে মা মেয়ে দেখতে গেছেন, ওঁরাও দেখেছেন এসে বিলাসবাবুর বাড়ি। ধরেই নিয়েছেন একান্নবর্তী পরিবার। বিলাসবাবু কারখানায় ঠিক কি কাজ করেন সুকৌশলে সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন, কন্যাপক্ষ ঘটকের কথা অবিশ্বাস করার কোন হেতু দেখেন নি। আগে থাকতে সতর্ক হওয়ার ফলে গোবিন্দ যে মূর্খ—তার চেয়েও সাংঘাতিক, হাবা—তা কেউই বুঝতে পারেন নি। মাত্র আটশ টাকা নগদ, সাধারণ বরাভরণ, মেয়ের বারো ভরি সোনা—এতেই এমন পাত্র পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছেন।

এই হ'ল গবার বিয়ের মোটামুটি ইতিহাস।

পাড়ায় চাঞ্চল্য উত্তেজনা উঠেছিল বৈকি!

সরমা যদি এতটা সুন্দরী না হ'ত—ইংরেজীতে যাকে Breath-taking beauty বলে—তাহলে হয়ত এমন উত্তেজনা দেখা যেত না; এক্ষেত্রে এই বিধাতার অবিচার ও মানুষের প্রবঞ্চনায় সবাই ক্ষেপে উঠল। উপযাচক হয়ে গিয়ে সরমার বাবাকে উপদেশ দিল নালিশ ক'রে এই বিয়ে খারিজ করাতে।

কিন্তু উৎসাহ উপদেশ পরামর্শ যতই দিক না এরা, কর্মক্ষেত্রে নামতে হলে সরমার বাবা সত্যবাবুকেই নামতে হ'ত।

তিনি সেকেলে ধরনের শান্তিপ্রিয় ভীতুপ্রকৃতির লোক—অদৃষ্টবাদী, এই শ্রেণীর লোক অদৃষ্টবাদীই হয়—ঝঞ্ঝাটে তাঁর বড় ভয়। তাছাড়া ব্যস্তও খুব, নিজের ও বিধবা বোনের মিলিত বিপুল সংসার চালাতে। আপিসের আয় খুব কম না হলেও তাতে কুলোয় না, তার সঙ্গে খুচরা উপার্জন যোগ করতে হয়। সময় অর্থ দুটোরই অভাব। তিনি কপালে হাত দিয়ে জানালেন, এ সব প্রারব্ধ, তাঁদের ও মেয়েরও। কপালে দুর্গতি থাকলে কে

খণ্ডাবে? এখন মামলা ক'রে এই বিয়ে নাকচ করতে গেলে বিস্তর সময় আর টাকার দরকার। কে করবে তাঁর হয়ে? বিলাসবাবু যে মিথ্যা বলে দিয়েছেন, তার তো কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। আদালতে মামলা দাঁড় করানোও শক্ত। আর মামলা জিতলেও, তারপর ও মেয়েকে নিয়ে তিনি কী করবেন? মেয়ে একজনের ঘর করেছে—তা সে যত অল্পদিনই হোক—তা জেনে কি কেউ বিয়ে করবে? করলেও বিনা পয়সায় করবে না। এই বিয়েতেই তাঁর যথেষ্ট দেনা হয়ে গেছে—নিজের এবং বোনের নিয়ে বাড়িতে আরও ছটা মেয়ে—একজনের জন্যেই বার বার সর্বস্বান্ত হলে বাকীগুলোর কি গতি হবে? এই তো এত সুন্দরী মেয়ে—সবাই বলছেন, দু বছর ধরে চেষ্টা ক'রেও তো ভাল পাত্র একটা জোটাতে পারেন নি সত্যবাবু—আবার কী ভরসায় ওকে ঘরে এনে তুলবেন? ইত্যাদি—

ফলে পরোপকার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার উৎসাহ সকলেরই স্তিমিত হয়ে এল। সরমা যথারীতি গবার ঘর করতে লাগল। বাসন মাজা ঘর মোছা রান্না করা, বাইরের কল থেকে সকলের স্নানাহারের জল তোলা—এবং শাশুড়ীর লাঞ্ছনা সহ্য করা—তার যা প্রাপ্য এবং করণীয় কোনটাতেই কোন ত্রুটি ঘটল না।

সেইটেই—দীপু কেলোদের মুখে শুনে—কষ্টের কারণ হ'ত বেশী। ঐ তো ভটভটে নর্দমার ধারে দুর্গন্ধের মধ্যে বাস, পুরাণ-পুঁথিতে যে নরকবাসের কথা আছে সেও বোধ হয় এর চেয়ে বেশী দুঃসহ নয়; তার মধ্যে দিবারাত্র পরিশ্রম—ভোরে উঠে বাসন মেজে উনুন ধরিয়ে রেঁধে দিতে হয় সাতটার মধ্যে—চা থেকে ভাতডাল সবই—গবার আটটায় ডিউটি—তারপর গুল দেওয়া ক্ষারকাচা গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেওয়া—এইসবে এক মিনিটের অবসর থাকে না সরমার। জলখাবারের কথা ভুলেই গেছে। সেটা অবশ্য এ বাড়িতে কেউই খায় না—বৌয়ের কথা বললে শাশুড়ী বলেন, 'কৌটোয় মুড়ি থাকে, ঘরে আটা আছে, রুটি গড়েও খেতে পারে—আমি কি খাও গো খাও গো ক'রে পিছু পিছু ঘুরব!'

সকাল সাতটায় যে ভাত নামে সেটাই খেতে বসে সরমা বেলা দেড়টায়—ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। শাশুড়ী নিজে খেয়ে নেন এগারোটার মধ্যে, বলেন, 'ও যে নিড়বিড়ে, এক ঘণ্টার কাজ দু ঘণ্টা লাগে ওর—নইলে এই কি

আর একটা কাজ, একখানা ঘরে থাকা আর ঐ তো চুড়ুর-বুড়ুর রান্না। তা ও যা পারে, যতক্ষণে পারে করুক—সময়ের তো আর অভাব নেই এ বাড়িতে—তাই বলে আমি ওর জন্যে তেতপ্পর বেলা পর্যন্ত টাঙ্গিয়ে থাকতে পারব না। যে ইচ্ছে ক'রে বেলা করবে, সে কড়কড়া ভাত খাবে, তার আমি কি করব!'

ভাত শুধু কড়কড়ে তাই নয়, গবার পাতে যদি দুটো-চারটে দানাও পড়ে থাকে তো সেও তুলে রাখবেন তার মা, সেই থালাতেই সেই ভাতের সঙ্গে নিজের ভাত বেড়ে খেতে হবে সরমাকে—গবার সেই অজস্র লালামাখা ভাত। দীপু বলে, সেই সময়ই ওর কান্না আর বাধা মানত না, চোখের জলেই ভাত পান্তা হয়ে উঠত।

বাজার হ'ত ক্বচিৎ কদাচিৎ। আপিস থেকে আসবার সময় যা দু'চার পয়সার আনাজ রাস্তার ধার থেকে কিনে আনত গবা—তাতেই চালাতে হ'ত। মাছ মাসে একদিন। কিন্তু তরকারি যাও বা রান্না হ'ত তা ছেলে আর ছেলের মা খেতেই শেষ হ'ত—বৌয়ের বেলা থাকত জলের মতো একটু ডাল আর হয়ত গাছকতক ডাঁটা।

মেয়ের বাবা দুঃখে লজ্জায় আসতে চাইতেন না। মেয়ের এই দুর্গতি দেখে দুঃখ হ'ত যত—নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে ততটাই লজ্জা। তিনি যে আসেন সেটা গবার মা'রও পছন্দ ছিল না। একদিন হঠাৎ এসে পড়ে মেয়ের ওপরহাতে পাখাপেটার কালসিটে দাগ দেখেছিলেন—সরমার মাখনের মতো চামড়ায় সে দাগ সহজে মেলায় না—কী দিয়ে সে ভাত খায় তাও চোখে পড়ে গিয়েছিল ঐ সময়েই। এর কোন অবস্থাই বিজ্ঞাপিত হওয়া ভাল নয়—এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল। তাই যাও বা গোড়ার দিকে দু-একদিন এসেছিলেন সত্যবাবু—ইচ্ছে ক'রেই অত্যন্ত রূঢ় ও অপমানজনক ব্যবহার করেছেন গবার মা। ফলে সত্যবাবুর মেয়েকে দেখতে আসার সাধ ঘুচে গিয়েছিল প্রায় চিরদিনের মতো।

অর্থাৎ আশা নেই আশ্রয় নেই আশ্বাস নেই আনন্দ নেই—সরমার জীবনে কোথাও আর কিছু রইল না। শুধুই এই বিপুল দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে যাওয়া—আর কষ্ট-লাঞ্ছনা সহ্য করা।

একটানা একটা অবিশ্বাস্য দুঃখের মধ্য দিয়ে কাটানো দিন ও রাত্রি।

তবু এর মধ্যেও প্রকৃতি তার কাজ ক'রে যায় বৈকি! হাবাই হোক আর হাঁদাই হোক, দৈহিক কামনা থাকবেই। বছর দেড়েকের মধ্যেই সরমার কোলে ছেলে এসে গেল একটি।

তাতে দুর্ভোগ আর দুর্গতি বাড়ল বই কমল না। নাতির আদর হলে তার গর্ভধারিণীরও আদর হবে, ন্যায়শাস্ত্রের এমন অনুশাসন নেই। শিশু পালনের সহস্ররকম কাজ—তার এতটুকু সাহায্যের চেষ্টামাত্র করেন না শাশুড়ী, পুত্রবতীর পুষ্টিকর না হোক, পেট পুরে খাওয়ারও কোন ব্যবস্থা করেন না। অমানুষিক পরিশ্রম আর ঐ কদর্য খাওয়া—ঈশ্বর-দত্ত স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলেই এতকাল সয়েছিল সরমা, এবার সে স্বাস্থ্যও জবাব দিল। শরীর ওর ভেঙে পড়ার উপক্রম হ'ল।

কথায় আছে গর্তের ব্যাঙকেও অবিরত খোঁচালে সে একসময় তেড়ে ওঠে, রুখে দাঁড়ায়। স্বভাবভীরু সরমাও একসময়ে কঠিন হয়ে উঠল—অন্তত একটা ব্যাপারে। একটি সন্তান হলেই গবার কামপিপাসা কমবে এমন মনে করার কোন হেতু ছিল না—কমেও নি। অথচ গর্ভনিরোধের জন্যে অর্থব্যয় করাটা বাজে খরচ বলে মনে হ'ত, তাছাড়া ওসব তার মাথাতে ঢুকত না। সেসব শিক্ষা তো ছিলই না। কিন্তু এইখানে সরমা একেবারে বেঁকে দাঁড়াল। না, আর নয়, এরপর সন্তান আর নয়।

এতদিন কটূক্তিবর্ষণ শাসন লাঞ্ছনাদি যা করবার গবার মা-ই করতেন; গবা কোনদিন তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। মার ওপর কথা বলার কথা সে ভাবতেও পারত না। তাছাড়া তার স্ত্রীকে শাসন করবার প্রয়োজনও হয় নি। খাওয়া এবং 'শোওয়া' চলে গেছে—স্বাভাবিক নিয়মে—এর বেশী মাথা ঘামানোর মতো মাথা তার ছিলও না। কিন্তু এবার সেও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল পশুর মতোই—আহার নিদ্রা জৈবমিলন, এছাড়া অন্য কোন চিন্তা বা ধারণার অস্তিত্ব ছিল না তার কাছে। শেষেরটার স্বাদ আগে পায় নি, এখন পেয়েছে। সেটা নিত্য প্রয়োজন—অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। জীবনধারণের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতে বাধা পেয়েই যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং যা সে এতকাল করে নি—দৈহিক নির্যাতন শুরু করল; আর এই জ্বালার কারণটা যখন গবার মা শুনবেন তখন তিনিও লাঞ্ছনা নির্যাতনের নূতন কারণ পেয়ে উল্লসিত উৎসাহিত হয়ে উঠবেন—সেও

তো জানা কথাই।

বৌ স্বামীর কাছে শুতে চায় না, আর ছেলে পেটে ধরতে রাজী নয়, এমন কথা তাঁর চৌদ্দপুরুষে কেউ কখনও শোনে নি। এসব ক্রিশ্চানীপনা তাঁর ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি সহ্য করতে রাজী নন। এ বিবিয়ানা ভদ্রগৃহস্থ ঘরের মেয়েরা মুখেও আনতে পারত না। এ তো পুরোপুরি বেশ্যাদের মতো কথাবার্তা আচার-আচরণ।

'ছেলে পেটে না ধরে গতর ভাল রাখবি কার জন্যে? বলি মেয়েদের শরীর তো সোয়ামীর ভোগের জন্যেই। তোকে কি ঘরে বাবু বসাতে হবে নাকি যে ফুলফুলে মুখখানি রাখতে হবে! এসব ছোটলোকপনা আমার এখানে চলবে না—সাফ বলে দিচ্ছি। খানকিবিত্তি চালাতে হয়—বাজারে গিয়ে নাম লেখাগে যা। আমরাও বাঁচি তুইও বাঁচ। হারামজাদী ঘরে এসে এস্তক আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল গা! সাতপুরুষ বজ্জাতের ঘরের মেয়ে এনে আমার ঘরের লক্ষ্মী যেতে বসেছে। বলে ধনেপুত্তুরে লক্ষ্মীলাভ—পুত্তুরই বাদ!'

সে হুঙ্কার ও গর্জন, আস্ফালন ক'রে তেড়ে যাওয়া, পাখার বাঁটের বাড়ি মারবার শব্দ—আমার ঘর থেকেই দেখা ও শোনা যেত।

সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল সরমার অনেকদিনই। তার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করারও শক্তি ছিল না। বোধ হয় কোন কারণও না। ভদ্রঘরের মেয়ে সতীধর্ম সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল যথেষ্টই—তবু সব জিনিসই নিরন্তর আঘাতে ক্ষয়ে যায়, সে ধারণাও যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! শাশুড়ীর সব কথাই সরমাকে এতাবৎ মানতে হয়েছে অনিচ্ছায়—শেষেরটা সে সম্পূর্ণ স্বইচ্ছাতেই মেনে নিল, বেশ ভেবে-চিন্তে সব দিক বিবেচনা ক'রে সত্যিই একদিন বাজারে নাম লেখাবার উদ্দেশ্যেই গৃহত্যাগ করল সে। কারও প্রলোভনে পড়ে বা কারও প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়। সুখে ও শান্তিতে এর থেকে স্বচ্ছন্দে থাকবে বলেই। পশুর জীবন নয়—মানুষের জীবনযাপন করবে বলেই চলে গেল। মহৎ জীবন নয় ঠিকই—স্বাভাবিক সাধারণ জীবনও যে তার কাছে দুরাশা।

বাপের বাড়ি আশ্রয় খুঁজে কোন লাভ নেই, শুধু শুধু তাদের বিব্রত করা—তাছাড়া বাবার সম্বন্ধে একটা সুগভীর অভিমানও বহুদিন থেকে তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়েছিল—সে কথা সে গোপনও করে নি। পাড়ায় ছোট ছেলে-

মেয়েদের মধ্যে যা দু'একটি শুভানুধ্যায়ী ছিল তার—বা বস্তির অন্য ভাড়াটেদের মধ্যে দু'একজন সমব্যথিনী—তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় সে অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর কোন বাবাই বোধ হয় এমন বিয়ে দেয় না মেয়ের, নিজের মূর্খতায় বা অজ্ঞতায় দিয়ে ফেললেও এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না। এ ব্যবহার যে করতে পারে তাকে বাবা বলে ভাবতে ইচ্ছা হয় না ওর।—ওর পরের বোনটির বিয়েতে বাবা নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, সে বাবার সঙ্গে নাকি একটা কথাও বলে নি, অকারণেই কটা বাসন টেনে নিয়ে রাস্তার কলে চলে গিয়েছিল, কলের ধারে মাটিতে বসে মাজতে শুরু করেছিল। বিয়েতে তো যায়ই নি। শাশুড়ীও পেড়াপীড়ি করে নি অবশ্য—কারণ গেলে লৌকিকতার প্রশ্ন উঠত।

সেই জন্যেই—বাপের বাড়ি বা অন্য কোন আত্মীয়ের কথা চিন্তা না ক'রে সোজাসুজি শাশুড়ীর তিরস্কার বাক্যার্থ মেনে নিয়ে বাজারেই গিয়ে উঠল সে।

সেই একরকম হারিয়েই গেল সরমা, আমাদের মধ্যে থেকে ভদ্র সমাজ থেকেই হারিয়ে গেল সে—চিরদিনের মতো। আমরাও কিছুদিন পরে ওপাড়া ছেড়ে দিয়েছি, নারকেলডাঙ্গার নতুন রাস্তায় বাড়ি ক'রে চলে এসেছি। আর থাকলেও—তার খবর পেতাম কি ক'রে?

তবে সে যে বেঁচে আছে—আত্মহত্যা করে নি—যা প্রথমটায় মনে হয়েছিল—বাঁচার জন্য অন্য পথ অন্য জীবন অবলম্বন করেছে—সে খবরটা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যেত। কেউ হয়তো তাকে দেখেছে মহার্ঘ্য বেশভূষায় সিনেমা থেকে বেরোতে; কেউ বা দেখেছে একটি মোটা, অনেক আংটি, সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার হার পরা বাবুর সঙ্গে সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঢুকতে—কেউ বা দেখেছে বালিগঞ্জের সম্ভ্রান্ত দোকানে শৌখিন শাড়ি কিনতে। একবার শুনলুম—পাড়ার সুরেনবাবু পূজোর সময় মুসৌরীর কুলড়ি বাজারে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে—সঙ্গে এক সাহেববেশী ভদ্রলোক।

খবর গবারও পাই বৈকি।

পরের বিয়েটা তো ও পাড়া ছাড়বার আগেই দেখে এসেছি। দেড় বছরের ছেলে রেখে চলে গিছল সরমা, তাকে মানুষ করা, গবাকে সাতটার মধ্যে আপিসের ভাত যোগানো—দীর্ঘদিন অনভ্যাসের পর—আর পেরে উঠছিলেন না ওর মা, তবু তো গবা উঠে চা করা, ছেলের কাঁথা কাচা, কয়লা ভাঙা—

অনেক কাজ ক'রে দিত। সুতরাং আবার বিয়ে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই গবার—এ সবাই জানত। দৈহিক প্রয়োজন তো আছেই, সংসারের প্রয়োজন আরও জরুরী। তবে কনে খুঁজতে নেমে দেখা গেল সত্যবাবুর মতো আহাম্মক মেয়ের বাপ বেশী নেই। শেষে অনেক কাণ্ড ক'রে কোন এক পূর্ব পাকিস্থানী কলোনী থেকে এক নিঃস্ব হাঁপানী রোগীর মেয়ে ঘরে আনতে হ'ল; সমস্ত খরচ দিয়ে, মাসে মাসে মেয়ের বাবাকে দশ টাকা দেবার অঙ্গীকার ক'রে। তাও পাড়ায় রটে গেল মেয়ে ব্রাহ্মণের নয়—এমন কি কায়স্থের ও নয়। যে পদবী ওদের তা ব্রাহ্মণেরও হয়, নমঃশূদ্রেরও হয়। কোন্ জাত কেউ সঠিক জানে না।

বিয়ের পরের খবরও মধ্যে মধ্যে পেয়ে যেতুম। কেলোদের ও পাড়াতেই জন্ম, এত বয়স অবধি ছিল, বন্ধুবান্ধব বেশির ভাগই ওখানে, সুতরাং বাস ছাড়লেও যাতায়াত বন্ধ হয় নি। তাদের মুখ থেকেই খবর মিলত।

গবার এ বৌ যেন সরমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত বেদনা আর অভিশাপ—মূর্তি ধরে এসেছে। প্রচণ্ড দজ্জাল—মুখরা প্রখরা দুই-ই। তাকে না শাশুড়ী না স্বামী—কেউই পেরে ওঠে না। সামান্য কিছু বলতে গেলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। লোকজন ছুটে এলে চিৎকার ক'রে এদের কীর্তির ফিরিস্তি দেয়। আগের বৌকে কি ক'রে জোচ্চুরি ক'রে এনেছিল দেওর-ভাজ মিলে—কী দুর্ব্যবহার ক'রে কুপথে যেতে বাধ্য করেছে তাকে—ইতিমধ্যে সে সব কথাই শুনেছে সে, প্রথমেই সে সব খবর সংগ্রহ করেছে পাড়া থেকে—সেই ইতিহাসকেই অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করত—সবিস্তারে রঙ চড়িয়ে বলত, সেই ভয়ে মা-বেটা বেশী কিছু শাসন করতে সাহস পেত না।

সংসারের চাকাও ঘুরে গিছল সম্পূর্ণ ভাবেই, এখন মাকেই ভোরে উঠে বৌ-ছেলেকে চা ক'রে দিতে হয়। উনুনে আঁচ দিয়ে বাসি পাট সারতে হয়। বৌ পরিষ্কার বলে দিয়েছে—'বাইরে ব্যাবাক লোক, রাস্তার কলের থেকে জল আইন্যা পাট-কাম আমি করতে পারুম না।'

অবশ্য গবার মা খুব সহজে হাল ছাড়ে নি। অনেক কৌশল, অনেক অন্তর-টিপুনি দিয়ে শাসন করার চেষ্টা করেছেন, নব নব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেছেন—কিছুই লাভ হয় নি। ইদানীং শুনছি বৌই রুদ্ররূপ ধারণ করেছে, হাতও উঠেছে তার, এমন কি স্বামীকে লাথিও মারে মধ্যে-মিশেলে। শাশুড়ী

ঝাঁটা খেয়েই হার মেনেছেন নাকি। আরও চুপসে গেছেন তিনি—বৌয়ের ভয়ানক ভয়ানক ভয় দেখানোয়। সে বলে, 'দোরে শেকল দিয়ে আগুন লাগাব ঘরে, তোদের পুড়িয়ে মারবো—বেশী কিছু করবি তো—।'

শুনতুম আর ভাবতুম—এ খবরটা যদি সরমার কাছে পৌঁছত, কিছুটা তৃপ্তি পেত অন্তত।

দেখা গেল খবর তার কাছে পৌঁছত। নিয়মিত না হলেও প্রায়ই পায় সে।

আমরাই সে খবরটা—সরমার খবর পাওয়ার খবরটা—পেলাম বরং অনেক পরে।

সরমা চলে যাওয়ার বছর আষ্টেক পরে।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে।

চন্দনযাত্রার সময় সেটা। রোজ বিকেলে জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি মদন-মোহন যান সেজেগুজে নরেন্দ্র সরোবরে জলবিহার করতে। বহু ভক্ত-সমাগম হয় সে সময়। আমিও সেই উদ্দেশ্যেই গেছি—সঙ্গে সঙ্গে চন্দনপুকুর পর্যন্ত না যাই, রওনা হওয়াটা অন্ততঃ দেখব।

আমি যখন পৌঁছেছি তখনও যাত্রার বহু বিলম্ব। সবে নাকি মূল দেবতার 'যাত্রাভোগ' লেগেছে। সে ভোগ সরলে তবে মদনমোহন রওনার তোড়জোড় করবেন্। এদিকেও দেরি, ওদিকেও দর্শন বন্ধ—অনেক দর্শনার্থীই নাট-মন্দিরের দরজার বাইরে সিঁড়ির দুদিকে পাথর-বাঁধানো জায়গাটায় বসে অপেক্ষা করছেন। আমিও গিয়ে এক ধারে বসলুম, আর বসে এদিকে চাইতেই প্রথম যার চোখে চোখ পড়ল সে সরমা—আমার থেকে মাত্র হাত-তিনেক তফাতে বসে আছে।

না, চিনতে কোন অসুবিধা নেই—সে চেহারা বঙ্গদেশ কেন ভারতেই এত সুলভ নয় যে দেখার পরও ভুলে যাবো। অনেকেই এই মন্দিরে বসেও হাঁ ক'রে চেয়ে আছেন। অল্প বয়সের সে আশ্চর্যরূপ পরিপূর্ণ হয়ে যেন আরও মধুর হয়ে উঠেছে। পরিপূর্ণ হয়েছে কিন্তু দেহের সীমা লঙ্ঘন করে নি। স্থির হয়েই আছে। ওকে দেখে স্থির-বিদ্যুৎ কথাটার অর্থ বুঝলাম।

সরমা বোধ হয় মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করল, তারপর হাত তুলে একটা নমস্কার

করে আস্তে সরে এল। বললে 'আপনি তো দীপুর কাকা নন্দবাবু—না? কতদিন ধরে ভাবছি আপনার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু কিছুতেই সাহসে কুলোল না। এ মুখ নিয়ে কোন লজ্জায় যাবো! যদি আপনি কথা না কন, যদি মুখের ওপরই দরজা বন্ধ ক'রে দেন—এই ভয়েই আরও—'

রূপের আঘাতটা মন-মাথা তখনও সামলে উঠতে পারে নি। আস্তে আস্তে বললুম, 'না না, তা কেন! ছিঃ! কী অবস্থায় তুমি বাইরে পা দিয়েছ সে কি আর আমরা জানি না! তুমি বলে তাই অতদিন তবু ঐ জানোয়ারটার ঘর করেছ, অন্য কোন মেয়ে পারত না।'

'পারত না কেন, আর একজন তো ঘর করছে।' ম্লান হেসে বলল সে।

'হ্যাঁ' সে পারে। ঐটে আমার একটু ভুল হয়েছে। বলা উচিত ছিল কোন ভদ্র ঘরের বা ভদ্র মেয়ে পারত না। সে কী করছে তা তো জান না, তোমার ওপর অত্যাচারের চারগুণ শোধ তুলছে সে।'

'জানি। খবর সবই পাই।'

'খবর পাও!' বিস্মিত না হয়ে পারি না।

'হ্যাঁ। এ শহরে—বিশেষ যার হাতে দরকারের বেশী পয়সা আছে—তার খবর যোগাড় করতে কতক্ষণ লাগে? ইচ্ছে থাকলেই যে কোন খবর পাওয়া যায়।'

'কিন্তু ওদের খবরের ইচ্ছে এখনও তোমার আছে, সেইটেই তো অবাক হবার মতো কথা। ও জীবন তো তোমার ভুলতে চেষ্টা করাই উচিত, ও তো দুঃস্বপ্ন একটা—'

'কিন্তু ছেলে? ছেলেটাই যে ওখানে পড়ে। সেই জন্যেই আরও চেয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বড্ড দরকার। কিছুতে সাহসে কুলোয় নি বলেই—' সঙ্কোচেই যেন কথাটা শেষ করতে পারে না।

হেসে আশ্বস্ত ক'রে বলি, 'এত খবর যখন রাখো তখন এটাও জানা উচিত যে বহু লোক প্রত্যহ আমার কাছে আসে—নানা দরকারে। তোমার সামনেই তো থাকতুম দেখেছ নিশ্চয়, কেলোদের কাছেও শুনে থাকবে। যত লোক আসত সবাই যে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা এমন কথা কে বললে?'

'দাদা, দাদাই বলছি অপরাধ নেবেন না—ছেলেটাকে কি কিছুতেই আমার

কাছে রাখা যায় না? দশ-এগারো বছর বয়স হয়ে গেল—লেখাপড়া কিছুই হচ্ছে না। শুনেছি ইস্কুলে পর্যন্ত দেয় নি, কর্পোরেশনের ইস্কুলে গিছল মাস-কতক—বই জোটে নি বলে তাও আর যায় না—পাড়ায় বস্তির বখা ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলে ঘুরে বেড়ায়। এই বয়েসেই হয়ত বিড়ি খেতে শিখেছে, হয়ত খারাপ গালাগালও সব—'

'কিন্তু তোমার পরিবেশই কি স্বাস্থ্যকর হবে ওর পক্ষে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা মনে করাতে হয়।

লজ্জায় অপমানে সুগৌর মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে। মাথা নামিয়ে বলে,' 'জগন্নাথের মন্দিরে বসে মিথ্যে কথা বলব না—দু'বছর আগে পর্যন্ত ঐ পাড়াতেই থাকতুম। কিন্তু এখন ইনি—মানে যে ভদ্রলোক আমাকে পালন করেন—আলাদা নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। একটি বামুনের মেয়ে আছে, রান্নাবান্না করে—সে-ই পাহারা দেয়, ঐ যে সঙ্গে এসেছে—আর একটি পুরানো বুড়ো চাকর—এই নিয়ে থাকি। উনি আসেন রাত দশটার পর—ভোরবেলা চলে যান। খারাপ কোন দৃষ্টান্ত দেখবে না সে। তাও বাড়িতে রাখব না ছেলেকে—ভাল কোন ইস্কুলের হোস্টেলে রেখে দেব—একটু-আধটু ছুটিছাটায় বাড়ি আসবে।'

'আমার মনে হয় এক্ষেত্রে এদের দিক থেকে কোন অসুবিধা হবে না। যা দিনকাল, একটা ছেলে পোষা তো সহজ নয়, ওরা বেঁচেই যাবে। ছেলের ঠাকুমারই এক টান থাকার কথা—বাপ তো জড়ভরত—তা ঠাকুমাও আর পেরে ওঠে না, খাটুনি কমলে খুশীই হবে বোধ হয়। তাছাড়া খরচের কথাটা তো আছেই। এ স্ত্রীর বাধা দেবার তো কোন কারণই নেই। একে সতীনের ছেলে, তায় গরিবের সংসারে বসে খাচ্ছে। আমার মনে হয়—ওদের গিয়ে বললেই ছেড়ে দেবে।'

'দেবে? দেবে দাদা?' হঠাৎ—হাঁ-হাঁ' করতে করতে সে দু হাতে আমার পায়ের ধুলো নিল। দেবমন্দিরে দেবতা ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করতে নেই—হয় সে জানে না—নয়তো আশায় আনন্দে দিশাহারা হয়ে গেছে।

কথাটার ঐখানেই শেষ হ'ল না। সরমা আমি যেদিন ফিরব শুনে নিয়ে সেই দিনই ফিরল। আর তার নিরন্তর তাগাদায় একদিন সত্যি সত্যিই

আবার ঐ পাড়ায় যেতে হ'ল।

রবিবার দেখেই গিয়েছিলুম। গাড়িতে সরমাকে বসিয়ে রেখে—যতদূর সম্ভব মাথায় ঘোমটা দিয়ে এক কোণে বসে রইল—আমি আর দীপু গেলুম সেই ছোট্ট পুলটা পেরিয়ে, গবাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। আমাদের দেখে তিনজনেই বেরিয়ে এল দরজার কাছে, মায় ছেলেটা সুদ্ধ তার ঠাকুমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। একবার মাত্র তার দিকে চেয়েই বুঝতে পারলুম সরমার আশঙ্কা কি নিদারুণ সত্য! ছেলেটার বোধ হয় মানুষ হবার, লেখাপড়া শেখার সম্ভাপনা কোথাও কিছুমাত্র নেই। আর কিছুদিন পরে যদি কারখানায় ঢোকাতে পারে গবা তো ভাল, নইলে পকেটমারদের দলে গিয়ে পড়বে হয়ত।

তবু সরমার বক্তব্যটা জানালুম ওদের, যতদূর সম্ভব মোলায়েম ভূমিকা ক'রে। মা ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়, হোস্টেলে রেখে ভাল ইস্কুলে পড়বে, মানুষ করবে—ইত্যাদি।

গবা একবার তার মা'র মুখের দিকে তাকাল, মাও গবার মুখের দিকে। কিন্তু তার কিছু বলার আগেই, যেন বোমার মতো ফেটে পড়ল গবার নতুন বৌ।

'কিসের জন্যে। কেন ছেলে দেব তাই শুনি! তার আস্পর্দাও তো কম নয়। ছেলের ওপর ভালবাসা উথলে উঠল একেবারে। দেড় বছরও হয় নি ছেলেটার, তাকে ফেলে গেছল, ত্যাখন এ ভালবাসা কোথায় ছিল! আমারা গু-মুত ঘেটে এত বড্ডা করলুম, সব ধকল-ঝক্কিটা পোয়ালুম, এখন উনি এসেছেন তৈরী ফসলটি ভোগ করতে! হায় হায়! আর তাও বলি, তার না হয় এত বিবেচনা নেই, লজ্জাঘেন্না সব ঘুচিয়ে দিয়ে তবে তো ও কাজ করেছে, সাথকপর লোক, আপনি কোন্ লজ্জায় এসব বলতে এলেন? সে আসতে পারল না, তাহলে জবাবটা ভাল ক'রে দিতুম। ঐ নদ্দমার পাঁক এনে মুখে দিতুম, তাতে থানা পুলিস যা হয় হ'ত।'

বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে পড়ে গেল, এই বৌটির আজও কোন ছেলেপুলে হয় নি। তাতেই—

তবু বুঝিয়ে বলতে গেলুম, 'দেখুন নালিশ-মকদ্দমা করলে কী দাঁড়ায় তা তো বলতে পারা যায় না, তার পয়সা আছে তার কাছে কিছুই না, আপনারা পারবেন মামলার খরচ টানতে? তাছাড়া—ছেলেটা তো এখানে থেকে একবর্ণও লেখাপড়া শিখছে না, এই বয়সেই তো দেখছি দস্তুরমতো বকে

গেছে—মিছিমিছি তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট করছেন কেন? যদি মানুষ হয়—একটা চেষ্টা তো সে করতে পারবে অন্তত। আর এত বিষয় তার—সেটা থেকেও বঞ্চিত হবে। আপনারা ওকে কি দিতে পারবেন সে জায়গায়?'

'পরিচয়। যতই যা হোক, এখানে থাকলে বামুনের ছেলে, ভদ্দর লোকের ছেলে বলে পরিচয় দিতে পারবে। ওখানে তাকে কী ঘরে কী পরিচয়ের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছেন? বড় হলে লোকে কি বলবে? অমুক বেশ্যার ছেলে, এই তো?' সগর্বে যেন কথাগুলো ছুঁড়ে মারে সে।

কী উত্তর দেব মনে মনে দ্রুত ভেবে নিচ্ছি—ড্রাইভার এসে পিছন থেকে জামার খুঁট ধরে টানল, 'ঐ মাজী ডাকছেন আপনাকে।'

বিস্মিত এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলুম গাড়ির কাছে।

দেখি সরমার দুই চোখ দিয়ে অবিরলধারে জল পড়ছে। সে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—'থাক দাদা। ওদেরই জিনিস, সত্যিই—ওদের কাছেই থাক। আমার—আমার সত্যিই এটা আস্পদ্দা। চলুন ফিরে যাই। মিছিমিছি অপমান। ছি ছিঃ, আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে! সেদিন অদৃষ্টের নমুনা তো দেখেই নিয়েছিলুম, সেদিন আমার মরাই উচিত ছিল।'

এবার হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল সে।

মজার গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী লোক জমছে দু'একজন ক'রে। আমি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে দীপুকে ইঙ্গিত করলুম উঠে পড়তে।

'দাঁড়ান!' বলে একটা হুঙ্কার উঠল পিছনে। দেখি সেই বৌটা, ছেলেটার হাত ধরে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

'এই চেয়ে ছাখ, ঐ তোর মা। আসল মা। যাবি ওর কাছে? অনেক পয়সা ওর। খুব সুখে-ভোগে থাকবি, নেশাভাং করে বেড়াবি দেদার, ফুর্তি করবি। যাবি?'

ছেলেটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে একবার আমাদের গাড়ির দিকে আর একবার পিছনে বাপ-ঠাকুমার দিকে তাকাতে লাগল।

ড্রাইভার ততক্ষণে ব্যাপার-গতিক বুঝে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে তাই রক্ষা, এ নাটক বেশী প্রলম্বিত হবার আর সুযোগ ঘটল না।

শুভ বিবাহ

প্রথম খবরটা খুবই ফলাও ক'রে কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিল—আপনারা অনেকেই পড়েছেন। পাঁচ-ছ'বছর আগের ঘটনা হলেও কারও কারও মনে আছে নিশ্চয়। কারণ সে সময় যথেষ্ট ঢাকঢোল বাজানো হয়েছিল ঘটনাটা নিয়ে। বাংলা দৈনিকের যে নিজস্ব সংবাদদাতারা সংবাদের জায়গায় কাহিনী পরিবেশন করার পক্ষপাতী, তাঁদের পক্ষে এইসব খবর দৈবপ্রেরিতের মতোই। এ সুযোগ তাঁরা ছেড়ে দেবেন তা সম্ভব নয়। বেশ কয়েকদিন ধরেই সংবাদসাহিত্য-জগতের নায়িকা হয়ে ছিলেন মানসী সোম। তাঁর জীবনী, তাঁর বাবা-মার জীবনী, তাঁদের তাবৎ ইতিহাস, কর্মস্থলের সহকর্মিণী মায় সেখানকার দাসীদের পর্যন্ত বিস্তারিত বিবৃতি ছাপা হয়েছিল। সবই কাব্য ও আবেগময়, সবই নাটকীয়—সুতরাং ভুলে যাওয়ার কোন কারণ নেই। ছবিও ছাপা হয়েছিল—একাধিক ; বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন ভঙ্গীর।

দ্বিতীয় খবরটি খুব সামান্য—সম্প্রতি বেরিয়েছে। চোখে পড়ার কোন কারণ নেই। সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের শেষে কিম্বা বাজার দরের পাদপূরণ হিসেবে ছাপা হয়েছিল কোন কোন কাগজে। বড় দু'একটা কাগজে আদৌ ছাপা হয় নি। কিন্তু সে খবরের কথা পরে বলছি। আগেরটা আগে সেরে নিই। তবে তারও আগে নায়কের একটু পরিচয় বোধ হয় দেওয়া দরকার। পরিচয় দেবার মতো বিশেষ কৃতিত্ব ছিল না, সেটা পরে অর্জন করল সে। সুবিমল দত্ত নাম, আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে, বছর দুয়েক আগে ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করার পর ও-পাট চুকিয়ে দিয়ে রকবাজী করত—এই তার যা পরিচয়। বাবা রেলের টিকিট-কালেক্টার—অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বেলেঘাটায় দুখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকতেন। টিকিটের অনুকল্প পয়সা, দুধ-মাছের ভাগ ইত্যাদি কুড়িয়ে-বাড়িয়েও যা আয় তাতে ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়াও কষ্টকর—প্রাইভেট টিউটার রেখে পড়ানো তো কল্পনার বাইরে।

এর মধ্যেই একদিন বন্ধুতে বন্ধুতে রেষারেষির ফলে একটি স্কুলের ছাত্র

খুন হ'ল, রাস্তার ওপর, সন্ধ্যার সময়—অনেকের চোখের সামনে। সে ঘটনার কথাও কাগজে বেরিয়েছিল, আপনারা দেখে থাকবেন। কেউ বলল মেয়ে নিয়ে আকচাআকচি, কেউ বা অন্য কারণ দিল। কিন্তু কারণ যাই হোক, সুবিমল আর তার ছোট ভাই সুশান্ত সেই খুনের দায়ে ধরা পড়ল। ওদের বাবা স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে মামলা লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সুবিমল বাধা দিল। জীবনে এই প্রথম বোধ হয় বাবার অবস্থা উপলব্ধি করল সে। প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, বহুলোক সাক্ষী, ছাড়া পাবে না কিছুতেই, মাঝখান থেকে বাবা সর্বস্বান্ত হবেন। এখনও দুটি ছেলের পড়ানো বাকী, তিনটি মেয়ের বিয়ে।

সে নিজেই অপরাধ স্বীকার করল। হ্যাঁ, অনেকদিন ধরেই রাগ ছিল ছেলেটার ওপর, বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না। সেদিনও আঁতে-ঘা-দেওয়া এমন একটা কথা বলেছিল যে রাগ সামলাতে পারে নি আর। লোহার ডাণ্ডাটা, ওদের পাশের বাড়ির ভাঙ্গা জানলার গরাদে—নিয়েই এসেছিল, প্রস্তুত হয়ে। ছোট ভাই জানত না কিছু, এমনি গোলমাল বেধেছে মনে ক'রে ছুটে এসেছিল, সুবিমলই খুনটা করেছে। মারবে ঠিক ভাবে নি, রাগের চোটে আঘাতটা মারাত্মক হয়ে গেছে। ইত্যাদি—

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই কথা বলে গেল সে। সুতরাং মামলা আর চালাবার কিছু ছিল না। আদালত সবদিক বিবেচনা ক'রে ফাঁসির হুকুম দিলেন না—তাই বলে খুব দয়াও করলেন না। কোল্ড্-ব্লাডেড্ মার্ডার—আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে এসে খুন করেছে—যাকে খুন করেছে তার মাত্র ষোল বছর বয়স, সে এমন কোন প্রোভোকেশন-এর কারণ হতে পারে না—যার জন্য এতখানি রাগের কোন যথার্থ কৈফিয়ত খুঁজে পাওয়া যায়; ভাল ছেলে, বিপুল সম্ভাবনা তার সামনে পড়েছিল, তার কথা চিন্তা করলে বিন্দুমাত্রও দয়া দেখানো চলে না; এই ধরনের অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন হাকিম।

পাড়ায় একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। যে খুন হয়েছে সে সুশান্তরই বন্ধু, এক ক্লাসে পড়ত। তার ওপর সুবিমলের রাগের কী কারণ থাকতে পারে? সুবিমলের নিজেরই বিরাট বন্ধুর দল ছিল, ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোন প্রয়োজন ছিল না। সবাই বলল—ছোট ভাইকে বাঁচাতে আর বাপকে

সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজের ওপর এই দায় তুলে নিয়েছে সে। এই একটি ঘটনায় পাড়ার বখা এবং রকবাজ ছেলে সুবিমল 'হিরো' হয়ে গেল। সকলেই বললেন, কার মধ্যে যে কী কোয়ালিটীজ থাকে তা কেউ বলতে পারে না, এমনি এক একটা চরম পরীক্ষার মুহূর্তে বেরিয়ে আসে, তখন আসল মানুষটাকে চেনা যায়। কেউ কেউ এমনও বললেন, এই ঘটনাই যদি শরৎ চাটুয্যে লিখতেন তোমরা বলতে গাঁজাখুরি, অবিশ্বাস্য। ওরে বাবা, তিনি যে এমনি অধঃপতিত, ব্রাত্য, ভবঘুরে নেশাখোর বিশ্ব-বকাটেদের মধ্যে মহত্ত্ব নিজে দেখেছিলেন, তাই সে কথা লিখতেও পেরেছেন।

এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গের কথা মানসী সোমের কানেও পৌঁছল। পৌঁছনোর কথা নয়—কারণ মানসীরা থাকে বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ায়, ঘটনাটা বেলেঘাটার। তবু পৌঁছল তার কারণ যে ছেলেটি খুন হয়েছিল সে মানসীরই মামাতো ভাই হ'ত—দূর সম্পর্কের।

এর আগে মানসী সুবিমলকে দেখে নি কখনও, নামও জানত না। ঘটনার পরেই বা দেখবে কখন, তবু এই 'হিরোইজ্‌ম্' তার মনে গভীর রেখাপাত করল। সে তখন স্কুল-ফাইনাল পাস ক'রে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, 'হিরো ওঅরশিপ' বা বীরপূজারই বয়স সেটা। সে মনে মনে সুবিমলের একটা চেহারাও কল্পনা ক'রে নিল। লম্বাচওড়া চেহারা, চওড়া বুকের ছাতি, মাজা-মাজা রঙ—মাথায় একমাথা অবিন্যস্ত চুল, চোখে দুর্বলদের সম্বন্ধে অপরিসীম করুণা।

এই ঘটনার বছর-দেড়েক পরে একদিন খবর বেরোল কাগজে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুবিমল দত্ত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে, আরও কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণও হয়েছে। অতঃপর সে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এখন থেকেই—নিজস্ব সংবাদদাতাদের চেষ্টায় সে খবরও পাওয়া গেল, একসঙ্গেই।

আসলে সুবিমল শুনেছিল—হাজতে থাকতেই যে, সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রমটা এড়াবার প্রকৃষ্ট পন্থা, বিশেষ অল্পবয়সী ছেলেদের পক্ষে—লেখাপড়ার আশ্রয় নেওয়া। সেই মনে ক'রে প্রথমেই লেখাপড়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল সে, এবং ইতিপূর্বে যে সব কারণে পড়াটা এগোয় নি, যথা—সিনেমা, খেলা,

রেডিও এবং আড্ডা—তার কোনটাই না থাকায় নির্বিঘ্নে পড়তেও পেরেছিল।

এই সময়ই মানসী মনে মনে তার এই কঠোর সংকল্প গ্রহণ করল, যদি কোন দিন সম্ভব হয়, এই সুবিমলকেই বিয়ে করবে সে, অন্যথায় চিরকুমারী থাকবে।

মানসীর বাবা অবশ্য এ প্রতিজ্ঞার কিছুই জানতেন না, মেয়ে বি. এ. পাস করার পরই পাত্র খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মানসী বাবাকে গিয়ে ধরল,—এখন থাক না বাবা, এম. এ-টা পড়ে নিই। অতশত বুঝলেন না তিনি, মেয়ের মনোভাব—সাধারণ মনোভাবই বাপেরা বুঝতে পারে না—এ তো অস্বাভাবিক, দু'চারবার মৃদু আপত্তি ক'রে রাজী হয়ে গেলেন। মানসী যথাসময়ে এম. এ. পাস করল। ইতিমধ্যে কাগজে ছোট্ট একটি খবর লক্ষ্য ক'রে রেখেছে সে—সুবিমল আই. এ. পাস করেছে, বি. এ.-র জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এবার আর তার কোন দ্বিধা রইল না, বাবা এক বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ারকে পাত্র ঠিক করছেন খবর পেয়ে সোজাসুজিই গিয়ে বলল,—এখন বিয়ে করা আমার হবে না বাবা, যদি ভগবান কখনও দিন দেন, আমিই আপনাকে বলব। পাত্র আমার ঠিক করাই আছে, কিন্তু সেও এখন হতে পারবে না।

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। তবু তখনও ভেবেছিলেন পাত্র ওর সহপাঠী কেউ, এমন তো আকছারই হচ্ছে, উপার্জন করতে শুরু করে নি বলেই দেরি হবে—কিম্বা অন্য কোন জাতের পাত্র, অথবা দুটোই—তিনি বললেন,—তা বেশ তো, কে সে পাত্র শুনিই না, সেটুকু বলতে দোষ কি? আমার এমন কোন প্রেজুডিস কি দেখেছিস যে অন্য জাতের পাত্র হলে আমি বিয়ে দেব না, আপত্তি করব?

তবুও সহজে বলতে চায় নি মানসী, প্রতিক্রিয়াটা কী হবে তা সে জানত। শেষে অনেক পীড়াপীড়ি বিশেষ মার কান্নাকাটিতে প্রকাশ করল নাম-ধাম-পরিচয়।

ওর বাবা এমন অবাক হয়ে গেলো যে প্রথমটা মুখে কথাই সরল না বহুক্ষণ, তারপর খুব খানিকটা হেসে নিলেন, বললেন,—'আমার পিসীমা বলতেন মেয়েদের বেশী পড়াতে নেই, মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা কথাটা এখন দেখছি সত্যি। তাকে বিয়ে করবি কি রে, খুনী আসামী, বিশবকা ছেলে—

তাকে চোখে দেখিসও নি আজ পর্যন্ত, তাকে তোর পছন্দ হ'ল। তাছাড়া তার তো যাবজ্জীবন জেল—কবে বেরোবে তার কি কিছু ঠিক আছে! যা যা, জ্বালাস নি বেশী, গুচ্ছের সিনেমা দেখে দেখে এইসব নাটুকে-পনা হচ্ছে!'

কিন্তু মানসী তার সঙ্কল্পে দৃঢ়, বললে,—'তুমি বেশ জানো সে খুন করে নি, ছোট ভাইয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, সে বাপ-মার বেশী প্রিয়—সে গেলে তাঁরা কষ্ট পাবেন এই জন্যেই সে স্বেচ্ছায় এই দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। আর বকাটে যে নয় তার প্রমাণ এই-ই যথেষ্ট, এতখানি স্যাক্রিফাইস যে করতে পারে, যার এতটা বিবেচনা বাবা-মা ফ্যামিলির জন্যে, সে আর যাই হোক বকা হতে পারে না। তা ছাড়া কাগজে তো দেখেইছ—টপ টপ একটার পর একটা পাস করছে সে। বি. এ. পাসও করবে তা আমি বেশ জানি। দেখা—না-ই বা দেখলাম, কানাখোঁড়া নয়—তাহলে জানতে পারতাম। ···আর যাবজ্জীবন এখন তো আর যাবজ্জীবন নয়—ম্যাক্সিমাম কুড়ি বছর, শুনেছি সৎভাবে থাকলে তার ঢের আগেই ছেড়ে দেয়। এ সময়টুকু অপেক্ষা করতে পারব। অনেকে তো বিয়েই করে না, ভেবে নাও আমিও চিরকুমারী রইলুম। তোমার অন্য ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সংসারী করো, আমাকে তোমরা খরচের খাতায় লিখে রাখো।'

এরপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হ'ল। কান্নাকাটি, রাগারাগি, চেঁচামেচি আত্মীয়-স্বজনদের আনাগোনা—বোঝানোর চেষ্টা, কিছুই বাদ গেল না। শেষে ওর বাবা ডাক্তার ডাকবার প্রস্তাব করলেন, স্নায়ুবিদ্‌ বা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ডাকা হবে কিনা—এই নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন মানসী প্রাণপণে ছুটাছুটি ক'রে ওর এক অধ্যাপকের চেষ্টায় এই চাকরিটা যোগাড় ক'রে ফেলল, ঝিনুকপাড়া ফকিরচাঁদ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ, মৌখিক কথা রইল যে দুতিন বছরের মধ্যে বি.-টি.টাও পাস ক'রে নেবে। মাইনে নিতান্ত কম নয়, ফ্রি কোয়ার্টার, ইস্কুলের ঝি-ই দুবেলা রেঁধে অন্যান্য কাজকর্ম ক'রে দেবে, তার জন্য তাকে মাইনে দিতে হবে না, দুবেলা খেতে দিলেই হবে।

বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সবাইকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে বিজয়গর্বে নিজের স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল মানসী। এক বান্ধবীর কাছ থেকে শ-দুই

টাকা ধার নিয়েছিল, যাবার পথে একেবারে বিছানাপত্র কিনে নিয়ে গেল।

অবশ্য তাতেই যে ওর বাবা-মা একেবারে হাল ছেড়েছিলেন তা নয়, চিঠিপত্র আনাগোনা অব্যাহত রেখেছিলেন। ওর ছোট বোন তো এসে মাস-দুই প্রায় ওর ঘরে কাটিয়ে গেল, সে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিল যে দিদিভাইকে রাজী করিয়ে তবে সে ফিরবে—কিন্তু দেখা গেল 'দিদিভাই'-এর প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়ভিত্তিক, তাকে অত সহজে টলানো যাবে না। মানসী নিজেই নিজেকে শবরী আখ্যা দিয়েছিল, বলত,—আমার এ শবরীর প্রতীক্ষা, দেখা যাক এ যুগের রামচন্দ্রকে পাই কিনা!

অবশ্য সে যুগের শবরীর মতো চুপ ক'রে বসে থাকার মেয়ে সে নয়। ত্রেতার শবরী বালিগঞ্জের এম. এ. পাস করা মেয়ে হলে বোধ করি অযোধ্যা পর্যন্ত ধাওয়া করত—মানসী জেলখানা অবধি চলে গেল। সুবিমলের সঙ্গে দেখা করবে সে, অনুমতি চাই।

সুবিমল এতশত জানত না। সে কোনদিন স্বপ্নেও আশা করে নি তার জন্যে কোন শিক্ষিতা ধনী-দুহিতা বসে তপস্যা করবে। জেলখানার 'মেজ সাহেব' যখন তাকে জানালেন যে এক মানসী সোম তার সঙ্গে দেখা করতে চায়—তখন সুবিমল একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, 'এ নামে তো কৈ কাউকে চিনি না, সে আবার কে? কী চায়?'

এ পর্যন্ত তার বাবা আর মা ছাড়া কেউ তার সঙ্গে কোন দিন দেখা করতে আসে নি, তাও এখানে আসার পর থেকে তাঁরাও আসতে পারেন নি। বাবাও তদ্বির ক'রে বিহারে বদলি হয়ে গেছেন, নইলে মেয়ের বিয়ে হয় না। পাস পান বটে কিন্তু যাতায়াতে অন্য খরচ আছে—সে তাঁদের সাধ্যের বাইরে। বাসা তুলে দেওয়ার ফলে ভাইরাও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সুশান্ত কোন্ কারখানায় চাকরিতে ঢুকেছে—কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ নেই আর। আগে এক-আধটা চিঠি আসত, এখন তাও আসে না।

সুতরাং এ কোথা থেকে কে এল—কিছুতেই ভেবে পেল না সুবিমল।

মেজসাহেব মুখ টিপে হাসলেন, বললেন,—'এম-এ পাস, গার্ল স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, বালিগঞ্জের মেয়ে—তোমাকে বিয়ে করতে চায়, দরখাস্ত করেছে জেলে থাকতেই বিয়েটা রেজেস্ট্রী হওয়া সম্ভব কিনা!'

'সে আবার কি? মাগীটা পাগল বুঝি? দোহাই স্যার, পাগলের সামনে আমাকে পাঠাবেন না।'

'চুপ চুপ, পাগল কি, শুনছ মাস্টারী করে!···আমাদের এক আণ্ডার-সেক্রেটারীর মেয়ে, দুঁদে লোক, ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন ভদ্রলোক, মেয়েটা বেঁকে দাঁড়াতেই তো হ'ল না। ওর ধনুর্ভঙ্গ পণ, তোমাকে পেলে তোমাকে বিয়ে করবে—নইলে করবে না। তোমারই তো ভাল হে ছোকরা, দেখতেও খারাপ নয়, রোজগার করছে, বড়লোকের মেয়ে, বাপ যতই বলুক কিছু কি আর দেবে না, অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা যাকে বলে।'

কিন্তু সুবিমল কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয় না। বলে,—'যতই বলুন স্যার, ওর মাথা খারাপ। আমাকে দেখল না জানল না, আমিও কখনও তাকে চোখে দেখলুম না—আমাকে বিয়ে করবে কি?···না না, স্যার আপনি বলে দিন, ওসব দেখাটেখা হবে না, আমি দেখা করতে পারব না।'

সাহেব বলেন,—'অমন হয় হে হয়—এখনও তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি, মনপ্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছি! গান শোন নি? দেখা করো না, দেখা করতে দোষ কি? তেমন ভায়োলেণ্ট পাগল তো নয়—মন্দ কি, যদি খেলিয়ে তুলতে পারো! অমন একটি তদ্বিরকারিণী থাকলে চাই কি চট্ ক'রে খালাসও হয়ে যেতে পারে—'

খুব আশ্বস্ত হয় না সুবিমল, যদিও শেষ পর্যন্ত দেখা করতে যেতেই হয়।···

মানসীকে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেল সে, এত কম বয়স—হেডমিস্ট্রেস শুনে ভাবতেও পারে নি। বেলেঘাটার গলির সেই রকবাজী জীবনে এই রকম শিক্ষিতা স্মার্ট মেয়েদের দূর থেকেই দেখেছে ওরা—আর টিটকিরি দিয়েছে। তারা সুদূর, ওদের আশা বা আয়ত্তের বাইরে বলেই টিটকিরি দিয়েছে—মেয়েদের গায়ের ঝাল মেটাবার মতো। এই রকম মেয়ে সত্যি-সত্যিই তাকে বিয়ে করতে চায়?···অবাক যেমন হ'ল, একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল তার। মাথা যে এর খারাপ সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র রইল না। তা নইলে এমন অসম্ভব কল্পনা মাথাতেই বা যাবে কেন? আরও ভয় হ'ল তার, এ মেয়ের সঙ্গে কি সে কোনদিন ঘর করতে পারবে? তাকেও শিক্ষিত ধরে নিয়েই মানসী তার সঙ্গে কথা কইছে, অর্ধেক কথা ইংরেজীতে বলছে, কিন্তু ওর

বক্তব্যের বারো আনাই তো সুবিমলের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। সে বি. এ পরীক্ষা দিয়েছে ঠিকই, হয়ত পাসও করবে—বাকী দুটো পরীক্ষা থেকেই বুঝে নিয়েছে যে যেমন-তেমন ভাবে পাস করতে গেলে খুব একটা বিদ্যার দরকার হয় না—কিন্তু তার থেকে যে এ মেয়ে ঢের বেশী লেখাপড়া জানে, সে কোন দিন এম-এ পাস করলেও এর শিক্ষার ধারে-কাছে পোঁছতে পারবে না! সারা জগৎ যেন এক মুঠোর মধ্যে, এমন ভাবেই কথা কইছে।

সুবিমল গম্ভীর হয়ে রইল সমস্তক্ষণ, কথা যখন কইল তখন বিজ্ঞভাবে, ধীরে ধীরে বলল। এসব পাগলামি ত্যাগ করতে বলল সে, তার মতো দাগী আসামীর সঙ্গে ওর মতো মেয়ের বিয়ে হয় না, হতে পারে না। তাছাড়া তার এখন ছন্নছাড়া জীবন, যদি কোনদিন ছাড়া পায়ও, কোথায় যাবে কী করবে তা কিছুই জানে না, এ অবস্থায় সে জীবনকে একটা ভদ্র মেয়ের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়াতে চায় না, নিজেরও কোন বন্ধনে যেতে ইচ্ছে নেই আপাতত। মানসী যেন আর এ নিয়ে মাথা না ঘামায়, সে তার বাপের পছন্দমতো বা নিজেরই পছন্দমতো একটি সৎপাত্র দেখে বিয়ে করুক, সুবিমল সর্বান্তঃকরণে এই চায়। তার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ (কথাটা বেশ ভারিক্কী শোনাল বলেই মনে হ'ল তার) রইল।

যদিচ সুবিমলের চেহারাটা মানসীর এতদিনের ধারণার সঙ্গে একেবারেই মিলল না, কোথায় সেই লম্বাচওড়া দরাজছাতি তরুণ যুবক, একমাথা ঝাঁকড়া চুল (অবিন্যস্ত ?)—আর কোথায় এই শ্যামবর্ণের পাকাটে ধরনের রোগা চেহারার লোক, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।—কিন্তু তবুও এই কথাবার্তাতেই মানসী আরও যেন বেশী ক'রে আকৃষ্ট হ'ল। এও তো সেই আত্মোৎসর্গেরই ব্যাপার, পাছে মানসী সুখী না হয়, পাছে তার বাবা-মা দুঃখিত হন, সেই জন্যেই এ সৌভাগ্য ও সুখ যেন জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে।

ফলে জেদ বেড়েই গেল মানসীর।

জেলের মধ্যেই বিয়ে করার অনুমতি পাওয়া যায় কিনা—প্রথমটা সেই চেষ্টাই করল দিনকতক। কিন্তু ওপরওলারা রাজী হলেন না। দুজনেই কয়েদী হ'লে না হয় হ'ত, এ একজন বাইরে থাকবে আর একজন ভেতরে, শুধু একটা রেজেস্ট্রী ক'রে লাভই বা কি ?

এই উপলক্ষে আরও বারকতক মানসী দেখা করল সুবিমলের সঙ্গে। আরও দু'একদিন গম্ভীর একটু রগচটা ভাব বজায় রেখেছিল সে, তারপর তারও যেন একটা নেশা লাগল। মানসীর চোখের তন্ময়তা দেখে তারও মনে হ'ল যে হয়ত কিছু অসাধারণত্ব আছে তার, এতদিন তার আত্মীয়রা বুঝতে পারে নি, এ শিক্ষিত মেয়ে বলেই চিনতে পেরেছে।

ক্রমশঃ মানসীর পূজা তার প্রাপ্য বলেই মনে করতে লাগল।

মানসী বিস্তর তদ্বির ক'রেও যখন রেজেষ্ট্রী বিয়ের অনুমতি পেল না, তখন সে অধিকতর সাফল্যের জন্য চেষ্টা করতে লাগল—অর্থাৎ সুবিমলের মুক্তির। প্রায় দশ বছর পূর্ণ হতে চলল তার জেল খাটার, এই সময়ে তার নামে কোন অভিযোগ নেই, লেখাপড়া করে নিজের চেষ্টায় বি-এ পাস করেছে সে, এখন তাকে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে মুক্তি দিতে পারেন। প্রথম দিনকতক কলকাতায় বিস্তর ছুটোছুটি করল সে, বিধানবাবুকে গিয়ে ধরল, তাতেও যখন কাজ হ'ল না, তখন দিল্লীতে গিয়ে মাসখানেক বসে থেকে স্বয়ং নেহেরুকে ধরল। নেহেরু ওর সঙ্গে কথা কয়ে বিস্মিত হলেন, মুগ্ধ হলেন ওর এই নিষ্ঠায়, প্রতিশ্রুতি দিলেন কী করতে পারেন দেখবেন। তবু তারও অনেক পরে—প্রায় বারো বছর জেল খাটার পর সুবিমলের মুক্তির হুকুম বেরোল।

ইতিমধ্যে মানসী বি. টি. পাস করেছে। অবশ্য তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, এম. এ-তে হাই সেকেণ্ড ক্লাস ছিল তার, অধ্যাপকরা চেষ্টা করেছিলেন তাকে কোন কলেজে লেকচারার ক'রে দিতে। তার যা আত্মীয়স্বজন, এমনিও একটা অধ্যাপিকার পদ পাওয়া খুব দুর্লভ হ'ত না। কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই সেদিকে যায় নি মানসী। কলকাতা তো নয়ই, কলকাতার কাছাকাছি থাকারও ইচ্ছে নেই তার। শহরের আত্মীয়সমাজে এই ব্যাপার নিয়ে নানা কথা শুনতে হবে, মফস্বল কলেজেও ঐ একই অবস্থা, সেখানে আবার শিক্ষিত ভদ্রলোকের গণ্ডী ছোট—প্রত্যেকটি কথাই অপরের সমালোচনার বিষয়বস্তু। তার চেয়ে এ বেশ আছে। বাসাটি ভাল, ভাড়া লাগে না, মেয়েরা তাকে ভালবাসে, শহরের মেয়েদের মতো বাচাল কি উদ্ধত নয়, লেখাপড়াতেও মন আছে। ওর যা আয় দুজনের সংসার ঢের চলে যাবে। বাজার তো এখানে করতেই হয় না—সব্‌জি ফল মাছ প্রায়ই কোন-না-কোন ছাত্রীর বাড়ি কিংবা সেক্রেটারীর বাড়ি থেকে আসে। সে যে খুব একটা আত্মত্যাগ ক'রেই

এখানে পড়ে আছে—সে বিষয়েও তারা সচেতন এবং কৃতজ্ঞ, সর্বোপরি এই শান্ত নির্জন স্থানে থেকে স্বভাবটাও হয়ে গেছে কুঁড়ে, এখন আর শহরে গিয়ে কলেজে পড়ানোর কথা ভাবতেই পারে না সে।

সুবিমল যখন ছাড়া পেল তখন একমাত্র মানসীই তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার বাবা এ খবর জানেন না, মা মারা গেছেন, ভাইদের খবরও জানা নেই তার, আর কাউকে তাই আশাও করে নি। মানসীর চেষ্টাতেই যে সে এত আগে ছাড়া পেল, মানসী যে অসাধ্যসাধন করেছে তার জন্যেই, সে কথাও শুনেছিল। সে জানতই যে মানসী অপেক্ষা করবে। ওরা দুজন কলকাতায় এসে সোজা রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলল—মানসীর কোন বান্ধবী বা আত্মীয়কে খবর দেয় নি সে, ইস্কুলের বৃদ্ধ সেক্রেটারী এসেছিলেন, ওখানকার স্থানীয় জমিদার, তিনি আর তাঁর সরকার সাক্ষী হবেন বিয়েতে। বিয়ে সেরে একটা হোটেলে যাওয়ার পর্ব চুকিয়ে একেবারে রওনা দিল ঝিনুকপাড়া। উৎসাহী সেক্রেটারীবাবুই তাবৎ খরচ দিলেন, সাহেবী হোটেলে খাওয়ালেন এবং ফার্স্ট ক্লাস-এর ভাড়া দিয়ে নিয়ে গেলেন ওদের। বাবা এ বিয়েতে রইলেন না বটে—কিন্তু এঁর জন্যে সে অভাবটা অত বুঝতে পারল না মানসী। কৃতজ্ঞতায় চোখ ছলছল করতে লাগল ওর, ভাগ্যে সে এ ইস্কুল ছেড়ে কলেজে পড়াতে যায় নি!

এ যুগের শবরী যখন তার রামচন্দ্রের মুক্তির জন্য দিল্লী কলকাতা ছুটোছুটি করছে—সেই সময়ই খবরটা ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছিল কাগজে কাগজে, ছবি বিবৃতি ইতিহাস—মায় পাত্রপাত্রীর নাড়ীনক্ষত্রর খবর বেরিয়েছিল। প্রথমটা মানসীর বাবা কিছু বিরক্ত হয়েছিলেন এই অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে—কিন্তু পরে বিজ্ঞাপনের মোহেই একটু যেন গর্বও অনুভব করেছিলেন, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে মেয়েটার মাথা বোধ হয় অতটা খারাপ নয়। তবে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন মানসীর জানবার সুযোগ ঘটে নি। সে নিজে নিরতিশয় তৃপ্তি পেয়েছিল এটা ঠিক, তার তপস্যা যে সার্থক হয়েছে—উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু খবরের কাগজের ঢাক একটা উপলক্ষে বেশীদিন বাজানো চলে না, সুতরাং এত কাণ্ড ক'রে যে বিয়ে সেটা যেদিন সত্যি-সত্যিই হ'ল—সেদিনের খবর কেউ টের পেল না! সুবিমলও খবরের কাগজের এই প্রচারের ব্যাপার শুনেছিল, পড়েও ছিল কিছু কিছু, আজ

জেলখানার দোরে ফুলের মালা না হোক—ক্যামেরা নিয়ে রিপোর্টাররা থাকবেন ভিড় ক'রে—ভেবে রেখেছিল, এই অনাড়ম্বর বিয়েতে সে একটু যেন ক্ষুন্নই হ'ল। দু'তিনবার অনুযোগও করল, 'কাগজে খবরটা দেওয়া হয় নি বুঝি! দেওয়া উচিত ছিল, ওরা পরে টের পেলে আপসোস করবে খুব।'

এই উচিতটা যে কার ছিল তা বোঝা গেল না, সুতরাং শ্রোতারা চুপ ক'রে রইল।

কলকাতা যাবার আগে তার ঘর—এখন তাদের ঘর—মোটামুটি সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল মানসী। সেক্রেটারী মশাইয়ের উদ্যোগে একটা ডবল তক্তপোশ এবং প্রশস্ত বিছানারও ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়তি চেয়ার টেবিল, ফুলদানিতে ফুল, তাকে নতুন কিছু পেপার-ব্যাক বই—কিছুরই অভাব ছিল না। ধূম-পানের অভ্যাস আছে কিনা সুবিমলের সেটা জানা না থাকায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই এক প্যাকেট সিগারেটও আনিয়ে রেখেছিল। সুবিমল ঘরে ঢুকে সাজসজ্জা দেখে একটু আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেও—এমন ঘরদোর আসবাব তার পৈতৃক বাড়িতেও ছিল না বলা বাহুল্য—যদিচ খাট একটা আনিয়ে রাখবে মানসী, খাট আর গদি, আশা করেছিল সে; তার একটা ধারণা ছিল যে, বিয়েতে পাত্রীপক্ষ খাট-বিছানা দেয়ই—টেবিলের ওপর সিগা-রেটটা দেখে যেন জ্বলে উঠল, 'এ কি, সিগারেট কে খাবে! বিড়ি, বিড়ি চাই আমার। কতকাল যে বিড়ি খাই নি, সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকে অভ্যেস করেছি—আর ওখানে শালা গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল একেবারে! সিগারেট তবু জেলার সাহেবের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ফাইফরমাস খেটে খুশী ক'রে পেতুম, দু'একটা চুরিও করেছি মধ্যে মধ্যে ডেস্কের মধ্যে থেকে, বাবুরাও দিত কেউ কেউ—কিন্তু বিড়ির তেষ্টা কি আর সিগারেটে মেটে! যাদের পয়সা আসত বাইরে থেকে তারা দেদার আনাত ওয়ার্ডারকে দিয়ে, আমাকে আর কোন্ শালা পয়সা দিচ্ছে বলো! যারা বিড়ি আনাত তাদের কাছে মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যেত না একটা, বলে মাগের ভাগ দিতে পারি—বিড়ির ভাগ দিতে পারব না!'

একটু কি স্বপ্নভঙ্গ হ'ল শবরীর? হলেও টের পেতে দিল না সে, বলল, 'আচ্ছা সে আমি আনিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ও নোংরা নেশাটা ছাড়তে হবে

আস্তে আস্তে। এখানে আমার স্বামী বিড়ি খেলে চাকরবাকররা অশ্রদ্ধা করবে।'

মনে মনে জপ করে সে, আজকের রাত বাসররাত তাদের, আজ কোন ছায়াকে ম্লান করতে দেবে না তাদের এত সাধনার মিলনকে।

ম্লান হয়ও না অবশ্য। অন্য শিক্ষিকারা এসে পড়েন, তাঁরা নিজেরাই যোগাড়যন্ত্র ক'রে একটা ভোজের আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন—মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে একঝুড়ি ফুল সংগ্রহ ক'রে ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেল, দুটো গোড়ে মালাও রেখে গেল—বিছানার পাশে একটা থালায়। খাওয়াদাওয়া হৈ-হুল্লোড়ে কখন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি হয়ে গেল, তা কেউ টেরও পেল না। প্রথমটা সুবিমল একটু গাম্ভীর্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রইল না। তার ফলে অন্য মহিলাদের ঠাট্টাতামাশার জবাবে যেসব ভাষা বেরোতে লাগল তার মুখ দিয়ে, তাতে রীতিমতো সঙ্কোচই বোধ করল মানসী। শিক্ষিত—বি.এ. পাস করেছে যখন তখন শিক্ষিত বৈকি—ছেলের মুখ থেকে এ ধরনের ভাষা বেরোয় তা সে জানত না। পাড়ার রকবাজ কেন, রাস্তার 'মোড়বাজ' অর্থাৎ চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে সব ছেলেরা আড্ডা দেয় তাদের সঙ্গেও মেশার বা কাছাকাছি যাওয়ার কখনও কারণ ঘটে নি মানসীর—তাই তার কানে যেন আরও বেশী আঘাত লাগে। তবু সে হতাশ হয় না, শুধু মনে মনে ভাবে, তার আরও একটা সাধনা বাকী আছে—স্বামীকে ভদ্র ক'রে তোলার।

মাস খানেক পরে কথাটা তোলে মানসী, 'জনার্দনবাবু মানে আমাদের সেক্রেটারী বলছিলেন, এখানকার ছেলেদের ইস্কুলে একটা পোস্ট নাকি খালি আছে টিচারের, জিওগ্রাফী আর অঙ্ক পড়াতে হবে নিচের ক্লাসে, সে কি তুমি পারবে? কী সাবজেক্ট ছিল তোমার—তাও তো জানি না।'

'রক্ষে করো বাবা, অঙ্ক আর ভূগোল—ও দুটো সাব্‌জেক্টকেই যমের মতো ভয় করেছি চিরকাল, কী ক'রে যে স্কুল ফাইনালে অঙ্কে পাস করলুম তা আমিই ভেবে পাই না।...তার পর থেকে তো মা বলে ত্যাগ করেছি অঙ্ককে। ওখানে য়্যাসিস্টাণ্ট জেলারবাবু আমাকে খাতা লেখার কাজ দিয়েছিলেন একবার—এমন ভুল হ'ল যে খাতাকে খাতাই বদলাতে হ'ল শেষ পর্যন্ত।... তাছাড়া ও মাস্টারী করা—গাধা পিটনো—ও আমার পোষাবে না। ওসব

চেষ্টা করো না।'

'মুশকিল, এখানে তো অন্য আর কাজও নেই। ইস্কুলে মোটে একটি ক'রে কেরানী থাকে—তা এখন যাঁরা আছেন তাঁরা দুজনেই বেশ শক্তসমর্থ—সে পোস্ট এর ভেতর খালি হওয়ার কোন চান্‌স্‌ নেই।'

'খালি হলেই বা নিচ্ছে কে? ইস্কুলের কেরানীগিরি তো আরও ওয়ার্স্‌! ছেলেরা যে চোখে দেখে জানি তো।···তাছাড়া এখন কিছুদিন আমি কাজকর্ম করতেও পারব না। জেলে কি শরীরের কিছু থাকে? এখন বেশ কিছুদিন লাগবে ধাক্কা সামলাতে।' তারপরই মুখখানা বিকৃত ক'রে কেমন এক রকমের ব্যঙ্গের সুরে বলে,—'কেন, এর মধ্যেই কি অসহ্য লাগছে নাকি? খরচায় টান ধরছে? জেলফেরত দাগী আসামী সহজে কোন কাজ পাব না জেনেই তো বিয়ে করেছিলে, এখন আবার কাজের জন্যে হাঁপিয়ে উঠলে কেন? আমিই তো তখন আপত্তি করেছিলুম, সাফ্‌ জানিয়ে দিয়েছিলুম আমার কিস্‌সু নেই, এক পয়সা কেউ দেবেও না—তখন তো খুব গলাবাজী ক'রে লেক্‌চার ঝেড়েছিলে—যেমন ক'রেই হোক খাওয়াব, আমার যা আছে তাতেই চলে যাবে।···এখনও তো এক মাস কাটে নি বাবা, এর মধ্যেই অরুচি ধরে গেল!'

'আমি কি তাই বলেছি। তোমারই বসে বসে বিশ্রী লাগতে পারে বলে—। পুরুষমানুষ কাজ না পেলে মনমরা হয়ে পড়বে ভেবেই—। শরীর খারাপ জেনেও কাজ করতে বলব আমি কি এমনি অমানুষ।'

বলতে বলতেই যেন চোখে জল এসে যায় মানসীর। সে সেটা গোপন করতেই ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই শুনতে পায় সুবিমল বলছে, 'কিচ্ছু বিশ্রী লাগবে না বাবা, অনেক দিন পরে একটু নিজের মতো থাকবার দিন পেয়েছি—এখন কিছুদিন তো হাত-পা মেলে থাকি।'

বিড়ির নেশাটা কমাতে পেরেছে মানসী—কিন্তু তার ফলে বিড়ির চেয়েও কড়া সিগারেট আনিয়ে দিতে হয়েছে, সে গন্ধটা আরও অসহ্য লাগে তার। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। সুবিমলের কথা বলার ধরণটাই যেন কেমন খারাপ হয়ে গেছে—এমন অন্তর্ভেদী কথা বলে, আর ভাষাটাও এমন—মনে মনে ইতর শব্দটার অনুকল্প অন্য কোন ভদ্র শব্দ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়—ইয়ে যে, আজকাল ওর আচরণের প্রতিবাদ করা কি তা নিয়ে কোন অনুযোগ

করাই ছেড়ে দিতে হয়েছে মানসাকে।

এখানে আসার পর মাস-তিনেক সত্যিই কোথাও নড়ল না সুবিমল। শুধুই খেয়ে ঘুমিয়ে চা সিগারেট খেয়েই কাটিয়ে দিল সময়টা। একটা সুবিধা—মানসীর তরফ থেকে—ও কারও বাড়ি বড় একটা বেড়াতে যেত না। সুবিধা এই জন্যে যে জনসমাজে সাধারণ আলাপের অভ্যাসটাই একেবারে চলে গিয়েছিল ওর, কথাবার্তা বলতে গেলেই যে শ্রেণীর ভাষা সহজে বেরোত মুখ দিয়ে, তাতে মানসী মনে মনে লজ্জায় মরে যেত।

হঠাৎ, এই তিন মাস পরে একদিন সকালে স্ত্রীকে বলল, 'গোটা-পাঁচেক টাকা রেখে যেও, আজ একবার শহরে যাব ভাবছি।'

অবাক হয়ে যায় মানসী, 'শহরে? হঠাৎ?'

'এমনিই। ঘুরে আসি একটু।'

'না, মানে যদি কোন জিনিসের দরকার থাকে তো আমি ভোলাকে দিয়েই আনিয়ে দিতে পারি, ও তো প্রত্যহই একবার যায় বিকেলে ডাক নিয়ে।'

হঠাৎ যেন খিঁচিয়ে ওঠে সুবিমল, 'কেন, আমি কি তোমার নজরবন্দী আছি নাকি? ওসব বাপু আমার পোষাবে-টোষাবে না—সাফ্ বলে দিচ্ছি, সরকারী জেল থেকে বেরিয়ে এসে মাগের জেলে আটকে থাকব—সে আমি পারব না। বলো, এখনই এই এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি। সে বান্দা আমাকে পাও নি যে দুবেলা দুমুঠো ভাত দিচ্ছ বলে কান ধরে ওঠাবে বসাবে।'

বেশ চেঁচিয়েই বলে সে, রান্নাঘরে ঝি মানসীর ভাত বাড়ছে তখন, তার না-শোনবার কোন কারণ থাকে না। লজ্জায় মরে যায় যেন মানসী, তাড়াতাড়ি পাঁচটা টাকা এনে সামনে রেখে বলে, 'কী সামান্য কথায় কি উত্তর যে দাও তুমি তার ঠিক নেই! ছি ছি, ঝি-চাকররা কি মনে করে বলো দিকি! তুমিই বলো শরীর খারাপ—তাই বলছিলুম যে যদি কোন জিনিস আনাবার দরকার থাকে তো আনিয়ে দিচ্ছি।'

'ওঃ, পয়সা দিয়ে ঝি-চাকর রাখব—তাকে সমীহ ক'রে কথা বলতে হবে, হোঃ!'

শহর পাঁচ মাইল মাত্র এখান থেকে, নিয়মিত বাস যাতায়াত করে, গিয়ে

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও ফিরে আসা যায়।

মানসী সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখল, সুবিমল তার আগেই ফিরে এসেছে। বেশ খুশী-খুশী ভাব, একটা হিন্দী ফিল্ম-এর গান ভাঁজছে গুনগুন ক'রে।

সকালের মেঘটা কাটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই মানসী বলল, 'কৈ, শহর থেকে কি আনলে?'

'কী আবার আনব, এমনি ঘুরে ফিরে এলুম খানিক। তোমার এই কুয়োর মধ্যে বসে বসে একঘেঁয়ে লাগছিল তাই—।'

তাতে পাঁচটা টাকার কী দরকার পড়ল, প্রশ্নটা ঠোঁটের ডগায় এলেও করতে সাহস করল না মানসী, আবার কি কটু কথা শুনবে কে জানে!

এর পর কদিনই ইস্কুল থেকে ফিরে কী রকম একটা বিজাতীয় গন্ধ পায় মানসী বাড়ির মধ্যে, ধরতে পারে না ঠিক। বাড়ির আনাচেকানাচে দেখে কিছু পচল কিনা—অথচ ঠিক পচা গন্ধ বলেও মনে হয় না। ঘর তো প্রায় সব সময়ই সস্তা কড়া সিগারেটের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবু তা ছাপিয়েও গন্ধটা যেন পীড়া দেয়। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কোন্ নেতার মৃত্যু উপলক্ষে দুপুরবেলাই স্কুলে ছুটি হয়ে গেল। সাধারণত এইসব ছুটিগুলোয় অফিসে বসে বকেয়া জমে-থাকা কাজগুলো সারে সে, সেদিন শরীরটা ভাল লাগল না, সোজা বাড়ি চলে এল। আর ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল, একটা চকচকে ছোট কলকেতে কী সেজে গাঁজার মতো টানছে সুবিমল।

'তুমি—তুমি গাঁজা খাও?' যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে মানসী।

'গাঁজা নয় ঠিক—দু'তিন রকম মিশোনো আছে, সুল্লা—সুল্লা জানো, তাও আছে।' বেশ নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয় সুবিমল। বলে, 'ওখানে থাকতে এক শালা ওআর্ডার এই নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, না ক'রে কি উপায় ছিল, নইলে এমন সব অত্যেচার করত—সে তোমাকে বলা যাবে না—। অনেক চেষ্টা করলুম কাটাবার—তিন মাস কোথাও বেরোই নি দেখলেই তো—কিন্তু আর পারা গেল না। এ-এই একবার, এসময় তো তুমি থাকো না—তাও বলো তো বাগানে গিয়ে না হয়—'

মানসী আর উত্তর দিতে পারল না, কথাই কইতে পারল না, কোনমতে

টলতে টলতে সেই ইস্কুলের জামাকাপড়েই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ আর হতাশা ও ব্যর্থতা সংযমের বা চক্ষুলজ্জার বাঁধ মানল না, বালিশে মুখ গুঁজে হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগল সে, বুকফাটা কান্না।

সেদিন রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হ'ল না, সুবিমলও ঘাঁটাতে সাহস করল না। প্রথম দিককার বেপরোয়া ভাবটা তার কেটে গেছে—এখন আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অনেকখানি—ইদানীং খাওয়াদাওয়ার জুৎ না হলে রীতিমতো স্ত্রীকে শুনিয়ে ঝির ওপর তম্বি করে সে—সুতরাং এখন একটু একটু ভয়ই করতে শুরু করেছে যেন স্ত্রীকে।

পরের দিন সকালে উঠে মানসীই প্রথম কথা কইল। সে এতদিনে চিনে নিয়েছে সুবিমলকে—মিছিমিছি রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে কোন লাভ নেই, পাঁকে ঢিল ছুঁড়লে সে পাঁক ছিটকে নিজের গায়েই আসবে আগে। সে বেশ শান্তকণ্ঠেই বলল, 'ছাখো, তুমি এবার কিছু কাজকর্ম করো, যা হয়। ছোটখাটো কোন ব্যবসা করতে চাও তো করো—সামান্য পুঁজির দরকার হয়, দু-এক হাজার, আমি দেব—না হয় যদি চাকরি করতে চাও তো তাও দেখতে পারি একে-ওকে বলে। টাকার দরকার বলে বলছি না, তোমার টাকা তুমিই রেখো—একটা কিছুতে এনগেজ্‌ড্‌ হয়ে থাকা দরকার। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—ছেলেবেলায় ইস্কুলে নিশ্চয় শুনেছ, কথাটা খুব খাঁটি কথা—'

'নাও, সক্কাল বেলা—এখনও পেটে কিছু পড়ল না, লেকচার ঝাড়তে শুরু করলে! লাও বাবা, একেই বলে মাগের ভাত! ঝাড়ু মারো এমন ভাতের মাথায়, আমারই ঝকমারি হয়েছিল তোমার মতো জাঁহাবাজ মেয়েছেলের ভাঁওতায় ভোলা—'

'ছাখো, যা বলো—আমিও আর তোমার ঐ ইতর কথার ভয়ে চুপ ক'রে থাকতে রাজী নই। যদি আমার কথা না শোন, আমি তোমার সামনে বসে উপোস ক'রে মরব বলে দিলুম।'

স্ত্রীর এ ধরনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নয় সুবিমল, সে একটু ঘাব্‌ড়ে গেল। খানিকক্ষণ গুম্‌ বসে থেকে বললে,—'ও চাকরি-বাকরি আমি করতে পারব না, টাইম ধরে যাওয়া আর পরের তাঁবে হেঁই-গো হেঁই-গো মশাই করা—

আমার ধাতে সইবে না। তাছাড়া কীই বা আমার বিদ্যেবুদ্ধি আর কীই বা সুপারিশ। ভাল চাকরি তো আর মিলবে না। দেখি দিনকতক শহরে বাজারে ঘুরি, কী করা-টরা যায় দেখি।'

বলল কিন্তু তারপরও আট-দশদিন নড়ল না কোথাও। ওর মেজাজের ভয়ে মানসীও তাগাদা দিতে সাহস করে নি প্রথম—কিন্তু দশ দিন কেটে যেতে অগত্যা বলতে বাধা হ'ল, 'কৈ, কী হ'ল তোমার শহরে যাওয়ার?'

'উঃ, ভ্যালা জ্বালা হ'ল তো দেখছি! দিনরাত খ্যাচখ্যাচানি ভাল লাগে না। বলি মানুষের শরীর-গতিক মনমেজাজ বলে একটা কথা আছে তো!'

আর কথা বাড়াতে সাহস করে না মানসী।

যাই হোক, তবু তাইতেই বোধ হয় কাজ হয় কিছু। দিন দুই পরে সত্যি-সত্যিই একদিন খাওয়া-দাওয়া ক'রে শহরে যায়, ফেরে একেবারে সন্ধ্যে নাগাদ। উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে মানসী, 'কী হ'ল, কি বুঝলে? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—অমনি একদিন আমি গেলুম আর ব্যবসাগুলো হাত জোড় ক'রে সার বেঁধে এসে দাঁড়াল—বাবুমশাই আমাকে ধরুন, আমাকে ধরুন! বাজার জিনিসটা কি আর এক দিনে স্টাডি করা যায়!'—আরও যা বলে তা না লেখাই ভাল।

কথাটা সত্যি। মানসীই যেন একটু লজ্জিত বোধ করে। চুপ ক'রে যায় সে।

এরপর দু'একদিন ছাড়া-ছাড়াই শহরে যেতে শুরু করল সুবিমল। ইদানীং আর পয়সা চাইতে হয় না, পুরুষমানুষ প্রত্যেক কথায় স্ত্রীর কাছে হাতখরচার জন্যে টাকা চাইবে সে বড় খারাপ দেখায়। মানসী আজকাল ওর হাতখরচা বাবদ মধ্যে মধ্যে পাঁচ-সাত টাকা একটা ড্রয়ারে রেখে দেয়, সুবিমলকে বলাই আছে, তার বিড়ি সিগারেট নাপিতখরচা তাই থেকেই করে। বাস ভাড়া বা শহরে চা-পান খাওয়ার জন্যও আর নতুন ক'রে কিছু দেয় না মানসী—ড্রয়ারে খুচরো কমে আসছে দেখলেই আবার রেখে দেয় কিছু। হাতখরচা বলে থোক্ একটা টাকা ধরে দিতেও তার লজ্জা করে।

বেশ কদিন ঘোরাঘুরির পর আবার একদিন মানসী কথাটা পাড়ল।

সেদিন আর সুবিমল খিঁচিয়ে উঠল না। বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, বোসো। একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, ওখানকার আবগারী দোকানটার লাইসেন্স বদল হবে, চেষ্টায় আছি সেইটে নেবার। সেই জন্যেই ঘোরাঘুরি করছি।'

'সে তোমাকে দেবে কেন?'

'কেন দেবে না? আমি গ্র্যাজুয়েট নই? তাছাড়া জনার্দনবাবু যদি বলেন—'

'কিন্তু সে তো শুনেছি অনেক টাকা ডিপোজিট রাখতে হয়?'

'আরে সে হয়ে যাবে। এ তো শুধু গাঁজা আর আপিং—মদ তো আলাদা। খুব বেশী লাগবে না। তাছাড়া লাইসেন্স পেয়েছি জানলে অমন অনেক মিঞা ধার দেবে।'

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে। তারপর থেকে প্রায় রোজই শহরে যেতে শুরু করল সে। ফেরে কোন-কোনদিন শেষ বাসে, কোনদিন বা আরও পরে—রিকশা ক'রে। প্রশ্ন করলে ভারিক্কী চালে উত্তর দেয়, 'এ কি হাতের মোয়া যে হাত-পাতলেই পাওয়া যাবে? এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে!'

সে কাঠখড় পোড়ানোর নমুনা পাওয়া গেল কদিন পরেই। সাইকেল রিকশা ক'রে আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিল—রিকশাওলা এসে বললে, 'কেউ নামিয়ে নেন আজ্ঞা, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে রেশকাতেই।'

এত রাত অবধি খাবার সাজিয়ে মানসী বসে অপেক্ষা করছে।

বিরক্তিতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, 'ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও না!'

'উঁহু, উঠবেক নাই। নেশা করেছে বাবুটা, মদ, মদ খেয়েছে।'

'মদ! কী বলছ?'—মাথাটা যেন ঘুরে ওঠে মানসীর।

'দেখেন না কেন এসে।'

অগত্যা উঠতে হয়, ঝিকে ডাকে না সে, রিকশাওলাকেই বলে আর একদিকে ধরতে।

ধরাধরি ক'রে ঘরে এনে চেয়ারে বসাতেই ঘুম ভাঙে সুবিমলের।

'ইস ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, না? বললুম শালাকে যে ও জিনিস ছোঁব না—শালা এমন জেদ করলে—'

'তুমি, তুমি মদ খেয়ে এলে?' অতিকষ্টে কথা কটা বেরোয় মানসীর

মুখ দিয়ে।

হঠাৎ যেন সুবিমল চটে ওঠে, নেশাটা কেটে যায় তার।

'হ্যাঁ, খেয়েছি। কী হয়েছে তাতে? এক-আধদিন নেশা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি!···মানুষেই মদ খায়—গরু-ভেড়াকে কখনও মদ খেতে দেখেছ কোথাও?'

আর শুনতে পারে না মানসী, ছুটে পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। কিন্তু তাতেও রেহাই পায় না শেষ অবধি। দমাদ্দম কপাটে লাথি মারতে থাকে সুবিমল। সে আওয়াজে হয়ত ঝি উঠে পড়বে, হয়ত পাশের বাড়ি থেকে চক্রবর্তী বাবুরা ছুটে আসবেন—কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। অগত্যা দরজা খুলে দিতে হয়, খাবারও বেড়ে দিতে হয় সামনে—এবং শেষ পর্যন্ত পাশে গিয়ে শুতেও হয়।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়ার পর ইস্কুলে যাবার সময় একটা কাগজের টুকরো স্বামীর সামনে রেখে চলে যায়। কালকের ঘটনার পর আর কথা কইতে সাহস হয় না ওর—কী বলতে কি বলে ফেলবে সে ভয় তো আছেই, হয়ত কথাও কইতে পারবে না ভাল ক'রে, তার আগেই চোখে জল এসে পড়বে।

কাগজে লিখেছিল, 'আমার ঘাট হয়েছে তোমাকে রোজগার করতে বলা—তোমার আর শহরেও যেতে হবে না, ব্যবসাও করতে হবে না। দেরাজ থেকে টাকাপয়সা সরিয়ে নিয়েছি—কিছু মনে করো না। বিড়ি সিগারেট সব কেনা আছে, পয়সা আর লাগবেও না।'

স্কুল থেকে ফিরে দেখল, সেই কাগজেরই উল্‌টো পিঠে লেখা আছে,—'আমি কাউকে দাসখৎ লিখে বসে নেই যে তার কথায় উঠতে বসতে হবে। চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে চললুম। ওঁকে দিয়ে দিও, নইলে তোমারই লজ্জার কারণ হবে। বলেছি যে ভুলে চাবি নিয়ে ইস্কুলে চলে গেছ।'

গুম্‌ হয়ে বসে ছিল মানসী, ইস্কুল থেকে এসে তখনও কাপড় ছাড়ে নি, মুখে-হাতে জল দেয় নি। ঝি বীণার মা রান্না শেষ ক'রে এসে দাঁড়াল,—'দিদিবাবু ওঠো, গা ধোও, একটুকু চা খাও, কখন কী করবে? আত হয়ে

গেল ঢের!'

'যাই' বলল মুখে কিন্তু তখনও ঠিক যেন উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। বীণার মাও আর তেমন তাগাদা করল না। বরং খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে একটু উশখুশ ক'রে আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল,—একটা কথা বলব দিদিবাবু, আগ করবে নি?'

'কী কথা বীণার মা?' অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে যেন বলে মানসী, কে জানে কেন একটা কিসের অজ্ঞাত আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে তার।

'জামাইবাবুকে আর তুমি শহরে যেতে দিও নি বাপু।'

'কে—কেন বল্ তো?'

'তুমি আগ করবে হয়ত শুনলে, আমার জামাই বল্তেছেল যে, জামাইবাবুর স্বভাবচরিত্তির নাকি খুব বিগড়ে গেছে, শহরে গিয়ে খারাপ মেয়েমানুষের ঘরে যায় নাকি!'

'কোথায়—কোথায় যায় বললে বীণার মা?' কথাগুলো যেন মাথায় ঢোকে না মানসীর, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঝিয়ের মুখের দিকে।

'কী ক'রে বলি বাপু তোমাকে, তোমরা ওসব বুঝবে নি। খারাপ মানে নষ্ট মেয়েমানুষ সব গো, ঐ যে যারা শহরে বাজারের ধারে মুখে খড়ি মেখে দাঁইড়ে থাকে—তাদের ঘরে নাকি সেঁধোয় মধ্যে মধ্যে—'

'মিথ্যে কথা। তোমার জামাই মিথ্যে কথা বলেছে। আর যে দোষ থাক—ও দোষ ওঁর নেই।'

'সেকালেই তো বলেছিলুম দিদিবাবু, তুমি আগ করবে।...তবে এও বলি বাপু, য়্যাদ্দিন বলি নি, আমার খুকী বেণা এ বাড়িতে আর আসতে চায় নি কেন—তা কোন দিন খোঁজ করেছ? একবার তোমার বরকে শুধিয়ে দেখো—। আমার সামনে শুধিও—দেখব কী জবাব দেয়। মুখ শুকিয়ে আম্‌সি যদি না হয়ে যায় তো ত্যাখন বোলো আমায়, আমার নামে কুকুর পুষো।'

আর একটাও কথা কইতে পারে না মানসী, আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

সেদিন সুবিমল আসে সকাল ক'রেই—দশটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছয়। বোধ হয় সে একটা প্রচণ্ড ঝড় আশা করেছিল। মনে মনে সেজন্য প্রস্তুতও

হয়ে এসেছিল। কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। এ রকম সে কখনও দেখে নি এর আগে। ঝিয়ের কাছেই ভাত চেয়ে খায় সে, বাইরে অন্ধকারে বসে একটা বিড়ি খেয়ে চুপচাপ এসে শুয়ে পড়ে। মানসী যে সারারাতই সেই চেয়ারে বসে থাকে—তা জেনেও ঘরে শুতে আসতে বা খেয়ে নেবার কথা বলতে সাহস হয় না তার।···

এর দু'তিনদিন পরেই সেই ছোট্ট সংবাদটি বেরিয়েছিল : যা অনেকের চোখে পড়ে নি কিম্বা কোন বড় কাগজেও ছাপা হয় নি।

'রহস্যজনক নিরুদ্দেশ'। স্থানীয় ফকিরচাঁদ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই! পরের দিন গ্রাম হইতে দুই মাইল আন্দাজ দূরে নদীর ধারে তাঁহার পরিধেয় শাড়িখানি পাড়ের কাছে জলজঘাসে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পুলিস ইহাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন, যদিও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলে প্রকাশ, ভদ্রমহিলা কিছুদিন যাবৎ পারিবারিক কারণে যৎপরোনাস্তি অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে আত্মহত্যার অনুমানই সমর্থিত হয়।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি—আত্মহত্যা করে নি মানসী। বুদ্ধিমতীর মতোই বিবাহবন্ধনের জেলখানা থেকে পলায়ন করেছে। কারও কারও কিছু বেশী বয়সে আক্কেল হয়—কারও বা কখনই হয় না। ওর সৌভাগ্যক্রমে মানসী প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানুষ। বিলম্বে হলেও তার চৈতন্য উদয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

একটি বাড়তি শাড়ি সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিল সে, সহজ ভাবেই বেড়াতে বেরিয়েছিল বলে কেউ লক্ষ্য করে নি। জায়গাটা জানা ছিল, বহুবার বেড়াতে গেছে। কাপড়টা ঘাসে আটকে রাখতে কোন অসুবিধা হয় নি। ওখান থেকে হেঁটে শহরে গিয়ে সেই রাত্রেই ট্রেন ধরে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে সকালের প্যাসেঞ্জার ধরে নাগপুর চলে গিয়েছিল। সেখানে ওর ছোট-ভগ্নিপতি অধ্যাপনা করেন, তিনি ওর মুখে সব শুনে এবং ওর অবস্থা দেখে—অনেক তদ্বির-তদারক ক'রে একটা স্কলারশিপ যোগাড় ক'রে আমেরিকায়

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সেখানে একটা চাকরিও যোগাড় ক'রে নিয়েছে সে। মানসী সোম বলেই সেখানে সে পরিচিত। বিবাহের স্মৃতিটা পর্যন্ত ভোলবার জন্য এখন তপস্যা তার।

মানসীর একান্ত অনুনয়েই ওর বোন-ভগ্নিপতি কথাটা ওদের বাবা-মাকে পর্যন্ত জানায় নি—ভারত ত্যাগ করার আগে।

সুরাভিশাপ

দশ-বারো বছর আগেও যাঁরা বিহারের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তের এই ছোট পার্বত্য শহরটিতে এসেছেন, তাঁরা সকলেই ভরতকে চিনবেন। নাম না জানলেও দেখেছেন নিশ্চয়ই, লক্ষ্যও ক'রে থাকবেন, বর্ণনা দিলেই বুঝবেন। শহর অবশ্য তখনও ছিল না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবিশ্বাস্য জনস্ফীতি সত্ত্বেও না। গণ্ডগ্রামই বলা উচিত। পূজোর সময় থেকে মাঘের শেষ পর্যন্ত চেঞ্জার বাবুদের আসার সময়টুকু বাদে পল্লীগ্রামের চেহারাই ধরে থাকত এই ছড়ানো-এলানো জনপদ। এখন বড় বড় অনেক আপিস দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, স্থানীয় কারখানার বহু বিস্তৃতি ঘটায় তবু একটু প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায় অন্য সময়ও। তবে এখনও লীন মন্থস্ যাকে বলে, সে সময়ে বাজার দোকান খাঁ খাঁ করে, কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না। পূজো এলে জমতে ও জাগতে শুরু করে জায়গাটা।

যা বলছিলুম, ভরতের কথা।

ভরতের কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে—এত জোর দিয়ে বলার মানে আছে।

ভরত রিক্‌শা চালাত। ওর একটি অদ্বিতীয় অর্ধেক ভাঙা নড়বড়ে রিক্‌শা ছিল, সেই রিক্‌শাই চালাচ্ছে দেখেছি অন্তত বারো বছর, মনে হ'ত তাতে চাপলেই ভেঙে পড়ে যাবে, কিন্তু ভাঙত না। চলেছেও—যাবৎ ভরতের মৃত্যু। রথ ও রথী একসঙ্গেই পঞ্চত্ব পেয়েছিল হাতীজোবড়ার খালে।

রিক্‌শার মালিক রিক্‌শা সারাত না, কারণ তারও রিক্‌শা থেকে প্রাপ্তি হ'ত সামান্যই। তাতে সারানোর খরচা উঠত না। যা কিছু ভরতের রোজগার—রিক্‌শার অবস্থা-গুণে ইদানীং সে রোজগার কমে এসেছিল—তা ও মদ

খেয়েই শেষ করত। মালিককে কি দেবে? ফলে মালিকের কোন গরজ ছিল না, আর ভরত নিজে সারিয়ে নেবে সে সামর্থ্য কৈ? কারণ তো একই —মদ।

একে ভাঙা রিক্শা তায় মাতাল চালক। অবশ্য ভরতকে মাতাল বলা যায় কিনা, সেটা বিচারসাপেক্ষ। কারণ যতই মদ খাক, কেউ তাকে কোন দিন মাতাল হতে দেখে নি। সে বে-এক্তিয়ার হয়েছে বলে কারুর মনে পড়ে না। বেহুঁশ তো নয়ই। যতই মদ পড়ুক পেটে, ভরত কোন 'পেসেঞ্জার' বা 'গাহক'কে (দুটো অভিধাই ব্যবহার করত সে) কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছে এ অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। সে যদি ঘাড় পেতে নিয়ে থাকে দায়িত্বটা, কথা দিয়ে থাকে তো ঠিক আসবে—তা কে জানে ভোর পাঁচটা, কে জানে রাত বারোটা, এবং ঝড় জল ঝঞ্ঝাবাত যা-ই হোক না কেন। আরও ভোরে যাওয়ার বরাত থাকলে রাত্রেই এসে শুয়ে থাকত ঐ রিক্শার ওপরই। ভরতের জন্যে কারও গাড়ি ফেল হয়েছে, এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

আরও একটি মহৎ গুণ ছিল ভরতের, আরোহীদের সঙ্গে কখনও অসদ্ব্যবহার করত না। ভাড়া নিয়ে দর-কষাকষি তো করতই না, রিক্শার অবস্থা শোচনীয় বলেই বোধ হয়, ভাড়া চাইতই অপরের থেকে অনেক কম।

যারা আগে দর করত না, নেমে ইচ্ছামত পয়সা দিত, তাদের কাছে সবিনয়ে বলত, 'দেন আজ্ঞা আর দু'গণ্ডা পয়সা, সকাল থেকে মাল পড়ে নাই পেটে এক ফোঁটাও—কী দিয়ে যুঝব বলেন! ই শয়তান গাড়ি কি চলে? ইয়াকে ঠেলে লিয়ে যেতে হয়।'

কিন্তু আসল কথা অন্য। মাতাল হওয়া, মদ খাওয়া, এমন কি বেশী মদ খাওয়াও নতুন নয় এদেশে, বিস্ময়কর তো নয়ই। বিস্ময়কর যেটা সেটা হচ্ছে যে ভরত মদ ছাড়া কিছুই খেত না।

বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা?

সেই কথাই তো বলতে বসেছি। সেইখানেই তো গল্প।

সত্যিই মদ ছাড়া আর কিছু খেত না লোকটা। অবশ্য দেশী মদ, শুনেছি —ওতে কিছু খাদ্যপ্রাণ থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ খেয়েই লোকটা কম ক'রে বিশ বছর বেঁচে গেল, বেঁচে গেল না শুধু, গাড়িও ঠেলত; এ বিশ্বাস করা

কঠিন বৈকি। অথচ সত্যিই তাই। যা পয়সা পেত শুধুই মদ খেত, প্রাপ্তি-মাত্রেণ, দিনরাত সব সময়েই। যখনই ভরতকে দেখুন না কেন, বেশ খানিকটা দূর থেকেই উৎকট গন্ধটা পাবেন। চোখ দুটিও সর্বদাই লাল, জবাফুলের মতো, ঠোঁটের প্রান্তে ঈষৎ একটু ফেনা, মাত্রা যেদিন খুব বেশী চড়ত সেদিন কথাটা একটু জড়িয়ে আসত, এ ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া যেত না তার মদ খাওয়ার। পা-ও টলত না কিম্বা হাতও কাঁপত না। অবশ্য এই শেষ উক্তিতে সামান্য একটু সত্যের অপলাপ ঘটছে বোধ হয়, শেষের দিকে দু-তিন বছর হাতটা একটু কাঁপতে শুরু করেছিল, সব সময়ই কাঁপত একটু একটু। এ ছাড়া অন্য কোন দুর্বলতা কি ক্ষয়ের লক্ষণ দেখি নি কখনও। শরীর দশ-বারো বছর ধরে একই রকম দেখেছি। রোগাটে, তবে কাঠির মতো কিছু রোগা নয়। জামা কাপড় কিনত না কখনও। চেয়ে-চিন্তেই চালিয়ে দিত। কেউ হয়তো একটা হাফপ্যাণ্ট দিলে, সেইটে পরেই বছরখানেক কাটিয়ে দিলে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে সুতো সরা সরা হয়ে যখন আর কোনমতে লজ্জা নিবারণ হয় না, তখন আবার কেউ হয়তো একখানা ছেঁড়া ধুতি দিলে। সেটারও ঐ অন্তিম অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতি নেই।

জামারও সেই হাল। কেউ হয়তো একটা জিনের কোট দিলেন, ওর চেয়ে অনেক লম্বা কোন ব্যক্তি, ঢলঢল করছে বড়, হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত; তা হোক, সেই পরেই হয়তো আট মাস চালিয়ে দিলে। একবার সারা গরম ঐ রকম মোটা কোট পরে কাটিয়ে দিল। তার ফলে ঘামের দুর্গন্ধ, সেই সঙ্গে সুরার সৌরভ তো আছেই। যখন সবাই ওর রিক্শাতে চড়তে অস্বীকার করল তখন একদিন সবসুদ্ধ গিয়ে বাঁধের জলে ডুব দিয়ে এল, তারপর জামাটা খুলে পথের ধারে ঘাসের ওপর মেলে দিয়ে, তিন-চার খেপ খালি গায়েই ঘুরে এল, তারপর জামাটা শুকোলে আবার গায়ে চাপিয়ে এসে বলল, 'লেন, হ'ল তো? আর তো বলতে পারবেন নাই যে ঘামের গন্ধ আছে ইটাতে! দস্তুরমত কাচা করায়ে লিইছি আজ্ঞা।'

এই কোট শতছিন্ন হতে হতে হয়তো শীত এসে গেল, তখন ভিক্ষে দুঃখু ক'রে যা জুটল, তা হয়তো একটা কোন কমবয়িসী ছেলের ছিটের শার্ট। সেটা আঁট হয়ে লেগে থাকে গায়ে, তাছাড়া হয়তো খুবই পাতলা কাপড়ের, কিন্তু তাতে ভরতের কিছু এসে যায় না। সে ওতেই মহাখুশী। তার শীতও লাগে

না, গরমও না।

ভরতকে অন্য কিছুর খাবার কথা বলেছে বৈকি। আমি—আমরাই বলেছি কতবার। ভরত এসে হয়তো দু'ঘণ্টা বাড়ির সামনে গাড়িতে বসে ঝিমোচ্ছে, স্বভাবতই কিছু খাবার উদ্‌বৃত্ত হলে বা নিজেরা খাবার সময় ওর কথা মনে হয়। কিন্তু ভরতকে কোনমতেই কিছু খেতে রাজী করানো যেত না। একমাত্র সকালের দিকে একবার চা হয়তো খেত, চেয়েও খেত অনেক সময়ে; কোথাও থেকে একটা ভাঁড় বা নারকেল মালা সংগ্রহ করে এনে সামনে ধরত, 'একটু চা কেন দেন নাই আজ্ঞা, আপুনিদের ভরতকে। সকাল থেকে ও কম্মটি হয় নাই এখনও পজ্জন্ত!'

আমি নিজে চেপে ধরেছি অনেকবার খাওয়ার জন্যে। রুটি কি পরোটা, এমন কি কলকাতা থেকে আনা ভাল কেক্, ঘরে ভাজা বেগুনি, কোনটাতেই রাজী করাতে পারি নি।

'আজ্ঞা, উ আমার সয় লাই। মাতালের পেট তো। দেখেন নাই কেন, কতকাল ধরে শুধু মদ খাঁয়েই আসতেছি, এখন সব ভাল ভাল খাবার দিলে পেট মানবেক কেনে? বিপুরীত কাণ্ড হবেক আজ্ঞা।…তার চেয়ে ভরতের উপর দয়া হয়—চারটে ছ'টা পয়সা দেন আজ্ঞা—দৌড়ে গিয়ে একটু টেনে আসুক।'

'বিপুরীত কাণ্ড' যে হয় সেটা চোখের সামনেই দেখলুম একদিন। শীতের দিন দুপুরবেলা মিঠেরোদে একটু দূর চক্কর ঘুরে আসব বলে ওকে আসতে বলেছি—ন'টা থেকে এসে বসে আছে। তাড়াহুড়ো ক'রে খেয়ে নেবার কথা, তবু বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। খেয়ে উঠলুম যখন তখনই এগারোটা। ভরত মাঝে দু-তিনবার তাড়া দিয়েছে তবে খুব একটা গোলমাল করে নি, কারণ তাড়া লাগিয়েই আবার ঝিমুতে শুরু করে, সময়ের হিসাব থাকে না।

সেদিন তাড়াতাড়ি সারার জন্যেই খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল, খিচুড়ি আর দু'রকম ভাজা। একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল বস্তুটা। সকলের খাওয়া যখন শেষ হ'ল তখনও পুরো একজনের খোরাক হাঁড়িতে আছে। স্বভাবতই মনে হ'ল ভরতের কথা। দু'ঘণ্টা ধরে এসে বসে আছে। ওকে একটু খাইয়ে দিলে কেমন হয়?

খাওয়ার কথা বলতে যথারীতি হাত জোড় করল, 'উটি আমাকে বলবেন নাই আজ্ঞা। বেশী হয়ে থাকে রাঁখে দেন, রাতে গরম ক'রে লিবেন। না হলেও খাবার লোক ঢের মিলবে। আমাকে কেন দিবেন মিছামিছি, লষ্ট হবেক!'

আমার যেন জেদ চেপে গেল। নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলাম, 'খেতেই হবে তোমাকে, কোন কথা শুনব না। তুমি কোনদিনই কিছু খেতে চাও না কেন বল তো? না খেয়ে তো আর সত্যিই মানুষ বাঁচে না, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু খাও। তাহলে আমাদের কাছে খাও না কেন?'

অনেক বলল, অনেক কাকুতিমিনতি করল ভরত, আমি কিন্তু কোন কথাই কানে তুললুম না। জোর ক'রেই বাইরের বারান্দায় বসিয়ে দিলুম। গোটাকতক শালপাতা ছিল বাড়িতে, তাই ডবল ক'রে পেতে খিচুড়ি ও একটু আলুভাজা, যা পড়েছিল, এনে ঢেলে দিলুম সবটা।

'দেন, যখন শুনবেন নাই! তবে মিছামিছি আমাকে কষ্ট দিবেন খানিকটা, আপুনিদের খাবারটাও লষ্ট হবেক।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভরত হাতটা ধুয়ে খেতে বসল।

খেতে খেতে কিন্তু বেশ যেন উৎসাহিতই হয়ে উঠল, 'খুব ভাল হঁয়েছে আজ্ঞা, ইটি বেশ জমেছেক।' বলল বারকতক। দুটো লঙ্কাও চেয়ে নিল। বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেল সবটা।

আমি মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছি যে এবার একহাত নেব ওকে, 'বিপুরীত কাণ্ড'টা কি হ'ল বাপু তাহলে, তাই শুনি? এই তো বেশ খেলি। তবু শুধু শুধু উপোস ক'রে থাকিস কেন, খাবার যেচে এলেও খেতে চাস না! মনে মনে এই ধরনের আরও কি বলা যায় ভেবে নিচ্ছি, এমন সময় খাওয়া শেষ হওয়ার মুখে, হঠাৎ তীরবেগে বাগানে নেমে গিয়ে লোকটা হড়হড় করে সবটা বমি ক'রে ফেলল। বমির ধমকে, খাবারটা উঠে গেলে সেইখানেই বসে বুকটা চেপে ধরে হাঁপাতে লাগল।

তারপর একটু সামলে নিয়ে উঠে এসে ম্লান হেসে বলল, 'দেখলেন তো! আপুনিরা বিশ্বাস করেন নাই, নিজের চোখেই তো দেখলেন কাণ্ডটা। আমার আর কিছু খাওয়ার জো নাই। ই তার কলকাঠি। মিছামিছি এখন শরীরটা এই যে খারাপ হঁই গেল, রিক্শা ঠেলব কেমন ক'রে আজ্ঞা ই এতটা পথ?'

না, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার বমি নয়। বমির চেহারা তো চোখেই

দেখলাম। শুধুই খাবার উঠেছে। তার সঙ্গে একটু জল কি মদ, কিছুই না। তা ছাড়া ছ'ঘণ্টার ওপর তো আমাদের চোখের সামনেই বসে আছে। মদ খেল কখন? তার আগেও ভরত অনেকবার শুনিয়েছে, কাল সন্ধ্যে থেকে এক ফোঁটা মদ পেটে পড়ে নি। যাওয়ার মুখে আমাদের কাছ থেকে আগাম কিছু পয়সা নিয়ে খানিকটা মদ খেয়ে তবে গাড়ি ঠেলবে। তবে?

তখন আর এ রহস্যের মীমাংসা হ'ল না। চার আনা পয়সা খাওয়াবার দক্ষিণা বা জরিমানা দিয়ে ফুলোর বাড়ি মদ খেতে পাঠিয়ে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। একটু পেটে না পড়লে এখন এক পা-ও গাড়ি চালাতে পারবে না ওর সাফ কথা।

এর দু-একদিন পরে মওকা মতো পেয়ে গেলুম ভরতকে। বাজার করতে বেরিয়েছিলুম, তবে বাজারের খুব তাড়া ছিল না, মানে এবেলাই হাঁড়ি চড়িয়ে বসে থাকবে—তেমন নয়। তাই বেড়াতে বেড়াতে রাজবাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়েছিলুম। রাজবাড়ির পিছনে খানিকটা জঙ্গল মতো আছে, তার ধারেই নদী। বড় বড় বোলডারে ঘা খেয়ে সগর্জনে বয়ে যাচ্ছে, জায়গাটা আমার বেশ লাগে। জনমানব থাকে না। যতক্ষণ পারি পাড়ের আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে নদীর সফেন জলতরঙ্গের দিকে চেয়ে থাকি।

সেদিন কিন্তু দেখলাম যতটা জনমানব-শূন্য ভেবেছিলাম প্রথমটায়, ততটা নয়। সেই কামরাঙা বকুল আর আমগাছের সারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছেন শ্রীমান ভরত—খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির জঙ্গল মুছতে মুছতে। বুঝলুম এখানে নিশ্চয়ই কোন বে-আইনী মদের ভাটি আছে।

এ সুযোগ আর ছাড়া ঠিক নয়। 'একটু বোস' বলে ওকে পাশে বসিয়ে চেপে ধরলুম।—ভরত বল দিকি এবার সত্যি ক'রে, কেন কিছু খেতে পারিস না! মদ খেয়ে খেয়ে পেটে ঘা হয়ে গেছে, না কি অন্য কোন কারণ আছে?'

ভরত একটু হাসল, 'তাই কেন ভেবে লেন নাই বাবু আপুনিরা। ল্যাঠা তো চুকেই যায়।···আর কি কারণ থাকবে বলেন, পেটে সয় না, খাই না। ইয়ার আবার কারণ কি?'

'কিন্তু পেটে যদি ঘা হয়েথাকে; তার ওপর মদ খাচ্ছিস, তাহলে তো মরে যাবি!'

'দেখেন দিকি, মরার কি আমার ভয় আছে নাকি! মরলেই তো আমার ছুটি, ইটা কেন বোঝেন না! কী সুখে আর বাঁচব? তবে মরণও আমার সহজে হবেক নাই, ইটা আপুনি জেনে রেখে দেন।'

মুখে যা-ই বলুক, ওর গলার আওয়াজে বেশ বুঝতে পারলুম যে এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে?

পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে ওর সামনে ধরে বললুম, 'ছাখ, পুরো এক বোতল মদের দাম দোব, যদি ব্যাপাটা খুলে বলিস।'

কেন যে কথাটা বলেছিলুম তা আজও জানি না, কী এমন রহস্য আশা করেছিলুম ওর কাছে! এমন কী বা ঘটতে পারে একটা রিক্শাওয়ালার জীবনে, বিশেষ এই সব জায়গায়, শহরের ব্যস্ত উন্মত্ত জীবন, ঐশ্বর্য ও সম্ভোগের জীবন যেখানে আজও শুরু হয় নি? কিন্তু দেখলুম ঠকি নি। টাকাটার দিকে কিছুকাল লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ও বলল, 'তাহলে চলেন ঐ নদীর ধারে গিয়ে বসি। ই কথাটি তো অল্পে হবেক নাই, সময় লিবে। আর মদটা যদি লিয়ে যেতে পারি তবে এক কাজে দু' কাজ হয়ে যাবে। তাই করেন, টাকাটা দিয়ে দেন আজ্ঞা, ভরত ফাঁকি দিবে না, মিছা কথাও বলবে না।'

দিলাম টাকাটা। মদ কিনে এনে আমার থেকে একটু দূরে বসে ভরত বলতে শুরু করল তার কাহিনী :

'আজ থেকে কুড়ি-একুশ বছর আগের কথা, ভরতের বয়স তখন কুড়ি-একুশ কি আর একটু বেশী হবে, সে হিসেব ঠিক ওর জানা নেই। এই অঞ্চলেই ওর বাড়ি, বহড়াগোড়া থেকে দু-তিন ক্রোশের রাস্তা। নিজেদের জমি ছিল না, ভাগচাষীর কাজ করত ওর বাপ-দাদারা। শেষে তাও ছিল না, চাষে মজুর খাটত। এ অঞ্চলে খরা আর অজন্মা লেগেই আছে, সুতরাং ভরতেরও দুর্গতির শেষ হ'ত না কোন দিন। বছরের মধ্যে অর্ধেক দিন উপবাস, কচু-ঘেঁচু খেয়ে কাটানো, জ্ঞান হয়ে পর্যন্তই এ দেখে আসছে।

তাই বাবা মারা যেতে দুত্তোর বলে চলে এসেছিল এখানে কাজের চেষ্টায়। মা ছিল বটে, তেমনি আরও দু'ভাইও ছিল—ঘরবাড়ি যখন তারা ভোগ করবে তখন তারা মাকে দেখতে বাধ্য, এই ছিল সেদিন ওর যুক্তি। আর

কোন দিন দেশে যায় নি, মা বেঁচে আছে কি মরেছে তাও বলতে পারবে না।

এখানে তখন কারখানা চলছে কিন্তু তার অবস্থা ভাল নয়। তাই বিস্তর ঘোরাঘুরি ক'রে হাতে-পায়ে ধরেও কোন কাজ হ'ল না, পেল যা তা এই রিক্‌শা চালাবার কাজ।

এরই মধ্যে একদিন গঙ্গা বলে একটি মেয়ে এসে নামল বিকেলের ট্রেনে। গঙ্গা তার নাম নয়, তবে আসল নামটা ভরত বলবে না—গঙ্গাই ধরে নিই না কেন আমি! নামটা এমন কিছু খারাপ নয়।

বিকেলের নাগপুর প্যাসেঞ্জার থেকে মেয়েটি একাই নামল, নিরাভরণ, চুলপাড় ধুতি পরনে, বৈধব্যের বেশ। এমন কিছু রূপসী নয়, গৌরাঙ্গী তো নয়ই, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখ-চোখ চলনসই। খারাপ নয় দেখতে এই পর্যন্ত বলা যায়। এতদিনের জীবনে সুন্দরী অনেক দেখেছে ভরত, যথার্থ সুন্দরী যাদের বলে—গঙ্গা তাদের ধারে-কাছেও লাগে না, তবু অল্পবয়সের একটা লাবণ্য তো আছেই, সবটা জড়িয়ে ভরতের সেদিন ভালই লেগেছিল।

ট্রেন বেরিয়ে গেলেও অনেকক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, একটু যেন বিপন্ন ভাবেই এদিক ওদিক চাইতে লাগল। যেন কী করবে কোথায় যাবে ভেবে পাচ্ছে না। তখন আর ক'টা লোকই বা নামত এখানে! পাঁচ-সাতজন বড় জোর, তাও বেশির ভাগই কারখানার কর্মচারী, দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম জনহীন হয়ে গেল, রিক্‌শাওয়ালারা যে যার সরে পড়ল, শুধু ভরতই যেতে পারল না। এই অপরিচিতার রহস্য যেন কী এক দুর্নিবার বলে আকর্ষণ করলে তাকে। এর কিছু খবর না নিয়ে তার নড়া সম্ভব নয়।

খানিকটা ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত ভরতই এগিয়ে গেল, 'আপনি কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

,অপেক্ষা!' মেয়েটি কেমন একরকম বিব্রত ও কিছুটা বিহ্বল দৃষ্টি তুলে তাকাল, একটু যেন ভয়ও পেল এই জনহীন প্ল্যাটফর্মে ভরত এসে কাছে দাঁড়াতে। ভরত তখন তাগড়া জোয়ান ছিল, এখনকার ভরতকে দেখে সে চেহারা কল্পনা করা যাবে না।

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এই যাচ্ছি। আচ্ছা, শুষনি-কল্‌মী বলে একটা পাড়া আছে না এখানে? সেটা কোন্ দিকে?'

'সি তো বহুত দূর এখান থিঁকে।—হেঁটে যেতে পারবেন নাই। বলেন

আপনাকে পঁওছায়ে দিয়ে আসি।'

'না না, আমি বেশ যেতে পারব। হাঁটা আমার অব্যেস আছে।···আচ্ছা, আমি বাইরের কোন দোকানে গিয়ে খোঁজ করছি—'

মেয়েটি যে দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেছে সেটা আর গোপন রইল না। তার কেঁপে যাওয়া গলায় ও অকারণ ব্যস্ততাতেই ধরা পড়ল।

'এই দেখেন, আমি কি খবর দিব নাই বঁলেছি আজ্ঞা! আমি গরিব মানুষ, রিক্‌শা চালাই-করি খাই, তাই বলছি চলেন আপনাকে পঁওছায় করি আসি।'

'না। আমার কাছে পয়সা নেই।'

'পয়সা না হয় অন্য দিন দিবেন। তাতে আর কি! গাড়িতে তো চাপেন।'

'না না, বলছি তো, তোমার গাড়িতে আমার দরকার নেই। 'মেয়েটি এবার ধমক দিয়ে ওঠে। এ ধমক ভয় চাপবারই চেষ্টা। আর্তস্বর ক্রুদ্ধ স্বরের ছদ্ম আবরণে গোপন করার প্রয়াস।

এবার ভরত এগিয়ে ঘুরে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আপুনি ভাবছেন আমার বদ মতলব আছে আজ্ঞা? রঙ্কিনীমায়ের দিব্যি—এখানে রঙ্কিনী মা খুব ভারী মা আছেন, আপুনিকার কলকাতার কালীমায়ের মতো, আমার কোন খারাপ মতলব নাই। আমি রিক্‌শা চালাই, ই সব মতলব করলে লোকে যে মেরি ফেলবেক।···সন্ঝার আর কত দেরি বলেন দেখি, এতটা পথ হাঁটি করি যেতে রাত হঁয়ে যাবে না? ও পথটি আজ্ঞা ভাল না। বলেন গাড়িতে পঁওছায় ক'রে আসি। যেদিন যখন পয়সা হয় দিবেন।'

'আমি—আমি হয়তো কোনদিনই দিতে পারব না।' বোঝা গেল নির্জন রাস্তায় অন্ধকারে যাওয়ার কথাতেই মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে এবার।

'না-ই দিলেন। কত লোক তো ঠকাই করি লিচ্ছে কত পয়সা। ছ'গণ্ডা পয়সা নাই পেলাম। ই তো দাঁড়াই আছি, পেসেঞ্জার তো আর নাই।'

মেয়েটি এবার অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে রিক্‌শার দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'ওখানে ডাঃ নাগের বাড়ি কোন্‌টা জানো?'

'লাগসায়েব? ফরসা করি সুন্দরপানা বাবু, মাথার চুল সব পাকি যাঁইছে—বুঢ়া মতো, না? খুব চিনি। চলেন।···তা সে বাড়িতে তো কেউ নাই এখন?'

'তা হোক। মালী তো আছে। চল।'

উঠে বসল গঙ্গা গাড়িতে। ভরতও রিক্‌শা ছাড়ল।

এতক্ষণ মেয়েটার দিকেই নজর ছিল, সে কোথায় যাবে কি করবে সেইটেই ছিল লক্ষ্য, গাড়ি চালাতে চালাতে ভরতের অন্য কথা মনে এল এবার। ওর সঙ্গে কোন জিনিস নেই। দ্বিতীয় কোন কাপড়জামা পর্যন্ত না। মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছে না তো? শেষে কি একটা পুলিস-হাঙ্গামে পড়বে সে? পুলিসকে ওর বড় ভয়। বড্ড ফৈজৎ করে ওরা গরিবদের ওপর।

কিন্তু এখন আর এসব ভেবে লাভ কি! গাড়িতে তোলাই হয়ে গেছে।

দীর্ঘ পথ, উঁচু নিচু। স্টেশন থেকে যার নাম আধ ঘণ্টার রাস্তা রিক্শাতেও। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে এল। শীতের দিন হলে এতক্ষণে সন্ধ্যা উৎরে যেত। ওরা যখন অবশেষে গন্তব্যস্থানে পৌঁছল তখন ম্লান অপরাহ্ণে সেই জনহীন গৃহবিরল পল্লীতে খালি বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে, বাইরে থেকেই সেদিকে চেয়ে গা ছমছম করে।

কিছুক্ষণ মূঢ় দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বসে থেকে নেমেই পড়ল গঙ্গা। ভরত ইতিমধ্যেই লোহার ফটকটা খুলে ভেতরটা ঘুরে এসেছে। কেউ কোথাও নেই, বাড়িতে চাবি দেওয়া—বাইরের দিকে যে চাকরের ঘর, চাকর মালী কেয়ার-টেকার যা-ই বলা যাক না কেন, সে ঘরেও তালা ঝুলছে।

'লেন এখন! আপুনিকার মালিও তো নাই। বাড়ি তো কুলুপ আঁটা। ই কুথায় কী বাত্তা লিই করি আলেন! চাবিকাঠিটি লিয়ে আসিছেন?'

'চাবি!' আর সত্য গোপন করার চেষ্টা করে না মেয়েটি, বলে, 'ডঃ নাগ জানেনও না যে আমি আসব। এখানে ওঁর একটা বাড়ি আছে, খালিই পড়ে থাকে, এইটুকু শোনা ছিল, সেই ভরসাতেই আমি এসেছি।'

'কাণ্ড দেখেন দিকি! ই তো দেখছেন চারিদিকে কোথাও জনমনিষ্যি নাই, ইখানে থাকবেন কোথায়? রোয়াকে বসে থাকবেন নাকি? রাতের বেলায় বাঘে খাবেক যে। হাতী আছে, ভালুক আছে, নাই কি?'

সত্যিই ব্যাপারটা খুব ভরসাপ্রদ নয়। ঘরবাড়ি এমনিতেই খুব কম এদিকটায়, দূরে দূরে ছড়ানো এক-আধখানা বাড়ি, সবই বন্ধ। এটা এখানের সীজন নয়। এখন এসব বাড়িতে কেউ থাকবে তা আশা করাও ভুল। এই ক'টি খালি বাড়ি ছাড়া শুধুই বড় বড় গাছ, বড় বড় পাথর আর পাহাড়।

তবু, উপায়ও নেই আর। মুখে জোর দিয়ে গঙ্গা বলে, 'না, এখানেই বসে থাকি। মালী কোথাও এই গাঁয়ের দিকেই গিয়ে থাকবে, কি হাটে।

ফিরে আসুক। তুমি যাও।'

ভরত বোকা নয়। সে আর কথা বাড়াল না। বুঝল তার অনুমানই ঠিক, এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। যাওয়ার কোন জায়গাও নেই। 'তাই থাকেন আজ্ঞা' বলে সে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল।

লোকালয়েই ফিরল ভরত কিন্তু যাত্রী খোঁজার চেষ্টা করল না। সন্ধ্যের লোকাল আসার সময় হয়ে এসেছে। এমনিতেও স্টেশনের মোড়টাতে দাঁড়ালে দু-একটা দোকানী-ব্যাপারী যাত্রী মিলতে পারে, তবে তাতে আজ আর আগ্রহ নেই। অন্য কাজে এসেছে সে। হাতে টাকা দেড়েক বাড়তি জমেছে। মালিকের এক টাকা বাদেও। সে বাজারে ঘুরে চাল কিনল, আলু, নুন, হাটতলার দোকান থেকে একটা হাঁড়ি। যাবার পথে ক'টা পাতা চেয়ে নেবে মুরতের মিষ্টির দোকান থেকে। আর কি নেওয়া উচিত অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারল না। শেষে মনে পড়ল জল রাখার একটা জায়গা দরকার। বাসায় গিয়ে নিজের জল রাখার টিনটাও তুলে নিল। তারপর গেল ভাগমলের কাপড়ের দোকানে। গিয়ে নমস্কার ক'রে প্রশ্ন করল, শাহুজী তার একটা কথা রাখবেন কিনা। একখানা শাড়ি ধারে চাই তার, এমনি সাধারণ শাড়ি, দেড়টাকা দু'টাকা যা দাম হয়—সে শাহুজীর মাল বয়ে শোধ দেবে; নয়তো রোজ চার আনা হিসেবে, বাড়তি চার আনা সুদ হিসেবে, দেবে শাহুজী?

শাহুজী এতদিন পরে ভরতের শাড়ির দরকার নিয়ে একটু রসিকতা করল—শাড়ির লোক কোথায় 'কাড়ল' ভরত জানতে চাইল, তারপর দিয়েই দিল। এতকাল দেখছে ওকে, মেরে দেবার লোক নয়। কাপড়ের দামেই মোটা লাভ ধরেছে, তার ওপর বাড়তি চার আনা, মন্দ কি?

সব গুছিয়ে নিয়ে ভরত যখন শুষনি-কলমী ফিরল তখন চারিদিকে আব্‌ছা হয়ে অন্ধকার নেমেছে। দেখল মেয়েটা বাইরের ফটক ধরে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

ভরত গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'এই দেখেন! কাঁদছেন কেনে? ভাবছিলেন আমি আপুনিকে এই বিজন বনে ফেলি করি পলাই গেঁছি? আমি তো জানি এই হাল হবে। আপনি একা এসেছেন, মেয়েছেলে ধরমশালায় তো থাকতে দিবে না, নইলে সেখানেই লিয়ে যেতাম। তা আছে, আমাদের

শহরের দিকে ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে মেলা। বলেন, কারও বাড়ি বলে রাখি করি আসি আজকার মতো—'

মেয়েটা ঘাড় নাড়ে, 'না, আমার কোথাও যাওয়ার মুখ নাই। আমাকে—আমাকে বাঘে খায় তো বাঁচি—'

'বুঝলাম। এখন চলেন, খাঁত্তি তো হবেক কিছু। এমনি তো পেট মানবেক নাই। কুয়োটায় দেখে গেছি বালটি দড়ি রেখে গেছেক। জল তুলে দিই, মাথায় মুখে দেন। কাপড় আনা করেছি একখানা, ছাড়তে চান ছাড়েন। তারপর দুটি ভাত চাপায়ে দেন। ও মালী আজ আর আসবে নাই। আজ হাটবার নয় তো, হাট সেই বুধবারকে—নইলে ভাবতাম হাটে যেছে। দেখেন কুথায় মদ খাই করি পড়ে আছে, কি ঘরেই পলাইছে।'

মেয়েটা ওর কাণ্ড দেখে আর কথাবার্তা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে যায়, 'তুমি, তুমি, এ কি করেছ? এত কাণ্ড কেন করতে গেলে? এ যে—এ যে অনেক খরচ হয়েছে। এ আমি শুধব কেমন ক'রে? আমার কাছে তো এক পয়সাও নেই।'

'তাহলে এখানে আসা করেছিলেন কি না খাঁই করি শুঁকায়ে থাকবেন বলে? এ বাবুটা তো ইখানে থাকে না জানেন। একা থাকবেন, পয়সা নাই তো আসেন কেন? বাড়ি থাকতে পালাই আসিছেন সে তো বুঝলাম। তা খাওয়া-নাওয়ার কম্মটি তো চাই। নেন, যা হয় চাপায়ে দেন দুটো ভাত। আলু নুন সব আনছি। দাঁড়ান কেনে জলটা তুলে দিই—'

তবু মেয়েটির যেন হাত-পা আসে না।

ভরত নিজেই কাজে লেগে যায়। জল তুলে টিন ভর্তি ক'রে বারান্দায় এনে দেয়। বলে, ঘটি-টটি নাই কিন্তুক। যা করবেন এমনিই সেরে নেন। তার পর নিজেই বাগানে গিয়ে তিনটে পাথর যোগাড় করে। কতকগুলো শুকনো কাঠির ডাল ভেঙে আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে আগুন ধরায়। হাঁড়িতে ক'রেই চাল ধুয়ে গোটাকতক আলু ফেলে ভাত চাপিয়ে দেয়। বলে, 'জল যা দিঁছি ফেন গালতে হঁবেক নাই। ভাত হলে নামায়ে খাঁয়ে লিবেন। পাতা আনছি, ওই বারান্দায় রাখা করিছি। আমি চলি এখন।'

মেয়েটার মুখ দিয়ে যেন আপনিই বেরিয়ে যায়, 'আমি একা থাকব, এখানে?'

'ওই ল্যান! তার আমি কি খবর রাখব বলেন! আপুনি তো আমাকেই

শুণ্ডা ভাবছিলেন। একা থাকবার লেগেই তো আসিছেন।' বলে—কিন্তু সেই কাঠের আগুনের আভাতেই গঙ্গার অপ্রতিভ বিপন্ন মুখের দিকে চেয়ে কোমলও হয়ে আসে, আবার বলে, 'চাল আমি জানি করিই বেশী চাপাঁইছি, ভাত দুজনারই হবেক। কিন্তুক থাকা? আমি রাতটা গাড়িতেই কাটাতে পারি, আপুনি?'

বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর আসে না। ভরতও তার জন্যে অপেক্ষা করে না। কোথা থেকে একটা লোহার শিক কুড়িয়ে এনে এক-টানে তালাসুদ্ধ দরজার শুর্মোটা খুলে ফেলে।

'এ কি করলে? তালা ভাঙলে? ওঁরা, ওঁর মালী যদি কিছু বলে?' মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে প্রশ্ন করে।

'কী আর করা যায় বলেন! আপুনিকে তো আর বাঘের মুখে ফেলি রাঁখা যায় না।···মালী তো নাই। উয়ার বাড়ি কোন্ দিকে তাও জানি নাই।··· তবে তাকে আমি বুঝ করাঁইতে পারব। মালিককে আপুনি বুঝবেন।'

আলো নেই, সেই অন্ধকারেই চুলোটাতে পাতা-লতা গুঁজে দিয়ে তারই আলোয় সেই ফেনভাত শালপাতায় ঢেলে শুধু নুন দিয়ে দুজনে খায়। ভরত হাঁড়িটা ফেলে না, বারান্দার এক কোণে রেখে দেয় উপুড় ক'রে। ভাত সে-ই নামিয়েছে; প্রথমটা কি জাতের মেয়ে, বামুন কিনা, জাতের বিচার আছে কিনা—জানাতে গঙ্গাকেই বলেছিল নামাতে। গঙ্গা অস্বীকার করেছে। বলেছে, 'তুমিই নামাও, বামুনের মেয়ে বটে কিন্তু এখন আমি কিছুই নই।'

এ পর্ব চুকলে একটা কাঠ জ্বেলে নিয়ে ভরত সামনের ঘরে ঢুকল।

ঘরে কতকগুলো ধুলো পড়া চেয়ার টেবিল, একপাশে একটা চৌকি। তার ওপরও পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। ভরত একটা শুকনো ইউক্যালিপটাসের ডাল কুড়িয়ে এনে যতটা পারল ধুলো ঝেড়ে দিল। তারপর রিক্‌শার সীটটা এনে বলল, 'আপনি দোর দিয়ে শুয়ে পড়েন আজ্ঞা। আমি এই বাইরেটায় পড়ে আছি। ঐটেই মাথায় দেন, বিছানা তো নাই।'

'কিন্তু তুমি, তুমি বাইরে একা শোবে?'

'আমাকে বাঘে খাঁবেক নাই। আর খেলে তো ভালই।'

অতঃপর এই দায় পুরোপুরি ভরতের ওপরই এসে পড়ল। নিজেই ঘাড়ে

নিল সে। চৌকির ওপর পাতার জন্য একটা চাদরও কোথা থেকে এনে দিল পরের দিন। পাশের ঘরে ক'টা তোশক-বালিশ ছিল। আলোও পাওয়া গেল, দু-একটা বাসনও। এক রকম গৃহস্থালীই সাজিয়ে বসল গঙ্গা। কিন্তু খাদ্য-খাবার যা কিছু ভরতকেই যোগাতে হচ্ছে। গরিব রিক্‌শাওলা, কীই বা ওর উপার্জন, এটা জানা সত্ত্বেও গঙ্গা কোন বাধা দিতে পারল না।

তা না হোক। ইতিহাসটা খুলে বলতে হ'ল।

বিধবা নয়। স্বামী আছে, মানে ছিল। ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন শৈশবেই। বিধবা মা একটি সন্তান নিয়ে বাপের বাড়ি এসে উঠেছিলেন। মামারা অযত্ন করেন নি। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। ভাল ছাত্রী ছিল বলে গঙ্গা কলেজের পড়াটা বরাবর নিজের স্কলারশিপেই চালিয়েছে। এম-এ পাস করা সম্ভব হয় নি। সিক্সথ্‌ ইয়ারে পড়তে পড়তেই এই বিয়ে হয়। উকিল পাত্র। কলকাতায় বাড়ি আছে। সুতরাং দুই মামাই প্রচুর দিয়ে-থুয়েই ভাগ্নীর বিয়ে দিয়েছিলেন।

বিয়ের পর প্রায় আট দিন কিছু বুঝতে পারে নি গঙ্গা, বরং এমন স্বামী পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতীই ভেবেছিল। পরে সবই ধরা পড়ল একে একে। আসলে ওর স্বামী পরেশেরও বেশীদিন চাপা রাখার অবস্থা ছিল না। মাতাল জুয়াড়ী লম্পট। ওকালতি কেন কোন পাশই করে নি। মুখে ইংরেজী বলতে পারত ভাল, সাহেব সাজলে মানাত—তাই লোকে অবিশ্বাস করত না। যে মাকে দেখে মামারা বিয়ে দিয়েছিলেন, সেও আপন মা নয়, ভাড়া করা। বিয়ের জন্যেই খাড়া করতে হয়েছিল। পরেশের আসল বাবা মা কোথায় তা কেউ জানে না, সম্ভবত পরেশ নিজেও না।

দেখতে দেখতে গঙ্গার গহনা গেল, দানের বাসন গেল, শেষ পর্যন্ত দামী শাড়ীগুলোতেও টান পড়ল। আসলে দেনার দায়ে কোথায় কী একটা বড় রকমের জোচ্চুরি ক'রে ফেলেছিল পরেশ। তার জেল বাঁচাতেই, আর কোন পথ না পেয়ে এই বৃহত্তর জোচ্চুরি—বিয়ের পথ ধরেছে।

গঙ্গা প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেদম মার খেল একদিন। মাতাল হয়ে একটা বড় ছোরা বার ক'রে কাটতেও গিয়েছিল। মামাদের যে চিঠি লিখবে, পরেশ শাসিয়ে দিল, 'খবরদার, দেখেছিস আমার পোষা গুণ্ডার দল—তোর মামার গুষ্টির একটাকেও আস্ত রাখব না আমার সঙ্গে চালাকি করতে এলে।'

এরপর তাদের বিপন্ন করতে সাহস হয় নি। সত্যিই কতকগুলো গুণ্ডামতো লোক আসত মাঝে মাঝে পরেশের কাছে। পরে একদিন কান পেতে শুনে বুঝল তারা অন্য উদ্দেশ্যে আসছে। আসলে এরা আসছে গঙ্গাকেই কিনতে। গঙ্গার তখন খাঁচাকলে পড়ার মতো অবস্থা। পুরোপুরি নজরবন্দী। বাড়িতে একটা রাক্ষসের মতো লোক আছে, সে দিনরাত কড়া পাহারায় রেখেছে। এখানে আসার আগের দিন একটা লোক দেড় হাজার টাকায় রফা ক'রে বায়না দিয়ে গেল, পরের দিন দুপুরে তাকে নিয়ে যাবে। বোধ হয় টাকাটা হাতে পড়তেই ফুর্তি করতে ইচ্ছে হয়েছে পরেশের, ভাল বিলিতি মদ কিনে এনে বসে বসে নিজে আকণ্ঠ গিলেছে, গিলিয়েছে পাহারাদার সাগরেদটিকেও। ফলে দুজনেই বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে দেখে ভোরবেলা উঠে গুণধরের কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে এসেছে গঙ্গা। হাতে লোহা আর শাঁখা ছাড়া কোন গহনা ছিল না। তাই সেগুলোরও মায়া করে নি, খুলে সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে তুলে পরেশেরই একটা ধুতি পরে বেরিয়ে এসেছে বিধবার সাজে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে সেটা ভাবতে শুরু করেছে। মামার বাড়ি গিয়ে তাঁদের বিপন্ন করতে মন চায় নি। হাঙ্গামা হুজ্জৎ কি থানা পুলিস ক'রে মিছিমিছি বেইজ্জৎ হওয়া একটা। মামলা করতে গেলেও টাকা লাগবে, কোথা থেকে পাবে? আর তো ধার করারও পথ নেই। অনেক ভেবে হাওড়ার দিকেই হাঁটা দিয়েছে। হাওড়া স্টেশনে যায় নি, নিরুদ্দিষ্ট ভাবে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে পড়েছে। সেখানে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি খেয়াল হতে নাগপুর প্যাসেঞ্জারের মেয়ে-কামরায় চড়ে বসেছে।

এই গাড়িতে চেপে বসে মনে পড়েছে যে অনেকদিন আগে ওর অধ্যাপক ডঃ নাগের মুখে শুনেছে যে এখানে 'শুষনি-কলমী' বলে কী একটা পল্লীতে তাঁর বাড়ি আছে, প্রথমে অনেক শখ ক'রে করেছিলেন, এখন কদাচিৎ কেউ যায়, নইলে খালিই পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর কোন জায়গা কোন আশ্রয়ের কথা মনে না পড়ায় এইখানেই নেমে পড়েছে।

মালী এল দিনপাঁচেক পরে। সে ব্যাপার গতিক দেখে অবাক। তবে

তাকে বেশী কথা বলার সময়ও দিল না ভরত। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল তাকে, কী ভেবেছে কি সে? বাবু চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন, তার ভরসায় বাড়ি ছেড়ে রেখেছেন বাবু, আর সে এমন ভাবে একেবারে ডুব দিয়ে বসে আছে! এমনিই সে থাকে বুঝি! এই তার বাড়ি পাহারা দেওয়া? এখন যদি এই দিদিমণি বাবুকে সব খুলে লেখেন?

অতঃপর দিদিমণির মালপত্রের বা কাপড়জামার স্বল্পতা সম্বন্ধে প্রশ্ন বা সংশয় প্রকাশ করবে মালীর এত সাহস নেই!

তা হোক, কিন্তু চলে কিসে? গঙ্গা বলে, আমাকে একটা কোন কাজ যোগাড় ক'রে দাও। এমন দেনা ক'রে তুমি আমাকে খাওয়াবে কদিন? আমিই বা খাব কেন? ভরতেরও বাঁধা উত্তর, 'খাওয়াব না তো কি তুমি উপোস ক'রে থাকবে? আর কাজ? কাজ কী করবে?'

'যা হোক। সেলাই বোনা জানি, লেখাপড়া জানি, ছেলেমেয়ে পড়াতে পারব।'

'ওসব কাজের খবর আমি বলতে পারব নাই। ওসব শহরে গিয়ে বাবুদের কাছে খবর নাওগা।'

'শহরে গিয়ে আমি কার কাছে কি বলে দাঁড়াব? তুমি যা পারো তাই যোগাড় দাও—বাসন মাজারও কাজ হোক, আমি তাই করব।'

'সে.তুমাকে কেউ রাখবেক নাই। ই জুয়ান বয়েস, লিখাপড়া জানা—সন্দ করবেক নানারকম। আর ধম্মটিও বাঁচাইতে পারবেন নাই।'

'তাহলে উপায়?'

এর কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ভরতের শুধু দেনার ওপর দেনা বাড়ে। মালিকের অনেক টাকা বাকী পড়ে যায়। গঙ্গাও তা টের পায়। শেষে, মাসখানেক পরে সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল একদিন।

ভরত ওকে বিয়ে করবে? ওদের মতো ক'রে। সাঙ্গা না নিকে কী বলে ওরা? না হয় রঙ্কিনী মা'র মন্দিরে গিয়ে মালাবদল? তাহলে সোজাসুজি ভরতের ঘরে গিয়ে উঠতে পারে সে। সেখানে ঢেঁাড়া তৈরি করে মুড়ি ভেজে লোকের ধান ভেনে দিয়ে কিছু কিছু রোজগারও করতে পারে।

ভরত প্রথমটা ভেবেছিল তামাশা। তখন মজা করার মতো ক'রে সায় দিয়েছিল। তারপর যখন বুঝল তা নয়, তখন জিজ্ঞেস করেছে, মাথাই

খারাপ হয়ে গেছে গঙ্গার, নাকি ওকে পাগল পেয়েছ সে? একদিন তো এলই না এদিকে, খবরই নিল না। গঙ্গাই ওকে খুঁজে বার করল। শুধু তাই নয়, সোজাসুজি এসে একদিন ওর ঘরেই উঠল।

এরপর তিনটে-চারটে বছর কেটেছে ভরতের যেন একটানা স্বপ্নের মধ্যে, এমন আদর-যত্ন জীবনে পায় নি। এমন ভালবাসাও না। এত লেখাপড়া-করা মেয়ে তার মতো একটা মূর্খ রিক্শাওলাকে, ভরতের ভাষায় ছোটলোককে, ভালবাসতে পারে তাই তো অবিশ্বাস্য।

খাটতও মেয়েটা অপরিসীম। নানারকমে রোজগার করার চেষ্টা করত কিছু কিছু। শেষের দিকে চানাচুরের যোগান দিত ফিরিওলাদের, পাইকিরি ব্যবস্থা, তাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হ'ত প্রায়, তার সঙ্গে নিজের সংসারের কাজ তো আছেই। ভরতও মনের উৎসাহে দ্বিগুণ কাজ করতে লাগল। ফলে সব দেনা শোধ হয়েও হাতে কিছু জমল ওদের।

কিন্তু এ সুখ সইল না। ভরতের ভাগ্য তাকে সর্বনাশের দিকে টানল। এ লাইনের যা দস্তুর। দেবী রায়, যতীন, লক্ষ্মণ—অন্য রিক্শাওলাদের দলে পড়ে একদিন সে ধাঙ্গীর আড্ডায় গিয়ে পড়ল। সে গোপনে মদ চোলাই করে, সস্তায় দেয়। বোধ হয় অন্য কিছু মাদকও মেশায় মদের সঙ্গে, যাতে তার কাছেই বার বার যেতে হয়। নিজের দেহ সম্বন্ধেও সে যথেষ্ট উদার। এইসব কারণে তার আড্ডার খুব নাম ছিল সে সময়ে। এখন আর নেই, প্রথম পুলিসের হাতে পড়ে, তারপর যমের হাতে।

অনেকদিন নিজেকে সামলে রাখলেও শেষে আর পারল না ভরত। সেই কড়া মদ খানিকটা গিলে বাড়ি ফিরল।

গঙ্গা যেন সাদা হয়ে গেল একেবারে। আর যাই হোক এটার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। এরা, এই শ্রেণীর লোকেরা সবাই মদ খায়, তবু ভরত যে খাবে খেতে পারে, এটা যেন এতকাল তার মাথায় আসে নি। এর চেয়ে ভরত যদি ওকে ঘাকতক মার দিত, লাথি মারত, তাহলেও সে এত বিচলিত হ'ত না। সে ভরতের সামনে মাথা খুঁড়তে লাগল।

অপ্রতিভ ভরত বার বার প্রতিজ্ঞা করল এ কাজ আর সে করবে না। সেদিনের মত শান্ত হ'ল গঙ্গা। কিন্তু সহকর্মীরাও নাছোড়বান্দা, আসলে তারা

সকলেই ভরতের সৌভাগ্যে ঈর্ষিত, তাই ওকে টেনে নিজেদের স্তরে নামিয়ে ওর সুখের ঘর না ভাঙতে পারলে তাদের সুখ নেই।

আবার ও একদিন মদ খেয়ে ফিরল। আবারও কান্নাকাটি, এ পক্ষের অনুশোচনা। এমনি ক'রেই কয়েকদিন চলল। শেষে এই দিনগুলোর সংখ্যা বাড়তে একদিন গঙ্গা ওকে রঙ্কিনীর বাড়ি নিয়ে গেল। বলল, 'মা'র চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করো—এ কাজ আর করবে না? আমি সব ছেড়ে তোমার কাছে এলুম কেন, আবারও মাতাল জুয়াড়ীর ঘর করতে হবে বলে?'

দিব্যি গালল ভরত তখনই, কিন্তু সে দিব্যিও রাখতে পারল না। দিন দশেক কোনমতে সামলে ছিল। তারপর একদিন আবারও মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল, রোজগারের সব পয়সা খুইয়ে। সেদিন আর কোন কান্নাকাটি করল না গঙ্গা, শান্ত স্বরেই বলল, 'এত বড় দিব্যিটাও রাখতে পারলে না? সেই মদ খেয়ে এলে?'

ভরত তখন পুরোপুরি মাতাল, সেও রুখে উঠল, আরও বন্ধুদের অবিরাম ধিক্কারটাই মাথার মধ্যে ছিল, 'একটা মেয়েছেলেকে তোর এত ভয়, তায় ঘরের বৌ?' সে জবাব দিল, 'উ দব্যটি খাওয়া আমি ছাড়তে পারব নাই।'

দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল গঙ্গার, বলল, 'ঠিক আছে, ঐ দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই যেন না খেতে হয় কোন দিন—মা রঙ্কিনীকে আমি এই কথাই জানিয়ে গেলাম।'

সে আর দাঁড়াল না। দাওয়া থেকে তর তর করে নেমে কোথায় বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল দেখার মতো অবস্থা নয় তখন আর ভরতের, সে সেইখানেই দাওয়াতে মুখ গুঁজড়ে পড়ল বেহুঁশ অবস্থায়।

পরের দিন ভোরে উঠে গঙ্গাকে না দেখে যেন একটু অবাকই হয়ে গেল। তারপর যখন মনে পড়ল কথাগুলো, তখনও অত ব্যস্ত হবার কারণ দেখল না। রাগের মাথায় কোথাও গিয়ে বসে আছে হয়তো, মন্দিরে কি আসাই-নগরের ঘাটে। সে রিক্‌শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বেরোল বটে কিন্তু স্থির থাকতেও পারল না। লোকালটা পাস করিয়েই ফিরে এল, তখনও বৌ ফেরে নি দেখে একটু চিন্তিত হ'ল। রিক্‌শা নিয়েই বেরোল কিন্তু ভাড়া তুলল না, গঙ্গাকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল;···এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করল, সেদিন আর খাওয়াও হ'ল না কিছু, খাওয়ার

কথা তখন মনেও পড়ে নি।

খোঁজ পাওয়া গেল একেবারে সন্ধ্যার ঝোঁকে। কাছিমদহের কাছে একটা বড় পাথরে—বাবুরা যাকে 'রোল্‌ডার' বলে, আটকে আছে গঙ্গার মৃতদেহটা।

কাহিনী শেষ ক'রে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভরত বললে, 'তার পর থিঁকে এই। কী যে ভুক করি গেল, মদ ছাড়া আর কিছু পেটে যায় নাই। জোর করি খাঁলেও বিপুরীত ব্যাপার হয়—চোখেই তো দেখলেন আজ্ঞা!'

তারপর একটু থেমে বলল, 'তবে বেশী দিন আমাকে ছেড়ে সি থাকবে নাই হুঁজুর, আমার সাজাটা ভোগ ক'রে লিতে যা দেরি। তারপর দেখা দিবে লিশ্চয়, এসে ডেঁকি লিয়ে যাবেক।...'

এর বছর দুই পরে শুনলুম ভরত একদিন মাতাল হয়ে রাত্রে গাড়ি চালাতে গিয়ে রিক্‌শাসুদ্ধ হাতিজোবড়ার খালে পড়ে মারা গেছে। কখন পড়েছে কেউ জানে না, মরে পড়ে ছিল—সকালে উঠে লোকে দেখেছে।

এতদিন দেখেছি, মাতাল হয়ে খালে পড়ার লোক নয় সে, অন্ধকারে ঐ পথে অভ্রান্ত গতিতে গাড়ি চালিয়েছে বহুদিন। তাছাড়া ঐটুকু উঁচু থেকে একহাঁটু জলে পড়ে মরবেই বা কেন?

কে জানে, তার 'সি'-ই হয়তো সেদিন তাকে দেখা দিতে এসেছিল। প্রায়শ্চিত্তর কাল পূর্ণ হতে ডেকে নিয়ে গেছে।

বিঘ্নরূপিণী

আমার বন্ধু সুনীলের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটা তত অস্বাভাবিক নয়। বরং বলা চলে বহুদিনের ঘটনাপ্রবাহের পূর্বাপর সংসারাভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কিন্তু তার বিয়ে করাটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য, অবাক হয়ে যাওয়ার মতোই ঘটনা।

সুনীল আমার সহপাঠী। স্কুলের নিচের ক্লাস থেকে একসঙ্গে পড়েছি। সৌম্য ও প্রিয়দর্শন। শান্ত স্বভাবের ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল, ভাল গান গাইতে পারত। সেজন্যে সহপাঠী ও শিক্ষক সকলেরই প্রিয় ছিল সে।

সংসার সম্বন্ধে তার বীতস্পৃহার কোন প্রবল কারণ ঘটেছিল কিনা জানি না। তবে যা জানি, যেভাবে একটু একটু ক'রে এ ভাবটা তার মধ্যে এসেছে, তাও খুব তুচ্ছ বা সামান্য নয়। আসলে ওর মূলে ওদের আর্থিক অভাব ও তার ফলে সাংসারিক অশান্তিই প্রধান। বাবা সামান্য চাকরি করতেন। তার মধ্যে তিনটি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে। মেয়েরা সকলেই খুব সুন্দরী কিন্তু তাই বলে কেউ বিনা পয়সায় নেয় নি তা বলাই বাহুল্য। ছোটটি তো পদ্ম-ফুলের মতো দেখতে, তাকে ষোল বছর বয়সে চুয়াল্লিশ বছরের তেজবরের হাতে দিতে হয়েছিল, তবু সাত-আটশো টাকা তো খরচ করতেই হয়েছে, সেই ১৯২৭-২৮ সালে, সারা পৃথিবী 'টোল খাওয়া'র দুর্দিনেও। ফলে আক্ষরিক অর্থেই সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। যে চাকরি করতেন তাতে পেন্‌সন্ ছিল না। চাকরি যাওয়ার পর স্ত্রী ও ছোট ছেলে অর্থাৎ সুনীলের খরচ চালাতে তাঁকে শেষ অবধি যজমানি ধরতে হয়েছিল, কিন্তু সে পেশাতেও খুব সুবিধে করতে পারেন নি।

সংসারে কাজ করার লোকের অভাব, এই অজুহাতে মা তাড়াতাড়ি দাদার বিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর অভাব মেটে নি, দাদার অভাব বেড়ে গিয়েছিল। তিন-চার বছরের মধ্যে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে হয়ে ন্যাঞ্জারী হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। লেখাপড়া বেশী ছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায়-কারীর চাকরি, তখন বোধ হয় ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে ছিল, সংসারে বেশী কিছু দিতে পারতেন না এবং বৌটিও ছেলেমেয়ে সামলে বিশেষ খাটা-খাটুনি করতে পারত না বলে মা রাগ ক'রে শেষে আলাদা ক'রে দিয়েছিলেন।

এই সব দেখেই প্রধানত সাংসারিক জীবনে বিতৃষ্ণা এসে থাকবে সুনীলের, অবশ্য যখন থার্ড ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি (এখনকার ক্লাস এইট/নাইন) তখনই দেখেছি, কেউ গান গাইতে বললে বা নিজে থেকেই যা গাইত, সব ভগবৎরসের গান। তবে লেখাপড়াটা ছাড়ে নি। কিন্তু বি. এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই মা মারা যেতে সব ওলটপালট হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'বিয়ে কর এবার, নইলে ভাত জল দেয় কে ?' দাদা বললেন, 'তার আগে অন্নের সংস্থান তো দেখতে হবে। ভাল চাকরি যখন পাবি তখন করিস, এখন পাড়ার ইস্কুলে ঢুকে পড়। ওদের অঙ্কের মাস্টার দরকার। তুই তো ভাল আঁক জানিস, এখনই নিয়ে নেবে। চল্লিশ টাকা মাইনে দেবে বলছে, মোটা-

মুটি চলে যাবে একরকম।'

কিন্তু কোন সৎ পরামর্শেই কান দিল না সুনীল। এক গৃহস্থ সাধু তখন খুব নাম করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁর কাছেই যাতায়াত শুরু করল। সুকণ্ঠ ও সুমিষ্ট স্বভাবের জন্যে সর্বত্রই সমাদর হ'ত ওর সহজে। সেই জোরেই এই গুরুরও সে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তাঁরই এক ধনী শিষ্যর বাগানবাড়ি পড়ে ছিল ত্রিবেণীর কাছে, পড়েই থাকে সে বাড়ি। তিনি জানালেন সেখানে সুনীল বাস করলে তিনি কৃতার্থ ও উপকৃত হবেন। এক মালী শুধু থাকে সেখানে, সেই বেটাই সব লুটেপুটে খাচ্ছে, একটা ঘাসের ডগাও পান না তাঁরা, ইত্যাদি।

সুনীল আর দ্বিধা করল না। সেইখানেই চলে গেল। যাতে উপবাসী না থাকে, গুরু সে ব্যবস্থাও করে দিলেন। কিছুদিন পরে সে প্রয়োজনও রইল না। ওর জীবনযাত্রার কথা শুনে প্রচুর সিধা আসতে লাগল, তত ওর দরকার হ'ত না। মালী ব্যাপার দেখে সাগ্রহে রেঁধে দেবার প্রস্তাব করল। শেষ অবধি এক ব্রাহ্মণ দম্পতি দু'বেলাই ওর খাওয়ার ভার নিলেন। তাঁদের বাড়িতে লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা ছিল, প্রসাদ পাঠাতে তাঁদেরও কোন অসুবিধা হ'ল না।

সেখানে আমিও, দু-একবার খুঁজে খুঁজে, ওর সেই বাগানবাড়িতে গেছি। আমিই নাম দিয়েছিলাম 'সাধনাশ্রম'। যখন ঠিক সব ব্যাপারটা দেখি নি তখন অন্যান্য বন্ধুদের মতো আমিও ঠাট্টা-তামাশা করেছি ঢের। কিন্তু গিয়ে দেখে শুধু যে আমার ঠাট্টার প্রবৃত্তি চলে গেল তাই নয়, ওর জন্যে শঙ্কিতই হয়ে উঠলুম। কঠোর তপস্যার কথা পড়াই ছিল, এখন চোখে দেখলুম। এ যদি কঠোর তপস্যা না হয় তো কঠোর তপস্যা কাকে বলে তা জানি না।

ওর যা প্রাত্যহিক রুটিন দেখেছি তা মোটামুটি এই: মন্দির বা বিগ্রহ কিছু নেই, নিয়ম করা পূজো-পাঠ যা অনেক অধার্মিক লোককে করতে দেখেছি তার ধার ধারত না। গোটা বাগানবাড়িটা খালি পড়ে থাকলেও সুনীল গঙ্গার দিকে একটি ছোট ঘর বেছে নিয়েছিল। তাতেই মেঝেতে কম্বল পেতে শুত, মাথায় দিত একটা কাঠের পিঁড়ি, তার ওপর গামছাখানা ভাঁজ ক'রে পেতে নিত শুধু। একটা কুলুঙ্গিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মাঠাকরুনের ছবি, তাতে প্রত্যহ দু-চারটে ফুল দিত। অন্য কোন রকম পূজোর চেষ্টাও

করত না। কুলুঙ্গির সামনে একটা কম্বলের আসন পাতা, সেইটেই তার ধ্যান পূজা-পাঠের আসন।

ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে এসে বসে জপ করত। সাতটা নাগাদ এক গ্লাস চা খেত, মানে সেই ব্রাহ্মণরা যখন দিয়ে যেত। তারপর স্নান, প্রয়োজন মতো সাবান কাচা প্রভৃতি সেরে ধ্যানে বসত। চক্ষু নিমীলিত ক'রে বা স্থির দৃষ্টি সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ ক'রে ধ্যানস্থ হয়ে থাকত। সে সময় সে এমন নিথর হয়ে যেত যে প্রথম প্রথম দু-একদিন বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম।

এইভাবে থাকত প্রায় দশটা পর্যন্ত। তার পরে যখন আসন ছেড়ে উঠত, তখন দেখতুম চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, Blood-shot যাকে বলে, নাড়ি দেখেছি, সে সময় ওর ব্লাডপ্রেসার অন্তত তিনশোতে পৌঁছে যেত। ওকে বারণ করেছি বহুবার, এতটা ক'রো না, সন্ন্যাস রোগ হয়ে যাবে। সুনীল তর্ক করত না, শুধু মুখ টিপে মিষ্টি ক'রে হাসত। ওর এই হাসি ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, disarming, তার পর আর ওকে আঘাত দেওয়া যেত না।

এইবার আসত জলখাবার। কোনদিন মুড়ি ছোলাসেদ্ধ, কোনদিন মুড়ি মুড়াক, কোনদিন বা রুটি গুড়। জলখাবার খেয়ে ও আবার জপে বসত। কোনদিন বা হার্মোনিয়াম টেনে নিয়ে গান শুরু করত। দুপুরের খাবার আসতে সেই যার নাম বেলা দুটো, সেই রকমই নাকি ওর নির্দেশ ছিল। নিরামিষ ভাত ডাল তরকারি। বড় জোর এক-আধদিন একটু দই।

খাওয়ার পর একটু শুত কিন্তু ঘুমোত না। এই সময়টা রেখেছিল বই পড়ার জন্যে। বিকেলে বাগানে একটু পায়চারি, সন্ধ্যায় আবার জপ ও ধ্যান। সেটা কোন কোন দিন ঘরেও হ'ত, কোনদিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে গঙ্গার ধারেও। তবে প্রস্ফুট জ্যোৎস্নারাত্রে কখনও গঙ্গার ধারে বসত না। কে জানে মন ওই জ্যোৎস্নায় চঞ্চল হ'ত কিনা, অথবা লোক দেখতে পেয়ে এসে অলস কৌতূহলে অর্থহীন আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করবে, এই ভয়।···রাত দশটায় শুতে যেত, জুটলে একটু দুধ নইলে এক গ্লাস গুড় বা বাতাসার সরবৎ।

এই ভাবেই চলছিল, চলেছিল প্রায় দশ-বারো বছর, হঠাৎ ঐ অঘটনটা ঘটিয়ে দিলেন ওর ভাগ্যবিধাতা।

যাঁদের বাগানবাড়ি তাঁরা এখানে আসতেন কখনও সখনও, কালেভদ্রে। এলেও তাঁরা সুনীল সম্বন্ধে সতর্ক থাকতেন খুব। ছেলেমেয়েদেরও সাবধানে রাখতেন, যাতে সুনীলের কানের কাছে বেশী হৈ-চৈ না করে। গুরুদেবের প্রিয় শিষ্য, সাধক বলেও খ্যাতি রয়েছে, একটু সমীহই করতেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদেরও কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন ধনীবন্ধু আছে। তার চেয়েও বড় কথা 'খাতিরের লোক' অর্থাৎ যাদের আপ্যায়িত করলে পরলোকের কাজ না হোক, ইহলোকের হবে।

এমনিই এক খাতিরের লোককে একবার বাগানবাড়ি ছেড়ে দিতে হ'ল। সুনীল সম্বন্ধে সতর্ক নিশ্চয়ই করেছিলেন—সুনীলকেও এদের সম্বন্ধে, কিন্তু এরা কেমন সেটা বোধ হয় জানা ছিল না, অন্তত এতটা ছিল না। এঁরা এলেন গোয়ানীজ বাবুর্চি ও ক্রেট ক্রেট হুইস্কীর বোতল নিয়ে। উৎকট সাহেব, ছেলে বাবা ও বাবার জামাই একত্রে বসে মদ খান। গৃহিণী আসেন নি, হয়তো এতটা তাঁর ধাতে সয় না, মেয়ে ও বৌ এসেছে, তারাও আধুনিক দলের। এ ছাড়া দু'তিনজন বয়স্য মোসাহেব, চাকর বেয়ারা ঝি, আরও দু-একটি তরুণী মেয়ে। তারা দাসী কি আশ্রিতা শ্রেণীর—ঠিক বোঝার উপায় ছিল না।

সাহেব যিনি—মিঃ সরখেল—তিনি এসেই মন্তব্য করলেন সুনীলকে শুনিয়েই, 'এঃ, গঙ্গার ধারের ভাল ঘরটাই তো দেখছি বেদখল। এমন জানলে—'

এমন জানলে কি করতেন সেটা উহ্য রইল, কিন্তু সুনীলের ভাল লাগল না কথাটা। সে মালীকে বলে বাড়ি ছেড়েই চলে যাচ্ছিল, মালী বলে-কয়ে জোর ক'রে সসম্মানে সস্নেহে নিজের ঘরে রাখল। মিঃ সরখেলরা তখনই সে ঘর দখল করলেন, ঘরটা হ'ল ওদের মদের ভাঁড়ার।

দূরে থাকলেও এত হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ কানে আসবে না তা সম্ভব নয়, অন্য লোক হলে বিরক্ত হয়ে চলে যেত—মানে সুনীলের মতো ধ্যানধারণা-সর্বস্ব লোক, কিন্তু সুনীলের অসীম ধৈর্য। তা ছাড়া এটা সে জানত, এই সংবাদ কানে গেলে বাড়ির মালিকরা খুব অপ্রতিভ বোধ করবেন। এতকাল যাঁরা সসম্মানে আশ্রয় দিয়ে এসেছেন, তাঁদের বিব্রত করা উচিত হবে না। সুতরাং যতটা সম্ভব 'গৃহগত' হয়ে সে থেকেই গেল।

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় সুনীল ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা জায়গায় এসে বসেছে, একটি মেয়ে প্রায় আছড়ে এসে পড়ল ওর পায়ের কাছে।

'আমাকে বাঁচান! শুনেছি আপনি যথার্থ ভদ্রলোক, আপনি পূজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন—আপনি আমার অসম্মান করবেন না! নইলে যার যার আশ্রয়ে গেছি তারা সকলেই আমাকে অপমান করেছে, লাঞ্ছনার কিছু বাকী রাখে নি!'

ঝাপসা ঝাপসা নক্ষত্রের আলো, কিছুটা বাড়ির আলোও প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে—তাতেই মনে হ'ল মুখটা একেবারে অচেনা নয়। এরা যেদিন প্রথম আসেন—এই সরখেল সাহেবরা, সেদিন ওদের দলেই দেখেছে সে। অপেক্ষাকৃত নগণ্য বা পশ্চাদ্‌বর্তীদের দলে।

খুবই বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে উঠেছিল সুনীল। সুপরিকল্পিত বিঘ্ন ভেবেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল এরা ওকে পরীক্ষা করার জন্যেই এই কাণ্ডটা করছে, ওকে নিয়ে একটা তামাশা করার জন্যে। কিন্তু সুনীলের মধ্যেকার স্বভাব-ভদ্র ও শান্ত মানুষটিরই জয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত, সে স্থির হয়ে বসে মেয়েটির কথা শুনেছিল। বহু অসংলগ্ন কথা ও কান্নার মধ্য থেকে, স্পষ্ট ভাষা ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত থেকে তার ইতিহাস যা উদ্ধার করা গেল তা এই—

মেয়েটির নাম অশোকা। সৎ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম। মা ক্যানসারে মারা যান বাবাকে ঋণগ্রস্ত ক'রে। সামান্য বেতনের স্কুলমাস্টার বাবা তবুও পড়াচ্ছিলেন ওকে। কিন্তু ম্যাট্রিক দেবার আগেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। সেদিন না ছিল কিছু সঞ্চয়, না ছিল তেমন কোন আত্মীয়। এক মামা ছিলেন, তিনি বহুদিন যাবৎ বিলাতবাসী, সে সময় বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে ঘানায় বাস করছেন। আসতেও পারেন নি, ভাগ্নীকে নিয়ে যাবারও কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কেবল কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষক বন্ধুরাই সবাই চাঁদা তুলে শ্রাদ্ধটা সেরে দিয়েছিলেন, কেবল ওকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এদিকে মামার পাঠানো টাকা এবং দু-পাঁচ টাকা যা স্কুল থেকে পাওয়া গেছিল তাতে বড়জোর তিন-চার মাস চলতে পারে। মামাকে জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে ওঁরা সেখানেই রেখে

দিলেন অশোকাকে—স্থির হ'ল হেড পণ্ডিতমশায়ের ছেলে এসে রাত্রে শুয়ে থাকবে। দুখানা ঘর, কোন অসুবিধা নেই। ছেলেটি ওর সমবয়সী, বন্ধুরই মতো। সেখান থেকে কোন বিপদ-আশঙ্কা নেই। কিন্তু বিপদ হ'ল বন্ধুর মতো বলেই। সান্ত্বনা দিতে অশোকার পিতৃপ্রসঙ্গ এসে পড়ত, তাতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে গল্প করা স্বাভাবিক। সেই অবসরে, শোক-বিহ্বলতার সুযোগে, সে-ই তার কৌমার্যের শ্রেষ্ঠ ফুলটি নষ্ট করল।

মামার জবাব এল, এখন আসা বা ভাগ্নীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিলাতের পুরনো চাকরি যেতে এখানে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছেন, এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে। খরচাও খুব বেশী। বরং একটা ঠিকানা দেওয়া থাকলে তিনি সাধ্যমতো কিছু কিছু খরচ পাঠাবেন।

বাবার বন্ধুরা ভেবেচিন্তে তাকে দূরসম্পর্কের এক পিসেমশাইয়ের কাছে পৌঁছে দিলেন। কালনার আদালতে মোক্তারী করেন তিনি। জিনিসপত্রের বিক্রয়াবশিষ্ট টাকাসহ মেয়েটিকে একজন এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তিনি বুঝিয়ে বলে গেলেন, মেয়ের হাতে কিছু রইল, মামাও নিয়মিত খরচ পাঠাবেন। এখন যা প্রয়োজন একটা অভিভাবকত্বের। সেটা আত্মীয় ছাড়া সম্ভব নয় বলেই ওঁর কাছে এনেছেন। বিশেষ এই যৌবনপ্রাপ্তা মেয়ে বলেই।

পিসেমশাই স্থান দিলেন। টাকাগুলি আগেই হাতে ক'রে নিলেন তিনি, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখবেন বলে, বেশী নয় অবশ্য, হাজার খানেক টাকা, তবু গরিবের পক্ষে তাই যথেষ্ট—অতিরিক্ত মূল্যটাও আদায় ক'রে নিলেন দিনকয়েকের মধ্যেই। জোর ক'রেই করলেন। অন্যথায় তিনি ওকেই দায়ী করবেন, চেঁচামেচি করবেন—এই ভয় দেখিয়ে।

পিসেমশায়ের কথা পিসিমার জানতে দেরি হয় নি, কারণ স্বামীর স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। তিনি এবার ব্যস্ত হয়ে নানা অজুহাতে ওকে সরিয়ে দিলেন। শুরু হ'ল এই ভদ্রভাবে দাসীবৃত্তি। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে। সাধারণ ভাবে ঝিয়ের কাজ করলে খাওয়া-পরা ছাড়াও কিছু টাকা হাতে পেত। এ তাও পায় না, বরং সম্ভ্রম রাখতে গিয়ে সম্ভ্রমটাই আগে খোয়াতে হয়।

শেষ পর্যন্ত তাকে এই নরককুণ্ডে এসে পড়তে হয়েছে। তথাকথিত এক আত্মীয় তার এই উপকারটি করেছেন। ভদ্র ধনীর আশ্রয়, অগাধ প্রতিপত্তি,

একটু দয়া হলেই একটা বিয়ে দিয়ে দিতেও পারবেন—এই আশ্বাস দিয়েই পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এবার অশোকার দুর্দশা চরমে পৌঁচেছে। এখানে আসার পর থেকে তাকে বাবা ও ছেলে উভয়েরই 'সেবা' করতে হয়। দুজনেই অপরজনের কথা জানে, কিন্তু কারুরই তাতে আপত্তি কি অরুচি নেই। কেউ কাউকে সংযত করার প্রয়োজন বোঝেন না। বোঝেন না মেয়ে-বৌও। তাদের কাছেও কাঁদাকাটা করেছে—কোন ফল হয় নি। বৌ বরং ঠোঁট উল্‌টে বললে, 'আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পাচ্ছি, আমার ও-ই লাভ।' মেয়ে বলেছে, 'কি করবে বল, এ বাড়ির এই ধারা। এ থেকে মুক্তি নেই। তাছাড়া তুমিও তো আর ধোয়া তুলসীপাতা নও, এই প্রথম জাত দিচ্ছ না।' বাবুর যে পেয়ারের খানসামা, এক নেপালী ছোকরা, সেও সুযোগমতো হাত বাড়িয়েছে। বাড়িয়েছে বাবুর সামনেই, বাবুর তাতেও আপত্তি নেই। আপত্তি করার জো নেই হয়তো। কারণ বাবুর সে সব রকম প্রয়োজনে লাগে, বাবুর সমস্ত রকম কুকর্মেরও সাক্ষী।

অনেক সহ্য করেছে, আর পারছে না, আর পারবে না। আজ তাই মরীয়া হয়ে ছুটে এসেছে সুনীলের কাছে, ওঁর কথা মালীর কাছে শুনেছে অশোকা, যে দুধ দিতে আসে পাড়া থেকে—তার কাছেও। উনি দেবতা। সেকালের ঋষি তপস্বীর মতো—উনি যদি কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন তো ভালই, নইলে সামনেই গঙ্গা, এমন সুযোগ আর পাবে না সে।

স্থির হয়ে বসে শুনেছিল সুনীল। শোনার পরও বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিল। যে দীর্ঘকাল মিথ্যা কথা বলে নি, অন্তত জ্ঞানমতে—তার কোন্‌টা সত্য বলছে লোকে কোন্‌টা মিথ্যা—বোঝবার একটা অদ্ভুত শক্তি জন্মায়। এ মেয়েটা যে মিথ্যা কথা বলছে না সেটা বুঝেছে ও। ওর করুণ অসহায় অবস্থার কথা শুনে তার মধ্যেকার উদাসীন নিস্পৃক্ত মানুষও যেন একটা যন্ত্রণা বোধ করছে। কিন্তু এর প্রতিকারের কি উপায় করবে সে? বহুদিন সংসারের সঙ্গে সংস্রবহীন তার মতো মানুষের করার কি উপায় আছে—সেইটাই ভেবে পাচ্ছে না।

তবু সময়ও আর নেই। তাও বুঝেছে ওর ওষ্ঠের দৃঢ়সম্বদ্ধ ভঙ্গীতে। তাই শেষ পর্যন্ত বলেছে, 'কাল সকালে দশটা নাগাদ একবার এস।'

'সকালেই !' যেন চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল অশোকা।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে ?'

'জানতে তো পারবেই। তাতে কি ? গোপন করার তো কোন কারণ নেই। তুমি তো ওদের কেনা বাঁদী, কি মাইনে করা ঝি নও। প্রকাশ্যেই চলে আসবে। লুকোবার, ভয় পাবার কারণ তো ওদের, তোমার তো নেই কিছু !'

সুনীলের সেই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে কী আশ্বাস পেয়েছিল অশোকা কে জানে, সেও অনেকখানি শান্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল।···

পরের দিন ঠিক সকাল দশটাতেই এসেছিল সে আবার।

ওদের, মানে আগন্তুক সাহেবদের সেটা ঘুম থেকে ওঠার সময়, বিছানায় শুয়ে চা খাবার। তাছাড়া এ রকম যে হতে পারে তা ভাবা ছিল না, তাই নজর রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন নি কেউ। বাধা দেবার বা কৈফিয়ৎ চাইবার প্রশ্নই ওঠে নি। স্নান সেরে পূজার্থিনীর মতই এসে সুনীলের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়েছিল অশোকা।

কিন্তু এমন অকল্পনীয় অভাবনীয় প্রস্তাব যে সুনীল করতে পারে তা ওরও ভাবা ছিল না। স্বপ্নের—সুদূর কল্পনার অগোচর। অন্য কোন ভদ্র আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে কি কোন কাজ শেখাবার, জীবিকার সন্ধান দেবে—এই ভেবেছিল। সেটাই ওর কাছে চরম সৌভাগ্য হ'ত।

সে কথাও সুনীল ভেবেছে বৈকি। কিন্তু তেমন কোন যোগাযোগের কথা সুনীলের মনে পড়ে নি। দীর্ঘদিন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্ক ছাড়া। দরিদ্র নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে সে, তেমন কোন প্রভাবশালী আত্মীয় তখনও ছিল না। একই গুরুদেবের সূত্রে দু-চারজন ধনী বা প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—গুরুদেব স্নেহ করেন বলে তারাও সমীহ করত—কিন্তু সেও আজ বহুদিনের কথা হ'ল। আজ খুঁজে খুঁজে তাদের কাছে গিয়ে একটা অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের জন্যে ভিক্ষার্থী হয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হয় নি।

সেরাত্রে সোজাসুজি ধ্যানস্থ হয়ে গুরুদেবের কাছেই পথ জানতে চেয়েছিল তাই। সারারাতই সেই ভাবে বসে ছিল সে। গুরুদেব তাকে বলে-

ছিলেন, 'তুমি যখনই কোন প্রয়োজনে ব্যাকুলভাবে আমাকে চিন্তা করবে, আমি ঠিক তোমার কাছে পৌঁছব।' পৌঁছে ছিলেনও। শেষরাত্রে স্পষ্ট শুনেছে সে তাঁর কণ্ঠস্বর, অনুভব করেছে তাঁর স্নেহের তাপ। তাতেই জোর পেয়েছে সে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে।

সুনীল বলল, 'যদি তুমি রাজী থাক, আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি। তবে আমি ভিখারী, পরের দয়ায় জীবনধারণ করি, সেই ভাবেই তোমাকেও থাকতে হবে। আরও একটা কথা—আমাদের কোন দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না, আমি শুধু তোমাকে সম্মানটাই দিতে পারব, সন্তান নয়। পরে যদি তেমন কোন পাত্র পাই, যে সব জেনে আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমাকে নিতে রাজী থাকে—আমি বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ক'রে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। বা তুমি যদি তেমন সজ্জনের সন্ধান ও সম্মতি পাও আমাকে জানিও। আরো লেখাপড়া ক'রে কর্মক্ষম হতে চাও, সেও ভাল। সে তোমার উদ্যমের ওপর নির্ভর করবে। আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করো না। আমাকে বিবাহ করলে আপাতত এই যন্ত্রণা থেকে, এই বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেতে পারবে এই পর্যন্ত।'

প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে নি অশোকা—বেশ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণ সত্ত্বেও। সেটাই স্বাভাবিক। ওর মতো অভাগিনীকে এমন তপস্বী ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করবেন? কী বলছেন উনি!

সে সংশয় অবিশ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে শুনল, 'তুমি এখন বলো, কি তোমার ইচ্ছা। আর কোন পথ খোলা নেই আমার। তোমাকে অন্য কোন উপায়ে সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। তোমার আপত্তি থাকে—তুমি এ প্রস্তাব ভুলে যাও।'

অতঃপর সুনীলের পরিচিত মহলে যে অবিশ্বাস ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে আনন্দের ঝড় উঠল—তা অবর্ণনীয়। ইংরেজীতে যাকে কমোশ্যন বলে তাই। সে মহলের পরিধি ক্ষুদ্র হলেও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়।

সাহেবরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এ লোকটার স্পর্ধায় ধৃষ্টতায়। কিন্তু কি করবেন তাও বুঝতে পারলেন না। অশোকা স্পষ্টই জানাল—সে সাবালিকা,

ওরাও কিছু তার আত্মীয় বা আইনত অভিভাবক নন, সে ওদের মাইনে-করা দাসীও নয়।

তাতেও ওঁরা নিরস্ত হতেন না—কিন্তু দেখা গেল এই গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত শান্ত সাধুসদৃশ ব্যক্তিটির একটা সদগতিতে, একটা 'ভাত-জল' দেবার, সেবা করার লোক জুটছে শুনে, আনন্দিত উৎসাহিত। তারা ইতিমধ্যেই চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। তাছাড়া অশোকার দুর্গতির কথা যখন সুনীলকে সে বিবৃত করছে—মালীটা আড়াল থেকে শুনে থাকবে—সে বিবরণও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, ছেলেরা দল পাকাচ্ছে এদের সমুচিত শিক্ষা দেবে বলে।

এরা তখন কিছুটা অসহায় ভাবেই সুনীলের আশ্রয়দাতাকে জানাতে গেলেন। প্রথমটা তো তাঁরা—সুনীল মালীর ঘরে যেতে বাধ্য হয়েছে শুনেই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, তারপর গুরুদেবকে জানাতে গিয়ে যখন শুনলেন —'আমি জানি, আমার সম্মতি ছাড়া সে এ কাজ করে নি। এ বিবাহে ওর সাধনার কোন বিঘ্ন হবে না। কিন্তু তুমি বাবা ঐ রকম কদাচারী লোকদের ওখানে থাকতে দিয়ে ভাল কাজ করো নি। সুনীলকে উত্ত্যক্ত করেছে বলে নয়, ঐ গ্রামে তোমার মর্যাদাও কিছুটা নষ্ট হ'ল।'—তখন লজ্জার পরিসীমা রইল না। সোজাই তাঁদের বলে দিলেন—আপনারা যত শিগগির হয় ওখান থেকে চলে আসুন, নইলে অসুবিধায় পড়বেন।

বিয়েটা রীতিমতো মন্ত্র পড়ে যজ্ঞ করেই হ'ল। পাঁচজন উপস্থিতও ছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন আধা-সন্ন্যাসীর বিবাহ দেখতে, যে লোক গৃহী হবে কেউ ভাবতেও পারেন নি কখনও। না-জানি সে বিয়েতে অভিনব কী সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে। অবশ্যই ভোজের আশা করেন নি কেউ। নিজেরাই কিছু কিছু মিষ্টান্ন এনেছিলেন, জলযোগের ব্যবস্থা হিসাবে। কিন্তু কৌতূহল কিছুটা চরিতার্থ হলেও—কিছুটা বলছি এই জন্যে যে এ বিয়েতে কোন অভিনবত্ব বা নতুন কোন পদ্ধতি দেখা গেল না, বিবাহের কৌতুকাংশ উপভোগ করতে পারল না কেউ। না হ'ল স্ত্রীআচার, না হ'ল বাসর। ফুলশয্যাও হবে না এমনি কানাঘুষো শোনা গেল। বলতে গেলে সেই দিনই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের শুরু, সেই দিনই শেষ।

সুনীল মালিককে বলে-কয়ে একতলায় সিঁড়ির নিচের একটা ছোট ঘর ঠিক করে দিল মালীর জন্যে, নিজে মালীর ঘরেই থেকে গেল। অশোকা

ওপরের সবচেয়ে যে ছোট ঘর সেইটেতে বাস করতে লাগল। কথা রইল কখনও মালিকপক্ষ সপরিবারে বা সপার্ষদ এসে পড়লে—অশোকা কদিনের জন্যে অন্য কোথাও সরে যাবে। যে ব্রাহ্মণ পরিবার সুনীলের খাওয়ার ভার নিয়েছিলেন তাঁরাই সেই ভবিষ্যতের জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন। তাঁদের বাড়িতে গিয়েই থাকবে—যতদিন না আবার এ বাড়ি খালি হয়।

তবে, পরিবর্তন একটা মেনে নিতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সব সূত্র ছিন্ন করা গেল না।

অশোকার বিছানা কাপড়-জামা, এমন কি কিছু কিছু বাসনপত্রও স্থানীয় অধিবাসীরা কিনে দিয়েছিলেন চাঁদা তুলে, এখন তার আহারের কথা ভেবে তাঁরা প্রায়ই এক রকম পালা ক'রে—সিধে পাঠাতে লাগলেন। সে প্রচুর জিনিস। একজনকে পাঠাতে গেলে আনুমানিক হিসেবের থেকে বেশীই পাঠাতে হয়। এখানে প্রচুর খাদ্য নষ্ট হবে—আর ওখানে একজনের বাড়ি থেকে ভাত জলখাবার আসবে, এটা বড় দৃষ্টিকটু ও অশোভন বোধ হতে লাগল অশোকার কাছে। শেষে আর থাকতে না পেরে একদিন সে গিয়ে দরজার বাইরে থেকে প্রণাম ক'রে বলল, 'আপনি তো দয়া ক'রে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদাই দিয়েছেন, আমি রেঁধে দিলে খাবেন না?'

সুনীল ঠিক বোধ হয় এ ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, যেন চমকে উঠল। মনে হ'ল ভয়ও পেল একটু। অনেক ইতস্তত ক'রে বলল, 'না, তা কেন—। সেই পরের দিনই তো পাকস্পর্শে—। মানে এমনি, চলে তো যাচ্ছে।'

'কিন্তু এখানে এত জিনিস আসছে, আমাকে রান্নাও করতে হচ্ছে। খাবার লোক তো আমি একা, বহু অপচয়ও হচ্ছে। এর ওপর ওঁদের ওখান থেকে খাবার আসবে—সেটা বড় খারাপ দেখায় না?'

'তা ঠিক। কিন্তু—'

কিন্তুটা ঠিক কি, তা বলতে পারল না। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, বেশ, কাল থেকে তুমিই খেতে দিও। তবে ঐ সামনে বসে ঠাঁই ক'রে যত্ন ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা করো না। ও আমার সইবে না! যা খাই, যখন যখন খাই, সবই তো দেখেছ—সেইভাবে সেই সেই সময়ে এইখানে চাপা দিয়ে রেখে যেও, আমার সুবিধামতো আমি খেয়ে যেমন বাসন বার ক'রে দিই তাই দেব।'

একটা কথা শুধু হয়তো মনে রইল না সুনীলের—'ওঁদের' বাড়িতে কাজ ক'রে যে মেয়েটি, সে-ই খাবার দিয়ে যেত, আবার বাইরে থেকে সে-ই বাসন নিয়ে গিয়ে মাজত। এখানে তেমন কেউ নেই, সেটাও অশোকাকেই করতে হবে। অর্থাৎ কিছুটা সেবা নিতেই হবে।

এই সিধা দেওয়া নিয়েই অর্জুন ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

সপ্তাহে একদিন ওপরতলায় সিধা পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় নিচেও দোরের বাইরে থেকে প্রণাম ক'রে যেত। প্রতিবাদ করতে গেলেও কথা কইতে হয়, ধ্যানের সময় মিছিমিছি কথা-কাটাকাটি করতে ইচ্ছা করে না। অর্জুনও কথা বলার চেষ্টা করত না। এক একদিন সন্ধ্যায় যখন একা বসে গান গাইত সুনীল, তখন এসে কাছে বসত, নিঃশব্দেই বসে থাকত। তাতেই তার দিকে আকৃষ্ট হয় প্রথম, দু-এক কথায় পরিচয়ও হয়। ভদ্র শিক্ষিত ছেলে, অবস্থাপন্ন অথচ অত্যন্ত বিনত। এই বয়সেই অধ্যাত্ম-জীবন সম্বন্ধেও যথেষ্ট আগ্রহী। এমন ছেলেকে ভাল লাগতে বাধ্য। কাজেই আলাপ ঘনিষ্ঠতাতেও পরিণত হতে দেরি হয় না। জানা গেল অর্জুনের মাথার ওপর কেউ নেই, এক দিদি ছাড়া। তিনি বৃহৎ পরিবারের গৃহিণী, তাঁর এ সংসারে এসে থাকা মুশকিল। এখানে একাই থাকে অর্জুন। অল্পবয়সে মা বাবা মারা যাওয়া সত্ত্বেও সে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। কলকাতায় এক কলেজে অধ্যাপনা করে, ইচ্ছে করলে সেখানেই থাকতে পারত। কিন্তু এখানের জমি-জমা বাড়ি ওর বাবার প্রাণ ছিল—তাই এখানেই থাকে সে, সব দেখাশুনো করে। ব্রাহ্মণ নয় অবশ্য, কিন্তু অত্যন্ত সদাচারী আর সত্যকার শিক্ষাপিপাসু।

ওকেই একদিন কথাপ্রসঙ্গে সুনীল অশোকার ইতিহাস বলল—অর্থাৎ কেন সে সংসারে বীতস্পৃহ হয়েও বিবাহ করতে বাধ্য হ'ল, বিবাহের পরই বা এমন বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছে—সব। এখন অশোকার ভবিষ্যৎটাই একটা চিন্তার বোঝা হয়ে ওর ঘাড়ে চেপেছে। বই কিছু কিছু সহৃদয় প্রতিবেশী এনে দিয়েছেন, অশোকা পড়ছেও—কিন্তু পড়াবার লোক না থাকায় বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। এভাবে চললে বি-এ পাস করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। আরও মুশকিল হয়েছে এই ব্যবহারিক জগতের চেয়ে অশোকা যেন আধ্যাত্মিক

জগতের দিকে বেশী ঝুঁকছে। তাতে দোষ নেই, কিন্তু বিনা শিক্ষায় বিনা গুরুতে এদিকেও কতটা এগোতে পারবে বলা মুশকিল। 'দায়িত্ব নেব না' বললেও এটা যে ওরই একটা দায়িত্ব, তাও সুনীল অস্বীকার করতে পারছে না। মধ্যে মধ্যেই এই চিন্তাটা ধ্যান-জপের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। অর্জুনের জানাশুনোর মধ্যে এমন কি কোন ভাল পাত্র আছে, যে সব জেনেশুনে অশোকাকে বিয়ে করতে পারে? তাহলে আইনত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে যা কিছু করণীয় ক'রে ওর জীবন মুক্ত ক'রে দেয় সুনীল। অর্জুন চুপ ক'রে বসে শুনল, তারপর সেই ভাবেই একসময়ে উঠে চলে গেল। কয়েকদিন এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলল না। সুনীলও আর প্রশ্ন করে নি। অর্জুনকে এতদিনে চিনে নিয়েছে সে, অনাবশ্যক কোন কথা বলার লোক সে নয়। হয়তো মনে মনে তোলাপড়া করেছে সে, কিম্বা তেমন কোন পাত্রই খোঁজ করছে সে।

তাই হ'ল। অর্জুন নিজে থেকেই এল, কথাটা তুলল কয়েক দিন পরে। বলল, 'আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, আপনার স্ত্রী জানেন? তিনি রাজী আছেন?'

আবার প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল সুনীল। চমকে উঠল সে। এ আবার কি কথা! সে বলল, 'মানে সে কথা তো গোড়া থেকেই হয়ে আছে। আর আমার কাছ থেকে সে তো কিছুই পাচ্ছে না—বিবাহিত জীবনের কোন সাধ-আহ্লাদও তার মিটছে না, মিটবেও না। তার অমতের আর কি আছে! এ তো একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত, তখনকার মতো রক্ষা পাবার জন্যে।'

এক রকম বাধা দিয়েই অর্জুন বলল, 'আপনি তবু একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেবেন ওঁর মতটা। আমার ধারণা, ব্যাপারটা অত সহজ হবে না। তবে তিনি যদি রাজী থাকেন আর আপনি যদি আমাকে অযোগ্য মনে না করেন, আমি প্রস্তুত আছি।'

সুনীলের মনে হ'ল সে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেল। শুধু অর্জুনের ঐ কথাটা কাঁটার মতো তারও মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। এতদিনে সে এটুকু বুঝেছে, সাংসারিক জ্ঞান তার থেকে অর্জুনের অনেক বেশী।

পরের দিনই যখন তার দুপুরের ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে অশোকা—'দাঁড়াও একটু' বলে জপের আসন ছেড়ে বাইরে এল সুনীল।

তারপর নিজে রকের ওপর বসে ওকেও সামনে বসতে ইঙ্গিত ক'রে প্রস্তাবটা খুলে বলল। সেই সঙ্গে অর্জুন যে কত ভাল ছেলে, পাত্র হিসেবে কত ঈপ্সিত তাও জানাতে ভুলল না। বরং যেন একটু সাড়ম্বরেই বলল।

কিন্তু নারীমানস-অনভিজ্ঞ সুনীল অবাক হয়ে দেখল, সুখ লজ্জা বা প্রত্যাশাতীত সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় মুখে যে অরুণাভা ফুটে ওঠা স্বাভাবিক—তার পরিবর্তে অশোকার মুখখানা রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে উঠল, কপালে কিছু কিছু ঘাম জমে তা ক্রমশ বড় বড় রেখায় কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত এবং বিশেষ ক'রে ঠোঁট দুটোও যে শব্দহীন কাতরতায় থরথর ক'রে কাঁপছে—তা একেবারে অন্ধ না হলে চোখে না পড়ার কোন হেতু নেই।

তারপর স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'আমি কি কোন অপরাধ করেছি এর মধ্যে—আপনার কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেছি? করে থাকলেও না জেনেই করেছি, একেবারেই এমন কঠিন শাস্তি না দিয়ে আপনি আমাকে সাবধান করতে পারতেন।'

ব্যাকুল হয়ে উঠে সুনীল বলল, 'না না, ছিঃ! এসব বলছ কেন? আমি তো তোমার কথা ভেবেই—। এইভাবে ভিক্ষার জীবন ধারণ ক'রে থাকবে কেন মিছিমিছি! দীর্ঘজীবন তোমার সামনে পড়ে। হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়—।'

এ কথাগুলো অশোকার কানে গেল বলে মনে হ'ল না, সে শুধু তেমনিই ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি এবার সত্যিকারের কোন বিয়ে করতে চান—আপনার উপযুক্ত কোন পাত্রীকে? তাহলে আমি আর কোন কথাই বলতে চাই না, যা করতে বলেন করব।'

'তুমি কি পাগল, বিয়ে করলে তো কবেই করতে পারতুম। তাহলে এভাবে এতকাল কাটাব কেন, কোন জীবিকার চেষ্টা না দেখে! এই বয়সে এই অবস্থায় বিয়ে! লোকে শুনলে হাসবে যে।'

'তাহলে আমাকে দয়া ক'রে আর পায়ে ঠেলবেন না। জীবনে অনেক দুঃখ অনেক অসম্মানের পর যে স্বাদ পেয়েছি, এর চেয়ে বড় কোন সুখ বা ঐশ্বর্যের কথা ভাবতেও পারি না। আমার মতো নরকের কীট গুরুপত্নীর আসন পেয়েছি—এর যে কী সুখ তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। যদি সত্যিই কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে থাকি—এই সামান্য সেবার অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত

করবেন না।'

মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল সুনীল প্রায় দু'তিন মিনিট। তারপর বললে, 'না, ঠিক বিঘ্ন যাকে বলে তা তুমি ঘটাও নি। কিন্তু কী জানো, এটা এখন আমার একটা দায়িত্ব বলে মনে হচ্ছে। যতটা নির্বিকার থাকব বলে ভেবেছিলুম, ততটা থাকতে পারছি না। তোমার ভবিষ্যতের চিন্তাটা বার বার উদ্বিগ্ন ক'রে তুলছে। তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, পরে হয়তো একমুঠো খেতেও পাবে না। তুমি সুখী নিরাপদ হয়েছ জানলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। এখনই ব্যস্ত হয়ো না, তাড়াতাড়ি কিছু উত্তর দিতে হবে না, যার হাতে যেখানে দিতে চাইছি সেখানে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। তোমাদের বিয়ে হয়ে গেল আমি এ জায়গা ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব—যাতে এসব কথা লোকে তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।'

অশোকা উত্তর দিল দিন তিনেক পর। দিল বলা ভুল, সুনীল পেল সে উত্তর। প্রতিদিনের মতো শেষরাত্রে উঠে সুনীল দেখল তার দরজার সামনে ঢিলচাপা একখানা চিঠি। হাতের লেখা এই প্রথম দেখল, তবু অশোকারই চিঠি বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। লেখা ছিল—

"আপনি নিশ্চিন্ত হোন, শান্ত হোন, আমার দায়িত্ব নিয়ে আমিই দূরে সরে গেলাম। আপনার দেওয়া এই সিঁদুর আপনি যদি কেড়ে নেন তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না, বরং এইটুকু সম্বল ক'রেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াব—এই সিঁদুরই আমার বর্ম। আত্মরক্ষার জন্যেই দুখানা শাড়ি গেরুয়ায় ছুপিয়ে নিয়েছি, হয়তো অন্যায় হয়েছে, সন্ন্যাস না নিয়ে গেরুয়া পরা—তবে মনে হয় এ অপরাধ আপনি ক্ষমা করতে পারবেন। তবে এ গেরুয়া কাপড়, সিঁদুরের অমর্যাদা করব না—করতে দেব না, এটুকু জানবেন। তেমন অবস্থায় পড়লে দেওয়ালে কি মাটিতে মাথা ঠুকে মরব বরং। তবে আমার কোন বিপদ আর আসবে না, আপনি দয়া ক'রে আমার কথা আর ভাববেন না। কেবল একটি শেষ ভিক্ষা—আপনি আর কোথাও যাবেন না, আপনার শরীর মোটেই ভাল নয়, এখানে অনেকে আপনাকে ভালবাসে, অসুখ হলে তারা দেখবে। এটুকু এতদিনে জেনেছি। প্রণাম নেবেন—ইতি দাসী অশোকা।"

আজ বছর দু-তিন আগের ঘটনা। অশোকার আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। কেউ খোঁজেও নি অবশ্য তেমন ক'রে। কে খুঁজবে? খুঁজে লাভই বা কি? কিন্তু তার শেষ অনুরোধটাও বোধ হয় সুনীল রাখতে পারবে না। শুনছি সুনীল তার গুরুদেবের কাছে সন্ন্যাস দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। গেরুয়া পেলে উত্তরকাশী বা ঐ রকম কোন দুর্গমতীর্থে চলে যাবে।

সে কি তার স্ত্রীকে খুঁজতে যাচ্ছে? কে জানে!

সংস্কার

এতকাল পরে এইখানে এসে বলাইদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—কে জানত! বিহারের এই একটি সিকি শহর—গণ্ডগ্রাম বলাই উচিত,—এইখানে!

এক কালে, যখন বর্ধমানই কলকাতার বাবুদের কাছে পশ্চিম ছিল—মধুপুর দেওঘর ছিল পশ্চিম-কল্পনার সর্বশেষ সীমা—কাশী 'পৈরাগ' যারা বড়লোক, পাঁচটা অনুগত পরিজন নিয়ে যেতে পারত তারাই যেত—তখন কোন কোন ডিসপেপ্‌টিক্ মধ্যবিত্ত বাবু এখানে এসে দু হাজার তিন হাজার টাকা খরচ করে সম্পত্তি করেছিলেন, আট-দশ বিঘে জমি, একটি ছোট বাড়ি ও একটি ক'রে কুয়া।

কিন্তু তারপর সে মোহ ঘুচে গেছে। এখন দেওঘর মধুপুরেই কেউ যেতে চায় না, শিমুলতলায় বড় বড় বাড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে—কাশী হয়েছে যাওয়া-আসার পথে দু' তিনদিন 'হল্‌ট্' ক'রে বাজার করার জায়গা, কাশীতে চেঞ্জে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারে না আজকাল—এখন নৈনীতাল মুসৌরী রাণীক্ষেত মাউণ্ট-আবু কোদাইকানাল উটি ছাড়া কারও মন ওঠে না। আপিস থেকে ভাড়া পায় অনেকেই, তা না হলেও বোনাস আছে, ভাবনা কি? নিতান্ত যারা গোলা লোক তারাও দিল্লী আগ্রার স্বপ্ন দেখে। কেবল আত্মীয় থাকলে—খরচ হবে না বিশেষ জানলে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ জব্বলপুর কি বোম্বের কথা চিন্তা করে।

সুতরাং—জায়গাটার খুব শ্রী কোন কালেই গড়ে ওঠে নি, যেটুকু ছিল

সেও গেছে—এখন একেবারেই ভগ্নদশা, শ্রীহীন। এখন যে ক-ঘর বাঙ্গালী আছেন তাদের সকলেরই তিন-চার পুরুষের বাস, এখানেই জোতজমা ভাত-ভিক্ষে—বাধ্য হয়েই আছেন। চাকরিও এক-আধটা জুটিয়ে নিয়েছেন কেউ কেউ। উকীল-ডাক্তারও দু' চারজন আছেন। আধভাঙা একটা হাসপাতাল, ছোট ওজনের একটা আদালত, স্টেশন—এইগুলি কেন্দ্র ক'রে একটা একান্ত লক্ষ্মীছাড়া বাজার। সামান্য কিছু বাড়তি জিনিস কিনতে গেলেও বাস-এ চেপে কাছাকাছি মহকুমা শহরে কিম্বা কারখানা-শহরে যেতে হয়। তিন চারটে রুটের বাস চলে—এই যা রক্ষা।

এমন, এই প্রায় ভগবানের-ভুলে-যাওয়া জায়গায় কি করছেন বলাইদা?

এই প্রশ্নটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

বলাইদা এককালে—যাকে ইংরাজরা টেররিস্ট বা সন্ত্রাসবাদী বলত, আমরা বলতাম সহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামী—তাই ছিলেন। একুনে সতেরো বছর জেল খেটেছেন, বাকী অন্তরীণে বা নজরবন্দীতে কেটেছে সেও কোন্ না তেরো বছর। জীবন-যৌবন দেশজননীকে সার দিয়ে এখন ফসল ঘরে তুলছেন মাসিক দুশোটি টাকা রাজনৈতিক নিগৃহীতের পেনসন।

এ খবর শুনেছিলাম অবশ্য আগেই, আমাদের আর এক বন্ধু, ঐ দলের শিশিরের কাছে। সে বেচারী বুড়োবয়সে একেবারেই নাচার হয়ে পড়েছিল, কোন কাজকর্ম ছিল না, অনেক কাণ্ড অনেক লেখালেখি ক'রে সম্প্রতি কিছু পেনসন বাগিয়েছে। পায় নি বলেই—যারা যারা আগে থেকে এ সুবিধা ভোগ করছে তাদের খবর রাখত।

আমি এখানে এসেছি নিতান্তই একটি বৈবাহিক ব্যাপারে, মেয়ের পাত্র খুঁজতে। এখানের এক উকীলবাবু আছেন। তাঁর ছেলে ডাক্তারী পাস করে সরকারী চাকরি পেয়েছে—তাকেই যদি গেঁথে তুলতে পারি এই আশায়। উকীলবাবু বলেছেন, 'আপনাদের যা খুশি দেবেন'। সেইটেই সাংঘাতিক। যদি দয়া ক'রে একটা ফর্দ দেন—কী পেলে খুশি, তাহলে তবু নিশ্চিন্ত হই, ওঁদের আকাঙ্ক্ষার তল পাই একটা—সেই আশাতেই ছুটে আসা।

দুপুরে স্টেশনে নেমেছি, সন্ধ্যার আগে উকীলবাবুর দেখা পাব না। সুতরাং ওখানেই মুখ-হাত ধুয়ে একটা খাবারের দোকান থেকে চলনসই রসগোল্লা ও অপেয় চা খেয়ে হাটতলায় ঘুরছি, দেখি আমাদের বলাইদা মাথায়

গামছা চাপিয়ে মাগুর মাছ দর করছেন।

'বলাইদা আপনি এখানে! এখানেই থাকেন নাকি? এই ভগবানের-ভুলে-যাওয়া জায়গায়—না বেড়াতে এসেছেন?'

'আরে ভাই ভগবান ভুললেই মানুষ ভুলবে তার মানে কি? কিন্তু তুই কি করছিস? কখন, কবে এলি? কোথায় উঠেছিস?'

তারপর সব শুনে নিজে সঙ্গে এসে স্টেশন ঘর থেকে আমার ছোট্ট কাঁধ-ঝোলাটা সংগ্রহ ক'রে জোর ক'রে টানতে টানতে একটা সাইকেল-রিকশায় তুললেন। যত বলার চেষ্টা করি, 'অনর্থক আবার টানাটানি কেন, এই তো রাতের ট্রেনেই চলে যাব। উকীলবাবুর সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা কাজ—' উনি কোন কথাই শোনেন না, এক-একটা বাক্যের শুরুতেই দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দেন। বলেন, 'উকীল মানে আমাদের ভূপতিবাবু তো? তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমিও তোর সঙ্গে আসব'খন। কি কাল সকালে খবর দিলে উনিই যাবেন। ওঁর যা বাড়তি আশা—মানে সাধারণ যা খাট-বিছানা ড্রেসিং টেবিল আলমারি, ডাইনিং টেবল্ বাদে—তা আমি জানি। একটা ফ্রীজ, একটা রেডিওগ্রাম আর ছেলের স্কুটার। ওঁর ধারণা এর চেয়ে কম দেবার কথা মেয়েপক্ষ ভাবতেই পারবে না—বিশেষ উনি যখন ক্যাশ নিচ্ছেন না—তাই উনি যা খুশি দেবেন বলে তাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। তুই ভাবিস নি, ও আমি ঠিক ক'রে দেব। ফ্রীজটা দিতেই হবে, গিন্নীর শখ—রেডিওগ্রাম স্কুটার আমি কাটিয়ে দোব।'

অগত্যা যথেষ্ট বুক-ধড়ফড়ানি সত্ত্বেও—ফ্রীজের কত দাম, কোন্ আকারের দিলে মেয়েকে কথা শুনতে হবে না, চিন্তাটা যথেষ্টই উদ্বিগ্ন ক'রে রাখলেও—কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে রিকশায় চড়ে বসলুম।

এবং আবার সেই প্রশ্নেই ফিরে এলুম, 'আপনি এখানে কেন? কী ক'রে এলেন, কেন এলেন?'

'আমার আবার এখান ওখান কী রে?' সস্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে জবাব দিলেন, 'আমাকে এই টাকায় চালাতে হবে সুতরাং সেই বুঝে একটা থাকার স্থান নির্বাচন করা—এই তো মামলা। এ জায়গার মস্ত সুবিধে এই যে, ইচ্ছে হ'লেও খরচ করার মতো সুযোগের অভাব। কিছুই পাওয়া যায় না, কী কিনব? এই তো বাজারের ছিরি দেখলি। একটি মাত্র কাপড়ের

দোকান, সাড়ে তিনখানা মনোহারী—তাতেও আদ্দেক দরকারী জিনিসই মেলে না। এই জায়গাই তো আইডিয়াল আমার পক্ষে।'

আরও শুনলুম। কলকাতার এক কট্টর বিষয়ী লোক তক্কে তক্কে থেকে জলের দামে এখানে একটি—তাঁর ভাষায়—'প্রপার্টি' কিনেছেন। এক বিখ্যাত সাহিত্যিকের বাড়ি—তাঁর ছেলে নেই, কে এক ওয়ারিশকে বোকা বানিয়ে এগারো হাজার টাকায় চল্লিশ বিঘে পাঁচিল ঘেরা জমি আর একটা পুরানো বাড়ি কিনেছেন। মহা ধুরন্ধর লোকটি—কয়েকটা ভাঙা ঘর আর দালানের ইট আর কিছু পড়ে যাওয়া বড় বড় গাছ বেচেই এর মধ্যে নাকি চার হাজার টাকা উশুল করছেন। সেই টাকাতেই বাকী বাড়িটা সারিয়ে বসবাসযোগ্য ক'রে নিয়েছেন, এখনও আরও যা ইট পড়ে আছে তাতে একটা ছোট বাড়ি ক'রে ভাড়া দেবেন এই ইচ্ছা।

কিন্তু মহা চতুর লোকেরও মাথায় গোলমাল হয়।

কলকাতার লোক, এত জমি দেখে দিশাহারা হয়ে চাষ লাগিয়েছিলেন। কিন্তু সারা বছর থাকা তো সম্ভব হয় না, তাই একজন লোক রেখেছিলেন, একটি বাঙালী ছোকরা, সে শ'চারেক টাকা মেরে দিয়ে সরে পড়েছে। এখন একটি স্থানীয় সাঁওতাল রেখেছেন—কিন্তু তার ওপর খবরদারী করে কে? কোন সূত্রে যেন বলাইদার সন্ধান পেয়ে—উনি তখন এখানে এসে একটা ছোট বাড়িরই খোঁজ করছিলেন—কায়স্থ-পাড়ায় ঐ ভূপতিবাবু উকিলের বাড়িতেই এসে উঠেছিলেন এক বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে—রমণীবাবু গিয়ে চেপে ধরলেন। আলাদা একদিকে একটি ঘর আছে, বড় ঘর, তার দরজা বাইরের দিকে; রমণীবাবু ঐদিকে একটা বাথরুম আর রান্নার জায়গা ক'রে দিচ্ছেন—যদি বলাইদা গিয়ে থাকেন দয়া ক'রে। এক পয়সা ভাড়া লাগবে না, ফল-ফসল যত পারেন ভোগ করুন। মিস্ত্রি খাটাতে কি চাষের তদারক করতে হবে না—টাকার হিসেব রাখতেও বলবেন না উনি। ঐ লাঙ্গ সাঁওতালটাই করবে সব, নব্বুই টাকা মাইনে দিচ্ছেন কি আর মুখ দেখে—শুধু ও বেটা না রাতারাতি সব বেচে দেয় কি পুকুর-চুরি করে—এইটুকু কেবল নজর রাখা। তাছাড়া বাড়িতে কেউ না থাকলে দরজা-জানলা-সুদ্ধ চুরি হবে। গাছকে গাছ কেটে সাবাড় করাও আশ্চর্য নয়। সেজন্যে একজনের বাস করা দরকার।

লোকটা 'বদ্ধজীব', বলাইদার ভাষায়, কিন্তু খুব খারাপ লোক নয়। বৌটির সঙ্গেও কথা হ'ল, খুবই ভাল। বলাইদা রাজী হয়ে গেলেন। না বনে পরে অন্যত্র সরে যাবেন—তার আর কি! সেই থেকে এখানেই আছেন। ভালই আছেন। অবশ্য কিছু কিছু ঝক্কি পোয়াতেই হয়। টাকাপয়সার হিসেব থেকেও একেবারে অব্যাহতি পান নি। আপনিই ঘাড়ে এসে পড়েছে। তা ওঁরও তো কোন কাজ নেই, একটু দায়িত্ব মানুষের জীবনে থাকা ভাল—এই ভেবেই সে দায় বহন করছেন।

গল্প করতে করতে ওঁর বাসায় পৌঁছে গেলুম। বিরাট বাড়ি ছিল এক কালে, তার অল্পই মেরামত হয়েছে। এখনও বেশির ভাগ অংশ ভাঙাচোরা পড়ে। তার মধ্যে একদিকে পূর্বমুখো বলাইদার ঘর, সামনে একটু রোয়াকের মতো, তার একপাশে বাথরুম একপাশে রান্নাঘর। মূল বাড়ির সঙ্গেই যুক্ত—কিন্তু ভেতর দিকের দরজা না খুললে কোন সংস্রব নেই।

'তা আপনার রান্নাবাড়া এসব করে কে?'

বলাইদা দরজার তালা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করি।

হা-হা ক'রে হাসেন বলাইদা, বলেন, 'সেই ভাবনাটাই এখন প্রধান, কী বলিস? তাহলে স্টেশনে থলে রেখেছিলি কিসের ভরসায়?···আছে আছে, সে ব্যবস্থাও আছে। এখানে যে সাঁওতালটি এদের জমি দেখাশুনো করে, তাকেই দুবেলা খেতে দেবার বন্দোবস্তে রান্নার কাজটা করিয়ে নিই। রাঁধতে বিশেষ পারত না, এখন কোনমতে চলনসই হয়েছে। এতে দুটো সুবিধে, আমার মাইনে লাগে না—অথচ প্রায় সব সময়ই হাতের কাছে পাই এখানের লোক বলে, ওরও বাইরে যাবার কোন কৈফিয়ৎ নেই। আর মালিকেরও সুবিধে—বাড়ি যাচ্ছি বলে দু' তিনদিন ডুব দিতে পারে না। কিম্বা দু'চার ঘণ্টার জন্যেও কোথাও গিয়ে বসে থাকতে পারে না। চোখে চোখে থাকে, তাতে কাজও কিছু হয়। অন্তত পাহারাটা থাকে।'

ঘরে ঢুকতেই প্রথম যা চোখে পড়ল তা ঘরটায় অপরিসীম পরিচ্ছন্নতা। আসবাব সামান্যই। মালপত্র আরও কম। সামান্য একটি বিছানা। সবই বই, কিন্তু সে বই, কাপড়জামা, বিছানা সমস্তগুলিই সুন্দরভাবে গোছানো সাজানো।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখটা জুড়িয়ে গেল। বলে উঠলুম, 'বাঃ!

আপনার ভৃত্যভাগ্য তো ভালই দেখছি। ঘরদোর এমন পরিষ্কার রাখতে পারে—এ রকম একটা চাকর পেলে তো কলকাতার লোক মাথায় ক'রে রাখবে!'

'এ বুঝি তুই আমার সাঁওতাল চাকরের কারিগরি দেখলি! হায় হায়! ঐজন্যে কিছু হ'ল না তোর। এমনি ওরা আমাদের দেশের এই শ্রেণীর লোকদের থেকে অনেক পরিষ্কার—কিন্তু এ রুচি ওদের গড়ে উঠবে কোথা থেকে? এ তো আমার মেয়ে গুছোয় রোজ। আজও সকালে গুছিয়ে গেছে—'

মেয়ে!

চমকে উঠি। সে কি! মেয়ে আবার কোথা থেকে এল বলাইদার? এতদিন যা শুনেছি, বিয়ে তো করেন নি।...না কি গোপনে কোথাও বিয়ে ক'রে রেখেছিলেন?

বলাইদা আমার মুখের বিহ্বলতা লক্ষ্য ক'রে মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, 'আছে রে আছে। মেয়ে থাকতে হলেই বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই। বরং ঔরসজাত মেয়ের থেকেও এরা অনেক বেশী আপন হয়—এই কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েরা। বোস না, সাড়ে চারটে তো বেজে গেছে। একটু পরেই দেখতে পাবি। সে-ই এসে চা ক'রে খাইয়ে আবার ফ্ল্যাস্কে রেখে যায়। নইলে আর তোকে কী ভরসার টেনে আনলুম! আমার শ্রীমান লাঙ্গ সবই বুঝে নিয়েছে, কেবল ঐ চায়ের রহস্যটা আজও ওর মাথায় ঢুকল না।'

কথাটা তখনও বলছেন বলাইদা, মেয়েটি এসে পড়ল।

শ্যামবর্ণ, সাতাশ-আটাশ বয়স হবে হয়ত। দোহারা চেহারা, স্বাস্থ্যটি চমৎকার। মুখশ্রী খারাপ বলা চলে না আদৌ। চলনে-বলনে একটা অভিজাত মর্যাদার ভাব আছে—কিন্তু তা উদ্ধত নয় কোথাও।

'কি রে বেটি, ইস্কুল পালালি নাকি? বাপীর গেস্ট এসেছে এর মধ্যেই খবর দিলে কে? নাকি হাত গুনছিস আজকাল?'

স্মিত মুখে মেয়েটি উত্তর দিলে, 'তোমার জন্যে ইস্কুল পালাতে হলে আমাকে আর চাকরি করতে হবে না; তোমার তো বেলা দেড়টা দুটো থেকেই চা খেতে ইচ্ছে হয়, মিছিমিছি গেস্টের দোহাই পাড়ছ কেন?...কাল ক্লাস

নাইনের মেয়েরা ভলিবলে ক্লাস টেনকে হারিয়ে দিয়েছে, এই জন্যে দু পিরিয়ড আগে ছুটি পেয়েছে তারা। আমার লাস্ট পিরিয়ড নাইন-এ, তাই আমারও এটুকু ফাউ মিলে গেল।'

বলতে বলতেই হাত-পা ধুয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মেয়েটি। স্টোভ জ্বালার গন্ধ পেলুম একটু পরেই।—আরও খানিক পরে দেখি দুটো প্লেটে খানকতক ক'রে লুচি, আলুভাজা আর দু'কাপ চা এনে সামনে রেখে গেল।

'কী রে, ঘি কোথায় পেলি—শান্তি? ঘি তো ছিল না। লুচিটা হ'ল কি করে?' দেখলুম খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন বলাইদা।

'বা রে! আচ্ছা মানুষ তুমি। ঘি তো তোমার সামনে দিয়েই সকালে নিয়ে এলুম। তুমি তখন এইখানে বসে লাঙ্গকে লেকচার ঝাড়ছ—মিথ্যে বলার অপকারিতা বোঝাচ্ছ!' রান্নাঘর থেকেই জবাব দিলে শান্তি, 'ও আমার এক ছাত্রী এনে দিয়েছে তার বাড়ি থেকে। কেমন খাচ্ছ, ঘি'টা ভাল?'

'খুব ভাল, খুব ভাল।' জবাব দিলেন বলাইদা, 'দাম দিতে হবে না শুনে আরও ভাল লাগছে।'

আমাদের চা-জলখাবার খাওয়া হ'লে বাসনগুলো ধুয়ে গুছিয়ে রেখে বঁটি পেতে রাত্রের তরকারির কুটনো কুটতে বসল শান্তি। কী রান্না হবে, আমি থাকব কিনা—এসব কোন প্রশ্নও করল না। কোটা আনাজ ধুয়ে সাজিয়ে রান্নাঘরে চাপা দিয়ে রেখে রাত্রের মতো আটা, তেল-মশলা বার ক'রে গুছিয়ে রাখল। তারপর একাই কোথা থেকে একটি দড়ির খাটিয়া বয়ে এনে ঝেড়ে মুছে দক্ষিণের জানলাটার সামনে পেতে বলাইদার বিছানার মধ্যে থেকে তোশক এবং বাক্স থেকে ধোয়া চাদর বার ক'রে পরিপাটি বিছানা পেতে দিল একটা।

নিঃশব্দেই ক'রে যাচ্ছে কাজগুলো। বলাইদাও নীরবে বসে দেখছেন। তাঁর দুই চোখ দিয়ে যেন স্নেহ আর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে। কোন প্রশ্নই করল না শান্তি, যেন সব বলা-কওয়া আছেই, বা ছিল। আমি যে আসব তাও জানা—থাকব তাও।

বাড়তি বিছানাটা যে আমার জন্যেই পাতা হচ্ছে সেটা অনুমান মাত্র—মুখে কেউই বলে নি। তবু থাকতে না পেরে বললুম, 'ওটা কি আমার জন্যে

করছেন ? কিন্তু আমি তো রাত্রের প্যাসেঞ্জারেই ফিরে যাবো। সেই রকমই বলা-কওয়া আছে বাড়িতে—'

মুখটিপে একটু মিষ্টি হাসল শান্তি, বলল, 'বাপীর পাল্লায় পড়েছেন, দেখুন কতদিনে ছুটি পান !'

'না, না।' ব্যস্ত হয়ে উঠি, 'কত দিন করলে চলবে কেন ? বাড়িতে ভাববে। তাছাড়া আপিস আছে—'

এবার বলাইদাই বাধা দিলেন, 'আপিস তো সেই পরশু, কাল তো রবি-বার। আর বাড়ি ? সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে'খন। কাল সকালেই একটা টেলিফোন করিয়ে দোব ডাক্তার সরখেলের ওখান থেকে। তুই স্থির হয়ে বোস দিকি, আজ রাত্রে তোর যাওয়া হবে না, নিশ্চিন্ত থাক।'

শান্তি আর কথা কইল না। ততক্ষণে এধারের কাজ সারা হয়ে গেছে তার। সব গোছগাছ শেষ, যে আসবে তার শুধু উনুনে আঁচ দিয়ে বসে খুন্তি নাড়া ছাড়া কোন কাজ থাকবে না। মায় আমার জন্যে প্রস্তুত বিছানার পাশে কোথা থেকে একটা প্যাকিং-বাক্স এনে উপুড় ক'রে রেখে একটা কাচের ডিকেণ্টারে জল আর একটা গ্লাসও রেখে যেতে ভুল হ'ল না।

তারপর কাপড়টা একটু টেনে নামিয়ে ভদ্রস্থ ক'রে নিতে নিতে বলল, 'তাহলে আমি এখন চললাম। রান্নাটাও ক'রে দিয়ে যেতে পারতুম কিন্তু অতক্ষণ থাকা চলবে না। বেরোবার আগে দেখে এসেছি বড়মার জ্বর এসেছে। বামুনদি অবিশ্যি আছেন, তবে তার বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম, যদি জ্বর খুব বাড়ে ডাক্তার ডাকবার কথাও মনে পড়বে না।'

বলাইদা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বুড়ীর জ্বর হয়েছে ! এই ছাখ কাণ্ড। যা যা ! তাহলে এত দেরি করলি কেন মিছিমিছি ? চা-খাবার আমিই ক'রে নিতুম। যা, আর দেরি করিস নি।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বুড়ীর একটু জ্বর ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে ভুল বকতে আরম্ভ করবে, আর বিছানা-মাদুর নোংরা করবে। শান্তি ছাড়া সে সব সাফ করবে না কেউ, সেই অবস্থায়ই ফেলে রাখবে।'

শান্তি যেতে যেতে বলে গেল, 'কাল আমি খুব ভোরে এসে চা ক'রে দিয়ে যাব, রুটিও একটা নিয়ে আসব'খন। যদি পাঁচটার মধ্যে না আসি তাহলে বুঝবে আর এলুম না।'

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বাইরের রকে মাদুর পেতে বসে বলাইদাকে চেপে ধরলুম, মেয়েটি কে, বলাইদা কোথা থেকে পেলেন, কী যোগাযোগ—সেই কৌতূহলে।

বলাইদা খুব খানিকটা হেসে নিলেন, যেন খুব মজা হয়েছে একটা—আর সে মজা যে হবে তিনি জানতেন—এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর বললেন, 'তুই যে এই প্রশ্ন করবি আমি অনেকক্ষণই জানি, পেট ফুলে মারা যাচ্ছিস কৌতূহলে, তা কি আর বুঝতে পারি নি! শুধু কতক্ষণে মুখ ফুটে বলবি সেই অপেক্ষাই করছিলুম।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'মেয়েটা বড্ড ভাল রে, ডবল এম-এ, এই বিহারে যেখানে-খুশি প্রফেসারী পেতে পারত, পি. এচ. ডি. করছিল। স্কলারশিপও পেয়েছিল একটা—এক কথায় সব ছেড়ে এসে এই একটা জঙ্গলে মাস্টারীর চাকরি নিলে কেন জানিস? ওর ঐ বড়মা, ঐ বামুন বুড়ীর জন্যে। অথচ বুড়ীর এককুড়ি অন্তত নিকট-আত্মীয় আছে। কেউ দেখে না, খোঁজও নেয় না কেউ। বুড়ীটা আহাম্মুকের মতো বিষয়-আষয় সব মেয়ে-জামাই, বেটার বৌ আর নাতি-নাতনীদের ভাগ ক'রে দিয়ে বসে আছে—লেখাপড়া ক'রে; কে ভয় দেখিয়েছে—নইলে অনেক টাকা ট্যাক্স লাগবে ওদের, সেই জন্যে। এখন এক নাতি শুধু মাসে পঞ্চাশটি ক'রে টাকা পাঠায় আর একজন বুঝি রাঁধবার লোকের মাইনে দেয়—এই মোট আয়। এখানের জমিতে কিছু চাষ হয় তাই রক্ষে। তাও এই মেয়েটা আসার পর কিছু ধান গম ঘরে উঠছে—নইলে আগে এক দানাও আদায় হ'ত না। কেন দেবে, কে খবরদারি করবে বল!'

'তা আপনার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা হ'ল কোথায়? আপনি তো এখানে বেশী দিন আসেন নি?'

'শান্তির সঙ্গে পরিচয় আমার রাঁচিতে। আমি তো অনেক বছর রাঁচিতে ছিলুম। অনুকূল মহারাজের সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হয়ে যায়, উনিই এক অধ্যাপকের বাড়ি আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেন বিনা ভাড়ায়। সে ভদ্রলোক জিতেনবাবু মিশনারী কলেজে পড়ান, সেই সূত্রেই শান্তি ওর বাড়ি আসত যেত। তখন থেকেই আমি ওকে মেয়ে বলি, ও আমাকে বাপী বলে। আসলে ওর টানেই আমার এখানে আসা। ও বড়মার সেবা করতে এখানে

আসছে শুনেই আমি এখানে ভূপতিকে চিঠি লিখি, তারপর ডেরাডাণ্ডা তুলে একেবারে ওর বাড়িতে এসেই উঠি প্রথম।'

'ওঁর কে আছে—মানে শান্তির?'

'কেউ নেই। মানে মা বাবা ভাই নেই কেউ। আর যারা আছে—হয়ত আছে, আমি জানিনে ঠিক, তাদের থেকে এত দূরে এসেছে ও আজ—যে আর কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।

'আসল কথাটা তাহলে খুলেই বলি। তুই আর কত জিজ্ঞেস করব। মেয়েটা, তোরা যাকে ছোটজাত বলিস সেই ঘরের। বাউরী শুনেছিলুম, আমার লাঙ্গ বলে মুচি। ঠিক জানি না, আমি কোনদিন প্রশ্ন করি নি। ওদের ঘরে এমন শ্রীময়ী মেয়ে জন্মাবার কথা নয়, এমন আভিজাত্য—দেখলি তো চালচলন—হয়ত ওদের বংশে কারও কোনদিন খুব বড়ঘরের কারও সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল, এমন হামেশাই হয়—কী বলে স্পার্টামোজেন থিয়োরী না কি—তার ফলে সেই ধারাটা হঠাৎ এক-একজনের মধ্যে প্রকাশ পায়। সে যাক গে, ওর বাবা মা ছোট ভাই একদিনে মারা যায় কলেরায়। এসব দেশে যখন ঐ ধরনের রোগ দেখা দেয় তখন দু'তিনদিনে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। মেয়েটার সুকৃতি কি দুষ্কৃতি জানি না—মেয়েটা কিন্তু বেঁচে ছিল, ওর কিছু হয় নি। কেউ মুখে জল দেবার নেই, মেয়েটা পড়ে কাঁদছে—ও পাড়ায় তখনও যারা বেঁচে আছে তারাও কেউ ভয়ে যাচ্ছে না দেখে ওর ঐ বড়মা, ব্রাহ্মণের মেয়ে—বেশ পয়সাও'লা ঘরের বৌ—উনি গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

'তা নিয়ে খুব ঘোঁট, হৈচৈ, আন্দোলন। ছোট জাত, ওদের ছুঁলে নাইতে হয়, বামুন-বাড়ি এনে তোলা—বুঝতেই পারছিস! আমরা যতই বিবেকানন্দ গান্ধীর দোহাই পাড়ি, জাতের সংস্কার কারও যায় নি। তবু ভাগ্যি ভাল যে উক্ত বড়মার শাশুড়ী বেঁচে ছিল না, কর্তাও হাতধরা ছিলেন—তাই কেউ ত্যাগ করাতে পারল না। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছিলই। মেয়েটাকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন, দেখলেন লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, প্রথমেই ডবল প্রোমোশন পেয়ে গেল। এখানে তখন এক মিশনারী সাহেব ছিলেন, তিনি সব খবর রাখছিলেন, এবার এসে বড়মাকে বললেন, ওকে আমায় দিন, আমি ওর ভাল লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ক'রে দোব। বড়মা প্রথমে রাজী হন নি, তারপর ছেলে-

মেয়েদের, বিশেষ বৌমাদের বিদ্বেষ লক্ষ্য ক'রে—তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হয় না, ওর অত ভাল হয়—জ্বালা তো স্বাভাবিকই—শেষ পর্যন্ত সেই সাহেবের হাতেই দিলেন, কিন্তু শর্ত করিয়ে নিলেন—কুড়ি বছর বয়স হবার আগে ওকে কেউ ক্রীশ্চান করবে না, কি করার চেষ্টা করবে না। কুড়ির পরে ও যদি স্বেচ্ছায় হয় তো হবে।

'সেই সাহেবই ওকে রাঁচিতে নিয়ে যান। সেখানে মিশন হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। বরাবর স্কলারশিপ পেয়ে পড়েছে, তবু খরচও তো ঢের। পরে প্রকাশ পেয়েছিল—বড়মাই গোপনে বৌদের লুকিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন সাহেবকে—ওর খরচের জন্যে। সাহেব সে টাকা ওর হিসেবে জমা ক'রে দিয়েছিলেন, সেই সুদটা শুধু মিশন নিতেন, বাকী খরচ তাঁদেরই ছিল।

'তারপর—এম-এ পাস করল ইতিহাসে। সেবার সেকেণ্ড ক্লাস হ'ল বলে পরে ফিলজফীতে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেলে। রিসার্চ স্কলারশিপও পেয়েছিল, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। বড়মা নিজে খবর দেন নি, কার মুখে যেন শুনল যে এই দুরবস্থা বুড়ীর—মুখে জল দেবার কেউ নেই—সকলেই বাইরে, কেউ কলকাতা, কেউ পাটনা, কেউ ভাগলপুরে থাকে—এখানে এক বামনী রেখে গেছে—সে শুধু রান্না করে। ঐ যা বললুম, একজন বামনীর মাইনে আর একজন পঞ্চাশ টাকা খোরাকী পাঠায়, বলে বিধবার আর কি লাগবে! অথচ বিস্তর সম্পত্তি ছিল, সব ওরা পেয়েছে। এখানের জমিজমা পর্যন্ত লিখে দিয়ে বসে আছে বুড়ী, নেহাৎ তাদের কারও এর উপস্বত্ব নেবার গরজ নেই বলেই সেটা বুড়ীর ভোগে লাগছে তবু। শান্তি ওর এই অবস্থা শুনেই সব ছেড়ে চলে এল। পাদরীরা কত ক'রে বলেছেন, বলেছেন, তুমি টাকা পাঠাও তাঁকে, নইলে এখানে এনে রাখো, প্রোফেসররাও অনেক বুঝিয়েছেন—কারুর কথাই শুনল না। নেহাৎ আসবেই দেখে—ওর এক পুরানো অধ্যাপকই ইনফ্লুয়েন্স ক'রে চাকরিটি জুটিয়ে দিয়েছেন ; শ'দুই টাকার মতো বোধ হয় পায়, কি আর দু-দশ বেশি, এই বাজার দুটো-তিনটে লোক, খুব কষ্টেই চলে। বামনীও চাই, নইলে বুড়ী ওকে যতই ভালবাসুক, ওর হাতে ভাত খাবে না। দু-একটা টিউশনি করলে একটু সচ্ছলে চলত—তা এই আবার বুড়ো খোকাটি আছে, দুবেলা আমার খোঁজ না নিলে ওর চলে

না, টিউশনি করে কখন ?'

এই বলে বলাইদা যেন একটু করুণভাবে হাসলেন।

'তা আপনি জেনেশুনে এ সেবা নেন কেন ?

'নইলে ছাড়বে নাকি ? তুই ওকে চিনিস না। আমাকে তো এই জন্যেই জোর ক'রে নিয়ে এল। বললে, না হ'লে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। লেখা-পড়াই শিখুক আর যাই শিখুক—মেয়েছেলে তো। বলে, সেখানে বুড়ীর সেবা করতে হবে ঠিকই কিন্তু এখানে তোমাকে কে দেখছে ভেবে মুখে আমার অন্নজল রুচবে না !'

'তা বিয়ে-থার কোন কথা ওঠে নি ? এমন মেয়ে, কোয়ালিফায়েড—'

'সবই বুঝলুম। কিন্তু জাত ? তবে আর সংস্কারের কথা বলছি কেন ? ওর যা কোয়ালিফিকেশ্যন্—ওদের ঘরে কোন পাত্র মিলবে না। আর আমাদের বামুন কায়েত কি বদ্যির ঘরে কে ওকে বিয়ে করবে বল্ ?'

'হ্যাঁঃ! এখন আবার জাত! আমার ভাইপো বামুনের ছেলে শুঁড়ির মেয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে এল, মানিকদার ছেলে চাষাধোপার মেয়েকে, ললিত-দার মেয়ে দাড়ি কামানো নাপিতকে বিয়ে করল। চক্রবর্তী বামুনের মেয়ে, এম. এ পাস। ওসব কেউ মানে নাকি আজকাল !'

'ওরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সবজান্তা ঠাকুর, ওসবই আমি জানি। কিন্তু মূলেই যে ভুল করছিস, প্রেমে কেউ পড়লে তো! সেখানেই যে মুশকিল হয়ে গেছে—প্রধান বাধা ওর স্বভাব। দেখলি তো একটু নমুনা। এমনি খুবই মিষ্টি স্বভাব কিন্তু এমন একটা ডিগনিটি আছে, ওর সঙ্গে ছ্যাবলামি কি ফষ্টিনষ্টি করার কথা কোন ছেলের মনেই হবে না। অথচ প্রেম শুরু করার এই সবই তো রাস্তা। যদি কেউ ওর বাইরেটা দেখে ভয় না পেয়ে একটু সাহস ক'রে এগিয়ে যেত, তাহলে বোধ হয় মেয়েটার জীবন এমনিভাবে নষ্ট হ'ত না। আর কি বিয়ে হবে ? এই কুয়োর মতো জায়গা, কে-ই বা এখানে ওকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে।···তাছাড়া ঐ বুড়ী, সে যে কারও কথা না শুনে ওকে সেই মৃত্যুপুরী থেকে কোলে ক'রে তুলে এনেছিল—সেজন্যে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছে—সেই কথাটা কোনদিনই যে ভুলতে পারল না মেয়েটা। বুড়ীকে অসহায় ফেলে ও স্বর্গেও যাবে না! বুড়ী না মলে উপায় নেই।'

চুপ ক'রে বসে থাকি অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎই কথাটা মনে এসে

যায়, 'আচ্ছা, শান্তিও তো প্রেমে পড়তে পারত। তেমন কি একজনেরও দেখা পায় নি জীবনে ?'

চাঁদের আলোয় বসে কথা হচ্ছিল। বলাইদার মুখটা দেখতে কোন বাধা ছিল না। আমার প্রশ্ন শুনে বিচিত্র রকমের হাসি হাসলেন। প্রায় চুপি চুপি বললেন, 'তাও পেয়েছিল। কিন্তু সেও এক ট্র্যাজেডী। এমন অপাত্রে গিয়েই পড়ল ওর প্রেম যে, বোধ হয় সে ছেলেটার জীবনও ব্যর্থ হয়ে গেল।'

'কী রকম, কী রকম!' সোজা হয়ে বসে কৌতুকে ও কৌতুহলে।

'বলব ? বলেই ফেলি। তুই আর কাকে বলতে যাচ্ছিস, শুনলি যখন—সব শুনেই যা। ওর স্বভাব তো দেখলি—লোকের সেবা করা, স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া ওর একটা রোগ। প্রেমটা সেই পথ ধরেই এসেছিল।'

বললেন: 'যে অধ্যাপক—জিতেনবাবুর বাড়ি আমি ছিলুম তার বাগানের এক কোণে ছোট একটা ঘর ছিল। বাড়িও'লা ওটাকে বোধ হয় সার্ভেন্টস্ রুম হিসেবেই তৈরী করেছিলেন। কিন্তু জিতেনবাবুর চাকর বিষম ভীতু, সে বাড়ির মধ্যেই শুত। ঘরটা খালি পড়ে থাকে দেখে উনি মাসিক একটা সামান্য ভাড়ায় কলেজের গুর্খা দারোয়ানকে ভাড়া দিয়েছিলেন। ছোট্ট ঘর, টিনের চাল—গ্রীষ্মে যেমন গরম, শীতে তেমনি ঠাণ্ডা। তার মধ্যেই রান্না-খাওয়া-শোওয়া সব। কিন্তু অত বাছতে গেলে তাদের চলে না। এত কম ভাড়ায়—দু টাকা না তিন টাকায়—রাঁচি শহরে কেউ ঘর দেবে না তাকে, এই ভেবেই বরং রাজবাহাদুর কৃতজ্ঞ ছিল জিতেনবাবুর কাছে। জিতেনবাবুর কিছু সুবিধেও হয়েছিল, কলেজ যাওয়া-আসার সময় ওঁর ভারী পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে চলে যেত, জিতেনবাবুকে বইতে হ'ত না। এছাড়াও—বাজার দোকান অনেকখানি ক'রে দিত। খুব খাঁটি লোক ছিল রাজবাহাদুর, কোন দিন এক পয়সা গোলমাল কি তঞ্চকতা করে নি, জিতেনবাবু অনেক রকমে বাজিয়ে যাচাই ক'রে দেখেছেন।

'গুর্খা বটে কিন্তু সাধারণ নেপালীদের মতো নাক-চ্যাপ্‌টা গোল চোখ ছিল না। কে জানে ওরও পূর্বপুরুষের রক্তে কোন সঙ্করতা দোষ ছিল কিনা। রঙটা দুধে আলতা, খাঁড়ার মতো না হলেও মোটামুটি উঁচু নাক, চোখের টানটাও ভাল। এক কথায় খুবই সুন্দর দেখতে। একটু দোষ যা, ওদের জাতের মতোই—বেঁটে। কিন্তু তেমনি অধিকাংশ গুর্খা যেমন সিক্‌লি

ধরনের হয়, রোগা-রোগা, তেমন ছিল না। হাফপ্যান্ট পরত, পা দুটো দেখেছি—খুব বলিষ্ঠ গঠন ছিল। কলেজের মেয়েরা যারা এদিকে আসত, গায়ে পড়েই ওর সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত—এ আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি।

'শান্তিও জিতেনবাবুর বাড়ি আসত, সেই থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ। তারপর কবে যে আমি ওকে বেটি বলে ডাকতে শুরু করলুম আর শান্তিও আমাকে বাপী বলতে লাগল তার হিসেব কেউই জানি না। শুধু একদিন লক্ষ্য করলুম, মেয়েটা বলতে গেলে আমার সম্পূর্ণ ভারই নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। আমার দিক থেকে করার মধ্যে রাজনীতিটা ভাল ওর মাথায় ঢুকত না, সেইটে প্রায়ই বুঝিয়ে দিতুম, আর ভাল ভাল বই যোগাতুম সময়ে সময়ে।

'ইতিমধ্যে আরও একটা জট পাকিয়েছিলুম আমিই। জিতেনবাবুর বাড়ি থাকতুম, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আমার স্বতন্ত্র। কুকারে নিজেই রান্না করতুম, একটা লোক ছিল বাসনটাসনগুলো ধুয়ে দিয়ে যেত। অবশ্য জিতেনবাবুর কিচেন থেকেও প্রায়ই এটা-ওটা আসত, রসনাতৃপ্তির কোন অসুবিধা ঘটত না। রাজবাহাদুর আসবার পর কি খেয়াল হ'ল, ওর সঙ্গেই একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেললুম। সকালে ভাত ডাল আর একটা তরকারি ক'রে দশটাব সময় ঢেকে রেখে যেত, রাত্রেও রুটি আর একটা তরকারি ক'রে রাত নটা নাগাদ ঘরে পৌঁছে দিত। খোরাকি হিসেবে নয়, আমি—ওর সুদ্ধ চাল ডাল আটা আর কয়লার দাম দিতুম, রাজবাহাদুর বাকী যা সব্জী আর তেল নুন মশলা কিনত। তাতেও ও কৃতজ্ঞই ছিল খুব। জিতেনবাবুরা এ ব্যবস্থায় প্রথমটা খুব আপত্তি করেছিলেন, ওঁদের ওখানেই খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। এমনও প্রস্তাব করেছিলেন, যদি খরচের জন্যে আপত্তি হয়, আমি খোরাকি বলে কিছু টাকাও ধরে দিতে পারি, তাঁরা স্বচ্ছন্দে নেবেন। কিন্তু আমি রাজী হই নি, এক তো এ বেচারাকে এতটা সুবিধে দেখিয়ে কেড়ে নেওয়া। তাছাড়া আমি জানি ভদ্রমহিলার শরীর ভাল নয়। নিজের স্বামী-পুত্রকে তেমন অসুবিধে হলে একদিন চিঁড়ে বা পাঁউরুটি খাইয়েও রাখা যায়, পরের দায়িত্ব ঢের বেশী!

'শান্তি যখন আমার হাল ধরল তখন স্বভাবতই আমার খাওয়ার দিকেও নজর পড়ল। কে রাঁধছে, কী ভাবে রাঁধছে, কতটা নোংরা—দেখার জন্যে

বাহাদুরের ঘরেও যেতে লাগল। ছোটবেলা থেকে মিশন হোস্টেলে থেকেছে, সাহেব ও ক্রীশ্চানদের কাছে মানুষ—এ সব বিষয়ে সঙ্কোচ ওর স্বভাবতই কম। এই পরিচয়ের ফলে বাহাদুর ইদানীং ওরও এটা-ওটা ফাইফরমাশ খাটছিল, কলেজ থেকে বইয়ের বোঝা নিয়ে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসত। এসব কাজ স্বভাবতই সাগ্রহে করত সে। বাহাদুর মানুষটাও ভাল ছিল, সভ্য ভদ্র—তার ওপর অল্প বয়স—ওদের বয়স বোঝা যায় না, তবু মনে হয় তখন ত্রিশের নিচেই ছিল। হয়ত আরও কম।

'রাজবাহাদুরের ঘরটা ছিল বাগানের এক প্রান্তে, কিন্তু আমার বিছানায় বসলে সে ঘরের ভেতর অনেকখানি দেখা যেত। বুড়ো হয়েছি, বই পড়তে চশমা লাগে কিন্তু দূরের জিনিস ভালই দেখি। বই বা কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ওর ঘরের দিকে নজর পড়ত, আগেও পড়েছে—এমনিই চেয়ে থাকতুম হয়ত, এখন যে বিশেষ ক'রে দেখবার চেষ্টা করতুম তা নয়—আর দেখবই বা কেন, ঘনিষ্ঠতা যে হতে পারে দুজনের মধ্যে তা কখনও ভাবি নি।

'কিন্তু আগেই বলেছি, মেয়েটার স্বভাব ঐ রকম। ঘরে গিয়ে রান্না তদারক করত, অনেক সময় কুটনো কুটে দিত, মশলা কতটা দিতে হবে দেখিয়ে দিত, নতুন রান্নাও শেখাত এক-আধটা! এর মধ্যেই—ওদের ঘরকন্না কী রকম হয় তো জানোই—একা পুরুষমানুষ থাকে, তায় সার্ভেন্ট ক্লাস—দেখি এক-একদিন ওর ঘরও গুছিয়ে দিচ্ছে; বিছানা, আলনার কাপড়জামা,—দড়ির আলনাতেই—সাজিয়ে রাখছে। ওর ঘরে কীই বা জিনিস, যেটুকু আছে সেইটুকুই ছিমছাম ক'রে গুছিয়ে দিত। প্রথম প্রথম বাহাদুর প্রবল আপত্তি করত, উপুড় হয়ে পড়ত, হাতজোড় করত—মুখখানা লজ্জায় সঙ্কোচে আলতামাখা হয়ে উঠত—কিন্তু শান্তি কোন আপত্তি গ্রাহ্যই করত না। ওর মিশনারী শিক্ষায় মনের মধ্যে মনিব-ভৃত্যের মধ্যে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানও ছিল না, আমাদের যেটা থাকে।

'কাজেই, এতে বিস্মিত হই নি, বারণও করি নি।'

'কিন্তু বিস্মিত হলুম একদিন, যেদিন দেখলুম রাত্রে বাহাদুর রান্না করছে—সেদিনটা ছিল খুব গুমোটের দিন, মেঘলা দিনের ভ্যাপ্‌সা গরম—ঠাণ্ডার দেশের লোক, রাজবাহাদুরের ঘামটাও এমনিতেই ছিল বেশী—শান্তি পিছন থেকে দাঁড়িয়ে বাতাস করছে।

'একবার ভাবলুম একদিন একটু সতর্ক ক'রে দিই। কিন্তু মন-কেমন করতে লাগল শ্রীশ, সত্যিই বলছি। জানি তো অভাগা মেয়েটার জীবনে ঘর বাঁধার, ভালবাসার, ভালবাসা পাওয়ার সুযোগ কোনদিনই আসবে না— যদি অশ্বত্থামার মতো পিটুলি গোলা খেয়ে দুধের সাধ মেটাতে পারে তো মিটিয়ে নিক না! আমি হন্তারক হই কেন?

'তারপর থেকে কৌতূহল একটু বাড়ল, স্বীকার করছি। স্বাভাবিকও এটা নয় কি? প্রায়ই চেয়ে থাকতুম। দেখতুম কেমন একটু একটু ক'রে মমতার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা যোগ হচ্ছে, সেবাই পুরস্কার হয়ে উঠছে। ক্রমশঃ দেখলুম, বাইরে থেকে বাজার দোকান ঘুরে এলে, "দেখি কী এনেছে" বলে দেখার ছুতো ক'রে ছুটে গিয়ে আঁচলে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে, জামাটা খুলে নিয়ে নিজেই দড়িতে মেলে দিচ্ছে। ওদিক থেকে না দেখা যায় সেজন্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু সাবধান হ'ত দেখেছি, আপনা থেকেই দরজার পাশে দেওয়ালের আড়ালে আড়ালে থাকার চেষ্টা করত। কিন্তু আমার ঘর থেকে জানলার মধ্য দিয়ে যে সোজাসুজি দেখা যায়—সেটা খেয়াল করে নি অত। এদিকে আমার রান্নার তদ্বির দেখি আমার তদ্বিরের থেকে বেশী সময় নিচ্ছে। এক-একদিন রান্না শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ওদের খেয়াল থাকে না। হোস্টেলের পুরনো ছাত্রী, এখন কি বলে, আবাসিক—বলে রাত ক'রে গেলেও কিছু বলত না, কিন্তু অত রাত্রে একা যাওয়া ঠিক নয় বলে আমিই বলতুম রাজবাহাদুরকে একটু এগিয়ে দিতে। কে জানে সেই লোভেই রাত হ'ত কিনা।

'এইবার একদিন এল ক্ল্যাইম্যাক্স্। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শান্তিই বলেছে পরে।

'একদিন—সেটা এপ্রিল মাস, শেষ বসন্ত ওখানে—আমাদের রান্না ছিল না। পাশের বাড়ি কী একটা উপলক্ষে আমাদের সকলেরই নেমন্তন্ন, বাহাদুর শুধু নিজের মতো দুটো ভাত ফুটিয়ে নেবে, এই কথা ছিল। তবু আমাকে চা-টা খাইয়ে, ঘরদোর-বিছানা গুছিয়ে দিয়ে কতকটা অব্যেস মতোই শান্তি চলে গেল বাহাদুরের ঘরে। বাহাদুরের সেদিন মন ভাল ছিল না। নভেলী ভাষায় বলতে গেলে শেষ চৈত্রের আতপ্ত বাতাস বোধ করি ওর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, বাইরে থেকে এসে গুম খেয়ে বসে ছিল খাটিয়ায়,

জামাকাপড় কিছুই খোলে নি তখনও। বাড়িতে জিতেনবাবুরা কেউ নেই। আমার ভরসায় বাড়িতে চাবি দিয়ে চাকরকে সুদ্ধ নিয়ে পাশের বাড়ি চলে গেছেন। আমার কী একটা কৌতূহল হ'ল। বোধ করি সিক্‌স্‌থ্‌ সেন্স যে, আজ একটা কিছু অঘটন ঘটবে। জানলার নিচের পাল্লা বন্ধ ক'রে দিয়ে জানলায় একটু পাশ ক'রে দাঁড়ালুম। শান্তি ঘরে ঢুকে ওর পাশে গিয়েই বসল। বোধ হয় জিজ্ঞাসা করলে কি হয়েছে, বাহাদুর কোন উত্তর দিল না। শান্তি প্রতিদিনের মতো ওর জামা খুলে নিতে গেল—এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিল বাহাদুর।···মেয়েছেলে এসব কথা নিজের মন দিয়েই বোধ হয় বুঝতে পারে, তাই সে রাগ করল না, অভিমান করল না, একটু কি প্রশ্ন করল আবার শান্ত ভাবেই, তারপর পাশ থেকে পাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে বসল।

'এবার বোধ হয় বাহাদুরের মাথায় খুন চেপে গেল, সে পাখাখানা শান্তির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বাইরে বাগানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর কী রকম একটা অব্যক্ত শব্দ করতে করতে নিজেই ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

'শান্তি উদ্বিগ্নও হ'ল না, ব্যস্তও হ'ল না। স্থির নিস্তব্ধ ভাবেই বসে রইল। সম্ভবত অপেক্ষা করতে লাগল বাহাদুরের এই উন্মত্ততা শান্ত হবার। অথবা কে জানে, বাইরের এই স্তব্ধতা তারও অন্তরের উন্মত্ততার, বিপুল দুর্যোগেরই পূর্বাভাস কিনা।

'দেখলাম শান্তির অনুমানই ঠিক; খানিকটা পরেই বাহাদুর ঘুরে এল আবার।

'কিন্তু এবার আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল সে, ঘরে ঢুকেই হঠাৎ নিচে বসে পড়ে শান্তির পা দুটো ধরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। বোধ হয় ক্ষমা প্রার্থনাই করতে লাগল। শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষের অশ্রু হয়ত পুরুষের চোখে বিসদৃশ দেখায়, কিন্তু সে বন্যা মেয়েদের চিত্তে প্রলয় ঘটিয়ে দেয়, অন্তরের ভীরু প্রেমকে টেনে বার করে।

'শান্তিরও এতদিনের ধৈর্যের বাঁধ এক নিমেষে ভেঙ্গে গেল, সে বাহাদুরকে টেনে উঠিয়ে দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমো খেতে লাগল। এমন অবিরাম উন্মত্ত চুম্বন, এমন শ্বাসরোধকারী সে প্রণয়ের প্রকাশ যে, মনে হ'ল তার আবেগে আর উন্মত্ততায় বাহাদুর হাঁপিয়ে উঠছে।···

'এর পর আর জানলার কাছে দাঁড়ানো সম্ভব নয়—আমার পক্ষে।

'হয়ত ওদের এই উচ্ছ্বাস এই উন্মত্ততা চরমেই পৌঁছে ছিল, হয়ত শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছিল। জানি না। কখনও জিজ্ঞাসা করি নি। ··

'যেটা জানি সেটা হচ্ছে, সেদিন শান্তি প্রস্তাব করেছিল, "এসো আমরা বিয়ে করি।"

'যেন শিউরে উঠেছিল বাহাদুর।

' "না না, ছি ছি! কী বলছ! আমি তোমার পায়ের জুতোর ধুলোর চেয়েও যে ছোট! তোমার জুতো বইবারও যোগ্য নই। তুমি কত লেখাপড়া শিখেছ, কত বড়! ছিঃ! আমাকে বিয়ে করলে তোমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। সকলে যা-তা বলবে, তুনিয়ায় মুখ দেখাতে পারবে না।" '

'শান্তি চিরদিনই নাছোড়বান্দা—তা তো বুঝছিসই। সে বললে, "বেশ, চলো এখান থেকে তুজনেই চলে যাই—দূরে কোথাও, তুজনেই খেটে খাবো। লেখাপড়ার কথা কেউ জানতে পারবে না সেখানে। তাহলে তো লজ্জা নেই?"

'ওর জেদে তখনকার মতো রাজী হয়েছিল বাহাতুর, হতে হয়েছিল। কিন্তু সে তার যোগ্যতা বেশী জানত, তার জীবন সম্বন্ধে ধারণা ঢের বেশী—কী যেন বলিস তোরা—বাস্তবানুগ। সে বুদ্ধিমানের কাজই করল, পালাল। পরের দিন ভোর থেকে বাহাতুরকে আর দেখা গেল না।

'কে জানে হয়ত তার বাবা মা সমাজের কথাও ভাবতে হয়েছিল, হয়ত ঘরে বৌও ছিল একটা। তবে তাতেও হয়ত আটকাত না—মনে হয় তার কথাই সত্যি, তার ঐ কারণটা।

'হ্যাঁ, তোকে বলা হয় নি। বাহাতুর একখানা চিঠি লিখে রেখে গিছল। ঘর থেকে একটি জিনিসও নিয়ে যায় নি, জামাকাপড় পর্যন্ত না। এক কাপড়েই চলে গেছে। আমরা টেরই পেতাম না চিরকালের মতো গেছে বলে, যদি না ঐ চিঠিটা রেখে যেত। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি আমার দরজার বাইরে—কলেজের কী একটা চাবি ওর কাছে ছিল সেই থলোটা, আর একখানা চিঠি।

'নতুন হিন্দী শিখেছিল বাহাতুর, চিঠিটা হিন্দীতেই লেখা। শান্তিই পড়ল এসে।

'যা লেখা ছিল তার মর্ম এই দাঁড়ায়ঃ

"বাবুজী, আমি চললুম। যদি কোনদিন আপনার মেয়ের যোগ্য হতে

পারি, অন্তত কিছু লেখাপড়া শিখে একটা কোন লেখাপড়ার কাজ, কি ভাল ব্যবসা করতে পারি, যাতে ওর পয়সায় না খেয়ে ওকে ডালভাত খাইয়েও রাখতে পারি—সেই শক্তি হয়েছে বুঝি, ফিরে আসব আবার। যেখানেই থাক, খুঁজে বার করব। আমি জানিও—ও অপেক্ষা করবে। যদি না ফিরি—তা'হলে জানবেন যে হয় আমি হেরে গেছি, নয় তো মরে গেছি। বলবেন আমাকে মাফ করতে। ওর হুকুম রাখতে পারলুম না তার কারণ—ওর গলার পাথর হয়ে ওকে ডুবিয়ে মারতে পারব না।"

'সেই শেষ খবর তার। প্রথম ও শেষ চিঠি।

'আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি, ফিরেও আসে নি। সে হ'লও আজ প্রায় তিন বছরের কথা। অবশ্য লেখাপড়া শেখার পক্ষে এটা কোন সময়ই নয়। তবু—। কে জানে এখনও তার সে যোগ্যতার তপস্যা চলছে কিনা! কিম্বা হারই মেনেছে!'

———